শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি ॥

ভক্তের জয়

প্রথম উল্লাস

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী কর্ত্তৃক

বিরচিত।

(তৃতীয় সংস্করণ)

শ্রীগৌরপূর্ণিমা—চৈতন্যাব্দ ৪৫২।

প্রকাশক—

১১, চাল্‌তা বাগান সেকেণ্ড লেনস্থ

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী হইতে

শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ১।০ এক টাকা চার আনা মাত্র।

ABC
Banga.
891.4425
At.89 bh.

সিংহ প্রিন্টিং ওরার্কস্ ৩০, বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীশচীন্দ্ররঞ্জন দাস বি-এ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীগৌরবিধুর্জয়তি।

ভক্তের জয়

প্রথমবারের পূর্ব্ব-ভাষ।

জয় দিই কার?—ভক্ত না ভগবানের? ইহার উত্তরের জন্য বড়-একটা ভাবিতে হয় না। স্বয়ং ভগবানই ত শ্রীমুখে বলিয়াছেন—'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা'। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের ভাষাতেই ইহার অনুবাদটা শুনাইয়া দিই,—

"আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দঢ়॥"

তাই আমরা ভক্তের জয় ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলাম। এক কাজে দুই কাজই হইয়া গেল। ভগবানের জয় দিলে বোধ হয় শুধু ভগবানেরই জয় ঘোষণা করা হইত, কিন্তু ভক্তের জয়ে—ভক্তেরও জয়,—ভগবানেরও জয়।

ভক্তচরিত্রের ছত্রেছত্রে ভক্তের অপ্রতিহত প্রভাব প্রকাশিত;—ভগবানেরও ভক্ত-প্রীতির পূত-প্রবাহ প্রবাহিত। আর সেই ভক্ত-চরিত্র লইয়াই ভক্তের জয় দিগ্‌দিগন্তে প্রচারিত। আমাদের এ 'ভক্তের জয়' ও সেই ভক্ত-চরিত্র লইয়া।

পূর্ব্বে বাংলা ভাষায় রীতিমত ভক্তমাল ছিল না। নাভাজীর হিন্দী ভক্তমাল ও তাহার প্রিয়াদাসের হিন্দী টীকা অবলম্বন করিয়া

বাঙালী লালদাস (অপর নাম কৃষ্ণদাস) বাংলা পদ্যে ভক্তমাল গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাহা ছাড়া রীতিমত ভক্তমাল এদেশে আর নাই। উৎকলদেশে একখানি ভক্তমাল উৎকল ভাষায় প্রচারিত আছে। তাহার নাম "দার্ঢ্য-ভক্তি-রসামৃত"। আমাদের দেশে উক্ত গ্রন্থ-গত ভক্তচরিত্রগুলি অদ্যাবধি অপ্রকাশিত। অথচ ঐ চরিত্রগুলির ঐতিহাসিক মূল্য অল্প-বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। আমি আমাদের দেশবাসীকে ঐ চরিত্রগুলি শুনাইবার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া বাংলা ভাষায় তাহার প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভক্ত-চরিত্র প্রকাশের ভাষা আমার আয়ত্ত না থাকিলেও আশা আছে, ভবি-ষ্যতে কোন উপযুক্ত ভক্ত কবি পুষ্পিত ভাষায় ইহার সৌন্দর্য্য-সুষমা ফুটাইয়া তুলিবেন এবং কবিত্ব-গন্ধে দেশবাসীকে পরমা-নন্দিত করিবেন।

শেষ একটি কথা বলিয়া রাখি, আমি উৎকল-ভক্ত-চরিত্রের আক্ষরিক অনুবাদ করি নাই। আমাদের দেশের রীতিনীতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া—আমাদের ছাঁচে সেগুলিকে ঢালিয়া লইয়াছি। তজ্জন্য উৎকল-চরিত্রের কিছুকিছু কাটছাঁট অদলবদলও করিতে হইয়াছে। চরিত্র-চিত্রের স্বাভাবিক বিকাশ সাধন এবং ভক্তিরসের পরিপোষণের জন্যও স্থানেস্থানে অনেক কথা জোড়াতাড়া দিতে হইয়াছে। ভাল হইয়াছে—কি মন্দ হইয়াছে, জানি না, তবে 'উৎকল-বার্ত্তা' প্রভৃতি উৎকল ভাষার প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে আমার লিখিত এই ভক্ত-চরিত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক উদ্ধৃত করায়, ইহা যে তাঁহাদের অনুমোদিত, তাহা অনায়াসে অনুমান করিতে পারি।

দ্বিতীয় বারের বক্তব্য।

চারি বৎসর পূর্ব্বে—শ্রীগৌরাব্দ ৪২৫, শ্রীগৌরপূর্ণিমার দিন 'গণপতি ভট্ট' প্রভৃতি আটটি ভক্ত চরিত্র লইয়া যখন 'ভক্তের জয়' প্রথম এক খণ্ড প্রকাশ করি, তখন ইহার দ্বিতীয় বার মুদ্রাঙ্কণের কথা দূরে থাকুক, অপর খণ্ড প্রকাশের তেমন আশাও করিতে পারি নাই। সেই কারণেই এই প্রথম খণ্ডের সহিত 'প্রথম উল্লাস' এই শব্দ সংযোজিত করিতেও সাহসী হই নাই। কিন্তু ভক্ত ও ভগবানের কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হইল—এই নাটক-নভেলের দেশে—ডিটেক্‌টিভের গল্পের রাজত্বে অল্প দিবসের মধ্যেই "ভক্তের জয়" শ্রেণীর গ্রন্থেরও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উল্লাস প্রকাশিত হইয়া গেল, প্রথম উল্লাসের দ্বিতীয় সংস্করণও অদ্য প্রকাশিত হইল। জয় অমিত-শক্তি-সম্পন্ন ভক্তের জয়,—ভক্তবৎসল ভগবানেরও জয়!

এই সংস্করণে বিশেষ যে কিছু নূতনত্ব সাধিত হইয়াছে, তাহা নহে সেই আটটি ভক্তচরিত্রই আছেন, ভাষা ও বর্ণনাও তাহাই আছে; কেবল স্থানেস্থানে একটুআধটু পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র।

লোকপরম্পরায় শুনিতে পাই কোন কোন সমালোচকের সমালোচনাতেও দেখিতে পাই, এই গ্রন্থগত চরিত্রগুলি 'অতিপ্রাকৃত' —ইহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। ভগবান্ এবং ভক্তের চরিত্র তো অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক হইবারই কথা। ভগবান্ প্রকৃতির অতীত, তাঁহার শক্তিতে সম্পন্ন ভক্তও তাঁহারই মত প্রকৃতির অতীত। সুতরাং এই প্রকৃতির রাজ্যের সাধারণ লোকের সহিত ভক্ত বা ভগবানের চরিত্রগত একতা কখনও হইতেই পারে না; চিরদিনই তাহা লোকাতীত-শক্তি-সম্পন্ন হইবেই হইবে। কাহারও বিশ্বাস অবিশ্বাসের মুখাপেক্ষা করিয়া তাহা কখনও আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিতে পারে না। যে, ভাগ্যবান, সে-ই ভক্ত ও ভগবানে

এবং তাঁহাদের অলৌকিক আচরণে বিশ্বাস করিতে পারে, অপরে তাহা পারিবে কোথা হইতে ?

আমাদের দেশে তেমন ধারাবাহিক 'ইতিহাস' নাই, অলস আমাদেরও তেমন অনুসন্ধান-সামর্থ্য নাই। তাই সকল চরিত্রগুলির কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিবারও উপায় নাই। কিন্তু, বলিতে কি, আমি যতই অনুসন্ধান করিতেছি, ততই এই সকল চরিত্রের কিছু-না-কিছু প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেছি। এই প্রথম উল্লাসে বর্ণিত গণপতি ভট্টের চরিত্রে অবিশ্বাস করা যায় না; কেননা, আজিও স্নানযাত্রার দিন শ্রীজগন্নাথদেবের গণেশবেশ হইতেছে। বন্ধু মহান্তির বংশ আজিও ৺পুরীধামে রহিয়াছেন, দেউলকরণের কার্য্য তাঁহাদের এত দিন সমভাবেই চলিয়া আসিতেছিল, অল্প কয়েক বৎসর মাত্র গিয়াছে। কারণ এখন যিনি আছেন,—তিনি উক্ত কর্ম্মের উপযুক্ত নহেন। দ্বিতীয় উল্লাসে বর্ণিত জগন্নাথ দাস এবং তৃতীয় উল্লাসে বর্ণিত সালবেগের সমাধি ৺পুরীধামে আজিও বিদ্যমান। তিলিচ্ছ মহাপাত্রের বংশও তথায় জাজ্জ্বল্যমান। এসকলও কি অবিশ্বাস্য ? অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় অনেক চরিত্রেরই এইরূপ প্রত্যক্ষ নিদর্শন এখনও পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বিশ্বাস করিবার উপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহের জন্য যেটুকু আয়াস স্বীকার আবশ্যক, সেটুকু করে কে ? তদপেক্ষা যাহা সহজসাধ্য—সেই অবিশ্বাস করাই অলস বাঙ্গালীর পক্ষে সাজে ভাল। এবার আর অধিক কথা বলিবার কিছুই নাই। ইতি—

শ্রীশ্রীঝুলনপূর্ণিমা ; শ্রীগৌরাব্দ ৪২৯
মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেন
সিমুলিয়া, কলিকাতা।

ভক্ত-চরণরেণু-প্রার্থী
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

ভক্তের জয়

সূচী-পত্র

কৃষ্ণের সমতা হইতে বড় ভক্তপদ।

আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত প্রেমাস্পদ ॥

আত্মা হৈতে কৃষ্ণ 'ভক্ত বড়' করি মানে।

তাহাতে বহুত শাস্ত্রবচন প্রমাণে ॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

ভক্তের জয়

গণপতি ভট্ট

(শ্রীশ্রীজগন্নাথের গণেশবেশ।)

উত্তরখণ্ডে কর্ণাটদেশ। কর্ণাটের কাণিয়ারি গ্রামে এক সর্ব্বসদ্‌গুণ-সম্পন্ন বেদ-বিদ্যা-বিশারদ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার নাম—গণপতি ভট্ট। ভট্টের ভগবানে অচলা ভক্তি। বিষয়চিন্তা ছাড়িয়া ভগবানের চিন্তাতেই তিনি অহরহ নিমগ্ন থাকিতেন। সদাই ভাবিতেন,—এ বিশ্বসংসারের সকল সামগ্রীই,—পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ সকল প্রাণীই,—সুর-অসুর-দিক্‌পালাদি সকলেই বারংবার যাতায়াত করিতে থাকে, কেবল একমাত্র পরব্রহ্ম জগন্নাথই নিত্য সত্য; তাঁহার যাওয়াও নাই, আর আসাও নাই। তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াই সকল প্রাণী সংসারের পারে গমন করে। তাঁহার কৃপা ব্যতিরেকে জীবের উদ্ধারের আর অন্য উপায়ই নাই। কিন্তু হইলে কি হয়, তাঁহাকে পাই কোথায়? সকল শাস্ত্রেই তো দেখি,—তিনি আমাদিগের ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর। তাঁহাকে না পাইলে, তাঁহার কৃপা অধিকার না করিতে পারিলেও তো মুক্তিলাভের অন্য উপায়

নাই। এখন করি কি? আচ্ছা, ভগবানে যখন সকলই আছে, তখন তাঁহাতে এটা আছে ওটা নাই,—এ কথাও তো বলিতে পারা যায় না। অণুও তিনি বৃহৎও তিনি, সগুণও তিনি নির্গুণও তিনি, সূক্ষ্মও তিনি স্থূলও তিনি। তিনি নন—এমন কিছুই যখন এ সংসারে থাকিতে পারে না, তবে তাঁহার—ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপের মত ইন্দ্রিয় ও মনের গোচর স্থূল রূপও তো থাকিবার কথা। আহা, তাঁহার সেই স্থূল রূপ কোথায়—কোন্ পুণ্যধামে বিরাজ করিতেছেন? যদি তত্ত্ব পাই, তখনই তাঁহার উদ্দেশে প্রধাবিত হই; এই চর্ম্মচক্ষে তাঁহাকে দর্শন করি, আর তাঁহাকে দর্শন করিয়া যাতনাপথ অতিক্রমপূর্ব্বক পরমানন্দময় মোক্ষপদের অধিকারী হই। আহা, সেই শুভদিন আমার কবে হইবে?

ভট্ট ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া কেবল এই কথাই ভাবেন, আর তন্ন তন্ন করিয়া, সকল শাস্ত্র অনুসন্ধান করেন। এইরূপে কিছু দিন যায়; ভট্টের উৎকণ্ঠার আর সীমা পরিসীমা নাই। শাস্ত্র দেখিতে দেখিতে একদিন তিনি ব্রহ্মপুরাণে দেখিলেন,—

"স্থূলস্বরূপ গোটি ধরি। ব্রহ্ম অচ্ছন্তি নীলগিরি॥
তাঙ্কু দেখন্তি যেউঁমানে। মুকত হুয়ন্তি দর্শনে॥
ন গমে যম দরশন। সকল শাস্ত্রে এ প্রমাণ॥"

পরমব্রহ্ম স্থূলস্বরূপ ধারণ করিয়া শ্রীনীলাচলে বিরাজ করিতেছেন। যে ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিবে, সে-ই মুক্তিপদের অধিকারী হইবে। তাহাকে আর যমভবনে যাইতে হইবে না।

ব্রহ্মপুরাণের এই বচন পাইয়া ব্রাহ্মণ আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন। ইষ্টদেবতার ন্যায় বচনটি হৃদয়পদ্মে ধারণ করিলেন। তখন তিনি নির্ব্বেদভরে প্রাণেপ্রাণে বলিয়া উঠিলেন,—

"বোইলা—ধিক এ সংসার। ধিক এ মায়াজাল মোর।
ধিক মো দারা স্নুত ধন। ধিক অটই এ জীবন॥
এ মর্ত্ত্যপুরে দেহ ধরি! ব্রহ্ম অচ্ছন্তি নীলগিরি॥
আজর যাএ মুঁন জানে। ভ্রমুঁ অচ্ছই অকারণে॥
যাহাকু নয়নে দেখিলে। জীব নিস্তার হোএ ভলে॥
যে গতাগত পথ জাণি। রহে ব্রহ্মর দেহে মণি॥
সে ব্রহ্ম চ্ছাড়ি মূঢ়পণে। মুঁ এথি থিবি কি কারণে
দারা তনয় ধন যেতে। কে যিব মোহর সঙ্গতে॥
দেহে সমর্থ থিবা যাএ। সবুরি বন্ধু হোই থাএ॥
বয়স হেব যেবে শেষ। দারা-পুত্রকু হোএ বিষ॥
আউ কে অটই কাহার। দেহ ত নোহে আপনার॥"

এ সংসারে ধিক্, আমার এ মায়াজালে ধিক্, স্ত্রী-পুত্র-ধনে ধিক্, এ জীবনে ধিক্। সেই ব্রহ্মবস্তু এই মর্ত্ত্যপুরেই দেহ ধারণ পূর্ব্বক নীলাচলে অবস্থান করিতেছেন, আজিও আমি জানিতে না পারিয়া অকারণে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি। আহা! যে ব্রহ্মকে নয়নে দেখিলে জীব অনায়াসে নিস্তার লাভ করে এবং গতায়াতের পথ অবগত হইয়া সেই ব্রহ্মের দেহেই লীন হইয়া যায়; হায়! আমি অতিশয় মূঢ়, তাই তাঁহাকে ছাড়িয়া এতদিন এই অসার সংসারে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি। কিন্তু আর এ

সংসারে থাকি কেন ? স্ত্রী পুত্র ধন কেহই ত আমার সঙ্গে যাইবে না ? যত দিন দেহ সবল, ততদিনই এই দেহ সকলের বন্ধু হইয়া থাকে। বয়স শেষ হইয়া আসিলে এই দেহই আবার স্ত্রী-পুত্রেরও 'বিষ' বলিয়া বোধ হয়। অহো ! এই দেহই যখন আপনার নহে, তখন আর অন্য কে-ই বা কাহার ?

ভট্ট মনেমনে এইরূপ আলোচনা করিয়া অবধারণ করিলেন, আমি অবিলম্বে নীলাচলে গমন করিব এবং সেই ব্রহ্ম দর্শন করিয়া অনায়াসে মুক্তিপদ লাভ করিব। তিনি আর কালবিলম্ব করিলেন না,—সংসারের মায়া-মমতা ও দেহের আশা-ভরসা বিসর্জ্জন দিয়া বাটীর বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সঙ্গের সম্বল রহিল কেবল সেই ব্রহ্মের অমৃতময় নাম আর ব্রহ্মপুরাণ।

দিনের পর দিন—মাসের পর মাস চলিয়া গেল, কিন্তু ভট্টের পথ-চলার আর বিরাম নাই। ভিক্ষা জুটিল তো ভিক্ষান্ন, না হয় কেবল পত্র ফল মূল—যে দিন যাহা জোটে, ভট্টের তাহাই আহার ; কিছু না জুটিলে উপবাস করিতেও তিনি কাতর নহেন। পানীয় জলেরও তাঁহার বিচার নাই ; তা নদীরই হউক, কূপেরই হউক কিংবা পুষ্করিণীরই হউক। পিপাসার সময় একটু পাইলেই হইল। এক ব্রহ্ম-চিন্তা ছাড়া ভট্টের আর অন্য চিন্তাও নাই—ভয়ও নাই। ভয় থাকিবেই বা কিসে ?—

"ব্রহ্মরে লাগি অছিছ লয়। তেনু তা কিছি নাহি ভয়॥"

এইরূপে বহুদিন বহুদেশ অতিক্রম করিয়া ভট্ট আঠারনালায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আঠারনালা নীলাচলের অতি

নিকটেই। এই স্থানের মাহাত্ম্যও অতীব বিচিত্র। তথায় প্রবেশ মাত্রই জীব যমদণ্ডকে জয় করিয়া থাকে। ভট্ট এই পবিত্র স্থান দর্শন করিয়া চর্ম্মচক্ষু সার্থক করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে আনন্দের উপর আনন্দের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। তিনি তথায় নিশ্চল আসনে বসিয়া একাগ্রচিত্তে ব্রহ্মচিন্তা করিতে লাগিলেন।

গণপতি ভট্ট ব্রহ্মচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বসিয়াই আছেন। থাকিতে থাকিতে দেখিলেন,—কতকগুলি লোক তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। তাঁহাদের সকলেরই হস্তে 'অবঢ়া' (অন্ন মহাপ্রসাদ)। সকলেই আনন্দে আত্মহারা। কেহ বা উচ্চৈঃস্বরে গান গাহিতেছেন, কেহ বা নানা রঙ্গের অবতারণা করিতেছেন; আবার কেহ বা হাসিয়া হাসিয়া অপরের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছেন। সংসারের শোক-তাপ জ্বালা-যন্ত্রণা যেন তাঁহারা জানেন না।

সকলকেই সম আনন্দে আনন্দিত দেখিয়া ভট্ট বিস্ময় সহকারে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—পথিকগণ! তোমাদের এত আনন্দ কিসের? তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ? কি লাভই বা পাইয়াছ? ভট্টের কথার উত্তরে পথিকগণ বলিলেন,—বিপ্রবর! আমরা নীলাচলে গিয়াছিলাম, তথায় পাঁচ দিন থাকিয়া প্রাণ ভরিয়া ব্রহ্মদর্শন করিয়া শ্রদ্ধাপূত-হৃদয়ে আবার গৃহে ফিরিয়া চলিতেছি। এ সংসারে ইহা অপেক্ষা অধিক লাভ কি-ই বা হইতে পারে?

ভট্ট এই কথা শুনিয়া ক্ষণকাল স্তম্ভীভূত হইয়া রহিলেন।

পরে সংশয়-সমুদ্বেলিত-হৃদয়ে তাঁহাদিগকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—পথিকগণ! বল বল, সত্য করিয়া বল, তোমরা যথার্থই কি সেই ব্রহ্মকে দর্শন করিয়াছ? পথিকগণ "হাঁ সত্যসত্যই দর্শন করিয়াছি" বলিয়া চলিয়া গেলেন। তখন এক অভিনব চিন্তায় ভট্টের হৃদয় তোলপাড় করিয়া তুলিল। তিনি মনেমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—পথিকগণ বলিলেন,—এখানে ব্রহ্ম আছেন, আর তাঁহারা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া আসিয়াছেন, এ সকল কথা নিশ্চয়ই মিথ্যা। কেন না, যাঁহার দর্শন লাভ করিলেই মুক্তি, সেই ব্রহ্মকে দেখিয়া ইঁহারা আবার ফিরিয়া আসিলেন কি প্রকারে? ইঁহাদের তো ব্রহ্মশরীরে মিশিয়া যাইবারই কথা!

ভট্ট অশান্ত-হৃদয়ে বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিলেন,—ঐরূপ আনন্দ-উল্লাস করিতে করিতে দলেদলে যাত্রিকদল অবিশ্রান্ত গমন করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলে সকলেরই মুখে ঐ একই কথা। পথিকগণের কথা শুনিয়া কিন্তু ভট্টের সংশয় অপনীত হইল না, বরং বাড়িয়াই যাইতে লাগিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না. ব্রহ্মপুরাণ খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন. পুরাণ-বচন দেখিতে তো ভুল করি নাই। দেখিলেন,—না, আমার তো দেখিবার ভুল হয় নাই, পুরাণে যে স্পষ্টই লেখা রহিয়াছে—"ব্রহ্ম অচ্ছন্তি নীলগিরি।"

ব্রাহ্মণ পুরাণবচন বারংবার পড়িলেন, কিন্তু মনের সংশয় মিটিল না। তিনি তখন ভাবিতে লাগিলেন,—এখন করি কি?

লোকের কথা বিশ্বাস করিতে হইলে বলিতে হয়, ব্রহ্ম নীলগিরিতে নাই ; কেন না ব্রহ্ম দর্শন করিয়া তো ফিরিবার কথা নহে, বরং ব্রহ্মের অঙ্গে মিশিয়া যাইবারই কথা। আবার এ দিকে পুরাণেও দেখিতেছি—ব্রহ্ম নীলাচলে আছেন। এখন কাহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করি? এক দিকে সাক্ষাৎ লোকের চোখে দেখা কথা, আর এক দিকে পুরাণের পুঁথিগত কথা। কোন্ কথাই বা বেশী বিশ্বাসযোগ্য? এইরূপ কত কি ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণের বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল। তিনি "ন যযৌ ন তস্থৌ" হইয়া রহিলেন। মনে মনে স্থির করিলেন,—গৃহদ্বার যখন একবার ছাড়িয়া আসিয়াছি, তখন সেখানে আর ফিরিয়া যাইব না; নীলাচলে যখন ব্রহ্ম নাই, তখন সেখানেও আর যাইবার দরকার নাই। দুই দিকের কোন দিকেই শান্তি নাই। ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎকরা তো আর এ পাপ জীবনে ঘটিল না; তখন এ জীবন না রাখাই ভাল। দুই দিকের কোন দিকেই যাইয়া কাজ নাই, কালকূট বিষভক্ষণ করিয়া এইখানেই জীবন বিসর্জ্জন দিই। আত্মহত্যা—আত্মহত্যা,—আত্মহত্যাও যে মহাপাপ! তাহাই বা করি কি প্রকারে?

ভট্ট এইরূপ ভাবিতেছেন। ভাবগ্রাহী ভগবান্ তাহা জানিতে পারিলেন। জানিবেন না-ই বা কেন?—

"সে সর্ব্ব-অন্তর্য্যামী হরি। সকল ঘটে চ্ছন্তি পুরি॥
ভগত-মন যার ঘর। তাহাকু কিস অগোচর॥"

একেতো ভগবান্ সকলেরই অন্তর্য্যামী, সকল ঘটেই তিনি

পূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছেন, তাহার উপর আবার ভক্তের মনই তাঁহার নিত্য নিকেতন, গণপতি ভট্ট সেই ভগবানের অকপট ভক্ত, সুতরাং ভট্টের হৃদয়ের কথা কি কখনও ভগবানের অগোচর থাকিতে পারে?

ভক্তাধীন ভগবান্ আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ এক ব্রাহ্মণ-স্বরূপ ধারণ করিয়া ভট্টের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মাণ্ডের নাথ হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বিপ্রবর! আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? এখানে বসিয়াই বা আছেন কেন? কোন্ স্থানেই বা যাইবেন মনে করিতেছেন? আপনাকে এত দুঃখিতই বা দেখিতেছি কেন?—আমাকে অকপটে তাহা বলুন।

সেই অপূর্ব্ব ব্রাহ্মণমূর্ত্তি দেখিয়া, তাঁহার অমৃতমধুর কথা শুনিয়া ভট্টের অশান্ত হৃদয় যেন কতকটা শান্ত হইল। তিনি বিনয়-সহকারে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—মহাশয়! ব্রহ্ম স্থূলরূপ ধারণপূর্ব্বক নীলাচলে অবস্থান করিতেছেন, আর তাঁহাকে দেখিলেই জীবের দুঃখ দূর হইয়া যায়, ব্রহ্মপুরাণে এই কথা পাঠ করিয়া আমি ব্রহ্মদর্শন-মানসে নীলাচলে যাইতেছিলাম। কিন্তু এখানে আসিয়া অবগত হইলাম যে, ব্রহ্ম নীলাচলে নাই। তাই বিষণ্ণ-মনে এখানে বসিয়া রহিয়াছি।

বিপ্ররূপী ভগবান্ ভট্টকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্রহ্ম যে নীলাচলে নাই, ইহা আপনি কি প্রকারে জানিলেন? ভট্ট বলিলেন,—বিপ্রচূড়ামণি! ব্রহ্মদর্শন করিলে তো ব্রহ্মের শরীরে

সকলেই লয় প্রাপ্ত হয়, অথচ আমি এখানে বসিয়া প্রত্যক্ষই দেখিতেছি, শতশত লোক ব্রহ্মদর্শন করিয়া আবার ফিরিয়া আসিতেছে ; তবে কেমন করিয়া বলি যে, ব্রহ্ম নীলাচলে রহিয়াছেন।

ভট্টের এই কথা শুনিয়া ভগবান্ মৃডুনন্দ হাস্য করিতে করিতে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—

"বোইলে—শুন বিপ্রবর। তো মনে সংশয় ন কর॥
ব্রহ্ম ন থিবা এ প্রমাণ। তাহা কহিব এবে শুন॥
যে আত্মা কল্পতরু হরি। যে যাহা মনে বাঞ্ছা করি॥
তাহাঙ্কু সেহি ফল দেই। তেনুটি বাঞ্ছানিধি সেহি॥
যেবন প্রাণী এথে আসি। দর্শন করে ব্রহ্মরাশী॥
কল্পনা করি তাঙ্ক মনে। লেউটি-যিবাকু সদনে॥
তাহাঙ্কু যদ্যপি রখিলে। কি বাঞ্ছানিধি বোলাইলে॥
এণু যে যাহা কল্পি থাই। তাহাকু সেহি ফল দেই॥
পেশন্তি প্রভু মহামেরু। তেনুটি বাঞ্ছাকল্পতরু॥
যেবন লোক মুক্তি অর্থে। নিশ্চয় আসিথিবে এথে॥
তাহাঙ্কু মুক্তিপথ দেবে। তু বিপ্রবেগে যাঅ এবে॥
মনে তু সংশয় ন কর। ব্রহ্মঙ্কু দরশন কর॥"

কল্পবৃক্ষের কাছে যে যাহা চায়, সে তাহাই পাইয়া থাকে। পরমাত্মা শ্রীহরিও বাঞ্ছাকল্পতরু। তাঁহার কাছেও যে যাহা চায়, সে তাহাই লাভ করে। যে সকল লোক সেই পরব্রহ্ম শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া পুনরায় গৃহে ফিরিয়া যাইতে চাহে, তিনি সেই

সকল লোককে আটকাইয়া রাখেন না; গৃহেই ফিরাইয়া দেন: যে গৃহে ফিরিয়া যাইতে চায়, তাহাকে আটকাইয়া রাখিলে তিনি আর 'বাঞ্ছানিধি' বলাইবেন কি প্রকারে? আবার যদি কেহ তাঁহার কাছে দৃঢ়চিত্তে মুক্তিরই প্রার্থনা করে, তিনি তাঁহাকে মুক্তিই প্রদান করিয়া থাকেন; তাঁহাকে আর ঘরে ফিরাইয়া দেন না। বিপ্রবর! তুমি আর বিলম্ব করিও না, মনের সংশয় দূর করিয়া নীলগিরিতে গমন কর,—ব্রহ্ম দর্শন করিয়া কৃতার্থ হও।

এই কথা বলিয়া বিপ্ররূপী ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন। ভট্টও পরমানন্দে নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মনের আবেগে অল্প সময়ের মধ্যেই সিংহদ্বারে পতিতপাবনদেবের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দৈবযোগে সেই দিনই স্নানযাত্রা। তাই দেবাদিদেব জগন্নাথ দেউল পরিত্যাগ করিয়া স্নানমণ্ডপে শুভ বিজয় করিয়াছেন। তাঁহার চারিদিকে সেবকবৃন্দ অশেষ তীর্থের জল লইয়া জয়জয়ধ্বনি করিতেছেন। দেব-স্নান দেখিবার নিমিত্ত দেবগণও স্বর্গ হইতে আসিয়া মানুষের সহিত মিলিয়া মিশিয়া মহামহোৎসব করিতেছেন। হরিহরিধ্বনিতে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে। আনন্দের আর সীমা-পরিসীমা নাই। এমন সময় গণপতি ভট্ট স্নানমণ্ডপে যাইয়া উপস্থিত।

ভট্ট দারুব্রহ্ম দর্শন করিলেন। একবার নয় দুইবার নয়, শতশতবার তিনি দারু-হরিকে নিরীক্ষণ করিলেন। কিন্তু

তাঁহার প্রাণের অভাব মিটিল না। তিনি মাথায় হাত দিয়া একটি সামান্য প্রণামও করিলেন না; যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই ফিরিয়া চলিলেন। ভট্টের দুঃখ রাখিবার আর স্থান নাই।

ভট্টের হৃদয়ের ভাব,—গণেশই একমাত্র ব্রহ্ম। যাঁহার গজানন নাই, তিনি কখনও ব্রহ্মই হইতে পারেন না। ইঁহারও যখন গজবদন নাই, তখন ইনিও ব্রহ্ম নহেন।

ভক্ত ভট্টের হৃদয়ের কথা ভক্তহৃদ্বিহারী শ্রীহরির জানিতে বড় বিলম্ব হইল না। অন্তর্য্যামী নারায়ণ তখনই অলক্ষ্যভাবে জগমোহনে গমন করিলেন। পূর্ব্ব দিবস প্রভুর পার্শ্বে রাত্রি-জাগরণ-প্রযুক্ত 'মুদিরথ' * পণ্ডা তথায় নিদ্রালস হইয়া শয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার কাছে গিয়া স্বপ্নমার্গে আদেশ করিলেন,—মুদিরথ! উত্তরদেশ হইতে আমার এক পরম ভক্ত পরমানন্দে আমাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার ধারণা—যাঁহার গজানন নাই, তিনি কখনও ব্রহ্ম নহেন। আমার গজমুখ না দেখিয়া ভক্ত মহাদুঃখে বিমুখ হইয়া চলিয়া যাইতেছে, তুমি শীঘ্র যাও, যাইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আইস। গিয়া এই কথা বল যে, ওহে ঋষি! তুমি ফিরিয়া যাইতেছ কি নিমিত্ত?

* "মুদিরথ"—শ্রীজগন্নাথের সেবক পণ্ডা বিশেষ। ইঁহারা পুরীরাজের প্রতিনিধিরূপে শ্রীজগন্নাথের সেবা করিয়া থাকেন। ৭ বৎসর হইতে ১২ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ইঁহাদের সেবার অধিকারকাল নিরূপিত। অনেকে বলেন যে,—"মুদ্রহস্ত" হইতে এই শব্দের উৎপত্তি। ইঁহারা অনেক সময় শ্রীপ্রভুর সম্মুখে মুদ্রিতহস্তে—জোড়হস্তে অবস্থান করেন।

তুমি আমার সহিত আইস, নিশ্চল নেত্রে চাহিয়া দেখ দেখি, গজানন দেখিতে পাইবে এখন।

এই কথা বলিয়া অন্তর্য্যামী অন্তর্হিত হইলেন। মুদিরথও তাড়াতাড়ি উঠিয়া হরিনাম করিতে করিতে গণপতি ভট্টের উদ্দেশে দৌড়াদৌড়ি গমন করিলেন। অচিরেই তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—

"বোইলা—শুন বিপ্রগোটি। কিপাঁ তু যাউচ্ছু লেউটি॥
ব্রহ্মকু দরশন কর। বাঞ্ছা সম্পূর্ণ হেউ তোর॥
যে চতুর্ব্বর্গ ফলদাতা। অশেষ জীবর করতা॥
ভগতজন প্রাণবন্ধু। নাম করুণাময় সিন্ধু॥
যে যাহা বাঞ্ছা করে চিত্তে। তাহাকু তাহা দেবা অর্থে॥
বিজয় নীলাচল গিরি। শ্রীদারুব্রহ্ম রূপ ধরি॥
তাহাঙ্কু চ্ছাড়ি মূঢ়পণে। লেউটি যাউ কি কারণে॥"

ব্রাহ্মণ! তুমি ফিরিয়া যাইতেছ কেন? চল, ব্রহ্ম দর্শন কর, তোমার বাঞ্ছা সম্পূর্ণ হউক। যিনি ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ ফল দান করেন, যিনি সমগ্র জীবের কর্ত্তা, যিনি ভক্তজনের প্রণের বন্ধু, যাঁহার নাম করুণাসিন্ধু, তিনি সকলের বাঞ্ছিত ফল দিবার নিমিত্ত শ্রীদারুব্রহ্ম রূপ ধারণ করিয়া নীলাচলে বিরাজ করিতেছেন। মূঢ়তা প্রযুক্ত তুমি তাঁহাকে ছাড়িয়া অকারণে চলিয়া যাইতেছ কেন?

মুদিরথের কথা শুনিয়া গণপতি ভট্ট অতিশয় ক্রোধভরে কটু কথা কহিয়া ফেলিলেন,—ওহে! তুমি আর মিছা ভাঁড়াও

কেন? এখানে ব্রহ্ম কোথায়? যাঁহার গজবদন নাই, আমি তাঁহাকে ব্রহ্মই বলি না। তুমি ফিরে যাও—ফিরে যাও, বৃথা আমার পাছু পাছু আসিয়া আমাকে ফিরাইতে চেষ্টা ক'রতেছ কেন? আমি তোমার সহিত যাব না হে যাব না।

ভট্টের কথা শুনিয়া মুদিরথ আবার বলিলেন,—বিপ্রবর তুমি তোমার মতিভ্রম ছাড়। এই,—এই দেখ, সাক্ষাৎ দারু-ব্রহ্ম শুভ বিজয় করিয়াছেন। তুমি আমার সহিত আসিয়া একবার নিশ্চল নয়নে চাহিয়া দেখ দেখি, নিশ্চয়ই গজানন দেখিতে পাইবে।

মুদিরথের এই কথা শুনিয়া ভট্টের ক্রোধ অন্তর্হিত হইল। আনন্দভরে তাঁহার হৃদয় পরিপূরিত হইয়া উঠিল। তিনি মহানন্দে মুদিরথের সহিত ফিরিয়া চলিলেন। মুদিরথ তাঁহাকে দারুব্রহ্মের সম্মুখে লইয়া গিয়া বলিলেন,—ব্রাহ্মণ! দেখ দেখি, একবার ভাল করিয়া—প্রাণ মন এক করিয়া নিশ্চল নয়নে দেখ দেখি, ইনিই তোমার সেই সর্ব্বসন্তাপহারী গজবদনধারী শ্রীহরি কি না?

মুদিরথের কথায় ভট্ট আপন চঞ্চলমন স্থির করিলেন। মন স্থির হইবামাত্রেই তাঁহার সাত্ত্বিক দিব্য জ্ঞানের উদয় হইল। তিনি তখন নিশ্চল দিব্য নয়নে দেখিলেন। কি দেখিলেন? দেখিলেন,—

"দেখিলা প্রভু ভগবান। হোই অচ্ছন্তি গজানন॥
লম্বি অচ্ছই থোরহস্ত। শোভা দিশই একদন্ত।"

অহো! প্রভু ভগবান্ গজানন হইয়া আছেন, তাঁহার শুণ্ড লম্বমান হইয়া দুলিতেছে, আর একটি দন্ত শোভা পাইতেছে।

ভট্টের দেখা আর ফুরায় না। তিনি অনিমেষ নয়নে তাঁহার প্রাণারাম গণপতি-মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন,—কেবল দেখিতেই লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে ভট্ট আরও যাহা দেখিলেন, তাহা অতীব অপূর্ব্ব। ভট্ট আরও কি দেখিলেন? দেখিলেন,—

"অদ্ভুত বিশ্বরূপ ধরি। ভৃত্যকু ডাকুচ্ছন্তি হরি॥"

অহো! যিনি ইন্দ্রিয় মনের অগোচর, সেই সুদুর্লভ ভগবান্ অপরূপ বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া অমিয়মাখানো স্বরে ভক্ত ভট্টকে আপন সমীপে আহ্বান করিতেছেন,—আয় আয় ভট্ট! আমার কাছে আয় কাছে আয়। আহা বাছা, আমার জন্য তুই কতই না ক্লেশ পাইয়াছিস্, কতই না যাতনা সহিয়াছিস্; আয় আয় বাছা! আমার কাছে আয় কাছে আয়, আমার হৃদয়ের ধন! হৃদয়ে আয়। আয় আয় বাছা! তোর অনন্ত দুঃখের অবসান হইয়া যাউক,—নিত্য নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে হৃদয় পরিপূর্ণ হউক।

তখন ভট্ট করিলেন কি?—

"তাহা শুনিন মহামতি। বোলে—নমস্তে গণপতি॥
নমো নমস্তে গজানন। নমস্তে কপিলবদন॥
নমস্তে দারুব্রহ্মরাশী। নমো নমস্তে বিশ্ববাসী॥
তব দর্শনে দারুব্রহ্ম। টুটিলা মোর মতিভ্রম॥
লভিলি পরম কারণ।"

তিনি ভাবগদ্গদকণ্ঠে ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন।

বলিলেন,—ওহে গণপতি! তোমায় নমস্কার নমস্কার; ওহে গজানন! তোমায় নমস্কার নমস্কার; ওহে কপিলবদন! তোমায় নমস্কার নমস্কার; ওহে দারুব্রহ্ম! তোমায় নমস্কার নমস্কার; ওহে বিশ্বরূপ! তোমায় নমস্কার নমস্কার। দারুব্রহ্ম হে, তোমার দর্শনে আমার মতিভ্রম দূর হইয়া গেল। আমি এতদিনে পরমকারণ তোমাকে পাইয়া পূর্ণকাম হইলাম। দয়াময়! জানিতাম না যে, দীনহীন জীবে তোমার এত দয়া। জানিতাম না হরি! তুমি কল্পতরুর মত যে যাহা বাঞ্ছা করে, তাহাকে তাহাই অকাতরে বিতরণ করিয়া থাক। জানিতাম না বিশ্বরূপ, সকল রূপই তোমাতে সতত বর্ত্তমান;—যে যে-রূপে তোমায় দেখিতে চায়, তুমি তাহাকে সেই রূপেই দর্শন দিয়া থাক। তুমি আজ দয়া করিয়া জানাইলে বলিয়াই তো জানিতে পারিলাম। নাথ! তোমার তত্ত্ব তুমিই জান, আর যাহাকে দয়া করিয়া জানাও, সে-ই জানিতে পারে; অন্যে তো পারে না। তাই কাতরে প্রার্থনা করি,—দয়াময়, যতদিন তোমার এই স্নানযাত্রা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে, ততদিনই তোমায় ভক্তবৎসল-নামের সাক্ষিস্বরূপ—বাঞ্ছাকল্পতরু-নামের প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ এই গণেশ-বেশ অঙ্গীকার করিতে হইবে। নাথ! যুগে-যুগে তোমার এই অনুপম মহিমা উদ্‌ঘোষিত হইতে থাকুক।

ভক্তবৎসল ভগবান্ তখন সহাস্যবদনে ভট্টকে বলিলেন,—"তথাস্তু"। ভট্টও পরমানন্দে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন, উঠিয়া অঞ্জলিবদ্ধ করযুগল মস্তকে ধারণ করিলেন, হৃদয়ে ব্রহ্মস্বরূপ ধ্যান করিতে করিতে অচঞ্চলভাবে অবস্থান করিলেন। সকলে

প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন,—ভট্টের দেহ হইতে দিব্য জ্যোতি নিঃসৃত হইয়া বিদ্যুতের মত যাইয়া ব্রহ্মশরীরে মিশ্রিত হইয়া গেল,—ভট্টের প্রাণপাখীও দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া কোথায় উড়িয়া চলিয়া গেল। সকলে জয়জয়-নাদে দশদিক্ মুখরিত করিয়া তুলিল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আনন্দময় হরিধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে আনন্দের বুঝি আর তুলনা হয় না।

জয় ভক্তের জয়। জয় ভক্তবৎসল ভগবানের জয়। ভক্ত তুমি ধন্য। কেন না, তুমি ভগবান্‌কে আপন অধীন করিতে পার। আর ভগবান্ তুমিও ধন্য। কেন না, তুমিও জাতি-কুল-বিদ্যা-সম্পদ প্রভৃতির অপেক্ষা না করিয়া ভক্ত মাত্রকেই আত্মসাৎ করিয়া থাক। তাই ব্রহ্মাদি-বন্দিত তুমি অদ্যাবধি শ্রীনীলাচলধামে স্নানযাত্রার দিন ভক্তপ্রার্থিত গণপতি-বেশ বা হস্তিবেশ অঙ্গীকার করিয়া থাক। প্রভু, তোমার জয় হউক—জয় হউক।

কবি যথার্থই বলিয়াছেন,—

“এণু সে সংসার মধ্যেন। প্রভুভগত বড় জন॥
ভক্তঙ্ক ন করিব সান। ভক্ত দ্বিতীয় ভগবান॥”

এই সংসার মধ্যে ভগবানের ভক্তই বড়। ভক্তকে কেহ কখনও ‘ছোট’ বলিয়া মনে করিও না। ভক্ত—ভগবানের অভিন্ন তনু—ভক্ত দ্বিতীয় ভগবান্। ভগবন্! তোমার ভক্তের জয় হউক—জয় হউক।

বলরামদাসের রথযাত্রা

বলরাম দাসের নিবাস শ্রীপুরুষোত্তম ধাম। তিনি মহান্ত সোমনাথের শিষ্য। ভক্তমণ্ডলীতে তাঁহার বড়ই খ্যাতিপ্রতিপত্তি। ভিক্ষাই তাঁহার জীবিকা। ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভগবানে সমর্পণ করিয়া,—সেই নিবেদিত অন্ন ভোজনান্তে তিনি সপরিবারে পরমানন্দেই দিনযাপন করেন। কোন দুঃখ নাই—চিন্তা নাই। চিন্তার মধ্যে তিনি কেবল চিন্তামণির চরণ-চিন্তাই করিয়া থাকেন। সেই আনন্দেই তিনি সতত বিভোর। যদি কাহারও মুখে তিনি একবার ভগবানের নাম শুনিতে পান, তবে মনে করেন, যেন কোটি নিধি হস্তগত হইল। হরিকথা শ্রবণ—হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া, হরি-প্রেমে মজিয়া থাকিতেই তিনি প্রাণে-প্রাণে ভালবাসেন। সাধুসজ্জনের সঙ্গেই তাঁহার সর্ব্বদা বসবাস। সকল জীবেই তাঁহার সমান দয়া। শ্রীনীলাচলনাথ দারুব্রহ্ম জগন্নাথের সেবা ব্যতীত তিনি আর কিছুই জানেন না, তাহাই তাঁহার জীবনব্রত। গুণ তো এত, কিন্তু পূর্ব্বজন্মের কি-যে কর্ম্মফল বলা যায় না, চন্দ্রে কলঙ্কের মত তাঁহার একটি মহান্ দোষও ছিল। তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় যখন-তখন বেশ্যাভবনে গমন করিতেন।

এইরূপে কিছুদিন যায়। আষাঢ় মাস, জগবন্ধুর গুণ্ডিচা-যাত্রা (রথযাত্রা) উপস্থিত। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা দেবীর

তিনখানি রথ প্রস্তুত। বলরাম 'তালধ্বজ' রথে, সুভদ্রা দেবী 'বিজয়া' রথে এবং জগন্নাথ 'নন্দিঘোষ' রথে আরোহণ করিলেন। বিশ্ববাসী সকলকেই কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত তিনজনে শ্রীগুণ্ডিচা অভিমুখে শুভযাত্রা করিলেন। লক্ষলক্ষ লোক আনন্দ-কোলাহলে—জয়জয় হরিহরি রোলে চারিদিক্ মুখরিত করিয়া তুলিল। বিবিধ বাদ্যের আরাব, সংকীর্ত্তনের উচ্চ-নিনাদ এবং সর্ব্বোপরি নন্দিঘোষ-রথের গুরুগম্ভীর গর্জ্জন সেই ধ্বনির সহিত মিশিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করিয়া ফেলিল। ধরণীতে বুঝি আনন্দ আর ধরে না।

এই আনন্দমহোৎসবে পুরীবাসী প্রায় সকলেই আসিয়া যোগদান করিয়াছেন। আসিতে পারেন নাই অতি অল্প লোকই। যাঁহারা আসিবার সৌভাগ্যে বঞ্চিত, বলরাম দাস তাঁহাদের মধ্যে একজন। তিনি তখন বেশ্যাগৃহে আমোদ-প্রমোদে প্রমত্ত; আজিকার এ মহোৎসবের কথা তাঁহার একটুও মনে নাই। হঠাৎ সেই আনন্দময় উচ্চ-ধ্বনিতে তাঁহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। তখনই তিনি মাথায় হাত চাপড়াইয়া আপনাকে শতশত ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন,—

"বোইলে—ধিক্ মো জীবন। অজ্ঞানে বঞ্চিলি মুঁ দিন॥
প্রভু মো রথে বিজে কলে। শোই মুঁ অচ্ছি বেশ্যাতূলে॥"

হায় হায়! আমার জীবনে ধিক্, জীবনে ধিক্। আমি অজ্ঞানে অন্ধ হইয়া দিনযাপন করিলাম। প্রভু জগন্নাথ রথযাত্রায় বাহির হইয়াছেন, আর আমি কিনা বেশ্যা সঙ্গে শয়ন করিয়া রহিয়াছি? হায় হায়! আমার জীবনে ধিক্! জীবনে ধিক্!

সেই অপ্রাকৃত ভূমানন্দের প্রবল আকর্ষণের সমীপে পার্থিব ক্ষীণ ক্ষণিকানন্দ পরাভব স্বীকার করিল। বেশ্যার প্রতারণাময় প্রেমের ফাঁস আর বলরামকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। তিনি ধ্বনি শুনিয়াই উন্মত্তের মত উধাও হইয়া ছুটিলেন,—চক্ষুর পলক না পড়িতে-পড়িতে রথের অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আসিয়া দেখিলেন কি? দেখিলেন,—তাঁহার প্রেমময় পরাণ-বঁধুয়া রথোপরি বিরাজ করিতেছেন। দেখিয়া বলরাম আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অমনি তিনি এক লম্ফে নন্দিঘোষ রথের উপরে যাইয়া উঠিলেন। অঞ্জলিবদ্ধ করযুগল মাথার উপর রাখিলেন। নির্নিমেষ নয়নে আনন্দময়ের বদন হেরিতে থাকিলেন; আর বিনাইয়া-বিনাইয়া কত কি বলিতে লাগিলেন।

জগন্নাথের সেবকবৃন্দ কিন্তু বলরামকে দেখিয়া ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। কর্কশস্বরে বলিতে লাগিলেন—

"গণ্ডে তো তাম্বূলর গার। কুঙ্কুমে দেহ জরজর ॥
অতি কদর্য্য তোর কায়ে। দিশুচ্ছি খণ্ড চিত্র প্রায়ে ॥
স্নান শউচ তোর নাহিঁ। থিলু তূ বেশ্যা ঘরে শোই ॥
কিপাঁ তূ চঢ়িলু রথর। ভগতপণ পোড়ু তোর ॥
কে তোতে বোলে জ্ঞানবন্ত। দেখ হো প্রভু জগন্নাথ ॥
ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি যার পাদে। সেবা করন্তি অপ্রমাদে ॥
তাহাঙ্কু তোর ভয় নাহিঁ। আসিচ্ছু শুচিবন্ত নোহি ॥"

আরে, তোর গালে পানের পিচ লাগিয়া রহিয়াছে। কুঙ্কুম-রাগে দেহ ভরিয়া গিয়াছে। তোর শরীর অতি অপবিত্র; ঠিক

যেন একখণ্ড ছবির মত দেখাইতেছে। তোর স্নান করা নাই, শুদ্ধাচার নাই ; বেশ্যার ঘরে তুই শুইয়াছিলি। আর সেই অবস্থায় তুই রথের উপর আসিয়া চড়িলি কি বোলে? তোর ভক্তপণার মুখে আগুন, মুখে আগুন ;—তোর ভক্তপণা পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাউক। তোকে জ্ঞানবন্তই বা বলে কে? আহা প্রভু জগন্নাথ ;—ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি দেবগণ অতি সন্তর্পণে সাবধানে যাঁহার চরণসেবা করিয়া থাকেন, তোর তাঁকে একটু ভয় নাই ; অশুচি অবস্থাতেই কিনা তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিস্?

এইরূপে সেবকগণ যাঁহার মনে যাহা আসিল, গালি দিতে-দিতে এবং গলাধাক্কার উপর গলাধাক্কা দিতে-দিতে বলরামকে রথের উপর হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন। ফেলিয়া দিয়াও সেবকগণের ক্রোধের বিরাম নাই, তখনও তাঁহারা অজস্রধারে বলরামের উপর দুর্ব্বাক্য বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শেষে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া দিলেন, —"যারে যা, তোর বাপের কাছে যা ; এই কথা তোর বাপের কাছে গিয়া বল।"

সেবকবৃন্দের কাছে এইরূপে তিরস্কৃত, অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া বলরাম মরমে মরিয়া গেলেন, দুঃখসন্তাপে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। তিনি অভিমানভরে ভক্তের যিনি মাতা-পিতা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলই—সেই জগন্নাথের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দূরে রহিয়াই একবার চাঁদবদন ভাল করিয়া দেখিলেন। অমনি তাঁহার নয়নযুগল হইতে অশ্রুধার গড়াইয়া পড়িল। তিনি ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া তাঁহার প্রাণবন্ধুর উদ্দেশে একটি

প্রণাম করিলেন। আবার উঠিয়া কপালে করযুগল স্থাপন করিয়া গদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"ওহে চক্রপাণি! তোমায় নমস্কার। ওহে জলদবরণ পদ্মবদন! তোমায় নমস্কার। ওহে মহাবাহু! ভক্ত তোমায় যে সাজে সাজায়, তুমি সেই সাজেই সাজিয়া থাক, ভক্তের লজ্জা তুমিই নিবারণ করিয়া থাক, তাই তুমি ভক্তবৎসল, তোমায় নমস্কার। তোমার অপার মহিমা!—তুমি যুগল করে শঙ্খ-চক্র ধারণ করিয়া ঐ নন্দিঘোষ রথে বিরাজ করিতেছ; ঐ রথের উপর থাকিয়া-থাকিয়াই তুমি তিন-পুরে বিরাজমান রহিয়াছ। তুমি পরিচ্ছিন্ন হইয়াও অপরিচ্ছিন্ন। তোমার তেজ তেজোরাশি সূর্য্যকেও গঞ্জনা দিতেছে। তোমার শক্তিসামর্থ্যের তো কিছুই অভাব নাই। তবে তুমি স্বয়ং আমার মুণ্ডচ্ছেদন না করিয়া পরহস্তে দণ্ড দিলে কি নিমিত্ত? ইহাতে তোমার যশই বা বাড়িয়া গেল কত? আমার এতদিন ধারণা ছিল যে, আমার প্রতি তোমার অপার করুণা; এই-বার সেই করুণার পরিমাণ বেশ বুঝা গেল—বুঝা গেল।"

এই সকল কথা বলিতে বলিতে অভিমানের প্রবল আবেগে বলরাম দাস তাঁহার প্রভুকে দুইটা কটুকথাও কহিয়া ফেলিলেন। বলিলেন,—"অহে তুমি আমাকে তোমার সেবক হাথাইয়া দণ্ড দেবে বই কি—দেবে বই কি! তুমি হ'লে নন্দঘোষের বেটা, আর আজ একেবারে নন্দিঘোষ রথে চড়িয়া অমূল্য আসনে উপবেশন করিয়া আছ; আমাদের মত অধম জন কি এখন আর তোমার মনে পড়িতে পারে? ওহে তুমি আর আমাদের দিকে তাকাইয়া দেখিবে কেন—দেখিবে কেন? আমি তোমায় প্রাণবন্ধু বলিয়াই জানিতাম,

তাই তোমার কাছে আসিয়াও ছিলাম। তাই বলে কি এত দণ্ড দিতে হয়? সে যাহা হউক, তোমায় উত্তমরূপেই চেনা গেল—চেনা গেল"

দুইটা কটুকথা বলিয়াও বলরাম ক্ষান্ত নহেন। তিনি তাঁহার প্রভুদত্ত দণ্ডের উপযুক্ত প্রতিদণ্ড বিধানে অগ্রসর হইলেন প্রণয়-গর্ব্বে স্ফীত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"আমি তোমায় উত্তমরূপেই শিক্ষা দিতেছি। তোমার নাড়ী নক্ষত্র সকলই তো আমি জানি। এইবার তোমার আক্কেল হইবে। এই আমি ফিরিয়া চলিলাম; দেখি তোমার রথের দড়িই বা টানে কে, আর তোমার রথযাত্রাই বা কেমন করিয়া হয়? তোমার বাপ নন্দের দিব্য দিয়া বলি, এই-বার রথটাই বা চালায় কে, একবার আমি দেখে নিই।"

দীনতাই ভক্তের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ভক্ত প্রণয়কোপে যতই অভিভূত হউন না কেন,—আর সেই অভিমানভরে ভগবান্‌কে যতই কটুকাটব্য বলুন না কেন, সে অভিমান হৃদয়ে অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না; ভক্তের স্বাভাবিক দৈন্য আসিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলে,—দীনতার আবরণে সেই অভিমান ঢাকা পড়িয়া যায়।

বলরাম দাস অভিমানে আত্মহারা হইয়াছেন সত্য, আর অভিমানভরে প্রাণবন্ধুকে কত কি কটু কথা বলিয়াছেন, তাহাও সত্য, অধিক কি অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, ইহাও সত্য; কিন্তু হইলে কি হয়, ভক্তস্বভাবসুলভ দীনতা আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলিল। তিনি তাঁহার প্রাণবন্ধুর উদ্দেশে দীনহীন কাঙালের মত বলিয়া উঠিলেন,—"ওহে

শ্রীবৎসলাঞ্ছন ! তুমি আমার আর একটা কথা শোন।—তুমিই আমার একমাত্র শরণ। আমি তোমার সেবক। তুমি আমার প্রাণের নায়ক। যদি আমার অন্য শরণ থাকে, তাহা অন্যে বুঝুক আর-না-ই বুঝুক, সর্ব্বান্তর্য্যামী তুমি তো তাহা ভালরূপেই বুঝিতে পারিবে। ওহে পূতনা-প্রাণ-নাশন ! তোমাকে আর একটা কথা—বেশী নয় আর একটা কথা বলিয়া বিদায় লই। শুনিবে না কি? বলি, এই যে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড, সেই ব্রহ্মাণ্ডে সেবকের প্রভু কি একটি বই আর দুইটি আছে? সেবকের যদি এক বই দুই প্রভু না রহিল, আর সেই সেবকের ক্ষতিবৃদ্ধি যদি সেই প্রভু না-ই বুঝিল, তবে লজ্জা হইবে কাহার? এই কথাটা তুমি হৃদয়ে বিচার করিয়া দেখ। তোমাকে অধিক আর কি বলিব, তুমিই আমার জীবিতেশ্বর ;—অন্য কেহ নয়।"

এই বলিয়া অভিমানভরে বলরাম দাস তথা হইতে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় যতদূর দৃষ্টি চলে—পাছু-পাছু চাহিতে-চাহিতেই চলিয়া চলিলেন। এইরূপ চলিতে চলিতে তিনি সিন্ধুতীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সমুদ্রতীরে চক্রতীর্থ। বাঁকিমুহানা তাঁহারই পাশাপাশি। চারিদিকেই বালুকারাশি বলরামের প্রাণের মতই ধূধূ করিতেছে। এত দৈন্যনিবেদন করিলাম, আসিবার সময় এত ফিরিয়া-ফিরিয়া থমকিয়া-থমকিয়া চলি-চলি করিয়া চলিয়া আসিলাম ; কিন্তু কই আমার প্রাণবল্লভ তো আমাকে একটি আশ্বাসের বাণী বলিলেন না ; আমাকে ফিরাইবার জন্য তো কোন চেষ্টা-চরিত্রই করিলেন না ;—এই বিষাদে বলরামের হৃদয় ভরিয়া গেল। তিনি

বিষণ্ণমনে বাঁকিমুহানার সেই বালুকাকীর্ণ প্রান্তরে যাইয়া উপবেশন করিলেন। প্রতিশোধ লইবার প্রবৃত্তি আবার তাঁহার প্রাণে জাগিয়া উঠিল। তিনি তাহারই ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

বলরাম করিলেন কি? তিনি তাড়াতাড়ি বালুকার তিনখানি রথ তৈয়ারি করিলেন। তাহার পর নয়ন মুদিয়া জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবীকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্যানযোগে তাঁহাদের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া বলিলেন,—"প্রভু হে, আমাকে যদি সেবক বলিয়া মনে হয়, তবে আর বিলম্ব করিও না; সত্বর এই রথে শুভ বিজয় কর।"

এই কথা বলিতে-বলিতে বলরাম ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নয়ন হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা গলিয়া পড়িতে লাগিল। সেই ধারা অমৃতনদীর মত তাঁহার সর্ব্বশরীর ভাসাইয়া দিতে থাকিল। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আদিমূল জগন্নাথ তাহা জানিলেন। জানিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। থাকেনই বা কি প্রকারে? যে প্রভু ভক্তবৎসল, যিনি শরণাগতের রক্ষাকর্ত্তা এবং সেবকের সামান্য বেদনাও যিনি সহিতে পারেন না, সেবকের এত দুঃখ-বিষাদ দেখিয়াও কি আর তিনি স্থির থাকিতে পারেন? তিনি তৎক্ষণাৎ তথাকার সুখসম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতা ও ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া বাঁকিমুহানায় ভক্ত বলরামের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বালির রথে শুভবিজয় করিলেন। তথাকার রথে কেবল দারুই পড়িয়া রহিল।

বলরাম দাস ধ্যানযোগে তাহা দেখিলেন। হর্ষভরে তাঁহার

হৃদয় ভরিয়া গেল। তিনি তখন অল্পে অল্পে নয়ন মেলিয়া দেখিলেন। তাঁহার কোটিকল্পকৃত সুকৃতির ফললাভ হইয়া গেল। তবুও তাঁহার অভিমানের অন্ত নাই; তিনি বক্রনয়নে চক্রধারীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ; কিন্তু বাহিরে দুঃখের অভিনয়। পদ্মমুখ ভগবান্ তাহা জানিলেন। পীতবাস হাসিয়াহাসিয়া দাসের প্রতি কহিতে লাগিলেন,—"বলরাম! তুমি আমার উপর রাগ করিও না। দেখ, আমি তোমার ঘোরতর সন্তাপ দেখিয়াই তথাকার যাত্রা উপেক্ষা করিয়া তোমার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এখন আমি তোমারি আয়ত্ত। তুমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার।"

প্রভুর শ্রীমুখের এই অমৃতময় কথা শুনিয়া দাসের হৃদয়ের অভিমান দূর হইয়া গেল; তখনই তিনি মস্তকের উপর অঞ্জলিবদ্ধ হস্ত দুইটি স্থাপন করিলেন; প্রভুর চরণতলে পড়িয়া আছি—চিন্তা করিয়া তাঁহার সম্মুখেই শুইয়া পড়িলেন। উঠিয়া আবার কপালে কৃতাঞ্জলিপুট করযুগল বিন্যস্ত করিয়া গদগদরুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"ওহে চক্রধারি! তোমায় নমস্কার। কমলা তোমার পরিচারিকা। বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মা আজ্ঞাকারী। তোমারই আজ্ঞায় দেবরাজ ইন্দ্র, সুর, অসুর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সূর্য্য, চন্দ্র, হুতাশন, নাগ, নৃপতি, চরাচর, পৃথিবী, আকাশ, দিক্‌পাল, সকলেই যাতায়াত করিতেছেন; তুমি সকল লোকের নাথ। সরস্বতী তোমার আজ্ঞাকারিণী। অষ্টনিধি তোমার পরিবার। সিদ্ধ যোগীন্দ্র মুনিগণ ধ্যানে তোমার চরণ চিন্তা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কাছে এ

কীটাণুকীট ছার আমি আর কতটুকু ; কেবল তোমার কাছে দাসখৎ লিখাইয়াছ বলিয়াই তো তুমি, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমার কাছে আসিয়াছ,—সহস্রসহস্র লোকের সেবা, সুরপ্রার্থনীয় সেবাসম্ভার, বহুমূল্য সুকোমল আসন, গীত বাদ্য নর্ত্তন প্রভৃতি উপেক্ষা করিয়া এই উত্তপ্ত অনাবৃত বালুকাকীর্ণ ভূমিতে বালুর রথে আসিয়া শুভ বিজয় করিয়াছ ! ধন্য ধন্য প্রভু ; তোমার প্রভুপণার বলিহারি যাই—বলিহারি যাই ! অহো ! মূঢ় মানব তোমার এ করুণার কথা—সেবকের সন্তাপমোচনের কথা কিছুই জানে না, তাই তাহারা অন্য দেবতার উপাসনা করিতে যায় । তাহারা যেন ঠিক—

"গঙ্গা তেজিণ গঙ্গাকূলে । কূপ খোলন্তি তৃষাতুরে ॥
সুধা তেজিণ বিষ খাই । মরিবা সম সে অটই ।"

পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া গঙ্গা ত্যজিয়া গঙ্গাকূলে কূপ-খনন করে ; সুধা ত্যজিয়া বিষ ভক্ষণ করিয়া মর-মর হইয়া পড়ে ।

কিন্তু নাথ, যে তোমার কিঞ্চিৎ মহিমা অবগত হইয়া অবিরত তোমার ভজনা করে,—তোমার চরণে শরণ গ্রহণ করে, সে ইন্দ্রাদি-পদকেও গণনার মধ্যে আনে না, তোমার বলে বলী হইয়া সংসারে আর কাহাকেও ভয় করে না । সর্ব্বদাই মনে করে,—শঙ্খ-চক্র-গদা-পাণি যখন আমার সহায় আছেন, তখন আর ভাবনা কিসের ?

প্রভু, আমি তোমার কাছে সর্ব্বদাই অপরাধী । কিন্তু তুমিও যে করুণার বারিধি । সে অনন্ত অপার সাগরে সকল অপরাধই তৃণখণ্ডের মত কোথায় ভাসিয়া চলিয়া যায় । সেই

সাহসেই প্রভু, আমি তোমায় আজ যত কিছু অকথা-কুকথা বলিয়াছি। তাহার সমুচিত শাস্তি হউক—আমার জিহ্বায় বজ্রাঘাত হউক।

নাথ, তুমি যে ভৃত্যের এত সহায়—এত পক্ষ, এতদিন তাহা কেবল ভাসা-ভাসা জানা ছিল, আজ কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখা গেল। প্রভু আজ নীলাদ্রি-নগরে তোমার রথযাত্রার মহোৎসব। আজ সেখানে তোমার সুখভোগের আর সীমা পরিসীমা নাই। কিন্তু তুমি কি-না আজ সেই নীলাদ্রি-নগর ছাড়িয়া, নন্দিঘোষ-রথ পরিত্যাগ করিয়া, অশেষ সুখভোগ উপেক্ষিয়া. ভ্রাতা ও ভগিনীকে সমভিব্যাহারে লইয়া কাঙাল আমার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। এখানে কি ভোগ উপভোগ করিবে প্রভু? মূঢ় আমি বড়ই মন্দ কর্ম্ম করিয়াছি;—আহা আমিই প্রভুকে এই মহাকষ্টে ফেলিয়া দিয়াছি! আমার গতি কি হইবে প্রভু?"

ভাবগ্রাহী ভগবান্ ভক্তের আত্মনিবেদন শুনিয়া পরম প্রীত হইলেন। প্রীতিভরে ভৃত্যকে আপনার পার্শ্বে বসাইলেন। মৃদু-মধুর হাস্য করিতে-করিতে শ্রীমুখে আদেশ করিলেন,—"বলরাম, প্রাণপ্রিয় বলরাম! বল দেখি, নীলাদ্রি-নগরে আজ আমার উৎসব হয় কি প্রকারে? ভক্তের ভাবই আমার মূল। ভক্ত ভাবমূল্যে আমায় কিনিয়া লয়। তুমি তো আমাকে সেখানকার অনেক সুখের কথা বলিয়া ফেলিলে, কিন্তু—

'অশেষ সুখভাব মোর। ভগত কথামৃত সার॥
মোর মহিঁমা পদে পদে। যে গুণ্ থিব সদা হৃদে॥

সে অটে সুখদাতা মোর। মুঁ থাই অগ্রতে তাহার ॥
এ কথা সত্য সত্য মোর। তো মনে সংশয় ন কর ॥”

ভক্তের কথামৃতই আমার সকল সুখ-সম্পত্তি। যে জন হৃদয়ে আমার মহিমা পদে-পদে চিন্তা করিয়া থাকে, সে-ই আমার সুখদাতা। আমি তাহারই অগ্রভাগে সর্ব্বদা বিরাজ করিয়া থাকি। আমার এ কথা সত্য সত্য; তুমি মনোমধ্যে সংশয় করিও না।”

প্রভুর শ্রীমুখের কথা শুনিয়া বলরামদাস পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। বালির রথে আর প্রাণনায়ককে বসাইয়া রাখিতে তাঁহার ক্লেশবোধ হইতে লাগিল। তিনি তখন আপন দেহরথেই আর এক নূতনতর রথযাত্রা আরম্ভ করিয়া দিলেন। তিনি তখন হৃদয়মধ্যে চক্রাসনে যতন করিয়া প্রভুকে বসাইলেন। আপন ধৈর্য্যস্তম্ভে মনোরূপ পট্টডোরি দিয়া প্রভুকে বাঁধিলেন। আনন্দ-দাণ্ডে (বড়রাস্তায়) রথ রাখিলেন। তাহাতে কল্পনারজ্জু বন্ধন করিলেন। তাঁহার প্রকৃতিরূপ কলাপিঠিয়াগণ (গোপজাতি-বিশেষ) আসিয়া রথরজ্জু আকর্ষণ করিতে লাগিল। রথোপরি সুগুণ-সারথী রঙ্গভরে নাচিতে-গাইতে রথ চালাইতে লাগিল। রাজসবুদ্ধি ছড়িদার হইয়া হস্তে বেত্র ধারণ পূর্ব্বক হিংসা দুর্বুদ্ধি প্রভৃতিকে তাড়াইতে থাকিল। মহত্তত্ত্ব ঘোর ঘণ্টানাদ করিল। শব্দতত্ত্ব শঙ্খ বাজাইয়া দিল। জাগ্রত পুরুষ পড়িছা-(পণ্ডা-বিশিষ)-রূপে রথ রক্ষা করিতে লাগিলেন। পঞ্চপ্রাণ ব্রাহ্মণ-রূপে সুবুদ্ধিপণ্ডাকে সঙ্গে লইয়া প্রভুর পূজায় বসিয়া গেলেন।

চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে যেখানে যত অপূর্ব্ব সামগ্রী পাওয়া যায়, প্রভুর সম্মুখে সমস্তই একত্রিত করা হইল। পূজা করিয়া প্রভুর ভোগ দেওয়াও হইয়া গেল। নৃপতি মন চৈতন্য-মন্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া সুষুম্নাদ্বারে বিরাট্ পুরুষের সম্মুখে অবস্থান করিলেন। আজ্ঞা দিলেন,—ভয়কে মার, আর ক্রোধ, তামস ভাব, কুটিলতা, কপটতা, কুমতি, মিথ্যা, লোভ, মদ, মাৎসর্য্য, দুর্গুণ, দাম্ভিকতা ও কল্পনা আদি যত দুষ্ট লোক,—সকলকে এ দিব্যরথে থাকিতে দিও না, সকলকে মারিয়া দূর করিয়া দাও। মন-নৃপতি এই প্রকার হুকুম দিয়াই প্রভুর শ্রীমুখ ধ্যান করিতে লাগিলেন।

এই অদ্ভুত অপূর্ব্ব রথযাত্রার অবতারণা করিয়া বলরাম-দাসের আনন্দ আর ধরে না। তাঁহার আর সংসারের সুখ-সমৃদ্ধি কিংবা দেহগেহ, কিছুরই আশা নাই; রাত্রিদিবস জ্ঞান নাই;—ক্ষুধাতৃষ্ণাও নাই। কেবল একমনে একপ্রাণে এবং একই ভাবে তিনি দারুব্রহ্মকে ভজনা করিতে লাগিলেন। ভক্তের এই বিশুদ্ধ ভাব দেখিয়া শ্রীহরিও সেই ভাববন্ধনে বাঁধা পড়িয়া গেলেন।

এদিকে নীলাচলনগরে বিষম ব্যাপার বাধিয়া গিয়াছে। অসংখ্য কলাপিঠিয়া নন্দিঘোষ প্রভৃতি রথের দড়ি ধরিয়া প্রাণপণে টানাটানি করিতেছে, কিন্তু রথ চলা দূরে থাকুক, রথের চাকাও একটু নড়িতেছে না। দেখিয়া শুনিয়া সকলেই অবাক্। সকলেই ভাবিয়া চিন্তিয়া অস্থির,—রথ চালাইবার কি বুদ্ধিই বা করা যায়, আর রথই বা চলে না কেন?

কিছুতেই কিছু হইল না দেখিয়া সকলে নৃপতির অগ্রে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং রথের বৃত্তান্ত সমস্তই কীর্ত্তন করিলেন। রাজা শুনিয়া পরম বিস্মিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ রাজ্যের চারিদিকেই ঢেঁড়া পিটাইয়া দিলেন,—আমার রাজ্যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বৈশ্য-শূদ্র কিংবা স্ত্রী-পুরুষ বালক-বৃদ্ধ যে যেখানে আছ, সকলে সত্বর আসিয়া রথ-রজ্জু আকর্ষণ কর।

রাজার আদেশে তখনই দেশেদেশে লোক ছুটিল এবং ঢেঁড়া পিটিয়া রাজার আদেশ জাহির করিতে লাগিল। রাজার আদেশ পাইয়া দেখিতেদেখিতে সহস্রসহস্র লক্ষলক্ষ লোক আসিয়া পুরী-ধাম পূর্ণ করিয়া ফেলিল। সকলেই প্রাবলপরাক্রমে রথের রজ্জু আকর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু যেখানকার রথ, সেইখানেই রহিয়া গেল। সকলের সমবেত শক্তি রথকে এক চুলও সরাইতে পারিল না।

ব্যাপার দেখিয়া নরনাথ অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। মনে-মনে বলিলেন,—হায়! না জানি আমার কি অভাগ্যের উদয় হইল, তাই আজ শত চেষ্টাতেও রথ চলিতেছে না। মনের দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া নৃপতি তখন আদেশ করিলেন,—"ওহে, রাজ্যে যেখানে যত মত্তমাতঙ্গ আছে, সত্বর লইয়া আইস।" রাজার এ আদেশও প্রতি-পালিত হইল। চারিদিক্ হইতে শতশত মদমত্ত হস্তী আনয়ন করা হইল। রাজার আদেশে সেই সকল হস্তী সুসজ্জিত করিয়া রথে সংযোজিত করা হইল। মাহুতগণ ঘনঘন অঙ্কুশের তাড়না করিতে লাগিল। এদিকে স্বয়ং প্রতাপরুদ্র রাজা জগন্নাথের নানামতে পূজা

করাইয়া কোমরে কাপড় কষিয়া রথরজ্জু ধারণ করিলেন। রাজা নিজে আসিয়া রথের দড়ি ধরিয়াছেন, দেখিয়া চারিদিকের লোক আসিয়া মহা ব্যগ্রতার সহিত নন্দিঘোষ রথখানিকে 'গুড়কে পিঁপড়ার মত' ঘিরিয়া ফেলিল। চারিদিক্ হইতে উলুউলু ধ্বনি চটপট করতালি ধ্বনি এবং হরিবোল ধ্বনির ধূম পড়িয়া গেল। সে আনন্দ-উল্লাস দেখে কে? সকলে রথের দড়ি ধরিয়া যথাশক্তি টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু রথ কিছুতেই চলিল না। রাজা ও অন্যান্য সকল লোকই প্রাণান্তপরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন এবং যে যেথানে পাইলেন, যাইয়া বসিয়া পড়িলেন।

তখন মহারাজ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আমি নিশ্চয়ই প্রভুর পাদপদ্মে অনেক অপরাধ করিয়াছি। তাই রথ কিছুতেই চলিতেছে না। সে যাহা হউক, ব্যাপারখানা কি, একবার বুঝিয়া দেখিতে হইতেছে। এই বলিয়া রাজা দুঃখিতমনে কুশাসনে শয়ন করিয়া রহিলেন। মনের সন্দেহ মিটাইবার আর অন্য উপায় নাই দেখিয়া, সেই প্রভুর পাদপদ্মেই মনপ্রাণ সমর্পণ করিলেন।

অন্তর্য্যামী নারায়ণ তখনই তাহা জানিতে পারিলেন। স্বপ্নচ্ছলে রাজাকে কহিলেন,—"রাজন্! তুমি চিন্তা করিতেছ কেন? আমি তোমাকে যাহা যাহা বলি, তাহা শুদ্ধচিত্তে শ্রবণ কর।—

"মোর ভগত যেউঁ জন। মো নাম করই গায়ন॥
সে কেবে অশুচি নুহই। সর্ব্বদা শুচিবন্ত দেহী॥"

দেখ, যে ব্যক্তি আমার ভক্ত,—দিনযামিনী আমার নাম-গান

করিয়া আনন্দে নিমগ্ন হইয়া থাকে, সে কখনও অশুচি হয় না ; তাহার দেহ, প্রাণ. আত্মা সমস্তই শুচি,—শুচি হইতেও পরম শুচি।

শুচি অশুচি কিংবা পবিত্র অপবিত্র বিচার প্রাকৃত দেহেই সম্ভবে। ভক্তের দেহ অপ্রাকৃত, সুতরাং তাহা নিত্য পবিত্র। শুচি-অশুচি কিংবা পবিত্র অপবিত্র বিচার তাহাতে চলিতেই পারে না। নরনাথ ! ভক্ত-চরিত্র বড়ই দুর্ব্বোধ।

দেখ মহারাজ, বলরাম দাস আমার প্রিয় ভক্ত। সে মহা হর্ষমনে আমার কাছে আসিয়াছিল। সেবকগণ তাহাকে মারিয়া ধরিয়া, তাড়াইয়া দিল। তাই সে অভিমানবশে চক্রতীর্থে চলিয়া গেল। সে দুঃখমনে বাঁকিমুহানায় যাইয়া বসিল। প্রাণে-প্রাণে আমার পাদপদ্ম চিন্তা করিতে লাগিল। আমি তাহা জানিতে পারিলাম। তৎক্ষণাৎ তাহার পার্শ্বে যাইয়া মিলিত হইলাম। সে আমায় যে প্রকার সুখ দিল—যে প্রকার রথযাত্রা করিল, অন্যের কথা কি, ইন্দ্রাদি দেবগণেরও তাহা অনুষ্ঠান করা কঠিন। তুমিই বা তাহার ভাব জানিবে কেমনে ? তাই আমি সেইখানেই রহিয়াছি। এখান-কার রথ চলিবে কি প্রকারে ? ভক্ত যে ভাবরজ্জুতে আমায় বাঁধিয়া রাখিয়াছে ; সে বন্ধন তো আর মোচন করিতে পারিতেছি না। এতো দড়ির বাঁধন নয় যে, ফুস্ করিয়া খুলিয়া ফেলিব ? ভক্তের ভাবের বাঁধন,—শক্ত বাঁধন ! ভক্তের সহিত আমার যে কত ঘনিষ্ঠতা—কত অভিন্ন ভাব, তাহা সকলে জানে না ; সে কথাও একটু বলি শুন,—

"ভগত মোহর শরীর। মুহিঁ তাহাঙ্ক প্রাণেশ্বর॥
ভগত মোর ভিন্নাভিন্ন। কেবেহেঁ নুহে হে রাজন॥
ভগত রক্ষণ নিমন্তে। চক্র মুঁ ধরিঅছি হস্তে॥
ভগত দুঃখ সুখ যেতে। মুঁ সিনা ভুঞ্জুথাই নিত্যে॥"

ভক্ত আমার শরীর। আমি তাহার প্রাণেশ্বর। রাজন্! ভক্তে ও আমাতে কখনও ভিন্নভাব নাই; আমরা চিরদিনই অভিন্ন। আমার হস্তে এই যে চক্র দেখিতেছ, ইহা কাহার্ নিমিত্ত ধারণ করিয়া আছি? আছি কেবল ভক্তেরই নিমিত্ত,—এই চক্রে ভক্তের বৈরি-নিপাত করিয়া তাহাকে নিরাপদ করিবার নিমিত্ত। ভক্তের যত সুখ যত দুঃখ, আমাকেই তো তাহা নিত্য উপভোগ করিতে হয়? ফল, ভক্তের সুখেই আমার সুখ, ভক্তের দুঃখেই আমার দুঃখ। ভক্ত সুখ-দুঃখ-নিরপেক্ষ। সে আমার উপর সকল ভার চাপাইয়া নিশ্চিন্ত আছে। ভাবনা তো যত আমারই। ভক্ত দুঃখ পাইলে যখন সে দুঃখ আমাকেই ভোগ করিতে হইবে, তখন স্বার্থের খাতিরেও তো তাহার দুঃখ দূর করিয়া দেওয়া আমার দরকার। ভক্তের সুখেই আমার সুখ হয় বলিয়া আমি সদাসর্ব্বদা ভক্তের সুখানুসন্ধানই করিয়া থাকি। ভক্তের দুঃখ বিদূরিত করা এবং তাহাকে নিত্যসুখে নিমগ্ন করাই আমার কার্য্য।

রাজন্! যাহা বলিলাম, তাহাতে মনে অণুমাত্র সংশয় করিও না। ইহা যার-পর-নাই সত্য কথা। অতঃপর যাহা বলিতেছি, তাহাও অবহিত-চিত্তে শ্রবণ কর। যদি তোমার নান্দিঘোষ রথে আমার যাত্রা করাইবার একান্ত ইচ্ছাই হইয়া থাকে, তবে তুমি এক

কার্য্য কর ;—যাহারা আমার ভক্তকে অকারণ দণ্ড দিয়াছে, সেই সকল সেবককে শীঘ্র ডাকাও ; ডাকাইয়া জোড়াজোড়া করিয়া তাহাদের বাঁধাও। তাহাদের গলায় কুড়ুল বাঁধিয়া দিবে ; তাহারা দন্তে তৃণগুচ্ছ ধারণ করিবে ; তাহাদের পিছন হইতে গলা ধাক্কা দিতে দিতে আমার ভৃত্য বলরাম দাসের সম্মুখে লইয়া আসিবে ; তাহার চরণতলে সকলে লুটাপুটি খাইতে থাকিবে ; আর তুমিও স্বয়ং বলরাম দাসকে কোলে বসাইয়া অনেক গৌরব-সম্মান-সহকারে নন্দি-ঘোষ রথে লইয়া আসিবে ; রথের উপর বসাইয়া পরম আদরে তাহার মাথায় পাটশাড়ীর শিরোপা বাধিয়া দিবে। এইরূপ পূজা পাইয়া সে যখন বেগে রথ চালাইবার জন্য আদেশ করিবে, তখনই রথ অবাধে চলিতে থাকিবে, নচেৎ কিছুতেই চলিবে না। রাজন্ ! আমি সত্য-সত্যই বলিতেছি,—

"মুহিঁ চ্ছাড়িলি নীলাচল। ভগতভাব মোর মূল ॥
ভগত যিব মোর যেণে। মুহিঁ নিশ্চয় যিবি তেণে ॥"

ভক্তের বিশুদ্ধ ভাবই আমার যাহা কিছু সকলই। সেই ভক্তের আকর্ষণেই আমি নীলাচল ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছি। ভক্ত আমার যে দিকে গমন করিবে, আমিও নিশ্চয় সেই দিকেই গমন করিব। ভক্ত নীলাচলে চলিলে আমিও তাহার সহিত নীলাচলে চলিয়া যাইব।

এই কথা বলিয়া ভগবান্ অন্তর্দ্ধান করিলেন। নৃপতিও ব্যস্ত-সমস্তভাবে উঠিয়া দাসদৌবারিকাদি সেবকবৃন্দকে ডাকাইলেন, জোড়াজোড়া করিয়া করিয়া তাহাদের বাঁধাইলেন ; সকলের গলদেশে

কুঠার ঝুলাইয়া দিলেন; দন্তে তৃণগুচ্ছ ধারণ করাইলেন এবং পাছু-পাছু গলাধাক্কা দিতে-দিতে ভক্ত বলরামদাসের সম্মুখে সকলকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেই ভক্তের চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। উঠিয়া আবার কপালে কৃতাঞ্জলি হস্ত অর্পণ করিলেন। বলিলেন,—দেব! আমরা বড় অপরাধী, অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড ও আমরা পাইয়াছি। আর কেন, এইবার আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন; উঠুন—নীলাচলনগরে শুভ বিজয় করুন। ধন্য আপনার ভক্তির মহিমা! অজ্ঞ আমরা তাহা কি প্রকারেই বা বুঝিতে পারিব?

নৃপতিও মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া অনেক আদরগৌরবে বলরাম দাসকে আপনার কোলের উপর বসাইলেন। ধন-রত্ন-বসন-ভূষণে তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন। অশ্বের উপর আরোহণ করাইয়া মহা মহোৎসব করিতে করিতে নীলাদ্রিনগরে নন্দিঘোষ রথের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরে স্বয়ং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া রথের উপর লইয়া গেলেন। প্রভুর সম্মুখে বসাইয়া পাটশাড়ীর শিরোপা তাঁহার মাথায় বাঁধিয়া দিলেন এবং বিনয়ের সহিত বলিলেন,—ভক্তবর! এইবার দয়া করিয়া রথযাত্রা করাও; সকলই তো তোমার আয়ত্ত।

বলরাম দাস রাজার আদর-আপ্যায়নে এবং সুমধুর সম্ভাষণে মনেমনে মহা হর্ষ অনুভব করিলেন। প্রভুর প্রতি প্রেমনেত্রে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"বোইলে—নমো মহাবাহু। ভগতবৎসল বোলাউ॥
নাম করুণামহামেরু। কিঞ্চিত্তে দ্রুব করু দারু॥

এবে মুঁ কহুঅচ্ছি তোতে। ভো প্রভু বিজে কর রথে ॥
তুরিতে রথ চলি যাউ। প্রভুমহিমা রহি থাউ ॥”

ওহে মহাবাহু! তোমায় নমস্কার। তুমি নাকি আপনাকে ‘ভক্ত-বৎসল’ বলাইয়া থাক। তোমার নাম নাকি করুণার মহামেরু। উচ্চতায় মেরুপর্ব্বতের বরং পরিমাণ হয়, কিন্তু তোমার করুণার আর পরিমাণ হয় না; তাই বুঝি তুমি করুণামহামেরু। তাই তোমার কাছে কিঞ্চিৎ করুণা ভিক্ষা করি,—তোমার দারুবিগ্রহ একটু দুর্ব্বল করিয়া দাও। বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি সংবরণ করিয়া রথে শুভ বিজয় কর। রথও ত্বরিত-গতিতে চলিতে থাকুক। ভক্তের প্রভু তুমি,—গতি তুমি, তোমার মহিমা চিরতরে বিশ্ব ভরিয়া রহিয়া যাউক।

ভক্ত বলরাম দাস নৃপতিদত্ত সম্মান মর্য্যাদা লাভ করিয়া ইতর-জনের ন্যায় আত্মবিস্মৃত হইলেন না, অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠিলেন না, আর সেই অহঙ্কারভরে স্বয়ং কোন হুকুমও চালাইলেন না। অধিকন্তু তাঁহার সকল সম্মান সকল মর্য্যাদার মূল সেই প্রভুরই নিকটে করুণা ভিক্ষা করিলেন। ভক্ত ও ভগবান্ একপ্রাণ কিনা, তাই ভক্ত বলরাম প্রাণেপ্রাণে প্রভুর প্রেরণা বুঝিতে পারিলেন। তিনি অতি দীনহীনের মত কৃতাঞ্জলিপুটে সকলের প্রতি বলিয়া উঠিলেন,—আর বিলম্ব নয়, তোমরা এইবার রথরজ্জু আকর্ষণ কর, প্রভুর শুভ বিজয় হইবেই হইবে।

ভক্তের কথা শুনিয়া অমনি কলাপিঠিয়াগণ রথের দড়ি ধরিয়া টান দিল। সকলেই জয়জয়-হরিহরি-ধ্বনি করিতে থাকিল। বিবিধ বাজনা বাজিয়া উঠিল। রমণীগণ হুলাহুলি দিতে লাগিল। সেবকগণের

ঘনঘন ঘণ্টা-কাংস্য-নিনাদ সেই সংমিশ্রিত শব্দকে আরও তুমুল করিয়া তুলিল।

চারিদিকেই এই আনন্দোল্লাস দেখিয়া ভগবান্ নৃপতির প্রতি পরম প্রসন্ন হইলেন এবং ভক্তের মহত্ত্ব রক্ষা করিবার নিমিত্ত রথ যাত্রা আরম্ভ করিয়া দিলেন। ঘন ঘোর গর্জ্জনে তালধ্বজ রথ চলিতে লাগিল, সঙ্গেসঙ্গে বিজয়া এবং নন্দিঘোষ রথও চলিতে আরম্ভ করিল। সে রথের দৌড়ই বা দেখে কে? রথের দড়ি কোথায় পিছনের দিকে পড়িয়া রহিল, আর পাখীর মত শূন্যমার্গেই যেন রথ তিনখানি উড়িয়া যাইতে লাগিল। পলক না পড়িতে পড়িতে তিনখানি রথই গুণ্ডিচানগরে আসিয়া প্রবিষ্ট হইল।

এই বিচিত্র ব্যাপার দেখিয়া স্বয়ং মহারাজ এবং অন্যান্য যত লোক, ভক্ত বলরামের চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়া নানাপ্রকার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন ভক্ত ও ভগবানের জয়জয়-রবে চারিদিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল। সে দৃশ্য যার-পর-নাই মধুর,—যার-পর-নাই মর্ম্মস্পর্শী! কেহকেহ ভক্তের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন,—ওহে তোমার জীবন ধন্য; তুমি নারায়ণকে আপনার বশ করিয়া ফেলিয়াছ। আবার কেহকেহ ভগবানের দিকে তাকাইয়া বলিতেছেন,—অহো প্রভু, ধন্য তোমার মহিমা; তুমি ভক্তের গৌরব রক্ষা করিলে। অনন্তর সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—

“এণু এ ব্রহ্মাণ্ডমধ্যেন। হরিভগত বড় জন॥
যে সাধুজনঙ্কু ভজই। সে নিশ্চে হরিঙ্কি লভই॥
যে বা সাধুরে দ্রোহ করি। সে নিশ্চে শ্রীহরি-বইরি॥”

এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে হরিভক্তই শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি সাধুজনের ভজনা করে, নিশ্চয়ই সে শ্রীহরিকে লাভ করিয়া থাকে। আর যে জন সাধুর দ্রোহ আচরণ করে, নিশ্চয়ই সে শ্রীহরির বৈরী হইয়া থাকে।

এইকথা বলিয়া সকলেই সেই ভক্তের ভাব চিত্তে চিন্তা করিতে-করিতে আপন-আপন আবাস অভিমুখে গমন করিলেন। সেবকগণও পরমানন্দে প্রভুকে শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে লইয়া গিয়া যে যাহার সেবায় লাগিয়া গেলেন। ভক্তের বিজয়-দুন্দুভি-নাদে দিগ্ দিগন্ত পূর্ণ হইয়া উঠিল।

অহো ভগবন্, ধন্য তোমার ভক্ত-বাৎসল্য! বিশুদ্ধ ভক্তির কথা দূরে থাকুক, সামান্য ভক্তির আভাস দেখিলেই তুমি ভুলিয়া যাও! তাই চরিত্রহীন বেশ্যাসঙ্গী বলরাম দাসের প্রতিও তুমি এতদূর কৃপা বিস্তার করিলে। নাথ, ইহা হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, যাঁহারা সদাচার রক্ষা করিয়া, বিশুদ্ধ চরিত্র বজায় রাখিয়া, নিরপরাধে তোমার ভজনা করেন, তাঁহাদের প্রতি তোমার কতই না করুণা—কতই না প্রীতি।

প্রভু, সংসারের পিচ্ছিল-পথে চলিতে-চলিতে প্রমত্ত জীবের তো পদেপদে পদস্খলন হইবারই কথা। সেই হতভাগ্য পতিত জীবের প্রতি তোমার এতদূর দয়া না থাকিলে কি আর তোমায় 'পতিত-পাবন' বলিয়া কেহ ডাকিত,—না, কেহ তোমার বিশুদ্ধ ভজনপথ অবলম্বন করিত? নিরপরাধের প্রতি করুণা তো সকলেই করিয়া থাকেন। সাপরাধের প্রতি করুণা বিতরণ করাই না কঠিন! সে শক্তি কি সকলের আছে? সাপরাধ

জনেও তোমার এই অবাধ করুণার ধারা বর্ষণ হইতে দেখিয়া আমাদের কেবল শ্রীরূপগোস্বামিপাদের এই মহাবাক্যই মনে পড়ে,—

"ভৃত্যস্য পশ্যতি গুরূনপি নাপরাধান্
সেবাং কৃতামপি মনাগ্ বহুধাভ্যুপৈতি।
আবিষ্করোতি পিশুনেষ্বপি নাভ্যসূয়াং
শীলেন নির্ম্মলমতিঃ কমলেক্ষণোঽয়ম্ ॥"

আর সঙ্গেসঙ্গে কবিরাজগোস্বামীর ও পয়ারের মধুর ঝঙ্কার আমাদের কাণের কাছে বাজিয়া উঠে,—

"ঈশ্বর স্বভাব—ভক্তের না লয় অপরাধ।
অল্প সেবা বহু মানে, আত্মপর্য্যন্ত প্রসাদ ॥"

(চৈঃ চং, অন্ত্য, ১ম পং)

দীনবন্ধু দাস।

অবন্তীনগরে উত্তম ব্রাহ্মণকুলে দীনবন্ধুর জন্ম। পত্নী মালতী, দুইটী পুত্র এবং একটি পুত্রবধূ লইয়াই তাঁহার সংসার। ভগবানের কি যে কৃপা, বলা যায় না; এই ব্রাহ্মণ-পরিবারের পাঁচজনেই যেন একই ছাঁচে ঢালা; দেহ ও আকার কেবল ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু মন প্রাণ সবই এক। সকলেই নিয়ত কৃষ্ণকথা কহিতে ও শুনিতে ভালবাসেন, হরিচরণে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। সাধুর মুখে হরিকথা শুনিতে পাইলে তাঁহারা সকল ভুলিয়া যান। অসৎসঙ্গে কাহারও আস্থা নাই। মিথ্যাকথা কেহই কহেন না। পরহিতসাধনই সকলের জীবনব্রত। সাধুসজ্জনের চরণসেবন ও দুঃখি-দরিদ্রকে অন্নবস্ত্রাদি বিতরণ করিতে সকলেই মুক্তহস্ত। তাঁহাদের দ্বারে আসিয়া অতিথি-ফকির কাহাকেও নিরাশ হইয়া ফিরিতে হয় না। অতিথি-সেবাই যে গৃহীর পরম ধর্ম্ম এবং অতিথিকে নিরাশ করিলে সেই অতিথি যে গৃহস্থকে আপন পাপরাশি অর্পণ করিয়া তাহার পুণ্যপুঞ্জ লইয়া চলিয়া যান, এ কথা তাঁহারা সকলেই উওম বুঝিয়াছেন। তাই তাঁহারা শ্রদ্ধাপূতহৃদয়ে যথাশক্তি অতিথির আশা পূর্ণ করিয়া থাকেন। না পারিলে অন্তত সুমিষ্ট বাক্যেও তাঁহাদের সন্তোষ সম্পাদন করেন। তথাপি 'না' কথাটি কাহারও প্রতি প্রয়োগ করেন না।

ফুল ফুটিলে গন্ধ ছাপা থাকে না,—এই ব্রাহ্মণ-পরিবারের যশঃসৌরভ দিন-দিন দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, প্রকৃতির রাজ্য ছাড়াইয়া ভগবানের অপ্রাকৃত রাজ্যেও সমাচার প্রচারিত হইয়া পড়িল। না পড়িবেই বা কেন? অতিথির বেশে যাঁহারা আমাদের আবাসে আগমন করেন, তাঁহাদের সকলকে কি আমরা চিনিতে পারি? অতিথির ভিতর ভালও আছে, মন্দও আছে; এ রাজ্যের লোকও আছে, আর সে-রাজ্যের অর্থাৎ সেই অপ্রাকৃত ভগবদ্রাজ্যের লোকও আছে। অতিথিসেবায় নিষ্ঠা থাকিলে একদিন-না-একদিন এক-আধজন সে-রাজ্যের অতিথিরও তো আসিবার কথা। সে-রাজ্যের লোকের আগমন হইয়া গেলে আর সেখানে এখানকার খবর পঁহুছাইতে বড় বিলম্ব হয় কি? হয়-না বলিয়াই তো দীনবন্ধুদাসের সংবাদ সেই দীনবন্ধুর কর্ণে যাইয়া প্রবেশ করিল।

সংসারে আমরা নানা প্রকার ব্যস্ততা দেখিতে পাই, কিন্তু 'অমুক আমায় ভালবাসে' এই কথা জানিতে পারিলে, তাহাকে পাইবার জন্য, তাহার কাছে যাইবার জন্য—'বেড়া নাড়া দিয়া গৃহস্থের মন বুঝা'র মত তাহাকে একটু নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিবার জন্য ভগবানের যে প্রকার ব্যস্ততা, তাহার সহিত সাংসারিক তুচ্ছ ব্যস্ততার তুলনাই হয় না। তাই দীনবন্ধুদাসের কথা শুনিবা-মাত্রই ভগবানের আসন টলিল। যোগি-ঋষিগণ সমাধি-যোগেও যাহার দর্শন পাইয়া উঠেন না, সেই ব্রহ্মাণ্ডনাথ আপনিই ত্বরিত-গতিতে দীনবন্ধুদাসের উদ্দেশে অবন্তীনগরে আগমন করিলেন।

আসিয়াই ভক্তের ভীষণ অগ্নিপরীক্ষার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তক্ষক নাগকে আহ্বান করিয়া বলিয়া দিলেন,—তুমি সত্বর দীনবন্ধুদাসের ভবনে যাও,—তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রকে দংশন কর।

ভগবানের এই আদেশে তক্ষক নাগ তৎক্ষণাৎ যাইয়া দীনবন্ধুদাসের জ্যেষ্ঠপুত্রকে দংশন করিল। তক্ষক-বিষের অসহ্য যাতনায় ছটফট করিতে-করিতে তাহার জীবলীলারও শেষ হইয়া গেল। এই আকস্মিক সর্ব্বনাশে সকলেরই মস্তকে যেন শত সহস্র বজ্র প্রবলবেগে আঘাত করিল। সকলেই শবের চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়া তাহার গুণ বিনাইয়া-বিনাইয়া উচ্চনাদে কাঁদিতে লাগিলেন। শোকের আর সীমা-পরিসীমা নাই। সে দৃশ্য দেখিলে পাষাণও বিদীর্ণ হইয়া যায়।

এমন সময়ে অবন্তীনগরের রাজপথে এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তাঁহার হস্তে দণ্ড ও কমণ্ডলু। সর্ব্বাঙ্গ বিভূতি-ভূষিত। পরিধান কাষায় বসন। কণ্ঠে তুলসীর মাল্য সংলগ্ন। তাঁহার কমনীয় রূপ দেখিলে বিশ্বসংসার ভুলিয়া যাইতে হয়। সন্ন্যাসী রাজপথের দুইধারে যাহাকে দেখেন তাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন,—হাঁগা, দীনবন্ধুদাসের বাড়ী কোথায় গা?

সন্ন্যাসী ঠাকুর এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে দীনবন্ধুদাসের বাটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই—'দীনবন্ধুদাস!—ও দীনবন্ধুদাস!' বলিয়া উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর আহ্বানধ্বনি ক্রন্দনকোলাহল ভেদ করিয়া দীনবন্ধুদাস প্রভৃতি

সকলেরই কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। সন্ন্যাসীর স্বরের কি যে মোহিনী শক্তি বলা যায় না; সেই সুধা-সুমধুর স্বরে সকলেই যেন বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন, শোকতাপ যেন সকলেই ভুলিয়া গেলেন, সঙ্গেসঙ্গে ক্রন্দনের উচ্চরোলও থামিয়া গেল। দীনবন্ধুদাস তৎক্ষণাৎ মুখে একটু জল দিয়া, অশ্রু-লালা প্রভৃতি প্রক্ষালন করিয়া, দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ভুবনমোহন সন্ন্যাসিমূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দভরে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। উঠিয়া কৃতাঞ্জলি-করযুগল কপালে রাখিয়া সন্ন্যাসীকে বিনয়সহকারে বলিলেন,—ঠাকুর গো, এ অধমের প্রতি কি আদেশ করিতেছেন?

দীনবন্ধুদাসের কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী বীণা-বিনিন্দিত-স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—ওহে দীনবন্ধুদাস! শুনিতে পাই, তুমি নাকি পরম আদরে অতিথিসেবা করিয়া থাক,—দীনদুঃখীকে অকাতরে অন্নবস্ত্র বিতরণ করিয়া থাক? তোমার এই কীর্ত্তিকাহিনী শুনিয়াই আজ আমি তোমার কাছে আসিয়াছি; তুমি পূতচিত্তে আমাকে অন্ন ভোজন করাও।

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া দীনবন্ধুদাস তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক একখানি আসন দিয়া বলিলেন,—ঠাকুর গো, এই আসনে দয়া করিয়া একটু বসুন, আমি আসিতেছি।

এই বলিয়া দীনবন্ধু বাটীর ভিতর স্ত্রীপুত্রাদির নিকটে যাইয়া বলিলেন,—দ্বারে অতিথি আসিয়া ভোজন ভিক্ষা করিতেছেন, এদিকে পুত্রের মৃতদেহও তো পড়িয়া রহিয়াছে; এখন তোমরা শুদ্ধচিত্তে অতিথিসেবা করিতে পারিবে কি না, শীঘ্র আমায় বল।

দীনবন্ধুদাসের অতিথিভক্তিময় বাক্য শ্রবণে তাঁহার পত্নী, পুত্রবধু ও কনিষ্ঠ পুত্র এককণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন,—

"মলে ত ন আসই আউ। অতিথি সেবা আগে হেউ ॥"

মরিলে তো আর কেউ ফিরিয়া আসে না, আমাদের অতিথিসেবাই সর্ব্বাগ্রে হউক। অতিথিকে নিরাশ করা ভাল নয়।

এই কথা শুনিয়া দীনবন্ধুদাস অতিশয় আনন্দিত হইলেন। একখানি 'মসিনা' (মাদুর) আনিয়া মৃতপুত্রকে তাহাতে শয়ন করাইলেন এবং জড়াইয়া দড়িতে বাঁধিয়া গন্তিরি-মধ্যে (ভিতরকার ঘরে) লুকাইয়া রাখিয়া দিলেন। সকলে মিলিয়া ঘর দ্বার 'লেপা-পোঁছা' করিলেন, স্নান করিয়া শুদ্ধভাবে রন্ধন চড়াইয়া দিলেন। রন্ধন শেষ হইয়া গেলে দীনবন্ধুদাস সন্ন্যাসীকে অন্দরে ডাকিয়া আনিলেন। তাঁহাকে দিব্য আসনে বসাইয়া অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করিলেন।

সন্ন্যাসী অন্নব্যঞ্জনাদি দেখিয়া যেন একটু অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ওহে, তোমরা করিয়াছ কি, আমিষ রন্ধন কর নাই? আমিষ না হইলে তো আমার আহারই হইবে না; অগত্যা আমাকে ফিরিয়াই যাইতে হইবে দেখিতেছি।"

অতিথিসেবাপরায়ণ ব্রাহ্মণ-পরিবার তখন সন্ন্যাসীকে সানুনয়ে বলিলেন,—ঠাকুর! অল্পক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমরা এখনই আমিষ রন্ধন করিয়া দিতেছি। বৈষ্ণবসন্ন্যাসিগণ সাধারণত নিরামিষ আহারই করিয়া থাকেন, তাই আমরা সেই প্রকার আয়োজনই

করিয়াছি ঠাকুর! আমাদের এই অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হউক।

সন্ন্যাসী সেই আসনে বাক্যহীন হইয়া বসিয়াই রহিলেন। এদিকে যতদূর সত্বর মৎস্য সংগ্রহ ও পাক করা হইয়া গেল। সন্ন্যাসীর পাত্রে সেই আমিষ পরিবেশন করিয়া তাঁহাকে ভোজনের জন্য অনুরোধও করা হইল। কিন্তু তবুও সন্ন্যাসী আহার করিলেন না। তিনি আবার এক নূতন কথা তুলিলেন। বলিলেন,—ওহে, তোমরা তো একখানি পাতেই ভাত বাড়িয়াছ; আমি তো একা-একা কখনই খাই না; তোমরা বাড়ীতে যে কয়জন আছ, সকলেরই পাতা হউক, তাতে ভাত বাড়া হউক, তরিতরকারি সব দেওয়া হউক, সকলে আসিয়া খাইতে বসিয়া যাও, তবে আমি ভোজন করিব, নচেৎ এই তোমাদের অন্নব্যঞ্জনাদি সকলই পড়িয়া রহিল, আমি চলিলাম।

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া তাঁহারা চারিজনে চোখ-ঠারাঠারি করিতে লাগিলেন। সকলেই ভাবিলেন,—আমরা যদি খাইতে না বসি, তাহা হইলে সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই ভোজন করিবেন না,—নিরাশ হইয়া চলিয়া যাইবেন, অতএব সন্ন্যাসীর সহিত আহার করিতে বসা-ই ভাল। অতিথিসেবা তো হইবে, তাহার পর যাহা হইবার হউক।

আবার চারিখানা পাতা করিয়া তাহাতে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি পরিবেশন করা হইল। কেবল আমিষটা তাহাতে বাদ দেওয়া রহিল। ইহা দেখিয়া সন্ন্যাসী যেন একটু কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—ওহে, তোমাদের পাতে যে মাছ পরিবেশন করিলে না?

বলি ব্যাপারখানা কি ; ও মাছে কি বিষ মাখানো আছে ? ওঃ, জানিলাম,—তোমরা যার-পর-নাই কপট। এই তোমাদের ভাতটাত সকলই পড়িয়া রহিল, আমি চলিলাম। এই বলিয়া সন্ন্যাসী আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন।

দীনবন্ধুদাস বিষম সমস্যায় পড়িয়া গেলেন, পত্নী-পুত্রকে কাছে ডাকিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন,—এখন করা যায় কি ? পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে,—সেই মৃতদেহ বাড়ীতে পড়িয়া রহিয়াছে, তাই আমরা আমিষ খাইতে চাহিতেছি না। সন্ন্যাসী একথা জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই ভোজন করিবেন না। তাহার অপেক্ষা চুপেচাপে মাছ-ভাত খাওয়াই ভাল। অতিথিসেবা ত সিদ্ধ হইবে, তার পর-যাহা হইবার হয় হউক। ইহা ভাবিয়া সকলেই পাতে মাছ লইয়া সন্ন্যাসীর দিকে তাকাইয়া রহিলেন। সকলেরই মনের ভাব—সন্ন্যাসী একবার ভোজনে বসিলে হয়, আমাদের মনোবাঞ্ছা সুসিদ্ধ হইয়া যায়।

সন্ন্যাসী যাহা-যাহা বলিতেছেন, আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মত চারিজনে তখনই তাহা সম্পন্ন করিতেছেন। কিন্তু এতেতেও সন্ন্যাসীর মন পাওয়া গেল না। তাঁহার ভোজন করাও আর হইল না। সন্ন্যাসী আবার এক অভিনব আপত্তি উত্থাপন করিলেন। এবার আর রাগ দেখাইয়া নয়, তাঁহার সেই ভুবন-ভুলানো হাসি দেখাইয়া তিনি দীন-বন্ধুদাসকে বলিতে লাগিলেন,—ওহে, আমি আসিবার সময় গ্রামে-গ্রামে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, তুমি—তোমার সহ-ধর্ম্মিণী, দুইটী পুত্র ও একটি পুত্রবধূ লইয়া পাঁচজনে এই গৃহে বাস

করিয়া থাক। এখন দেখিতেছি, তোমরা চারিজনে চারিখানা পাতা করিয়াছ। তোমার আর একটি পুত্র কোথায়? তাহাকে লইয়া আইস। তাহার পাতা হউক, তাহাকে অন্নব্যঞ্জনাদি দেওয়া হউক, সে আহারে উপবেশন করুক, তবে আমি ভোজন করিব। যাও,—শীঘ্র যাও, তোমার সেই ছেলেটিকে সত্বর লইয়া আইস।

এই কথা শুনিয়া দীনবন্ধুদাসের হৃদয়ের বল-ভরসা সকলই কোথায় উড়িয়া গেল, শরীর থরথর কাঁপিতে লাগিল। মুখ দিয়া একটি কথাও ফুটিয়া বাহির হইল না। তিনি কেবল ছলছলনেত্রে সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। যেন কত অপরাধী।

দীনবন্ধুদাসের এইপ্রকার ভাবান্তর দেখিয়া সন্ন্যাসী তাঁহাকে বলিলেন,—ওহে, তোমার এত ভয় কিসের? কপটতা ছাড়িয়া সত্য করিয়া বল—তোমার আর এক পুত্র কোথায়?

তখন চারিজনেই সন্ন্যাসীর চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন দীন-বন্ধুদাস তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—ঠাকুর, সত্য কথা বলি, শ্রবণ করুন। আমার সেই ছেলেটি এইমাত্র সর্পাঘাতে মারা পড়িয়াছে। আমরা কেবল অতিথিসেবার অনুরোধে তাহাকে ঘরের ভিতর মাদুর জড়াইয়া রাখিয়া দিয়াছি। এখন, যাহা আদেশ হয় করুন।

সন্ন্যাসী বলিলেন,—এ-ও কি একটা কথা? না দেখিলে একথা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। আচ্ছা, মড়াছেলে—মড়াছেলেই কই ঘরের ভিতর হইতে লইয়া আইস দেখি?

দীনবন্ধুদাস কি করেন, সন্ন্যাসীর আদেশে তখনই স্ত্রী-পুরুষে যাইয়া ঘরের ভিতর হইতে সেই মাদুর-জড়ানো মড়াছেলেকে লইয়া

আসিলেন এবং মাতুরখানি খুলিয়া সন্ন্যাসীর সম্মুখে স্থাপন করিলেন। দেখিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন,—ওহে দীনবন্ধুদাস, তোমাকে 'জ্ঞানবন্ত' বলে কে? আমিতো দেখিতেছি, তুমি বড় মন্দলোক।—তুমি কিনা—

"মলা পুত্রকু গৃহে থোই। বসিচ্ছু মাচ্ছ-ভাত থাই॥"

মড়াছেলেটিকে ঘরের ভিতর পূরিয়া রাখিয়া মাছভাত খাইতে বসিয়া গেছ? আরে ছি ছি!

দীনবন্ধুদাস বলিলেন,—গোঁসাই, তোমায় আর আমি বেশী কি-ই বা বলিব। তবে একটা কথা বলি,—

"কে অটে কাহার কুমর। কে অটে কাহার পিঅর॥
যেসনে চূতবৃক্ষ থাই। তহিঁ বউল বউলই॥
কেতেহেঁ কশিরু ঝড়ই। কেতে বা বাঢ়ি পড়ই॥
কেতে পাচিলা যাএ ডালে। থাইন পড়ে বৃক্ষতলে॥
এমন্তে কেতে ঝড়ি যাই। তা তূলে বৃক্ষ নিকি ধাই॥
এহি প্রকারে এ সংসার। বৃক্ষর ফলর প্রকার॥
তাহার সুখে সে ঝড়িলা। মোর অতিথিসেবা হেলা॥"

ঠাকুর' বলুন দেখি, এ সংসারে কে-ই বা কাহার পুত্র, আর কে-ই বা কাহার পিতা? যেমন আম্রবৃক্ষ। তাহাতে মুকুল হইতেছে। ছোটছোট কষি আম ধরিতেছে। সেই অবস্থাতেই কতক ঝরিয়া পড়িতেছে। কতক বা কিছু বড় হইয়া পড়িয়া যাইতেছে। আবার কতক-কতক গাছের ডালেই পাকিয়া গিয়া সে গাছের তলে পতিত হইতেছে। ছোট হউক, বড় হউক, আর মাঝারীই হউক, বৃক্ষ হইতেই ফলগুলি ঝরিয়া-ঝরিয়া পড়ে;

তাই বলিয়া কি বৃক্ষ সেই ফলের সঙ্গে-সঙ্গে ছুটিয়া যায়? এ সংসারও এই প্রকার। শিশু হউক, যুবা হউক, আর বৃদ্ধই হউক, কাল পূর্ণ হইলে ফলের মত সকলেই ঝরিয়া পড়ে। যে ঝরিয়া পড়িবার পড়িয়া গেল, তাহার পাছুপছু ছুটিবার কোন আবশ্যক আছে কি? আমার পুত্রের কাল পূর্ণ হইয়াছিল— ঝরিয়া পড়িবার উপযুক্ত সময় আসিয়া গিয়াছিল, তাই সে আপনার সুখে আপনি ঝরিয়া পড়িয়াছে। তাহার জন্য কাতর হইলে,—চিন্তাস্রোত তাহার দিকে প্রধাবিত করিয়া রাখিলে আমার চলিবে কেন? না, তাহা রাখা উচিত? তাহাতে কিছু লাভ আছে কি? আমার যে অতিথিসেবা হইল, ইহাই পরম লাভ। ইহার অপেক্ষা অধিক ভাগ্যই বা কি হইতে পারে?

দীনবন্ধুদাসের কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী হাস্য করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার পত্নীর প্রতি বলিলেন,—ওঃ, তোমার কি কঠিন প্রাণ। তোমার শরীরে একটুকুও দয়ামায়া নাই। তুমি হইলে ছেলের মা; আর তুমি কিনা—

"মলার পুত্রকু পকাই। বসিচ্ছু মাছ-ভাত খাই॥"

মড়া ছেলেকে ফেলিয়া রাখিয়া মাছ-ভাত খাইতে বসিয়া গিয়াছ? ছিছি, বড় লজ্জার কথা লজ্জার কথা!

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া তিনি ধীরেধীরে বলিতে লাগিলেন,—

"স্বরূপ শুন হে গোসাইঁ। মুঁ কে মো পুত্র কে অটই॥
যেসনে চক্রী চক্রখণ্ড। মৃত্তিকা লদি গঢ়ে ভাণ্ড॥
কে গঢ়ু গঢ়ু ভাঙ্গি যাই। কেহু পোড়িবা যাএ থাই॥

যেবন ভাণ্ড ভাঙ্গি যাই। তা তুলে চক্রী নিকি ধাই॥
সে চক্রীভাণ্ড মুহিঁ শুন। এ সর্ব্ব গোবিন্দ-ভিআণ॥”

গোঁসাই হে, আমি তোমাকে অন্তরের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমিই বা কে, আর আমার পুত্রই বা কে? আমাদের পরস্পর কিসেরই বা সম্বন্ধ? যেমন চক্রী (কুম্ভকার) চক্রখণ্ডের উপর মৃত্তিকা চাপাইয়া ভাঁড় গড়িয়া থাকে। গড়িবার সময় কতক ভাঁড় গড়িতেগড়িতেই ভাঙ্গিয়া যায়। কতক আবার পাঁজা সাজাইয়া পোড়াইবার সময় ভগ্ন হইয়া যায়। যে ভাঁড় ভাঙ্গিয়া যাইবার সে ভাঙ্গিয়া গেল, তাই বলিয়া কি কুম্ভকার সেই ভাঁড়ের সঙ্গেসঙ্গে কখনও ছুটাছুটি চলিয়া যায়? ঠাকুর গো, সেই কুম্ভকারের ভাণ্ডের মত আমাদের পরস্পর সম্বন্ধ। কেহই কাহার জন্য মরে না। প্রকৃত পক্ষে কাহারও সহিত কাহারও কোন সম্বন্ধ নাই। তবে কিনা, এ সকল সেই লীলাময় শ্রীগোবিন্দরই লীলাখেলা;—এ সংসার কিংবা এখানকার কৃত্রিম সম্বন্ধ যাহা কিছু, সমস্ত তাঁহারই রচনা।

তাঁহার কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। তখন তিনি দীনবন্ধুদাসের অপর পুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,— ওহে বাপু, তোমার এ কিরূপ আচরণ? তোমার দাদা মরিয়া গিয়াছেন না? আর তুমি কিনা—

“মৃত্যুশবকু তু পকাই। বসিচ্ছু মাছ-ভাত খাই॥”

মড়া ভাইকে ফেলিয়া রাখিয়া মাছ-ভাত খাইতে বসিয়া গিয়াছ? ছিছি, বড় লজ্জা বড় লজ্জা! তোমার মত অজ্ঞান ত আর দেখা যায় না।

এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণকুমার বিনয়-সহকারে বলিয়া উঠিলেন,—

"শুন হে সন্ন্যাস গোসাইঁ। সে মোর কেতে জন্মে ভাই ॥
মু তার কেমন্ত সোদর। এ সর্ব্ব মায়ার সংসার ॥
যেসনে হাটে বণিজার। পসরা বসই অপার ॥
একই ভ্রাত প্রায়ে হোই। বসিন বিকু থান্তি তাইঁ ॥
ব্যাপার সরই যাহার। সে বান্ধি চলে তার পুর ॥
যাহার সরিণ ন থাই সে নিকি তার সঙ্গে যাই ॥
সেহি প্রকারে এ সংসার। তাহার মোহর ব্যাপার ॥
ব্যাপার সরিলা সে গলা। মোর অতিথিসেবা হেলা ॥"

সন্ন্যাসী গোঁসাই, আমার কথা শুনুন। যাঁহাকে আমার 'অগ্রজ' বলিতেছেন, তিনি আমার কত জন্মের বড় ভাই, আমিই বা তাঁহার কত জন্মের কনিষ্ঠ ভ্রাতা? কেহই কাহারও নয়। সারা সংসারটাই মায়ার খেলা। সংসার ত নয়, যেন একটা প্রকাণ্ড হাট। হাটে যেমন নানা দেশের ব্যাপারীরা পাশাপাশী পসোরা সাজাইয়া বেচা-কেনা করিতে বসিয়া যায়; তাহাদের পরস্পর কোনকালে কোনরূপ আলাপ-পরিচয় না থাকিলেও, জাতিগত বা ব্যবহারগত ঐক্য না থাকিলেও, যেমন এক-মায়ের সন্তানের মত তাহারা গা-ঘেঁসাঘেঁসি বসিয়া ব্যাপার করিতে থাকে। অথচ ব্যাপার শেষ হইয়া গেলে, কেহ কাহারও খোঁজ খবর না রাখিয়া, যে যাহার বোচ্‌কাবুচ্‌কি বা পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লি বাঁধিয়া আপন আপন গৃহ অভিমুখে চলিয়া যায়, এ সংসার-হাটের ধরণটাও সেই প্রকার। এ হাটের বেচা-কেনা হইয়া গেলে আর থাকিবার যো নাই। দাদার ব্যাপার শেষ হইয়া গেল,

তিনি চলিয়া গেলেন। আমার ব্যাপার এখনও শেষ হয় নাই, সুতরাং থাকিতেই হইবে। ঠাকুর গো, এ হাটে যাহার ব্যাপার শেষ হয় নাই, সে কি কখনও ব্যাপার শেষ করিয়া ঘরমুখো ব্যাপারীর পাছুপাছু ছুটিয়া চলে? আমার যে অতিথিসেবা হইল ইহাই পরম লাভ।

ব্রাহ্মণকুমারের কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী মনেমনে মহা আনন্দ অনুভব করিলেন। মনেমনেই তাহার বুদ্ধির শতমুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাহার পর দীনবন্ধুদাসের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূকে ডাকিয়া বলিলেন,—ওগো বাছা, তোমারই বা আচার ব্যবহার কি প্রকার? তোমার স্বামী মরিয়া গেলেন, তুমি বিধবা হইলে; তুমি কোথায় বিধবার মত আচার-ব্যবহার করিবে। না তুমি—

"মৃত্যু পিণ্ডকু ঘরে থোই। আমিষ ভুঞ্জি লোড়ু তুহিঁ॥"

সেই মৃত পতিকে ঘরে রাখিয়া আমিষ ভোজনের জন্য লালায়িত হইয়াছ? ছি ছি, তোমার জ্ঞানি-পণায় ধিক্ ধিক্—শত ধিক্!

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া বিধবা বলিয়া উঠিলেন,—প্রভু, আমার একটা কথা শ্রবণ করুন,—

"কেহু অটই কাহা ভর্ত্তা। কে পুনি কাহার বনিতা॥
যেসনে ঘোর বৃষ্টিকালে। নদী পূরিণ বহে জলে॥
বনস্ত-কাঠখণ্ড দুই। মিশিন ভাসি যাউ-থাই॥
কেতেহেঁ দূরে ভাসি যান্তে। লতায়ে উহাড়ন্তি পথে॥
তহুঁ গোটিএ লাগি রহি। আরেক খণ্ডি ভাসি যাই॥
যেবন কাঠ ভাসি যাই। আরেক কাঠ কি গোড়াই॥

সেহি প্রকারে এ সংসার। গোবিন্দ-লীলা-খেলঘর ॥
বিনা আশ্রিতে সেহি গলা মোর অতিথিসেবা হেলা ॥"

কে কাহার পতি, কে-ই বা কাহার পত্নী? যেমন প্রবল বর্ষাকালে নদীর জল কাণেকাণ হইয়া তরতর বেগে বহিয়া চলিয়াছে। সেই খরতর স্রোতে দুইখানি বনের কাঠ মিলিয়া-মিশিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। কিছুদূর ভাসিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ পথিমধ্যে নদীতীরের লতা আসিয়া কাঠ দুইখানিকে জড়াইয়া ধরিল। দুইখানির একখানি কাঠ সেই লতার বন্ধনে বাঁধা পড়িয়া গেল, আর একখানি কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া ভাসিয়া চলিয়া গেল। ঠাকুর গো, এ সংসারের মেলামেশাও সেই প্রকার, আর ছাড়াছাড়িও সেই প্রকার। নদীবেগে যে কাঠখানি ভাসিয়া চলিয়া গেল, লতাবিতানে আবদ্ধ কাঠখানি কি কখনও তাহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ দৌড় দিতে থাকে? যে আশ্রয় পাইল, সে থাকিয়া গেল, আর যে পাইল না, সে চলিয়া গেল। তাহাতে কাহারও কিছু আসে যায় না। এ সংসার সেই লীলাময় শ্রীগোবিন্দের খেলাঘর। তিনি এই খেলাঘরে যে কত খেলা—কত মিলন-বিচ্ছেদের খেলা—কত হাসি-কান্নার খেলা—কত ভাঙ্গাগড়ার খেলা প্রতিনিয়ত খেলিতেছেন, তাহার আর ইয়ত্তা নিরূপণ করা যায় না। আমার পতি আশ্রয় পাইলেন না, তাই কালের স্রোতে কোন্ অলক্ষ্য প্রদেশে তিনি ভাসিয়া চলিয়া গেলেন। আমি যে কর্ম্মসূত্রে বাঁধা পড়িয়া আছি। আমার তো আর কোথাও যাইবার যো নাই। এ অবস্থায় আমার যে অতিথিসেবা হইল, ইহাই পরম লাভ।

সন্ন্যাসী এই কথা শুনিয়া মনেমনে বলিলেন,—অহো, এ চারিজনেরই মন ধন্য! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এ চারিজনের মত তো কই আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারাই ইহাদের তুলনা!” এইরূপ সাধুবাদ দিয়া সন্ন্যাসী তাঁহার কমণ্ডলু হইতে কিঞ্চিৎ জল ও তুলসী লইয়া সেই মৃতের মুখে সিঞ্চন করিলেন এবং জলদগম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন,—ওহে বিপ্রকুমার, গাত্রোত্থান কর।

সন্ন্যাসীর কথা শেষ হইতে-না হইতে সেই মৃত শরীরে জীবনী শক্তি আবার আসিয়া দেখা দিল। বিপ্রকুমার যেন নিদ্রা হইতে উঠিয়া উপবেশন করিলেন এবং সম্মুখে সেই অপূর্ব্ব সন্ন্যাসীমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন।

সন্ন্যাসীর প্রভাব দেখিয়া সকলে মহা বিস্মিত হইলেন। কিন্তু অহো কি ভাগবতী মায়া, তখনও কেহ সে সন্ন্যাসীকে চিনিতে পারিলেন না;—এ সন্ন্যাসী সহজ সন্ন্যাসী নন! যাঁহার জন্য শত সহস্র লোকে বিষয়-বৈভব আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া থাকেন, ইনি সেই সকল সন্ন্যাসীর মূল সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসী-করার গুরু সন্ন্যাসী! সকলে যেন কোন্ যাদুমন্ত্রে অভিভূত হইয়া সন্ন্যাসীর সেই কমনীয় মুখের দিকে অবাক্ হইয়া তাকাইয়া রহিলেন; আর তাঁহাদের পলকহীন নয়ন হইতে দরদর ধারে আনন্দের ধারা ধরায় ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সকলেরই মনে কেবল একই প্রশ্ন,—এ সন্ন্যাসী ঠাকুর কে?

সন্ন্যাসীও সহাস্যবদনে তৎকালজীবিত ব্রাহ্মণ-কুমারকে বলিতে লাগিলেন,—

"প্রভু বোইলে—আরে সুত। মুঁ ত দেখিলি বিপরীত॥
দেখ তো জননী পিয়র। আবর পত্নী সহোদর॥
তোর অর্জ্জনে করি আশ। খটিণ থাস্তি তোর পাশ॥
এবে তো মৃত্যুকাল দেখি। গুপত করি তোতে রখি॥
বসিলে মাচ্ছ-ভাত খাই। কেহ্নে এহাঙ্ক ঘরে তুহিঁ॥
হোইণ অচ্ছু রে নন্দন। ধিক্ এ তোহর জীবন॥"

ওহে বিপ্রকুমার, আমি তো বড়ই বিপরীত দেখিতেছি। দেখ, তোমার মাতা পিতা বনিতা ও ভ্রাতা সকলে তোমার উপার্জ্জনের আশা করিয়াই তোমার জন্য খাটাখাটুনি করিত। কিন্তু আজ তোমার মৃত্যু হইয়াছে দেখিয়া সকলে তোমাকে ঘরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া মাছ-ভাত খাইতে বসিয়া গিয়াছে। হায় হায়! তুমি এমনতর লোকের ঘরে ছেলে হ'য়ে আসিয়াছ কেন? তোমার জীবনে ধিক্—জীবনে ধিক্!

সন্ন্যাসিগোস্বামীর কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণকুমার বলিয়া উঠিলেন,—

"কে কার জননী পিয়র। কে কার ভ্রাত সহোদর॥
কে কার অটই যুবতী। কে পুনি অটে কাহা পতি॥
মিথ্যা অটই এ সংসার। কেহি ত নুহই কাহার॥
যেসনে ঘোর গ্রীষ্মকালে। পথরে পথিক সকলে॥
পঞ্চ-পঞ্চিশ যাউ থান্তি। বাটরে বৃক্ষেক দেখন্তি॥
এক-গৃহর প্রায়ে হোই। বসন্তি তথি-তলে যাই॥
শ্রম সরিলে যে-ঝা-মতে। চলন্তি বৃক্ষ থাই পথে॥
সেহি প্রকার এ সংসার। ঋণানুবন্ধন বেভার॥

এথকু শ্রীকৃষ্ণ-ভজন। সাধুঙ্ক সেবা প্রতিদিন ॥
করি বঞ্চই যেউঁ নর। ধন্য জীবন বোলি তার ॥”

ঠাকুর হে, কে কাহার জননী-পিতা, কে কাহার সহোদর-ভ্রাতা, কে কাহার যুবতী, আর কে-ই বা কাহার পতি? এ সংসার মিথ্যা। কেহই তো কাহারও নয়। যেমন দেখিতে পাই,—ঘোরতর গ্রীষ্মকাল। প্রচণ্ড রৌদ্র। পথে পাঁচ-সাত বিশ-পঁচিশ জন পথিক যাইতেছে। যাইতে যাইতে তাহারা পথের মাঝে বেশ একটি বড় ছায়াবৃক্ষ দেখিতে পাইল। অমনি তাপ জুড়াইবার জন্য সকলে সেই বৃক্ষের তলে একপরিবারের মত যাইয়া বসবাস করিতে লাগিল। আবার তাপ শান্তি হইলে যাহার যেদিকে ইচ্ছা চলিয়া যাইতে থাকিল। পথের বৃক্ষ পথেই পড়িয়া রহিল। সারা সংসারটাও এই প্রকার। এখানকার ব্যবহারও ঐ ধরণের। গাছের তলে মেলামেশার মত এখানকার মেলামেশা। গাছের তলে ছাড়াছাড়ির মত এখানকারও ছাড়াছাড়ি। তাপ শান্তি পর্য্যন্তই যেমন পথিকের পরস্পর সম্বন্ধ, তেমনই কোন-না-কোন জন্মের ঋণ পরিশোধ পর্য্যন্তই এখানকার পরস্পর সম্বন্ধ। তাপ শান্তি হইয়া গেলে পথিক আর বৃক্ষতলে থাকে না। ঋণ শোধ হইয়া গেলে এখানকারও কেহ এক মুহূর্ত্ত গৃহে অবস্থান করে না। গাছের তলে থাকিবার জন্য কেহ আসে না, যাইবার জন্যই আসে; এ সংসারেও সেইরূপ থাকিবার জন্য কেহই আসে না, যাইবার জন্যই আসে। এখানকার এই অল্প অনিরূপিত অবস্থানকালের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রতিদিন শ্রীকৃষ্ণের ভজন ও সাধুসজ্জনের সেবা করিয়া,

জীবনযাপন করিতে পারে, তাহারই জীবন ধন্য ও কৃতার্থ হইয়া যায়। তাহারই এখানে আসা সার্থক।

কুমারের কথা শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসীর আনন্দ আর ধরে না। তিনি মনেমনে বলিলেন,—অহো! এই পাঁচ জনেরই কি বিশুদ্ধ ভাব। ধন্য ইহারা। ইহাদের হৃদয়ে ধারণ করিয়া ধরণী আজ ধন্যা হইলেন।

এইবার সন্ন্যাসী রাশিরাশি আনন্দের হাসি হাসিতেহাসিতে প্রীতিকম্পিতস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—দীনবন্ধুদাস, বৎস! তোমাদের পাঁচজনেরই অকপট ব্যবহার, অতিথিসেবায় আন্তরিক অনুরাগ এবং ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি দেখিয়া আমি অপরিমিত আনন্দ লাভ করিয়াছি। আজি অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে তোমাদের আশীর্ব্বাদ করি,—

"জীবন্তে সুখী হোই থাঅ। মলে শ্রীহরি-পাদ পাঅ॥"

তোমরা পরম সুখে জীবন যাপন কর এবং অন্তে শ্রীহরির পাদপদ্ম লাভ কর।

সন্ন্যাসীর এই আশীর্ব্বাদবাণী শ্রবণ করিয়া সকলেই তাঁহার চরণতলে যুগপৎ পতিত হইলেন। সকলেরই প্রাণের কথা—ঐ অভয় পাদপদ্ম-তলে যেন চিরদিনই পড়িয়া থাকি।

সন্ন্যাসীও সকলের মস্তকে সুকোমল হস্ত অর্পণ করিয়া বরদান করিলেন,—"তোমাদের ভয় দূর হউক, ভয় দূর হউক। এককে ছাড়িয়া দুইএ মজিলেই ভয় দেখা দেয়। তোমরা সেই এক অদ্বিতীয় ভগবানেই অহরহ মজিয়া থাক। এই বিশাল বিরাট দুইএর রাজ্য—

ভয়ের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি 'সংসার' আর তোমাদিগকে কিছুতেই অভিভূত করিতে পারিবে না। আমার বরে তোমরা অভয় হও— অভয় হও।"

তখন যেন সকলে কোন্ এক নেশার আবেশে আপন-হারা। সকলের শরীর মন প্রাণ সকলই যেন এলাইয়া পড়িয়াছে। সন্ন্যাসীর চরণপ্রান্ত হইতে কাহারও আর সরিয়া যাইবার সাধও নাই, সাধ্যও নাই। এক অপূর্ব্ব আনন্দ-আলস্যে সকলেই জড় হইয়া গিয়াছেন। এমন সময়ে কে যেন তাঁহাদের কাণের কাছে কম-কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন,—"তোমরা তো আমায় চিনিতে পারিলে না, আমি চলিলাম। আমি ধরা দিব বলিয়া আসিয়াছিলাম, তোমরা তো আমায় ধরিয়া রাখিতে পারিলে না, আমি চলিলাম। চলিলাম বটে, কিন্তু তোমাদের আপদ-বালাই সকল লইয়াই চলিলাম,—তোমাদের ভাব-মূল্যে কেনা হইয়াই চলিলাম। আমি চিরদিন তোমাদের হৃদয়ে-হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিব। দেখো তোমরা যেন আমায় ভুলিও না। তোমরা আমার, আমি তোমাদেরই, এ কথা সর্ব্বদা মনে রাখিও। তবে আমি যাই। তোমাদের ছাড়িয়া যাইতেও প্রাণ যেন কাঁদিয়া-কাঁদিয়া উঠিতেছে। কিন্তু কি করি, আমায় যাইতেই হইবে। আমার যে নানান ঝঞ্ঝাট। তাই আমি চলিলাম, তোমরা কিছু মনে করিও না। তবে যাইবার সময় আমার পরিচয়টাও তোমাদের দিয়া যাই। আমি কে জান?—আমি সেই জগজ্জীবন ভগবান্।"

ভগবানের ভুবন-ভুলানো ভাষায় সকলে চমকভাঙ্গা হইয়া চাহিয়া দেখেন,—সেই দিব্য জ্যোতির্ম্ময় সন্ন্যাসিমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়াছেন।

যাহা পাইবার তাহা পাইয়াছি, ভাবিয়া সকলের যে আনন্দ-আবেশ-টুকু আসিয়াছিল, এইবার তাহা একেবারেই ভাঙ্গিয়া গেল। সকলে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন,—চারিদিকেই ছুটাছুটি খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করিয়া দিলেন; কিন্তু হায়, কোথায় বা সন্ন্যাসী—আর কোথায় বা ভগবান্!

তখন পাঁচজনেই কাঁদিতে-কাঁদিতে তাঁহার উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন,—ঠাকুর হে, তোমাকে দয়ালু বলে কে? তোমার মত নিষ্ঠুর হৃদয় তো আর দেখা যায় না। যদি দিবারই বাসনা নাই, তবে নিধি দেখাইবার কি আবশ্যক ছিল? আবার সেই নিধি হরিয়া লইয়াই বা কি পৌরুষ প্রকাশ করিলে? একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতেও তো দিলে না। পিছু ফিরিয়া চাহিয়া দেখিতে-না-দেখিতে সে নিধি হরণ করিয়া ফেলিলে। তুমি মায়া-বীর অগ্রগণ্য। ব্রহ্মা আদি দেবগণও যখন তোমার মায়ায় মুগ্ধ—তোমার মায়ার খেলা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, তখন কীটাণুকীট আমরা কোথায় লাগি। তুমি সর্ব্বশক্তিমান্, তোমাকে আর অধিক কি বলিব। তুমি আমাদিগকে ভালবাসার মোহনমন্ত্র শুনাইয়া যে কৃপা প্রকাশ করিয়াছ, আমরা যেন সেই কৃপাকণিকাটুকু চিরদিন উপভোগ করিতে পারি,—ধ্রুবনক্ষত্রের মত সেই কৃপার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভীষণ ভবসাগরের পারে গমন করিতে পারি।

ভগবানের আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হইবার নহে। তাঁহার বরে ব্রাহ্মণ-পরিবার অতিথিসেবা, সাধুসঙ্গ ও হরিভজন করিয়া পরমানন্দে দিন

যাপন করিতে লাগিলেন এবং দেহান্তে সকলেই সেই শ্রীহরির অভয় পদ লাভ করিলেন।

আমরা আর এবার ভক্ত বা ভগবান্ কাহারও জয় ঘোষণা করিব না। এবার জয় ঘোষণা করিব—গার্হস্থ্য আশ্রমের। এই আশ্রমেই না এই অমৃতোপম অতিথিসেবার ব্যবস্থা। এই অতিথি-সেবাই না ভগবান্‌কে কোন্ অপ্রাকৃতধাম হইতে অতিথির বেশে আকর্ষণ করিয়া আনিল। ভাই গৃহী, তোমার আশ্রমে যথন অতিথি-সেবা রহিয়াছে, তথন তোমার ভয়ই বা কি, আর ভাবনাই বা কি? তুমি শ্রীহরির প্রীতিকামনায় অতিথির কামনা পূর্ণ করিও। ক্ষমতায় না কুলাইলে, তুইটা মিষ্টকথা বলিয়াও তাঁহাদের সন্তোষ সম্পাদন করিও, দেখিবে—নিশ্চয় দেখিবে, দীনবন্ধুদাসের মত তোমার দ্বারেও একদিন অনাথনাথ অতিথিবেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন!

বিশ্বম্ভর দাস

উড়িষ্যাদেশে ঢেঙ্কানাল অতি প্রসিদ্ধ স্থান। বিশ্বম্ভর দাস সেই স্থানেই বাস করিতেন। তিনি করণ জাতি—এক রকম বেণিয়া। পরিবারবর্গ বড় বেশী নয়—এক স্ত্রী ও একটি পুত্র লইয়াই তাঁহার ঘরকরণা। বিশ্বম্ভর ভারি ভগবদ্ভক্ত। তাঁহার পত্নী রেবতী যার-পর-নাই পতিপরায়ণা। পুত্র রঘুনাথও পিতার সতত আজ্ঞানুবর্ত্তী। তিনটী প্রাণী যেন একটী সুরে বাঁধা তিনটী যন্ত্র। একের হৃদয়তন্ত্রীতে যে স্বর বাজিয়া উঠে, আর দুইটীর হৃদয়তন্ত্রীতে তাহার ঝঙ্কার আপনা-আপনিই হইতে থাকে। তিনজনেরই মতিগতি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে। তিনজনেই নিত্য শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেন। তিন-জনেই অহরহ শ্রীনামভজনে মাতিয়া রহেন। যদি কেহ তাঁহাদের কাছে নামমহিমা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা আর তাঁহাকে ছাড়িতে চান না। যাইতে চাহিলেও 'আর একটু বসুন,—আর একটু বসুন' বলিয়া যাইতে দেন না। যাঁহার মুখে একটি 'নাম, শুনিতে পান, তাঁহাকেই গুরুর মত মান্য করিয়া থাকেন। নামে তাঁহাদের এতই শ্রদ্ধা এতই প্রীতি।

বিশ্বম্ভরদাস সামান্য গৃহস্থ লোক। অবস্থা তত ভাল নয়। কিন্তু তাঁহার দ্বারে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব যোগি-সন্ন্যাসী অতিথি-অভ্যাগত যতই আসুন, তিনি একটুও বিরক্ত হইতেন না। যথাসাধ্য যত্ন-সহকারে সকলেরই সৎকার করিতেন। কাহাকে অন্ন দিয়া, কাহাকে

বা বস্ত্র দিয়া, তাহার উপর বিনয়-বচন বলিয়া সকলকেই সম্মানিত ও সন্তুষ্ট করিতেন। তবু নিরাশসূচক 'না' কথাটি মুখ ফুটিয়া কাহাকেও বলিতে পারিতেন না।

বিশ্বম্ভরদাস বড় দাতা—এ কথা তখন মুখে ধ্বনিত হইতে লাগিল। কথায়-কথায় বিশ্বম্ভরদাসের কথা উঠিলে 'ধন্য ধন্য' রবের ধূম পড়িয়া যাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বিশ্বম্ভরের যশে বিশ্ব-সংসার ছাইয়া ফেলিল।

দৈবের খেলা বুঝা ভার এ সংসারের আমি তুমি এ ও সে—সকলেই সেই দৈবের খেলার সামগ্রী। তিনি কখন কাহাকে লইয়া কিসের জন্য যে কি খেলা খেলেন; কিছুই বুঝা যায় না। তোমাকে লইয়া খেলা আরম্ভ হইলে আমি তোমার খেলা দেখি, হাসির খেলা হয়তো হাসি, কান্নার খেলা হয়তো কাঁদি, আর হাসি-কান্নার অতীত অন্য কোন খেলা হইলে বিস্ময়-বিমুগ্ধনেত্রে অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকি। তোমার বেলায় যেমন আমি দেখি, আমার বেলায় তেমনি তুমিও দেখ। কিন্তু "কে খেলায়, খেলি বা কেন"—এ রহস্যের উদ্ভেদ করিতে আমরা কেহই পারি না।

এ সংসারে আসিয়া দৈবের এ খেলার আবর্ত্তে পড়ে না কে? একদিন-না-একদিন সকলকেই পড়িতে হয়। তাই আজ ভক্ত বিশ্বম্ভরদাসকেও সেই খেলার আমলে আসিতে হইয়াছে। এ খেলাটা কিরূপে আরম্ভ হইল,—বলিতেছি।

ভগবানের প্রাণের অপেক্ষা পরম প্রিয়তম ভাগবতগণ কখনও এক স্থানে অবস্থান করেন না। তাঁহারা তীর্থযাত্রার ছলা ধরিয়া দেশেদেশে

ঘুরিয়া বেড়ান। একবার যাঁহার নাম করিলে মহা মহা অপবিত্রও পবিত্র হইয়া যায়, সেই ভগবান্‌কে যাঁহারা হৃদয়ের মধ্যে চির অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের তো আর নিজেকে পবিত্র করিবার জন্য তীর্থ যাত্রা নয়; জীব-উদ্ধারের জন্যই তাঁহাদের এই তীর্থযাত্রা। তাঁহারা এক স্থানে বসিয়া থাকিলে তো আর জগতের পাপী তাপী জীবের গতি কিছু হইয়া উঠিত না, তাই তাঁহারা তাঁহাদের হৃদ্বিহারী হরির প্রেরণাতেই হউক, আর তাঁহাদের অপরিসীম দয়ার প্রেরণাতেই হউক, তীর্থযাত্রার ব্যপদেশে নানা দেশে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহাদের এক কাজে দুই কাজই হয়। একদিকে তাঁহারা ভিখারীর ভঙ্গীতে গৃহীর গৃহে গমন করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিয়া আসেন; অপরদিকে অবিশ্রান্ত পাপীর পাপ লইয়া-লইয়া তীর্থেরও যে মলিনতা আসিয়া যায়, সে মলিনতাও নাশ করিয়া আসেন।

যাঁহারা হৃদয়ের মধ্যে হরিকে পূরিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা না পারেন কি? হরি তাঁহাদের হাত-ধরা। তাঁহাদের হরি তাঁহারা যাহাকে-ইচ্ছা তাহাকেই দিতে পারেন। শ্রদ্ধাদত্ত একমুষ্টি অন্ন বা দুইটি সুমিষ্ট কথার বিনিময়ে তাঁহারা সামান্য ধনরত্ন কি—অমূল্য ও অতি দুর্লভ তাঁহাদের প্রাণের হরিকেও অকাতরে দান করিয়া আসেন। গৃহীর দানের প্রতিদানে দয়ার প্রস্রবণ ভাগবতগণের আর বুঝি মনে থাকে না,—আমরা আমাদের হৃদয়সর্ব্বস্ব দান করিয়া ফেলিতেছি। পার্থিব পদার্থের মত হরির নাকি ক্ষয় নাই, নাশ নাই, তাই এত দিয়াও সাধুর হৃদয় হইতে হরি আর ফুরাইয়া যান

না। হরি আমার এ জগতের সামগ্রী হইলে পরম দয়াল ভক্তের হাতে পড়িয়া কবে যে ফুরাইয়া যাইতেন, তাহা আর বলা যায় না।

সে যাহা হউক, একদিন এইরূপ একদল তৈর্থিক সন্ন্যাসী দেশেদেশে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে বিশ্বম্ভরদাসের দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তাঁহাদিগকে যে দেখে, সে-ই বলে,—এই গ্রামে বিশ্বম্ভরদাসের বাড়ী; আপনারা তাঁহার গৃহে গমন করুন, তিনি অবশ্য ভোজনদানে আপনাদিগকে আনন্দিত করিবেন।

সাধুগণ এই প্রকার একই কথা শুনিতে শুনিতে,—তাঁহাদিগেরই প্রদর্শিত পথে চলিতে চলিতে বিশ্বম্ভরদাসের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বেলা আর নাই। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। সাধুবৃন্দ দ্বারে রহিয়াই উচ্চস্বরে আহ্বান করিলেন,—বিশ্বম্ভর!—ওহে ও বিশ্বম্ভর! একবার এদিকে এস ত।

অতিথিসেবায় যাঁহাদের নিষ্ঠা আছে, তাঁহাদের কর্ণদ্বয় অতিথির কণ্ঠস্বর শুনিবার জন্য সর্ব্বদাই সতর্ক থাকে। সাধুগণের প্রার্থনাবাণী মুখ হইতে সম্পূর্ণ বাহির হইতে-না-হইতে বিশ্বম্ভরদাস শশব্যস্তে তাঁহাদিগের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভুবনপাবন সন্ন্যাসিগণকে দেখিয়া চর্ম্মচক্ষু সার্থক করিয়া লইলেন। পরে সকলের পদতলে পতিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন।—উঠিয়া—হাত দুইটি যোড় করিয়া কপালে রাখিয়া বিনয় সহকারে বলিলেন,—অহো ভাগ্য অহো ভাগ্য, আজ আমি ধন্য হইলাম, ধন্য হইলাম। ঠাকুর, এখন কি করিতে হইবে, আদেশ করুন।

তাঁহারা বলিলেন,—বাবা বিশ্বম্ভর, আমরা তোমার বড় যশ

শুনিয়াই আসিয়াছি। আমরা অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত। শীঘ্র আহারের আয়োজন করিয়া দাও,—হাণ্ডী-কাষ্ঠ, চাল-দাল, দুধ-দধি, ঘৃত-নবাত, তরি-তরকারি প্রভৃতি লইয়া আইস; যাও আর বিলম্ব করিও না, আমাদিগকে ক্ষুধার অন্ন দান করিয়া অপরিমিত পুণ্য সঞ্চয় কর।

বিশ্বম্ভর 'যে আজ্ঞা' বলিয়া বাটীর ভিতর গমন করিলেন, স্ত্রী-পুত্রকে সকল কথা বলিলেন এবং সকলে মিলিয়া অতিথি-সেবার সামগ্রীসমূহ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। সকল সামগ্রীই সংগ্রহ হইল, হইল না কেবল ঘৃত। তাহাই তাঁহারা সাধুবৃন্দের সম্মুখে আনিয়া ধরিয়া দিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—ঠাকুর, আপনাদের আদিষ্ট সকল সামগ্রীই আনিয়াছি, কেবল ঘৃত সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি নাই।

উত্তরে সাধুগণ বলিলেন,—ঘৃতহীন ভোজন ভোজনই নয়। বিশেষত আমরা ঘৃতহীন অন্ন ভগবান্‌কে অর্পণ করিব কি প্রকারে? তা বাপু, তোমার সামগ্রী তুমি ফিরাইয়া লইয়া যাও, ইহা আমাদের কোন প্রয়োজনেই আসিবে না।

এই কথা শুনিয়া বিশ্বম্ভরের পুত্র রঘুনাথ অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া তাঁহাদের চরণতলে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন,—প্রভু, আমাদের অপরাধ লইবেন না, কৃপা করিয়া রন্ধন আরম্ভ করিয়া দিউন, দীন-বন্ধুর কৃপায় রাঁধিতেরাঁধিতেই ঘৃত আসিয়া যাইবে এখন। তজ্জন্য কোন চিন্তা নাই। রঘুনাথের কথায় অতিথিগণও আনন্দ-সহকারে রন্ধন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

এদিকে পিতা-পুত্র ঘরে আসিয়া সল্লা-পরামর্শ করিতে লাগিলেন,—এই রাত্রিকালে ঘৃত পাওয়া যায় কোথায় ? ঘৃত না পাইলেও বিষম বিপদ্ ;—অতিথি নিরাশ হইয়া যাইবেন। জীবন থাকিতে অতিথিই যদি নিরাশ হইয়া যাইলেন, তবে আর সে জীবনে ফল কি ? অতিথি বিমুখ হইয়া গেলে ইহলোকে অপযশ, পরলোকেও অনন্ত নরক। এখন করা যায় কি ? ভাল, একবার এখানে-ওখানে তল্লাস করিয়াই দেখা যাউক, তাহার পর অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে।

পিতা-পুত্রে পাতিপাতি করিয়া সমগ্র গ্রাম অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু ঘৃত কোথাও মিলিল না। উভয়েই বিষণ্ণ-মনে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। চিন্তা যেন শত শত বৃশ্চিকের মত তাঁহাদের দংশন করিতে লাগিল। তাঁহারা যেন জ্ঞানহারা হইয়া পড়িলেন। হঠাৎ বিশ্বম্ভরদাস বলিয়া উঠিলেন,—বৎস, শুনিয়াছি শাস্ত্রে বলে—পরের উপকার কিংবা সাধুসেবার জন্য যদি কেহ মিথ্যা কথা বলে, অথবা চুরি করে, তাহা হইলে তাহাতে তাহার কোন দোষ হয় না। আমরা যখন এত খুঁজিয়াপাতিয়াও ঘৃত সংগ্রহ করিতে পারিলাম না, তখন সাধুসেবার অনুরোধে চুরি করিতেই বা ক্ষতি কি ? দেখিতেদেখিতে রাত্রিও অধিক হইয়া যাইতেছে। এখন ইহা ছাড়া অন্য উপায়ই বা কি আছে ?

পিতার কথায় পুত্রেরও মত হইল। কোন ভাগ্যবানের ভবন হইতে ঘৃত অপহরণ করিয়া আনাই স্থির হইয়া গেল। পিতা-পুত্রে একখানি শাণিত অস্ত্র এবং একটি সাবল (খন্তা) লইয়া গোবিন্দ স্মরণ করিতে-করিতে বাটীর বাহির হইয়া পড়িলেন।

সাধুসেবায় অকপট অনুরাগে তাঁহাদের অন্তর-বাহির অধিকার করিয়া বসিয়াছে, সুতরাং চুরি করায় যে ফেসাদ কত, অবশেষে ধরা পড়িয়া গেলে লাঞ্ছনা-গঞ্জনাই বা কত, তাহা আর তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখিলেন না। তাঁহারা এক ভাগ্যবানের গৃহে গিয়া 'সিঁদ' কাটিলেন। পুত্র সিঁদ দিয়া গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। পিতা বাহিরে থাকিয়া পাহারা দিতে লাগিলেন।

বড় লোকের বাড়ী। ঘরের চারিদিকেই স্তরে স্তরে ধন-রত্ন। রঘুনাথ বড় বিপদেই পড়িলেন। এ ঘর ও-ঘর যে ঘরই দেখেন—সকল ঘরই হীরক মণি-মাণিক্যে স্বর্ণ-রৌপ্য-অলঙ্কারে পরিপূর্ণ। সাধুসেবার ঘৃত-প্রার্থী রঘুনাথের এ সকল লইয়া তো কিছু হইবে না, তাই তিনি বড় ব্যতিব্যস্তেই পড়িয়া গেলেন। যে ধন-রত্ন মণি-মাণিক্য দেখিলে অনেক মুনির মনও টলিয়া যায়—লোভ সংবরণ করা কঠিন হইয়া উঠে, রঘুনাথ সে সকল একবার অঙ্গুলির অগ্রেও স্পর্শ করিলেন না। তিনি অতি বিরক্তির সহিতই সে সকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঘৃতভাণ্ডই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এইরূপ খুঁজিতে-খুঁজিতে তিনি যখন একস্থানে কয়েকটি ঘৃতভাণ্ড দেখিতে পাইলেন, তখন তাঁহার আর আনন্দের অবধি রহিল না। তিনি তাহার মধ্য হইতে সাধুসেবার আবশ্যকমত দুইটি ভাণ্ড দুই হস্তে লইলেন এবং সিঁদের গর্ত্ত দিয়া গলাইয়া পিতাকে প্রদান করিলেন। নিজেও সিঁদের ভিতর দিয়া বাহির হইতে লাগিলেন। ঘৃত-ভাণ্ড পাইয়া পিতা বিশ্বম্ভরও আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িলেন!

পিতা-পুত্র যে চুরি করিতে আসিয়াছেন, তাহা যেন ক্ষণতরে বিস্মৃত হইয়া গেলেন। তাঁহাদের আনন্দকলরবে গৃহস্বামী জাগরিত হইয়া উঠিলেন। উঠিয়া দেখেন,—সিঁদের ভিতর দিয়া চোর পলাইয়া যাইতেছে। আর যায় কোথা, তিনি বায়ুবেগে আসিয়া রঘুনাথের চরণ চাপিয়া ধরিলেন। ক্রোধে অধীর হইয়া দুই হাতে দুইটি পা ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন।

রঘুনাথ দেখিলেন,—মহা বিপদ্! সিঁদের বাহিরে তাঁহার মুণ্ড, পা দুইটা ঘরের ভিতর, অবশিষ্ট অবয়ব সিঁদের মধ্যে; নিজের ক্ষমতায় আর বাহিরে যাওয়া চলে না। তাই পিতাকে বলিয়া উঠিলেন,—বাবা, সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আমি ধরা পড়িয়া গিয়াছি; ভিতর হইতে কে আমার পা দুইটি ধরিয়া ঝাকুনি দিতেছে, যদি আপনি পারেন তো আমার মাথা ধরিয়া ঝাকুনি দিয়া টানিয়া বাহির করুন, নচেৎ অন্য উপায় নাই।

বিশ্বম্ভর কি করেন। পুত্রের কথা শুনিয়া তাঁহার মহা ভয় হইল। তিনি তাঁহার সর্ব্বভয়হারী শ্রীহরিকে প্রাণ ভরিয়া স্মরণ করিতে-করিতে পুত্রের মাথা ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন। ভিতরে গৃহস্বামী পা ধরিয়া টানিতেছেন, বাহিরে বিশ্বম্ভর মাথা ধরিয়া টানিতেছেন, দুইটানায় পড়িয়া রঘুনাথের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িল। গৃহস্বামী ও বিশ্বম্ভর উভয়েই সমান বলবান্, সুতরাং যেখানকার রঘুনাথ সেইখানেই থাকিয়া টানাটানির কষ্ট সহ্য করিতে থাকিলেন। না গৃহস্বামী রঘুনাথকে টানিয়া ঘরের মধ্যে আনিতে পারেন, না বিশ্বম্ভর তাঁহাকে

টানিয়া ঘরের বাহিরে আনিতে পারেন। এইরূপ ধ্বস্তাধ্বস্তি অনেকক্ষণ চলিল। রাত্রিও অধিক হইয়া যাইতে লাগিল। যে সাধুসেবার জন্য এত কাণ্ড, সেই সাধুসেবাও পণ্ড হইতে চলিল, দেখিয়া রঘুনাথ পিতাকে দৃঢ়তার সহিত বলিয়া উঠিলেন,—

"স্বরূপ শুন আহে তাত। এথর সরিলা মহত্ত্ব ॥
রাত্র যদ্যপি পাহি যিব। চিহ্নি সাধুত দণ্ড দেব ॥
সাধুঙ্ক সেবাহিঁ নোহিব। এতেক কষ্ট ব্যর্থ হেব ॥
এথকু বিচার ন কর। কাটিণ নিঅ মোর শির।
সাধুমানঙ্ক সেবা হেউ। আম্ভর মহত্ত্ব ন যাউ ॥
মুণ্ড ন থিলে পিণ্ড এথে চিহ্না ন যিব কদাচিতে ॥
এথকু ন কর তূ হেল। মো মুণ্ড ঘৃত ঘেনি চল ॥"

কি ভয়ঙ্কর কথা; শুনিলেও সকল শরীর শিহরিয়া উঠে! রঘুনাথ বলিতেছেন কি,—'পিতঃ, তুমি আমার মস্তক ছেদন কর। আর বিলম্ব করিও না। ঐ ঐ দেখ, রাত্রি অধিক হইয়া যাইতেছে। গৃহে ক্ষুধার্ত্ত সাধুগণ ঘৃত প্রতীক্ষা করিতেছেন। রাত্রি পোহাইয়া গেলে সকলে আমাকে চিনিয়া ফেলিবে,— আমাদিগের মহত্ত্বও সরিয়া যাইবে, দণ্ডও ভোগ করিতে হইবে, অথচ সাধুসেবাও হইবে না। যাহার জন্য এত কষ্ট, সে কষ্টও ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তাহার অপেক্ষা সাধুসেবাও হউক, সঙ্গে-সঙ্গে আমাদিগের মহত্ত্বও রক্ষা পাউক। দেহে মুণ্ড না থাকিলে, কেবল ধড় দেখিয়া তো কেহ আর চিনিতে পারিবে না। তাই বলি, আর বিলম্বে কাজ নাই, ঐ শাণিত অস্ত্র দিয়া আমার

মাথা কাটিয়া ফেল এবং ঘৃতভাণ্ড ও ছিন্নমুণ্ড লইয়া গৃহে চলিয়া যাও” রঘুনাথের কথা শুনিয়া পিতার মাথা যেন ঘুরিয়া গেল। তিনি যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন,—স্নেহে ভয়ে ও শোকে যেন কিঞ্চিৎ কাতর হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সাধু-সেবার অনুরাগে তাঁহার সে ভাব তখনই অন্তর্হিত হইল। এদিকে পিতার বিলম্ব দেখিয়া রঘুনাথ অধিকতর উত্তেজনার স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—মায়ায় ভুলিও না পিতা' ঐ তোমার হস্তেই তো শাণিত অস্ত্র রহিয়াছে, তবে আর বিলম্ব কেন; দৃঢ়মুষ্টিতে অস্ত্র ধারণ কর, এক আঘাতে আমার মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেল। উদ্দেশ্য ভুলিও না পিতা, উদ্দেশ্য—সাধু-সেবা, সাধু-সেবা, সাধু-সেবা।

হায় অনুরাগ, তুমি এমনি করিয়াই সকলকে অন্ধ কর বটে। হায়, তুমি কাহাকেও কিছুই দেখিতে দাও না। তুমি কখন যে কাহাকে কাহার টানে ফেলিয়া দাও, বলা যায় না। যাহাকে যাহাতেই ফেলিয়া দাও না কেন, তোমার এমনি অমিত প্রভাব যে, তুমি কেবল সেইটি ছাড়া—যেটিতে ফেলিয়াছ সেইটি ছাড়া তাহাকে আর সকলই ভুলাইয়া দাও ;—তাহার হিতাহিত বা কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য জ্ঞান পর্য্যন্ত লোপ করিয়া দাও। তোমার পাল্লায় পড়িলে তোমার চোখেই দেখিতে হয়, শুধু দেখা কেন, সকল কার্য্যই তোমারই মতে করিতে হয়,—তা সে যত বড় কাজই হউক না কেন। এমনি তোমার অপার মহিমা! তুমি যাহাকে ধনের টানে ফেল, সে ধন ছাড়া আর সকল ভুলিয়া যায় ; অন্যে পরে কা কথা, সে ভগবান্‌কে পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়। ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম সে কিছুই দেখিতে পায়

না। দেখে কেবল—টাকা আর টাকা টাকা। অনুরাগ, তুমি যাহাকে কামিনীর আকর্ষণে নিক্ষেপ কর, সে-ও সেই কামিনী ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পায় না সে-ও সেই কামিনী ছাড়া মান-অপমান লজ্জা-ভয় প্রভৃতি সকলই ভুলিয়া যায়; তাহারও হিতাহিত বিবেচনা অন্তর্হিত হইয়া যায়। সেই কামিনীর জন্য সে না পারে বা না করে এমন কার্য্যই নাই। আজ সেই তুমি যখন বিশ্বম্ভরদাসকেও সাধুসেবার আকর্ষণে ফেলিয়া দিয়াছ, তখন তাহারই বা অসাধ্য কি আছে। পিতা হইয়া আপন হস্তে একমাত্র পুত্রের মস্তকচ্ছেদন, ইহা কি আর অসম্ভব হইবে? কখনই না,—কখনই না। ঐ ঐ দেখ, বিশ্বম্ভরদাস দৃঢ়মুষ্টিতে অস্ত্র ধারণ করিল। ঐ ঐ দেখ, অস্ত্র উত্তোলন করিল। ঐ ঐ দেখ, পুত্রের গলদেশে সজোরে আঘাত করিল। ঐ ঐ দেখ, উত্তপ্ত শোণিতের উৎস উত্থিত হইল। আহা অনুরাগ, ঐ ঐ দেখ, অহো! আমরা আর দেখিতে পারি না, দেখাইতেও পারি না, কেবল তুমিই দেখ,—ঐ ঐ দেখ, পিতার নিষ্ঠুর অস্ত্র-প্রহারে পুত্রের মস্তক দেহচ্যুত হইল। আরও কিছু দেখিবে কি? দেখিতে পারো তো দেখ,—ঐ ঐ দেখ, পিতা বিশ্বম্ভরদাস দুই হস্তে দুইটি ঘৃত ভাণ্ড লইয়া—আর কক্ষে রঘুনাথের রক্তাক্ত ছিন্ন মুণ্ড চাপিয়া রাখিয়া চঞ্চলচরণে চলিয়াছে। কোথায় চলিয়াছে জান কি?—সেই তুমি যাহাদিগের আকর্ষণে তাহাকে ফেলিয়াছ, সেই সাধুদিগের সমীপেই বিশ্বম্ভর চলিয়াছে। অহো, অনুরাগ, ধন্য —ধন্য তোমার মহিমা!!

বিশ্বম্ভরদাসকে লইয়া দৈব যে খেলা জুড়িয়া দিয়াছেন, এতক্ষণে

তাহা বেশ জমিয়া আসিয়াছে। বিশ্বম্ভরদাস ত্বরিতপদে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী এতক্ষণ কেবল ঘর-বাহির করিতে-ছিলেন। একটু খুট করিয়া শব্দ হইলেও তিনি চকিতনেত্রে চাহিয়া দেখিতেছিলেন,—ঐ বুঝি পতি পুত্র আসিতেছেন। এমন সময় বিশ্বম্ভরদাস তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

একা পতিকে আসিতে দেখিয়া মায়ের প্রাণ উড়িয়া গেল, পুত্রের অকল্যাণ আশঙ্কায় তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন, বিশেষত স্বামীর সেই গুরু-গম্ভীর ভাব—সেই রুধিররঞ্জিত কলেবর দর্শনে তিনি যেন মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। মনে করিলেন, একবার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি,—ওগো, তুমি যে একা-একাই ফিরিয়া আসিলে, আমার রঘুনাথ কই? কিন্তু কে যেন ভিতর হইতে তাঁহার গলা চাপিয়া ধরিল, তিনি মুখ ফুটিয়া একটি কথাও কহিতে পারিলেন না। তাঁহার শরীর থরথর কাঁপিতে লাগিল।

পত্নীর অবস্থা বুঝিয়া বিশ্বম্ভরদাস তাঁহাকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা তাঁহার কাছে বর্ণনা করি-লেন। পুত্রের কর্ত্তিত মস্তক কক্ষ হইতে বাহির করিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং উত্তমরূপে লুকাইয়া রাখিতে বলিয়া দিলেন।

পতিব্রতা রেবতী যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অন্ধকারময় দেখিলেন। এককালে যেন শতসহস্র বজ্র আসিয়া তাঁহার মস্তকে দারুণ আঘাত করিল। বিষম ব্যথায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে গেলেন, কিন্তু হায়, তিনি একটু কাঁদিতেও পারিলেন না। তাঁহাকে যে গলা ছাড়িয়া

কাঁদিতে নাই,—তিনি যে আজ চোরের মা! চোরের মাকে কি ডাকিয়া কাঁদিতে আছে? অহো, তাঁহাকে বুকভরা দুঃখ-সন্তাপ বুকেই চাপিয়া রাখিতে হইল।

সতীর এ ভাব কিন্তু অধিকক্ষণ রহিল না। পতিব্রতার স্বাভাবিক ভাব তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন,—বিশ্বম্ভর-দাস আমার পতি, আর আমি হইতেছি তাঁহার সহধর্ম্মিণী। পতির অতিথিসেবা পরম ধর্ম্ম, তাঁহার সেই ধর্ম্মানুষ্ঠানে আমার সর্ব্বতো-ভাবে সহায় হওয়াই আবশ্যক। পুত্রশোকের যথেষ্ট সময় আছে, এখন পতির ধর্ম্মই রক্ষিত হউক। আর পুত্রই বা কি, তাহাও তো পতির অনুগ্রহেই পাইয়াছি। পতিই সতীর একমাত্র গতি,—সেই পতিরই ধর্ম্ম রক্ষিত হউক।

পতিভক্তির প্রবল আবেগে পতিব্রতার পুত্রশোক তৃণখণ্ডের ন্যায় কোথায় উড়িয়া গেল। তাঁহার মুখকমল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি হাসিতে-হাসিতে বিশ্বম্ভরদাসকে বলিলেন,—স্বামিন্, আর বিলম্ব করিবেন না, শীঘ্র সাধুগণকে ঘৃত প্রদান করুন।

বিশ্বম্ভরদাসও মহানন্দমনে সাধুগণের নিকটে ঘৃতভাণ্ড লইয়া গমন করিলেন এবং বিলম্বজনিত অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে ঘৃত প্রদান করিলেন। সাধুগণও ঘৃত পাইয়া পরমানন্দে পাকভোজনাদি সমাধানপূর্ব্বক বিশ্বম্ভরদাসকে বলিলেন,—রাত্রি অধিক হইয়াছে, বাবা তুমি ঘরে যাও, ভগবান্ তোমার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল করুন।

সাধুবৃন্দের চরণে প্রণাম করিয়া বিশ্বম্ভরদাস আপন গৃহে

আগমন করিলেন। পতি-পত্নী উভয়েই সে রাত্রে একটুও ঘুমাইতে, পারিলেন না। পুত্রের অগণিত গুণ এবং শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্ম চিন্তা করিতেকরিতেই তাঁহাদের রাত্রি কাটিয়া গেল।

এদিকে সেই বড়লোকের বাড়ীতে মহা হুলস্থুল বাধিয়া গিয়াছে। সে হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার দেখে কে? রাত্রি প্রভাত হইতে-না-হইতেই সেই মুণ্ডহীন শরীরটা সদর রাস্তার মাঝে ফেলিয়া মহা হাকডাক আরম্ভ হইয়াছে। দেখিতেদেখিতে কাতারেকাতারে লোক জড় হইয়া গেল। এ ওকে ঠেলে, সে তাকে ঠেলে; সেই ধড়টি সকলেরই সর্ব্বাগ্রে দেখিবার ইচ্ছা। দেখিলও শতশত লোকে, কিন্তু কাহার যে ধড়, তাহা কেহই সনাক্ত করিতে পারিল না। কেবল বৃথা তর্ক ও কথা-কাটাকাটিতেই সে স্থানটা কোলাহলময় হইয়া উঠিল। তখন সেই ধনবান্ সেই খণ্ডিত দেহটিকে গ্রামের বাহিরে লইয়া গিয়া শূলের উপর চাপাইয়া দিলেন। সেখানেও অনেক লোক জড় হইয়া গেল। যে দেখিল, সে-ই ধড়টির উপর নানাপ্রকার গালাগালি বর্ষণ করিতে লাগিল,—কেহকেহ বা অঙ্গভঙ্গী সহকারে ঠাট্টা-বিদ্রূপও করিতে থাকিল। মুণ্ডহীন পিণ্ড লইয়া রঙ্গরস কতক্ষণই বা চলিতে পারে? বেলাও অধিক হইতে লাগিল, যে যাহার গৃহ-অভিমুখে চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিল।

এদিকে আবার সাধুবৃন্দ বিশ্বম্ভরদাসের নিকট বিদায় লইয়া যাইবার জন্য তাঁহাকে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিলেন,—বিশ্বম্ভর দাস! ওহে ও বিশ্বম্ভর দাস! শীঘ্র বাহিরে আইস, আমরা আর অধিকক্ষণ থাকিব না।

বিশ্বম্ভরদাস তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন। আসিবার সময় পত্নীকে বলিয়া আসিলেন, আমি সাধুগণের সমীপে যাইতেছি, তুমি রঘুনাথের সেই মুণ্ডটী লুকাইয়া লইয়া আইস। আমি সেটি সাধু-সকলকে দেখাইব, তাহার পর একান্ত স্থানে ফেলিয়া দিব। পত্নীও স্বামীর আজ্ঞা পালন করিলেন,—পুত্রের মুণ্ডটি আনিয়া স্বামীর হস্তে অন্যের অলক্ষিতে অর্পণ করিলেন। বিশ্বম্ভরদাসও সেই মুণ্ডটি কক্ষে চাপিয়া রাখিয়া ধীরেধীরে সাধুগণের অনুগমন করিতে লাগিলেন।

সাধুসমূহ বিশ্বম্ভরদাসকে প্রীতিভরে বলিয়া উঠিলেন,—বৎস, তোমার সেবায় আমরা পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি, তুমি সর্ব্ববিধ কল্যাণের অধিকারী হও। তবে আমরা এখন আসি ?

বিশ্বম্ভরদাস তাঁহাদিগকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—ঠাকুর ! আপনাদের যাহা ইচ্ছা, আমি আর কি বলিব। বিশ্বম্ভরের বিনয়-বচনে সাধুবৃন্দ আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাকে আশী-র্ব্বাদ করিতেকরিতে চলিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভরদাসও তাঁহাদিগকে একটু আগু বাড়াইয়া দিবার অছিলায় তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে থাকিলেন। এইরূপে কিছুদূর যাইবার পর সাধুগণ বিশ্বম্ভর-দাসকে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন,—হাঁ হে বিশ্বম্ভর, তোমার পুত্র রঘুনাথ কোথায় ? তাহাকে যে সঙ্গে আন নাই ? কল্য রাত্রে সে আমাদের অত সেবা-শুশ্রূষা করিল, অত আদর-আপ্যায়ন করিল, আর আজ তাহার একবারও দেখা নাই ? তুমি যাও, শীঘ্র রঘুনাথকে লইয়া আইস, আমরা তাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া তবে বিদায় লইব ; নচেৎ আমরা এই স্থানেই থাকিয়া যাইব।

সাধুগণের কথা শুনিয়া বিশ্বম্ভর মুখে আর কিছুই বলিলেন না; কেবল ছলছল্‌নেত্রে সাধুগণের দিকে চাহিয়াই রহিলেন। দরদর অশ্রুধারে তাঁহার বদন-বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বিশ্বম্ভরের অশ্রুদর্শনে সাধুগণের সহজকরুণ হৃদয় গলিয়া গেল। তাঁহারা ব্যথিত-চিত্তে বলিতে লাগিলেন,—বাবা বিশ্বম্ভর! তুমি কাঁদিতেছ কেন? তোমার দুঃখবিপত্তির কথা অকপটে আমাদিগের কাছে বল, কোন ভয় নাই, আমরা তাহার প্রতিকার করিব। ইহা শুনিয়া বিশ্বম্ভরদাস আপন কক্ষ হইতে রঘুনাথের মুণ্ডটি বাহির করিলেন এবং সেটি সাধুগণের পদপ্রান্তে রাখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। উঠিয়া কৃতাঞ্জলি করযুগল কপালে রাখিয়া একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—ঠাকুর, এই,—এই দেখুন আমার পুত্র রঘুনাথ। হায় প্রভু, বিধাতার লিপি অখণ্ডনীয়—অখণ্ডনীয়!

দেখিয়া-শুনিয়া সাধুসকল যেন ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। ভাবিলেন,—বুঝি কোন দুষ্ট লোক রঘুনাথের মস্তকচ্ছেদন করিয়াছে; তাই রোষকষায়-নেত্রে তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—বিশ্বম্ভর, শীঘ্র বল, কে তোমার পুত্রের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিল? আমরা এখনই সেই পাষণ্ডের সমুচিত দণ্ড প্রদান করিব,——তাহার বংশ নির্ব্বংশ করিয়া দিব।

শুনিয়া বিশ্বম্ভর বলিলেন,—প্রভু, ইহাতে অন্য কাহারও কিছুই দোষ নাই, দোষ আমারই—আমার দগ্ধ অদৃষ্টেরই। বলিয়া বিশ্বম্ভর সেই তাঁহাদের জন্য ঘৃত চুরি করিতে যাওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া একেএকে সকল কথাই বর্ণনা করিলেন। শেষে বলিলেন,—

"ভাগ্যে মুঁ অরিজ্জিচ্ছি যাহা। অবশ্য ভুঞ্জিবই তাহা॥"

সাধুবৃন্দ বিশ্বম্ভরের, তাঁহার পত্নী ও পুত্রের অতিথিভক্তি, ধর্ম্মরক্ষার্থে দেহাদিতে অনাসক্তি প্রভৃতি দেখিয়া অপার আনন্দ লাভ করিলেন এবং প্রীতিভরে বলিয়া উঠিলেন,—বৎস, তোমার জীবন ধন্য, তোমার পত্নীর জীবন ধন্য, তোমার পুত্রেরও জীবন ধন্য। তোমরা নশ্বর দেহের বিনিময়ে সেই অবিনশ্বর বস্তু অর্জ্জন করিবার প্রকৃত অধিকারী। তোমাদের জয় হউক। আমাদের অবস্থান-কালের মধ্যে যে তোমার পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, ইহাও দৈবের খেলা বলিতে হইবে। চল, তোমার পুত্রের মুণ্ডহীন দেহ যে-স্থানে আছে, তুমি সেই স্থানে আমাদিগকে লইয়া চল, কোন চিন্তা নাই, তোমার পুত্র পুনর্জীবন লাভ করিবে;—যাহার প্রাণে এত বিমল ধর্ম্মভাব—এত ভগবানে ভালবাসা, তাহার বিনাশ নাই—অকালমৃত্যু তাহার হইতেই পারে না। চল বিশ্বম্ভর চল, তোমার পুত্র জীবন লাভ করুক,—যুগযুগান্তর ধরিয়া তোমার যশে ভুবন ভরিয়া রহুক।

ইহা শুনিয়া বিশ্বম্ভরদাস, সেই গ্রামের বাহিরে—যেখানে শূলের উপর পুত্রের শিরোহীন শরীর স্থাপিত, সেখানে সাধুগণকে লইয়া গেলেন। তাঁহারাও শূলের উপর হইতে শবশরীরটী নামাইয়া সকলে মিলিয়া ঘিরিয়া বসিলেন। তার পর সেই ছিন্ন মুণ্ডটি ধড়ের সহিত জুড়িয়া দিলেন তাহার উপর তুলসীদল অর্পণ করিলেন এবং ভক্তিগদ্গদ-ভাবে বলিতে লাগিলেন,—

"বোইলে—ধর্ম্ম যেবে সত। নিশ্চয় বঞ্চু এ বালুত॥
প্রভুমহিমা যেবে সত। পূরাণ যেবে হেব তথ্য॥

যে প্রাণী পর-উপকারে। কি অবা হরিভজনরে॥
কি দীনরক্ষণনিমন্তে। কি অবা সাধু সেবা-অর্থে॥
অনলে পশিলেক যাইঁ। ত্রাহি করন্তি ভাবগ্রাহী॥"

যদি ধর্ম্ম সত্য হয়, এ বালক নিশ্চয় জীবনলাভ করিবে; প্রভুর মহিমা যদি সত্য হয়, পুরাণ শাস্ত্র যদি প্রকৃত হয়, তবে এ বালক নিশ্চয় জীবন লাভ করিবে; যে ব্যক্তি পরের উপকার করে, কিংবা হরিভজনে নিরত থাকে, অথবা দীনজনের রক্ষণের নিমিত্ত কিংবা সাধুসেবার জন্য বিপদের অনলে আত্মসমর্পণ করে, ভাবগ্রাহী ভগবান্ তাঁহাকে ত্রাণ করেনই করেন।

এই কথা বলিতে-বলিতে সাধুগণের সে এক ভাবই আলাদা হইয়া পড়িল। তাঁহারা তাঁহাদের হৃদ্বিহারী শ্রীহরিকে লক্ষ্য করিয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—ভগবন্, এ বালক মরিবে কেন? শরণাগতের রক্ষক—ভবভয়ের বজ্রবর্ম্ম তুমি থাকিতে এ বালক মরিবে কেন? মহিমময়, তোমার অপার অনন্ত মহিমা তো জগতে নিয়ত প্রচারিত রহিয়াছে, তাহা তো আর মিথ্যা বলিবার যো নাই; তাই বলি প্রভু, তোমার সেই মহিমার গুণে এই বালক জীবন লাভ করুক। আর যদি এ বালকের জীবন না-ই দাও, তবে এই লও নাথ! আমাদের সকলের জীবন তোমার চরণতলে উৎসর্গ করিলাম। তাহা প্রভু, ঐ বালক যে আমাদেরই জন্য আপন জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে। গোবিন্দ হে, এই পূতচিত্ত শিশুটিকে রক্ষা কর প্রভু—রক্ষা কর।

সংসারের লোকে ধন-বল, জন-বল, দেহ-বল প্রভৃতি কত বলেরই কল্পনা করিয়া থাকে, কিন্তু সাধুসজ্জন কথনও সে সকল বলকে 'বল'

বলিয়াই মনে করেন না। তাঁহাদের বল সেই সর্ব্ববলে বলীয়ান্ ভগবান্ —আর তাঁহারই স্বরূপভূত তাঁহার নানাবিধ নাম। তাই সাধুগণ তখন বারংবার সেই ভগবানেরই নাম বদন ভরিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের সেই সমুচ্চ নামধ্বনিতে সকল সংসার যেন নামময় হইয়া উঠিল। সেই নাম সংসার ছাড়াইয়া সুদূর ভগবদ্রাজ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। সঙ্গেসঙ্গে ভক্তবৎসল ভগবানেরও আসন টলিয়া উঠিল। তিনি আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। ডাকার মত ডাকিতে পারিলে তো আর তাঁহার স্থির হইয়া থাকিবার যো নাই। তাই তিনি তখনই অলক্ষিত ভাবে তথায় আগমন করিলেন। আর সেই বালকের জীবন দান দিয়া অলক্ষিতেই চলিয়া গেলেন। এ ব্যাপার অন্য কেহই কিছু বুঝিতে পারিল না, কেবল বুঝিলেন তাঁহারাই, যাহারা আর সকল ছাড়িয়া কেবল সেই ভগবান্‌কে লইয়া মজিয়া আছেন।

দেখিতেদেখিতে বালক রঘুনাথ উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার মুখোচ্চারিত মধুর হরিধ্বনিতে চারিদিক্ ভরিয়া গেল। তিনি সাধুবৃন্দের চরণে,—পিতার চরণে বারবার প্রণাম করিলেন। সে-দেশের লোক ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়সাগরে ডুবিয়া গেল। সকলেই বলিতে লাগিল,—আহা, এ বালকের জীবন ধন্য,—ইহাকে দর্শন করিলেও লাভ আছে। সাধুগণেরও আনন্দ আর ধরে না। তাঁহারা সেই বালককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—বৎস, তোমার মনটি বড় ভাল, তাই তুমি ভগবানের কৃপায় এই নবজীবন লাভ করিয়াছ। পূর্ব্বজীবনে তোমার নাম ছিল

রঘুনাথ, এ জীবনে তোমার নাম হইল 'সুমন'। আমরা তোমাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি অন্তে শ্রীহরির পাদপদ্ম লাভ করিবে। বৎস, এখন যাও, তোমার পিতার সহিত জননীর নিকটে যাও, তাঁহার তাপিতপ্রাণে শান্তির শীতল ধারা ঢালিয়া দাও।

এই কথা বলিতে-বলিতে সাধুবৃন্দ দেখিতে-দেখিতে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। পিতাপুত্রও ক্ষণকাল যেন স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। পরে সাধুগণের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। রঘুনাথ দ্বারদেশে আসিয়াই একবার 'মা' বলিয়া ডাকিলেন। স্বর্গের সুধা মিষ্ট কি সেই স্বর মিষ্ট, একথা লইয়া আমাদের তর্ক চলিতে পারে, কিন্তু রেবতীর কর্ণে তাহা সুধা অপেক্ষাও সুমধুর বলিয়া বোধ হইল। তিনি আলুথালুভাবে বাহিরে ছুটিয়া আসিলেন। দেখিলেন, পতির পার্শ্বে তাঁহার প্রাণের পুতলী রঘুনাথই বটে! আনন্দের আবেগে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তিনি ধাইয়া গিয়া তাঁহার রঘুনাথকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। কাহারও মুখে কথাটি নাই। কথা হইল নয়নে-নয়নে যেমনই নয়নে-নয়নে মিলন,—নয়নে-নয়নে সম্ভাষণ, অমনই নয়নে-নয়নে আনন্দের অমল জল পল্‌পল্‌ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল,—উত্তপ্ত মরুসৈকতে সুশীতল সলিলের ফোয়ারা ছুটিল!

বন্ধু মহান্তি।

"দিদি! মা কোথা গেল? বড় খিদে পেয়েছে।"

"মাকে তো ভাই! দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। কাঁদলে কি হবে; চুপ কর ভাই! চুপ কর, মা এখনই এসে খেতে দেবে এখন।"

"আমার পেট যে জ্বলে-জ্বলে উঠ্‌ছে দিদি! আমি যে আর থাক্‌তে পাচ্ছিনে দিদি! কাল সবে একটু ফেন খেয়েছি বই ত নয়?"

"কি করবো ভাই! আমারও তো ঐ দশা। আমরা তবু একটু ফেন পেয়েছি, মা আবার তা-ও পান নাই। না খেয়ে খেয়ে মার মাইয়ের দুধ নেই, খুকোটে কেঁদেকেঁদে অস্থির হ'য়ে পড়েছে।"

"বাবা কোথায় দিদি! না হয় তাঁকেই খাবার কথা বল না। ক্ষুধায় যে আর বাঁচিনে দিদি!"

"বাবাও সেই খাবারের যোগাড়েই বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন। চুপ কর ভাই! চুপ কর। বাবা এলেই খেতে পাওয়া যাবে এখন।"

উড়িষ্যার অন্তর্গত যাজপুরের এক জীর্ণ কুটীরে বসিয়া দুইটী ভাই-ভগিনীতে ঐরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল। ভগিনী বড়, বয়স সাত বৎসর; ভাইটি তাহার অপেক্ষা বছর তিনেকের ছোট। ইহাদের আরও একটী ছোট ভগিনী আছে, তাহার বয়ঃক্রম সবে এক বৎসর হইবে পিতা বন্ধু মহান্তি ভিক্ষাজীবী। আজ আনিলে কাল খাইবার আর ঘরে কিছু থাকে না। গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিয়া যে দিন যাহা মিলে, বন্ধু তাহাতেই সন্তুষ্ট; তাহাই পতিব্রতা

পত্নীর হস্তে আনিয়া দেন। তিনিও তাহা হইতে অতিথিসেবাদি নির্ব্বাহ করেন, বালক-বালিকাকে খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া কিছু থাকিলে পতি পত্নী দুইজনে ভোজন করেন। দেখিতে যেন বড় কষ্টের সংসার, কিন্তু পতি পত্নীর মনে ক্লেশের লেশও নাই। তাঁহারা যথালাভেই সতত সন্তুষ্ট। ঈশ্বরে অচল বিশ্বাস ও প্রগাঢ় প্রীতিই তাঁহাদের হৃদয়কে মধুময় করিয়া রাখিয়াছে। ভগবানের ভক্তই তাঁহাদের প্রত্যক্ষ দেবতা। ভগবানের নামই তাঁহাদের মহামন্ত্র। ভগবান্ এবং ভক্তের উচ্ছিষ্টই তাঁহাদের উপাদেয় আহার। ভগবান্ এবং ভক্তের পাদোদকই তাঁহাদের সর্ব্বব্যাধিনাশক মহৌষধি। তাই সঞ্চয়-সম্বলহীন দরিদ্র ভিখারী হইয়াও পতিপত্নী ধনীর ধনী—মহাধনী। তাঁহাদের জীর্ণ কুটীর, ছিন্ন কন্থা, শতগ্রন্থি বস্ত্র ও রুক্ষ দেহের আবরণ ভেদ করিয়া ভিতরের দিকে চাহিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে, আনন্দ বুঝি আর কোথাও নাই, সকল আনন্দই বুঝি ইঁহারা একচেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছেন। এই আনন্দের সংসারে নিরানন্দ কখনও দেখা দেয় নাই; দেবতার রাজ্যে সয়তান কখনও হুমকি দেয় নাই। কিন্তু চিরদিন তো আর সমান যায় না। প্রকৃতির নিয়মই যে তা নয়। এ রাজ্যে দিনের পর রাত্রি আছে, জোয়ারের পর ভাঁটা আছে, বসন্তের পর বর্ষা আছে; সুখের পর দুঃখও আছে। তাই এই শান্তির সংসারেও অশান্তি আসিয়া দেখা দিয়াছে। শিশুর হাস্যমুখরিত সংসার আজ ক্রন্দন-কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ। কাহারও দ্বারে ভিক্ষা মিলে না। অন্না-

ভাবে সকলেরই দেহ কঙ্কালসার। গবাদি পশুর আহারের দায়ে চালের খড়গুলি পর্য্যন্ত ফুরাইতে বসিয়াছে। মাঠে ঘাস নাই, গাছে পাতা নাই, পুকুরে পানা নাই; মানুষেই তাহা খাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার উপর চুরি ডাকাতি ও মহামারি এই ত্র্যহস্পর্শ আসিয়া দেখা দিয়াছে। আর রক্ষা নাই। যেদিকে চাও, দেখিবে—রাশিরাশি মড়া; যেদিকে কাণ পাতো, শুনিবে—কেবল হৃদয়ভেদী হাহাকার ক্রন্দন। শকুনি-গৃধিনীতে আকাশমার্গ পরিপূর্ণ। শৃগালগণ দিবাভাগেই শবশরীর লইয়া টানাটানি করিতেছে। পচা দুর্গন্ধে চারিদিক্ ভরিয়া গিয়াছে। অমুক আজ সাতদিন উপবাসী, অমুক আজ কচি ছেলের হাত হইতে একটি মুড়ি কাড়িয়া খাইয়াছে, অমুক আজ অভুক্ত শিশু পুত্রের মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া জলে ডুবিয়া মরিয়াছে, অমুক আজ উপবাসী পরিবারবর্গের ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া দেশান্তরী হইয়া চলিয়া গিয়াছে, অমুক আজ কুকুরের মাংস খাইয়াছে, অমুক নাকি আজ জঠরজ্বালায় মড়ার মাংসও আহার করিয়াছে, এইরূপ কথাই কেবল মুখে-মুখে আলোচিত। বড়ই ভীষণ সময়, চারিদিকেই বিষাদের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি। দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রভৃতি রাক্ষস রাক্ষসীগণ যেন লোল রসনা বিস্তার করিয়া উন্মত্ত ভৈরব এবং রণরঙ্গিণী চণ্ডিকার ন্যায় এই মহাশ্মশানে তাণ্ডবনৃত্য জুড়িয়া দিয়াছে। এই ভীষণ দৃশ্য ভাবিলেও হৃদয় দুরুদুরু করিয়া উঠে। বন্ধু মহান্তির আনন্দসাম্রাজ্যেও এই দুর্ভিক্ষদানব উঁকিঝুঁকি মারিতে আরম্ভ করিয়াছে। আজ তিনদিন তাঁহারা পতিপত্নীতে উপবাসী। ভিক্ষা জুটিতেছে না, সামান্য যাহা জুটিয়া-

ছিল, বালকবালিকা দুইটীরই তাহা পর্য্যাপ্ত হয় নাই। কোলের মেয়েটিতো কেন খাইয়াই আছে। গত কল্য বাসি ফেনে শিশুদের দিন গুজরান হইয়াছে। আজ ভাগ্যে তাহাও জুটে নাই, তাই বন্ধু মহান্তির কন্যা পুত্র দুইটীতে ঐরূপ কান্নাকাটী করিতেছে।

বন্ধু মহান্তি অনেক গ্রাম ঘুরিয়া হয়রাণ হইয়া এইমাত্র ফিরিয়া আসিলেন। একটি দানা চাউলও কোথাও মিলে নাই। একমুষ্টি শাকপত্রও তিনি সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। নিজের জন্য নয়, শিশু পুত্রকন্যার জন্যই যেন একটু চিন্তিত হইয়া বাহিরবাটীতে আসিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন, এমন সময় তাঁহার সহধর্ম্মিণী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আহা, তাঁহার কোলের মেয়েটি কাঁদিয়া কাঁদিয়া গলা ধরাইয়া ফেলিয়াছে। বাছা আমার শুষ্ককণ্ঠে আর কাঁদিতে পারিতেছে না, কেবল থাকিয়া-থাকিয়া ফোঁপাইয়া-ফোঁপাইয়া উঠিতেছে, আর মার প্রতি এমন করুণ নয়নে চাহিতেছে যে, দেখিলে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। আহা ঠাকুর! তুমি না বড় দয়াল, তোমার রাজ্যে এ কঠোর শাসন কেন? হায়, মা-অন্নপূর্ণার অন্নসত্রে এ দারুণ দুর্ভিক্ষ কেন? বাবা বৈদ্যনাথের রাজত্বে এ মহামারি কেন? এ রহস্যের উদ্ভেদ কে করিবে!

খুকীকে কোলে করিয়া পত্নী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহার নয়নে দরদর অশ্রুধারা; দেখিয়া বন্ধু মহান্তিও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। কাতর-কণ্ঠে বলিলেন,—সতি! শ্রীহরির কি যে ইচ্ছা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, উপবাসক্লিষ্ট শরীরে যতদূর পারি গ্রামেগ্রামে ঘুরিয়া আসিলাম, একটি

তণ্ডুলও কোথায়ও পাইলাম না। শাকপাতাও কোথায় চক্ষে ঠেকিল না তাই বসিয়াবসিয়া ভাবিতেছি,—লীলাময় হরির এই লোকসংহারিণী লীলা আর কতদিন চলিবে? এ লীলা সংবরণ কর প্রভু! তোমার সৃষ্ট জীব, তুমি না রাখিলে আর কে-ই বা রক্ষা করিবে। ঠাকুর! এই মর্ম্মপীড়ক দৃশ্য চর্ম্মচক্ষেই আমরা দেখিতে পারি না, আর তুমি তোমার করুণার প্রস্রবণ নয়নে কেমন করিয়া নিরীক্ষণ করিতেছ নাথ! এ লীলা সংবরণ কর প্রভু! সংবরণ কর।

পতির মুখে 'ভিক্ষায় কিছু মিলে নাই' শুনিয়া পত্নীর মাথা ঘুরিতে লাগিল। তিনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না। পতির পদতলেই বসিয়া পড়িলেন এবং বিনাইয়া-বিনাইয়া বলিতে লাগি-লেন,—হায় নাথ! আমি না হয় অভাগিনী, শৈশবেই মাতা পিতা হারাইয়াছি, আত্মীয় বন্ধু বলিতে কাহাকেও দেখিতে পাই-তেছি না যে, দুইদিন তাহাদের বাড়ীতে গিয়া এই অকালটা কাটাইয়া আসি, কিন্তু হাঁগা, তুমিও কি আমার মত? তোমারও কি আত্মীয়কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব সখাসাঙ্গাৎ কেহই নাই? নিকটে হউক দূরে হউক, যদি কেহ থাকে তো বল, ছেলেপুলে লইয়া সকলে তথায় চলিয়া যাই, উভয়ে প্রাণপণে তাদের সেবা-শুশ্রূষা করি, আর এক মুষ্টি অন্ন খাইয়া জীবন রক্ষা করি। তা না হলে বাছাদের আর বাঁচাইতে পারিব না, নিজেরাও মারা যাইব।

বন্ধু মহান্তি পত্নীর কথার প্রত্যুত্তরে বলিতে লাগিলেন,—সতি! না, আমারও তেমন আত্মীয়-স্বজন কেহই নাই। তবে

একজন বন্ধু আছেন বটে, তিনি কিন্তু থাকেন বহু দূরে। এখান-থেকে পাঁচদিনের পথ হইবে। বন্ধুটী বড় ভাল।—

"পুরুষমানঙ্ক উত্তম। কেহি নুহন্তি তাঙ্কু সম ॥
আবর ভাগ্যবন্তপণে। ব্রহ্মাণ্ডে নাহিঁ অন্যজনে ॥"

আমরা যদি তাঁহার কাছে যাইতে পারি, তাহা হইলে সকল ক্ষুধাই চিরতরে মিটিয়া যাইবে। আহা, তাঁহার নামটি বড়ই মিষ্ট। তাঁহার নাম,—দীনবন্ধু। আমাদের মত দীনহীনকে তিনি বড়ই ভাল বাসেন।

শুনিয়া সতির আনন্দ আর ধরে না। তিনি মহা ব্যস্ত-সমস্ত-ভাবে বলিলেন,—নাথ, হউক পাঁচদিনের পথ, চল সেইখানেই চলিয়া যাই, দীনবন্ধুর দরবারে গিয়া দারিদ্র-দুঃখ দূর করিয়া ফেলি। নাও খোকাকে তুমি কাঁধে কর, আমি ছোটখুকীকে কোলে করিয়া লই, বড়খুকী চলিয়া যাইতে পারিবে এখন; আর জিনিষটা পত্রটা যাহা লইতে হয়, তাহাও আমিই বহিয়া লইয়া যাইব। নাও, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। ঘরে একটু তোড়ানি (আমানি) আছে, সেইটুকু খোকা-খুকীদের খাওয়াইয়া দেই, তুমিও মোটঘাট বাঁধিয়া তৈয়ারী হও। নাও, আর বিলম্ব কোরো না। পাঁচটা দিন বই তো নয়, পথে ঘাসপাতা খাইতে-খাইতে পরমানন্দে চলিয়া যাইব এখন। তজ্জন্য কোন চিন্তা নাই।

বন্ধু মহান্তি ঈষৎ হাসিয়া ইঙ্গিতেই পত্নীকে সম্মতি জানাইলেন। পত্নীও প্রস্তুত হইয়া আসিতে গৃহমধ্যে গমন করিলেন। বন্ধু

মনেমনে ভাবেন,—প্রভু! যখন জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তখন একদিন-না-একদিন মরিতেও হইবে; তাহার জন্য কিছুমাত্র চিন্তিতও নহি। মৃত্যুভয়ে দেশত্যাগ, সে তো বাতুলেরই কর্ম্ম। মৃত্যু নাই কোথা? তোমার পাদপদ্ম ছাড়া এমন কোন্ স্থান আছে, যেখানে মৃত্যু নাই? এখান ছাড়িয়া যেখানেই পলাই না কেন, মৃত্যু আমায় কিছুতেই ছাড়িবে না, সে আমার পাছু ধরিয়াই চলিবে। তবে আমি মৃত্যুভয়ে পলাইব কেন? ঠাকুর! তুমি বিশ্বম্ভর; কোথায় জলের ভিতর পর্ব্বত, তাহার মধ্যে কোথায় একটি ক্ষুদ্র কীট রহিয়াছে, তাহারও রোজ-আহারের খবর যখন তুমি রাখিয়া থাক, তখন সেই আহারের দায়েই বা দেশান্তরী হইতে যাইব কেন? দেওয়া-না-দেওয়ার মালিক তো তুমিই। তা এখানেই দাও, আর অন্য কোথাওই দাও। তোমার ইচ্ছা হয় তো ঘরে বসিয়া-বসিয়াই একমুষ্টী পাইব, ইচ্ছা না হয় তো সাত-সমুদ্র তের-নদী পার হইয়াও চুটকি-ভিক্ষা জুটিবে না। তবে আবার দেশত্যাগ করিতে যাই কেন? 'যাই কেন?'—তাহা কি আর বলিতে হইবে? যাই,—তোমার জন্য,—তোমার সেই মদনমোহন মূরতি দেখিবার জন্য। হায় নীলাচল-নাথ! সে দিন—সেই শুভদিন কি হইবে?—বলভদ্র-সুভদ্রার সহিত কি তোমার পাদপদ্ম দর্শন ভাগ্যে ঘটিবে? যদি ঘটে, তাহা হইলে মনে করিব,—দুর্ভিক্ষ-দানবই আমার বন্ধু—বন্ধুর অপেক্ষাও বন্ধু—পরম বন্ধু। মনে করিব,—সে-ই আমায় বিষের মধ্যে অমৃতের অবস্থান দেখাইয়া দিল;—সে-ই আমায় অমঙ্গলের

মাঝারে তোমার সর্ব্বমঙ্গল শ্রীমূর্ত্তি সাক্ষাৎকার করাইয়া দিল। হউক,—নাথ! তাহাই হউক, আশীর্ব্বাদ কর, তাহাই হউক। নীলাচলে গিয়া যেন তোমার চন্দ্রবদন দর্শন করিতে পারি।

পত্নী, পুত্রকন্যাদের লইয়া সাজিয়া-গুজিয়া পতির নিকট হাজির হইলেন। তিনি আর মোটঘাট বাঁধিবেন কি, সামান্য দুই-একটা জলপাত্র ও কাঁথাকম্বল লইয়া তৈয়ারি হইলেন। পুত্রকে কাঁধের উপরে বসাইলেন, আর হরি হরি বলিয়া যাত্রা করিলেন। পত্নীও ছোট-মেয়েটি কোলে লইয়া পতির অনুগমন করিতে লাগিলেন। বড়-মেয়েটি তাঁর সঙ্গেসঙ্গেই হাঁটিয়া চলিল।

দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ, পথিমধ্যেও ভিক্ষা বড় জুটিল না। শাকপাতা খাইয়াই তাঁহাদিগকে চারিদিন চালাইতে হইল। পঞ্চম দিবসে সন্ধ্যা হয় হয় সময়ে তাঁহারা শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে শ্রীমন্দির দর্শনেই বন্ধুর ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হইয়া গেল। আনন্দ-গদ্গদ-স্বরে তিনি পত্নীকে বলিয়া উঠিলেন;—সতি! ঐ দেখ আমার বন্ধু দীনবন্ধুর দেউল দেখা যাইতেছে। শুনিয়া তিনিও যেন শরীরে নূতন বল পাইলেন; এইবার পুত্র-কন্যার প্রাণ রক্ষা হইবে ভাবিয়া নবীন আশায় যেন তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গেল. মলিন বদন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। আহা, শুষ্ককণ্ঠে আর তাঁহার বাক্য বাহির হইল না, ভাবভঙ্গীতেই আনন্দ প্রকাশ করিলেন মাত্র। দেখিতে দেখিতে তাঁহারা সিংহদ্বারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আনন্দে আর এ পথটুকু আসার ক্লেশ তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না, যেন কোন্ যাদুমন্ত্রে তাঁহাদের এ পথটুকু কেহ লইয়া

আসিল। সিংহদ্বারে আসিয়া দেখেন,—বেজায় ভিড়। পটাপেট বেত চলিতেছে। ভিতরে যায় কাহার সাধ্য? বন্ধু মহান্তি শিশুদের লইয়া আর ভিড়ের মধ্যে যাইতে সাহসী হইলেন না; দূর হইতেই পতিত-পাবন দেবকে দর্শন করিয়া চর্ম্মচক্ষু সার্থক করিলেন। দেউলের দক্ষিণদিকের 'পেজনালা'র (ফেন বাহির হইবার নর্দ্দমার) পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিলেন। একে অনশনে অবসন্ন দেহ, তাহার উপর দারুণ পথক্লেশ, সিংহদ্বারে ভিড়ের মধ্যে দাড়াইয়া থাকা কিছুতেই চলিল না। কাতর শরীরে পেটের কথা মুখ ফুটিয়া কাহারও বাহির হইতেছিল না; ক্ষণেক বিশ্রামের পর সকলেরই মুখে কথা ফুটিয়া উঠিল। পত্নী বলিলেন,—স্বামিন্! বন্ধুভবনে আসিয়া এ ভাবে এই পেজনালার পার্শ্বে গোরুর দলের মধ্যে বসি-বার দরকার? ঐ দেখ, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, নিবিড় অন্ধকার এখনই আকাশ-মেদিনী ছাইয়া ফেলিবে। তখন আবার পুত্র-কন্যা-দের লইয়া কাহার দ্বারে আশ্রয় লইতে যাইব বল? তুমিই না হয় একবার বন্ধুর নিকট যাও, কিছু খাবারদাবার চাহিয়া আন, ছেলে-পুলেরা খাইয়া জীবন রক্ষা করুক; নচেৎ এখন 'পেজপানী' (ফেন) চাহিতে যাই কাহার কাছে?

এমন সময় বড়খুকী ও খোকা কাঁদিতেকাঁদিতে মার হাত ধরিয়া বলিতে লাগিল,—মাগো! বড় ক্ষুধা পেয়েছে, প্রাণ আর বাঁচে না যে মা? কিছু খেতে দে মা, খেতে দে।

বন্ধু মহান্তি বলিলেন,—সতি! আমাদের আসাটা বড় অসময়েই হ'য়েছে। এ সময়ে বন্ধুর সহিত দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া ভার। বিশেষত

আজ নানা দেশ হইতে তাঁর আরও অনেক বন্ধু এসেছেন। তাঁদের ভিড়ে দেউলে ঢোকাও কঠিন। জোর করিয়া ঢুকিতে গেলে বেত খাইয়াই মরিতে হইবে। তার চেয়ে পেজপানী পান ক'রে আজিকার রাত্রিটা এখানেই কাটাইয়া দেওয়া যাউক; প্রাতঃকালে নিরিবিলিতে বন্ধুর সহিত দেখা করিয়া দুঃখ-দারিদ্রের কথা বলা যাইবে এখন।

পত্নীও তাহাতে সম্মত হইলেন। বলিলেন,—আচ্ছা তাহাই হউক, এখন পেজপানী (ফেন) তো আন, পান করিয়া প্রাণরক্ষা করা যাউক। বন্ধু মহান্তি পথ হইতে একটি এঁটো 'কুড়ুআ' (মাটীর ভাঁড়) কুড়াইয়া আনিলেন, আর পেজকুণ্ডে (ফেনের চৌবাচ্ছায়) বুড়াইয়া-বুড়াইয়া পত্নীর হস্তে দিতে লাগিলেন। তিনিও পুত্রকন্যাদের পান করাইয়া নিজেও উদর পূরিয়া পান করিয়া তথায় শুইয়া পড়িলেন।

বন্ধু মহান্তি তখন তুষ্টমনে তাঁহার বন্ধুরই চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। মনে-মনে বলেন,—

"বোইলা—নমো দারুহরি। চর-অচরে অচ্ছ পূরি॥
সকল জীবে পরিদাতা তুম্ভহুঁ—নাহিঁ না করতা॥
মুঁ এথুঁ তুহইঁ বাহর। তূ নাথ! যাহা ইচ্ছা কর॥
প্রভু! এঠারে কলে হেলা বুড়িলা চিন্তা-জলে ভেলা॥
ক্ষুধা-অনলে পাঞ্চজনে। পোড়ি মরুচ্ছুঁ অকারণে॥
তোর করুণাবারি দেই। শীতল কর ভাবগ্রাহি॥"

ওহে দারুহরি! তোমায় নমস্কার। তুমি এই চরাচর বিশ্বে ব্যাপিয়া রহিয়াছ। তুমিই সকল জীবের সমস্ত বাঞ্ছিত দান করিয়া থাক।

এ জগতে তুমি ছাড়া আর কর্ত্তাও স্বতন্ত্র কেহ নাই। আমি তো সেই জগতের বাহিরের লোক নই, আমাকে ঠেলিলে চলিবে কেন? নাথ হে! তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, কিন্তু মনে রাখিও, আমার বিষয়ে হেলা (উপেক্ষা) করিলে চিন্তার জলে আমার জীবন-ভেলা বুড়িয়া যাইবে। ওহে ভাবগ্রাহি জনার্দ্দন! আমরা পাঁচটি প্রাণী ক্ষুধার অনলে অকারণে পুড়িয়া মরিতেছি, তুমি তোমার করুণার বারিধারা ঢালিয়া তাহা শীতল কর প্রভু!

বন্ধুর শরীরটা পথশ্রমে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিল, কিছুক্ষণ এইরূপ বলিতে-বলিতেই তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। এদিকে শ্রীজগবন্ধুর সমগ্র সেবা সরিয়া গেল। "বড় সিংহার' বেশ হইল, পুষ্পাঞ্জলি দেবতা (ক্ষুদ্র ধাতুমূর্ত্তি) আসিলেন, পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হইয়া গেল, শয্যা বিছানো হইল, প্রভুরা শয়ন করিলেন, ভাণ্ডারী ভাণ্ডারগৃহ বন্ধ করিয়া ফেলিলেন, মুতুলী পণ্ডা মন্দিরদ্বারে দড়ি বাঁধিয়া তাহার উপর মাটী দিয়া সেই মাটীতে 'মুদ' (মুদ্রা—মোহর—ছাপ) করিয়া দিলেন। মশালপ্রদীপ জ্বালিয়া শ্রীমন্দিরের 'বেড়া' (চারিদিক) 'শোধ' (জনশূন্য) করা হইল। চারিদিকের কপাট পড়িয়া গেল। প্রথমে শিকল দিয়া তার পর তালা দিয়া বন্ধ করাও হইল। সেবকগণ যে যাহার ভবনে চলিয়া গেলেন। দেউলে জনমানব নাই। ভক্তবৎসল ভগবান্‌ও ভৃত্যের চিন্তায় বড় কাতর হইয়া পড়িলেন। সুকোমল শয্যায় শয়ন, কমলাদেবীর সাগ্রহ-সেবন আর তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া বরাবর ভাণ্ডারঘরে আসিলেন। তালা-চাবিতে আর সেই 'অণোরণীয়ান্' (সূক্ষ্মের

অপেক্ষা অতি সূক্ষ্ম) ভগবানের কি আসিয়া যাইবে ? তিনি ভাণ্ডার হইতে রত্নথালী বাহির করিলেন। তাহাতে অন্ন-ব্যঞ্জন, খাজা-গজা, পুরী-কচুরী, ক্ষীর-সর, পিষ্টক-পরমান্নাদি প্রসাদ স্তরেস্তরে সাজাইলেন। আহা, এগুলি প্রভু অভুক্ত বন্ধুর জন্য আগেআগেই সরাইয়া রাখিয়াছিলেন। দয়াময় স্বয়ং সেই রত্নথালী বহিয়া লইয়া দক্ষিণ-দ্বারে গমন করিলেন। দ্বার খুলিয়া ডাকিতে লাগিলেন,—বন্ধু ! ও বন্ধু !

ডাক শুনিয়া বন্ধুর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। কিন্তু তিনি মনে করিলেন,—এ পুরীসহরে কি 'বন্ধু' নাম আর কাহারও থাকিতে নাই ? এ হয় তো আর কাহাকেও কেহ ডাকিতেছেন। আর যদি প্রভুই হন তো এখনই বুঝা যাইবে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়াই দেখি না কেন ?

'বন্ধু ! বন্ধু !' ডাক শুনিয়া তাঁহার পত্নীও ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং পতির প্রতি কহিতে লাগিলেন,—ওগো ঐ শুনগো, তোমায় কে ডাক্‌ছে। বন্ধু বলিলেন,—কোথায় কে ডাক্‌ছে ? 'বন্ধু' কি আর কেউ থাক্‌তে নেই ? নাও শুয়ে পড়।

পত্নী কি করেন, আবার শুইয়া পড়িলেন। বন্ধু মহান্তিও কাণ খাড়া করিয়া শুইয়াই রহিলেন। অন্তর্য্যামী ভগবান্ বন্ধুর হৃদয় বুঝিলেন, উচ্চৈঃস্বরে আবার ডাকিতে লাগিলেন এবার আর শুধু 'বন্ধু' বলিয়া নয়,—এবার ডাক দিলেন,—ওহে ও যাজপুরিয়া বন্ধু, ঐ যে পেজনালার পার্শ্বে সপরিবারে শয়ন করিয়া আছ, বন্ধু ও বন্ধু এদিকে এস ভাই ! এদিকে এস, আমি তোমার জন্য অন্নগ্রাস লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছি।

বন্ধু মহান্তির কর্ণে সেই জলদগম্ভীর স্বর প্রবেশ করিল। তাঁহার সর্ব্বশরীর পুলকপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি আবার ভাবিলেন, সত্যই কি দীনবন্ধু আমায় ডাকিতেছেন, না, আমি স্বপ্ন দেখিতেছি, ? স্বপ্নও তো নয়, ঐ যে আবার সেই স্বর শুনা যাইতেছে, ঐ যে শীঘ্র যাইবার জন্য আবার তিনি আহ্বান করিতেছেন। সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী ছাড়া আর কে-ই বা জানিবেন যে, আমি যাজপুরবাসী বন্ধু মহান্তি ক্ষুধায় কাতর হইয়া সপরিবারে পেজনালার পার্শ্বে শয়ন করিয়া রহিয়াছি? না, তিনিই বটেন। যাই, কথাটা কি বুঝিয়া আসি।

বন্ধু মহান্তি শশব্যস্তে উঠিয়া দক্ষিণদ্বারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন,—একজন ব্রাহ্মণ রত্নথালী হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। যাইবামাত্রই তিনি বলিলেন,—বন্ধু! এত দেরি করিয়া কি আসিতে হয়? ডাকিতে ডাকিতে যে আমার গলা চিরিয়া গেল। এই দেখ অন্নথালার ভারে আমার হাত থরথর কাঁপিতেছে। যাও ভাই! এই গ্রাসেক অন্ন খাইয়া আজিকার রাত্রিটা তো অতিবাহিত কর, কল্যই তোমার আহার-অবস্থানের সমস্ত বন্দোবস্তই করিয়া দিব। যাও, কোন চিন্তা করিও না; খাইয়াদাইয়া সুস্থ হওগে।

বন্ধু মহান্তি হাত বাড়াইয়া প্রভুর হস্ত হইতে রত্নথালী গ্রহণ করিলেন। শ্রীঅঙ্গস্পর্শে বন্ধুর শরীর অবশ হইয়া পড়িল। বলিবলি করিয়া তিনি একটি কথাও প্রভুকে বলিতে পারিলেন না। প্রভুও শ্রীমন্দিরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। বন্ধু মহান্তি কিছুক্ষণ জড়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভাবেভাবে তাঁহার প্রাণ তোলপাড় করিয়া

তুলিয়াছে। তাঁহাতে আর যেন তিনি নাই। ক্ষণকাল পরে তিনি যেন মাতালের মত টলিতে-টলিতে পেজনালার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পত্নী-পুত্রাদিকে জাগাইলেন এবং সকলে সেই রত্নথালী ঘিরিয়া বসিয়া পরমানন্দে মহাপ্রসাদ ভোজন করিতে লাগিলেন। বন্ধু মহান্তি খাইতে বসিলেন মাত্র, কিন্তু তাঁহার আর ক্ষুধাতৃষ্ণা ছিল না, পরমানন্দেই তাঁহার ভিতর-বাহির ভরিয়া গিয়াছে। খাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়া গেল। একটু জল সংগ্রহ করা ছিল সেই জলে বন্ধুপত্নী রত্নথালীখানি ধুইয়া দিলেন। বন্ধুও সে খানি ফিরাইয়া দিবার জন্য দক্ষিণদ্বারে গমন করিলেন। গিয়া অনেক ডাকাডাকি—দ্বার-ঠেলাঠেলি করিলেন, কিন্তু কাহারও সাড়াশব্দ পাইলেন না। কি করেন, অগত্যা ফিরিয়াই আসিলেন। একটু ছেঁড়া নেকড়া ছিল, তাহাই জড়াইয়া রত্নথালীখানি মাথার শিয়রে রাখিয়া দিয়া পুত্রকন্যাদের লইয়া বন্ধুপত্নী আবার শুইয়া পড়িলেন। শুইবামাত্র সকলেই ঘুমাইয়াও পড়িলেন। কিন্তু বন্ধুর আর শয়নও নাই, নিদ্রাও নাই। তাঁহার তখন এক অপূর্ব্ব অবস্থা; সে অবস্থাটা জাগা ও ঘুমের মাঝামাঝি, অথচ স্বপ্ন বা তন্দ্রাও নয়। সে অবস্থাটা—মোহালস্যের অতীত,—তামস-সুপ্তের অতীত,—আত্মানন্দে উদ্ভাসিত কি-এক মাদকতাময়ী অবস্থা। সেই অবস্থায় থাকিয়া বন্ধু মহান্তি কত কি-ই ভাবিতে লাগিলেন। প্রথম তাঁহার মনে হইল, এই যে রত্নথালী, এটি সাক্ষাৎ প্রভুর হস্তচ্যুত। এটি সামান্য রত্নথালী নয়, এটি সাক্ষাৎ সেই প্রভুই। বন্ধু থালীটি লইয়া একবার বুকে চাপিয়া ধরিলেন, তাঁহার প্রাণ

যেন জুড়াইয়া গেল। সাক্ষাৎ প্রভুর স্পর্শ পাইতেছি বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। বুক হইতে থালীখানি লইয়া তিনি নয়নে-বদনে ও মস্তকে চাপিয়া-চাপিয়া ধরিলেন, আনন্দ-মদিরার নেশা যেন আরও ঘোরাল হইয়া আসিতে লাগিল। তাঁহার শরীর যেন অবশ হইয়া পড়িল। তিনি থালীখানি মাথায় দিয়া শুইয়া পড়িলেন। মনে হইতে লাগিল, যেন প্রভুর পাদপদ্মের উপরই মাথা রাখিয়া শুইয়া আছি। আর তিনি যেন সোহাগভরে মুখে-বুকে পদ্মহস্ত বুলাইয়া দিতেছেন, তৈলহীন সংস্কারহীন রুক্ষ জটাবাঁধা চুলগুলি ধীরেধীরে কুরিয়া-কুরিয়া দিতেছেন। চক্ষু তো বুজিয়া ছিলই, এইবার যেন সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারেই কপাট পড়িয়া গেল। মনপ্রাণ সে কি-এক অপ্রাকৃত আনন্দে ভরপূর হইয়া গেল। ইহাকে নিদ্রা বলিতে হয় বল, আর সমাধি বলিতে হয় বল, কিন্তু বন্ধুর অবস্থাটা তখন ঐ বলি-বলি-বলা-যায়-না-ধরণেরই হইল।

এদিকে রাত্রি শেষ হইয়া আসিল, কাক-কুক্কুট ডাকিয়া উঠিল। উষার অরুণরাগে চারিদিক লালেলাল হইয়া পড়িল। শ্রীজগন্নাথের সেবকগণ স্নানসন্ধ্যা সমাপন করিয়া শুদ্ধভাবে শ্রীমন্দিরে আগমন করিলেন। দ্বার খোলা হইল। দেউলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলেই আপনআপন সেবায় লাগিয়া গেলেন। ভাণ্ডারী ভাণ্ডার খুলিয়া দেখেন যে, বাসন-কোসন যে ভাবে গোছান ছিল, সেভাবে নাই; কে সব ওলটপালট করিয়া ফেলিয়াছে। দেখিতেদেখিতে আরও দেখেন যে, সর্ব্বনাশ! প্রভুর রত্নথালী একখানি নাই! তিনি মহা হাঁকডাক ছাড়িয়া বাহিরে আসিলেন। ব্যাপার কি জানিবার

জন্য চারিদিক্ হইতে সেবক সকল ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন। ভাণ্ডারী বলিলেন,—সর্ব্বনাশ সর্ব্বনাশ, কল্য রাত্রে দেউলে ডাকাত পড়িয়াছে, প্রভুর রত্নথালী চুরি করিয়া লইয়া পলাইয়া গিয়াছে। গোলমাল শুনিয়া প্রহরীরাও আসিয়া জুটিল। "দেউলের ভিতর চুরি ডাকাতি করিতে বাহির হইতে অন্য চোর কে আসিবে, এ কার্য্য সেবকদেরই"—বলিয়া তাহারা সেবকদের উপর চড়োয়া হইল। সে মারমার কাটকাট তর্জ্জনগর্জ্জন দেখে কে? শেষ যত দোষ গিয়া পড়িল—বেচারা 'সোয়ার' (সূপকার) পণ্ডাদের উপর। সকলেই সিদ্ধান্ত করিলেন,—রন্ধনের অনুরোধে তাহারা রাত্রে রন্ধনশালায় ছিল, একাজ ওদেরই হইবে, অন্য কাহারও নয়। ধর ওদেরই; রত্নথালী এখনই বাহির হইবে। আহা, প্রহরিগণ তাঁহাদের জোড়াজোড়া করিয়া বাঁধিয়া পিঠে পটাপট বেত মারিতে আরম্ভ করিয়া দিল। তাঁহাদের ক্রন্দনরোলে দেউলের ভিতরটা ভরিয়া গেল। এই কথা লইয়া সমগ্র পুরীসহর সরগরম হইয়া পড়িল।

দৈবেরই খেলা, যে রত্নথালীর জন্য এত কাণ্ড, এত হাঙ্গামহুজ্জত, এত নির্দ্দোষের নির্য্যাতন, সেই রত্নথালী মাথায় দিয়া বন্ধু মহান্তি মহানন্দে নিমগ্ন রহিয়াছে! নির্দ্দোষ বন্ধু মহান্তি কি আজ দৈবের এ খেলায় অব্যাহতি পাইবেন? না না, আজ আর তাঁহারও অব্যাহতি নাই। রত্নথালী আজ একটা মহা হুলস্থূল কাণ্ড না বাধাইয়া আর ছাড়িতেছেন না।

পেজনালার পার্শ্বে বন্ধু মহান্তি সপরিবারে শুইয়া আছেন। তাঁহার মাথায় সেই ছেঁড়া নেকড়াতে বাঁধা রত্নথালী। ছেঁড়া

নেকড়ার ফাঁক দিয়া রত্নথালীর চক্‌চকানি দেখা যাইতেছে। বিশেষত সূর্য্যকিরণে তাহার জলুষ যেন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। হঠাৎ তাহা একজনের নজরে পড়িয়া গেল। আর যায় কোথা, সে মহা গোলমাল করিয়া লোক জড় করিল, আর লম্ফঝম্ফ করিতে করিতে বলিতে লাগিল,—পাকড়াও পাকড়াও বেটাকে; রাত্রে চুরি ক'রে বুঝি চম্পট দিবার সুযোগ পায় নাই, তাই বেটা মট্‌কা মেরে এইখানে প'ড়ে আছে। ধর, ধর বেটাকে, শীগ্‌গির শীগ্‌গির ধর, নইলে বেটা এখনই পলাইয়া যাইবে।

বলাও যা, আর অমনি জন সাতেক লোক লাফ দিয়া গিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিল। বন্ধুরও আনন্দনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। অবাক্ হইয়া চাহিয়া দেখেন,—বিপরীত কাণ্ড! 'ব্যাপারটা কি?' জিজ্ঞাসা করিবারও আর তিনি অবসর পাইলেন না। কতকগুলি লোক তাঁহার মাথার নীচে হইতে থালীখানি জোরে ছিনাইয়া লইল, কতক লোকে তাঁহার হাতে-পায়ে শিকলী দিয়া বাঁধিয়া ফেলিল, তার উপর যে যত পারিল—চড়চাপড়টা ঘুষীঘাষাটা বসাইতে লাগিল। আর গালাগালির তো অবধিই নাই, সে যেন শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় চারিদিক হইতে বর্ষণ হইতে থাকিল।

বন্ধু মহান্তির দুর্দ্দশা দেখিয়া স্ত্রীপুত্রাদি কান্নার হাট বসাইয়া দিলেন। বন্ধু কিন্তু অচল অটল। তিনি থাকিয়া থাকিয়া 'গোবিন্দ গোবিন্দ' করিয়া উঠিতেছেন, আর সেই তাড়ন-ভৎর্সন অকাতরে সহ্য করিতেছেন। এ শরীরের সহিত যেন তাঁহার কোন সম্বন্ধই নাই,—এ শরীরের সুখদুঃখে বুঝি তাঁহার কিছুই করিতে পারে না।

প্রহার-তিরস্কারের বেগ একটু কমিয়া আসিলে বন্ধু তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন,—ভগবান্ আপনাদের মঙ্গল করুন। আপনারা মারুন, গালাগালি দিউন, যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন; কিন্তু আমারও দু'একটা কথা আপনাদিগকে শুনিতে বলি।

"হাঁঃ, বেটা চোর, ওর কথা আবার শুন্‌তে হবে?"—এই বলিয়াই অনেকে বন্ধুর কথা উড়াইয়া দিলেন। ভাল-মন্দ সব রকমেরই তো লোক আছে, তাই কেহ বা বলিলেন,—ভাল, ও কি বলিতেছে একবার শোনোই না কেন?

বলিবার হুকুম পাইয়া বন্ধুও তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন,—মহাশয়গণ! আমি বিদেশী। গতকল্য এখানে আসিয়াছি। পথ-শ্রমে কাতর হইয়া স্ত্রী-পুত্রাদিসহ এইখানেই পড়িয়াছিলাম। প্রবল ক্ষুধায় শিশুসন্তানগণ কাঁদিয়া অস্থির। একটু পেজপানী ভিন্ন অন্য আহার আর জুটে নাই। করা যায় কি, পড়িয়া-পড়িয়া পতিতপাবন প্রভুকেই ডাকিতেছিলাম। রাত্রি দশদণ্ড হইবে, এমন সময়ে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া দক্ষিণদ্বার হইতে আমায় ডাকিলেন। আমি তাঁহার কাছে গেলাম। তিনি এই রত্নথালী ভরিয়া নানাপ্রকার খাদ্য দিয়া চলিয়া গেলেন। আমরা সকলে মিলিয়া পরমানন্দে তাহা আহার করিলাম। পরে থালীখানি ফিরাইয়া দিতে গিয়া দেখি, দ্বার বন্ধ; কেহই কোথাও নাই। অনেক ডাকহাঁক করিয়াও যখন সাড়াসুড়ি পাইলাম না, তখন কাজেকাজেই ফিরিয়া আসিতে হইল। তাই ঐ-ভাবে ছেঁড়া নেকড়া জড়াইয়া থালীখানি রাখিয়া দিয়াছি। সত্য কথাই আপনাদের নিকট বলিলাম। এখন বলুন, আমার অপরাধ কি?

বন্ধুর স্ত্রীও তাঁহাদিগকে ঐরূপ কথাই বলিলেন, কিন্তু তাহাতে বড় একটা কাহারও বিশ্বাস হইল না। অনেকেই বলিয়া উঠিল,—ব্যাটাবেটির কথা শোন দেখি, রাত্রি দশদণ্ডের সময় ওদের জন্য রত্নথালী কোরে কে ব্রাহ্মণ আবার খাবার দিতে এসেছেন? বেটাকে বন্দিশালে নিয়েচল, দুদিন ঠাণ্ডা গারদে থাকিলেই সব ভণ্ডামী ভেঙ্গে যাবে এখন।

দুষ্টের দল চিরদিনই পুষ্ট। তাহারা বন্ধু মহান্তিকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া বন্দিশালায় লইয়া গেল এবং গারদঘরে বদ্ধ করিয়া রাখিল। বন্ধুর পত্নী ও পুত্র-কন্যা পেজনালার পার্শ্বেই পড়িয়া রহিলেন। আহা, তাঁহাদের করুণ ক্রন্দন শুনিলে পাষাণও বিদীর্ণ হইয়া যায়!

বন্ধুকে বন্দিঘরে দিয়া গালাগালি দিতে দিতে প্রায় সকলেই আপন-আপন গৃহে চলিয়া গেল। যাইলেন না কেবল দুই চারিজন। তাঁহারা বন্ধুর পত্নী-পুত্রাদিকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—বাছা! তোমাদের কোন ভয় নাই, তোমরা এইখানেই থাক, আহারাদি আমরাই জোগাইব। সত্যের জয় অবশ্যই হইবে, তিনি সত্বর কারা-মুক্ত হইবেনই হইবেন। বলিয়া তাঁহারা ছেলেদের জন্য কিছু খাবার দিয়া চলিয়া গেলেন।

কারাবদ্ধ বন্ধুর হস্ত-পদ লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ। একটু নড়িবার চড়িবার যো নাই। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার অনুমাত্র চাঞ্চল্য বা ক্লেশানুভব নাই। তিনি আনন্দমনে সেই দীনবন্ধুরই পাদ-পদ্ম ভাবিতে লাগিলেন। এত অপমান এত তাড়ন-তিরস্কার পাইয়াও তাঁহার মনোমধ্যে একবারও এ ভাবের উদয় হয় নাই

যে, ঠাকুর! কাল যে রাত্রিকালে তুমি বলিলে—কল্যই তোমার আহার-আবাসের বন্দোবস্ত করিয়া দিব, এই অজস্র গালা-গালিই কি আমার আহার, আর কারাবাসই কি আমার আবাস নিরূপিত হইল প্রভু!

এরূপ অবস্থায় তোমরা-আমরা হইলে বোধ হয় এর চেয়েও বেশী রকম দুই-চারিটা কড়া কথা না শুনাইয়া আর ছাড়িয়া দিতাম না। তা তিনি ভগবানই হউন, আর যিনিই হউন। কিন্তু বন্ধুর মনের কোণেও এ ভাবের কথা একবারও উঁকিঝুঁকি মারে নাই। তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী, তার উপর কর্ম্মফল মানেন। তাই তিনি সুচতুর কর্ণধারের ন্যায় কর্ম্মের শত ঝঞ্ঝাবাত শত তরঙ্গের আঘাত সহ্য করিয়াও অবিচলিতভাবে দেহ-তরণী চালাইয়া চলিয়াছেন। বিপদ দেখিয়া তাঁহার ভয় বা চাঞ্চল্য হইবে কেন? তিনিও যে তাঁহার ধ্রুব নক্ষত্র—তাঁহার কম্পাসের কাঁটা ভগবানের দিকেই দৃষ্টি স্থির রাখিয়াছেন।

তোমার যদি শুনিবার কাণ থাকে তো ঐ শুন, কারাবদ্ধ বন্ধু মনেমনে কি বলিতেছেন। বন্ধু বলিতেছেন,—

"বোলে—মুঁ পাপী অপরাধী। তুম্ভে যে করুণাবারিধি॥
ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে পাপিজনে। মো-পরি নাহিঁ অন্যজনে॥
তো পরি পতিত-তারণ। অচ্ছি কে ব্রহ্মাণ্ডমধ্যেণ॥
এণু তু যাহা কলে কর। অন্য শরণ নাহিঁ মোর॥"

ঠাকুর! আমি বড়ই পাপী, বড়ই অপরাধী; সেই পাপের ফলেই আমার এই নির্য্যাতন। ইহাতে তোমার কিছুই দোষ নাই;

কেননা তুমি যে করুণার সাগর। প্রভু! এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে আমার মত পাপী ব্যক্তি আর দুইটি নাই। কিন্তু তোমার মত পতিত-তারণই বা কে আছেন? তাই বলি নাথ! তুমি যাহা করিতে হয় কর। কিন্তু জানিয়া রাখিও, আমার আর অন্য শরণ নাই। আশ্রয় বল, রক্ষক বল, তুমিই আমার সকলই।

ভক্ত এত ব্যাকুল ভাবে প্রভুকে ডাকিতেছেন, তাঁহার কি আর শান্তি আছে? অথচ নিত্য নিয়মিত সেবা না সরিলেও কিছু করিতে পারিতেছেন না। তিনি বড় ব্যতিব্যস্তেই পড়িয়া গেলেন। দেখিতেদেখিতে দিনটুকু কাবার হইয়া গেল। প্রভুর সন্ধ্যা-আরতি, সন্ধ্যা ধূপ (রাত্রিকার ভোগ), চন্দনলাগি (শ্রীঅঙ্গে চন্দনলেপন), বড়সিংহার (পুষ্পবেশ) ও পহুড় (শয্যায় শয়ন করানো) প্রভৃতি সেবাও ক্রমেক্রমে সরিয়া গেল। দেউলের 'বেঢ়া শোধ' করিয়া দ্বারে তালা দিয়া সেবকগণও চলিয়া গেলেন। প্রভুও সত্বর শয্যাত্যাগ করিয়া গরুড়ের উপর চাপিয়া গগনমার্গে গিয়া চড়িলেন; হুকুম দিলেন—গরুড়! খোরধা (বর্ত্তমান খুরদা) রথি-পুরে প্রতাপরুদ্র রাজার প্রসাদে শীঘ্র লইয়া চল। গরুড়ও যে আজ্ঞা' বলিয়া সন্‌সন্ করিয়া বায়ুবেগে তাঁহাকে লইয়া চলিলেন এবং নিমেষ-মধ্যে প্রভুকে রাজভবনে পঁহুছাইয়া দিলেন।

গভীর রাত্রি। মহারাজ তখন অন্তঃপুরে পালঙ্কের উপর সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। ভাবগ্রাহী ভগবান্ ভক্তের ভাবে বিভোর হইয়া সেই-খানেই গমন করিলেন এবং স্বপ্নমার্গে রাজাকে বলিতে লাগিলেন,—ওহে রাউত! (রাজন্) আমার আজ্ঞা শ্রবণ কর! প্রথম একটা কথা

জিজ্ঞাসা করি,—তোমার গৃহে যদি বন্ধুবান্ধব আসে, তবে কি তাহারা উপবাসী হইয়াই ফিরিয়া যায়? ইতর লোকের ঘরেও আত্মীয়কুটুম্ব আসিলে তাহাকে পেট কোলে করিয়া ফিরিয়া যাইতে হয় না। আর কোথায় যাজপুর, সেখান থেকে আমার একটী বন্ধু সপরিবারে আমার বাড়ীতে আসিয়াছে, আমিই তাহাকে আমার রত্নথালী করিয়া ভোজন করিতে দিই। তোর বাপের পুঁজিপাটা তো কিছু ভাঙ্গিতে যাই নাই, আমারই রত্নথালী আমি তাহাকে দান করিয়াছি। থালী খানি বন্ধুর কাছেই ছিল। আর তোর লোকজন কিনা তাহাকে 'চোর' অপবাদ দিয়া ধরিয়া লইয়া গেল? আহা, তাহার হাতে-পায়ে বাঁধিয়া মাটীতে ফেলিয়া যেমন মারিতে হয় মারিল, তার পর দুইটী পায়ে শিকলী লটকাইয়া কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিল। আহা, তাহার স্ত্রীপুত্রাদির দুর্দ্দশার কথা আর কি বলিব। বন্ধুর জন্য তাহারা ব্যাকুলপ্রাণে হাহাকার ক্রন্দন করিতেছে। তাই আমি তোমায় আজ্ঞা দিতেছি, যদি মঙ্গল চাও তো সত্বর ক্ষেত্রে গমন কর। যাইয়া আমার বন্ধুকে কারামুক্ত করিয়া দাও, তাহার পায়ের শিকলী কাটাইয়া সেই পায়ের তলে পড়িয়া সম্মানিত কর। তার পর তীর্থজলে তাহাকে স্নান করাইয়া সূক্ষ্ম বস্ত্র পরাইয়া দাও এবং নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া দেউলের হিসাবরক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত কর। কাহাকেও কোন নূতন কর্ম্মে বাহাল করিতে হইলে যেমন তাহার মাথায় 'শাঢ়ী' (শিরোপা) বাঁধিয়া দিবার প্রথা আছে, বন্ধুর মস্তকেও সেইরূপ 'শাঢ়ী' বাঁধিয়া দিবে। আর আজীবন যাহাতে উত্তম ভোজন লাভ করিতে পারে, তাহারও বন্দোবস্ত করিয়া

দিবে। যাও, আর বিলম্ব করিও না। সত্বর আমার আদেশ পালন করগে। না কর তো জানিও, তোমার রাজ্যে আর মঙ্গল নাই। আমি কে, জান ত ?—আমি সেই নীলাচলনাথ নারায়ণ।

ভগবান্ রাজাকে এই কথা বলিয়া, তাঁহাকে চেতাইবার জন্য 'সপাং' করিয়া এক ঘা চাবুক মারিয়া, গরুড়ে আরোহণ-পূর্ব্বক নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজাও উঠিপড়ি করিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া পড়িলেন। তাড়াতাড়ি বাহিরবাটীতে বিজয় করিলেন। পাত্র-মিত্রকে ডাকাইয়া সকল কথা বলিলেন। তখনই তাঁহার 'বারু লাগি' (বাহিরে যাইবার সাজগোজ) হইল। তিনিও নীলাচল অভিমুখে চলিলেন। তথায় পৌছাইতে তাঁহার বড় বিলম্ব হইল না; তিনি বরাবর বন্দিমন্দিরেই গমন করিলেন। কারাগৃহের দ্বার মুক্ত করাইয়া অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। স্বপ্নাদিষ্ট সকল কথা হাতে-হাতে মিলাইয়া লইলেন। দেখিলেন,—হাঁ, যাজপুরবাসী জনৈক ব্যক্তি রত্নথালী চুরির অপরাধে কারারুদ্ধ রহিয়াছে বটে। তাঁহার আর অবিশ্বাস রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ বন্ধুর পার্শ্বে গমন করিলেন। বন্ধনমোচনের জন্য প্রহরীদের আদেশ দিলেন। প্রহরিগণ বন্ধন মোচন করিল। মহারাজও পরমাদরে বন্ধুকে কোলে লইলেন, বুকে বুক লাগাইয়া বলিতে লাগিলেন,—অহো, আমার জীবন ধন্য, বহু ভাগ্যে আজ তোমার বদন দর্শন হইল। আমার লোকজন তোমার কাছে বড়ই অপরাধ করিয়াছে, সে অপরাধ তাহাদের নহে, আমারই হইয়াছে। তোমায় তাহা ক্ষমা করিতেই হইবে।

বন্ধু মহান্তি বিনয়ের খনি। তিনি নৃপতিকে বলিতে লাগিলেন,—মহারাজ! আমি অতি তুচ্ছ, অতি ঘৃণিত, সামান্য করণজাতি; আপনি এ মহাপাতকীকে স্পর্শ করিবে না স্পর্শ করিবেন না। মহারাজ! আমার মত অপরাধী জগতে আর নাই। আপনিই আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন; আপনার আবার অপরাধ কিসের? আমায় ছুঁইবেন না ছুঁইবেন না, ছাড়িয়া দিউন ছাড়িয়া দিউন।

মহারাজ কিন্তু কিছুতেই ছাড়িলেন না। তিনি অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া তাঁহাকে লইয়া গেলেন। তীর্থজলে স্নান করাইয়া বসনভূষণে ভূষিত করিলেন। দেউলের হিসাবরক্ষককার্য্যে নিয়োগসূচক তাঁহার মাথায় 'শাঢ়ী' বাঁধিয়া দিলেন। তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদিকে আনাইয়া নানাপ্রকারে সম্মানিত করিলেন। দেউলের দক্ষিণ পার্শ্বে বাসভবনের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। বাসনকোসন আসবাব-পত্র প্রভৃতিরও বন্দোবস্ত হইয়া গেল। যাহাতে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে উপাদেয় প্রসাদ পাইতে পারেন, নরনাথ তাহারও লিখিত আদেশ দান করিলেন। পরে বহুমান সহকারে বন্ধুকে শ্রীমন্দিরে প্রভুর সম্মুখে লইয়া গিয়া সর্ব্ববিধ দানের সমর্পণ-পত্র (দলিল) তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। নৃপতির মনের ভাব,—ঠাকুর! এই দেখ, তোমার সম্মুখেই তোমার আদেশ প্রতিপালন করিলাম, আর আমার অপরাধ নাই।

মহারাজ শ্রীজগবন্ধুকে প্রণাম করিয়া, বিনয়-বচনে বন্ধুর কাছে বিদায় লইয়া আপন ভবনে গমন করিলেন। ভক্তের প্রভাব ও

ভগবানের ভৃত্য-প্রীতি দর্শনে সকলেই ভক্ত ও ভগবানের জয় জয় করিতে লাগিলেন। মুখেমুখে চারিদিকে এই কথা প্রচার হইয়া পড়িল। কল্য যাহারা বন্ধুকে গালাগালি দিয়াছিল, প্রহার করিয়াছিল, দলেদলে তাহারা আসিয়া বন্ধু মহান্তির পদতলে পড়িতে লাগিল, ক্ষমা ভিক্ষা করিতে থাকিল। বন্ধু জোড়হস্তে মানা করিলেও তাহারা আর মানা মানে না, বন্ধুর চরণ ধরিয়াই তাহারা বারবার ক্ষমা-ভিক্ষা করিতে লাগিল। বন্ধু কিন্তু আপনাকে বড়ই অপরাধী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। অত লোকের সঙ্গে একা আর পারিয়া উঠিলেন না বলিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বলিতে কি, এই ব্যাপার দেখিয়া অনেক নাস্তিক-পাষণ্ডেরও প্রাণে আস্তিক্যবুদ্ধি আসিল; তাহাদের হৃদয়ও ভক্তিদেবীর অধিবাস-যোগ্য হইল।

বন্ধু! তোমার বন্ধু নাম সার্থক। তোমার পিতা-মাতা বোধ হয় সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন; তা না হ'লে তোমার বন্ধু নাম রাখিবেন কেন? ভগবান্ যাঁহাকে 'বন্ধু' বলিয়া সম্বোধন করেন, তাঁহার জীবন ধন্য। ভক্তবর! তোমার চরণে প্রণাম। এ জগতে আমরা কল্পনার দৃষ্টিতে অনেক বন্ধুই দেখিতে পাই, কিন্তু তুমিই যথার্থ বন্ধু দেখিয়াছিলে। যেমন তুমি, তোমার বন্ধুও তেমনই। কে ছোট, কে বড়, বুঝা ভার! দুঃখ-দারিদ্র্য দিয়া তিনি তোমাকে চিনাইয়াছেন। কতটা সহ্যগুণ, কতটা দৃঢ়তা হইলে যে তাঁহাকে বন্ধু করিতে পারা যায়, তাহা তিনি তোমাকে দিয়াই বুঝাইয়াছেন। আবার সামান্য একটু ঐকান্তিক ভাবের বিনিময়ে

তিনিও যে কতটা করুণা বিস্তার করিয়া থাকেন, বন্ধু! তাহা তো তুমিই দেখাইয়া দিলে। এ জগতের স্বার্থপর বন্ধু যে বন্ধু নয়—তিনিই যে একমাত্র বন্ধু, তাহা তো তুমিই চিনাইয়া দিলে? তাই বন্ধু! তোমার চরণে বারবার প্রণাম করি, আশীর্ব্বাদ কর, যেন কোন-না-কোন জনমে তোমার মত দুঃখের দহন সহন করিয়া তোমার বন্ধু সেই জগবন্ধুকে বন্ধু করিতে পারি,—"হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে!"—বলিয়া তাঁহার চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণপূর্ব্বক প্রণত হইতে পারি।

জগবন্ধু যাঁহার বন্ধু, তাঁহার আর অভাব কিসের, কষ্টই বা কিসের? বন্ধু মহান্তি পরম সুখে সপরিবারে সেই নীলাচলেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই অবধি জগবন্ধুর আয়ব্যয়-হিসাব-রক্ষার কার্য্য তাঁহার বংশীয়েরাই করিতে থাকিলেন।

রঘু অরক্ষিত।

কে বলিল এ সংসারে সুখ নাই? কে বলিল স্বর্গেই কেবল সুধা মিলে? কে বলিল মরজগতে অমরধামের পারিজাত-সৌরভ সুদুর্লভ? যাও—বঙ্গদেশে, হরিপুর সহরে—কৃষ্ণচন্দ্র মহাপাত্রের ভবনে, তোমার মনের সন্দেহ দূর হইয়া যাইবে। তাঁহার পত্নী কমলাকে যাইয়া জিজ্ঞাসা কর, তোমার প্রতি-কথার প্রত্যুত্তর তাঁহারই কাছে পাইতে পারিবে।

কৃষ্ণচন্দ্র মহাপাত্র একজন মহা ধনশালী ব্যক্তি। সংসারে তাঁহার কিছুরই অভাব নাই,—হস্তিশালায় হস্তী, অশ্বশালায় অশ্ব, দাস-দাসী নায়েব-নফর কিছুরই অভাব নাই, অথচ তাঁহার প্রাণে কি যেন কিসের অভাব সতত বর্ত্তমান। অতিথি-অভ্যাগতের কলকল রবে তাঁহার অতিথিশালা সর্ব্বদাই মুখরিত, ধূপ ধূনা গুগ্‌গুলের পবিত্র সৌরভে ও স্তুতিগীতির মঙ্গল ধ্বনিতে তাঁহার দেবালয় সকল সর্ব্বদা পরিপূরিত, সকলেরই মুখে তাঁহার প্রশংসা প্রচারিত, তথাপি তাঁহার প্রাণে যেন আকাশযোড়া অভাব আসর লইয়া বসিয়া আছে। একা তাঁহারই যে এই দশা, তাহা নয়; পত্নী কমলারও অবস্থা পতিরই অনুরূপ। কমলার অত যে রূপ, সেই কি-এক সামগ্রীর অভাবে সে রূপও যেন দিনদিন উপিয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে কিছুদিন যায়, বিধাতার ইচ্ছায়, দম্পতীর হৃদয়ের অভাব যেন কতকটা শান্ত হইয়া আসিল,—কমলার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল

দেখিতে-দেখিতে দশ মাস পূর্ণ হইয়া গেল। বহু ভাগ্যে আজ কমলা একটি পুত্র সন্তান লাভ করিয়াছেন। পতিপত্নীর এতদিনের প্রাণের অভাব আজ একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্র মহাপাত্র আজ দুই হাতে করিয়া ধনরত্ন বিলাইতেছেন। আনন্দবাদ্যে ও দাতার জয়জয়রবে গৃহপ্রাঙ্গণ ভরিয়া গিয়াছে। আর কমলমুখী কমলা সদ্যোজাত শিশুকে কোলে লইয়া তাহার মুখচন্দ্র বারবার দেখিতেছেন, আর মনেমনে বলিতেছেন,—কে বলিল, এ সংসারে সুখ নাই? আজ আমাদের মত সুখী কে? কে বলিল, স্বর্গেই কেবল সুধা মিলে? আহা, সুধা যে আমার শিশুর বিম্বাধরেই উছলিয়া পড়িতেছে। কে বলিল, মর-জগতে অমরধামের পারিজাত-সৌরভ সুদুর্ল্লভ? আমার বাছার অঙ্গগন্ধের কাছে ছার সে পারিজাতের সুগন্ধ।

পিতামাতার সোহাগের শিশু দেখিতেদেখিতে পঞ্চম মাস অতিক্রম করিল। মহা সমারোহে তাহার নামকরণ ও অন্নপ্রাশন হইয়া গেল। কুলপুরোহিতের নিদেশক্রমে শিশুর নাম হইল—রঘুনাথ। একজন জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত আসিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে বলিয়া গেলেন,—মহাপাত্র! তোমার পুত্রটীর ভক্ত-অংশে জন্ম; কালে এ একজন মহাজন হইবে; দেখো যেন ইহার অযত্ন না হয়। অযত্ন হইবে? পিতামাতার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম পুত্রের অযত্ন হইবে, ইহা কি কখনও হইতে পারে? তথাপি ঐ দিন হইতে পিতামাতার আরও যেন একটু সতর্ক দৃষ্টি পুত্রের উপর পড়িল। ক্রমে-ক্রমে রঘুনাথ হামাগুড়ি দিতে, তার পর আলগোছা দাঁড়াইতে, তার পর চলিচলি

পা-পা করিয়া দু'চার পা চলিতে শিখিল। অল্পদিনের মধ্যেই দৌড়া-দৌড়ি করিয়া বেড়াইতেও শিখিয়া ফেলিল। আর রক্ষা নাই, রঘুনাথ আর বাড়ীতে থাকে না; একটু ফাঁক পাইলেই একদৌড়ে ঠাকুরবাড়ী চলিয়া যায়। তথায় যাইলে তাহার আনন্দ যেন শতগুণ বাড়িয়া উঠে। সে কখনও ঠাকুরের সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণাম করে, কখনও তুলসীমঞ্চের চারিদিকে ঘুরিয়াঘুরিয়া বেড়ায়, আবার কখনও বা দুবাহু তুলিয়া হরিসঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য জুড়িয়া দেয়। শিশুর খেলা দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকে, আর পরস্পর বলাবলি করে,—বাঁচে তো এ ছেলেটা একজন যথার্থ ভক্ত হইবে।

এইরূপে কিছুদিন যায়, রঘুনাথ আর এখন বালক নাই, সে ষোড়শ বর্ষ অতিক্রম করিয়া সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। তাহার অঙ্গে অঙ্গে আদ্য যৌবনের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। এক-দিন কমলা স্বামীর কাছে পুত্রের শুভবিবাহের প্রস্তাব করিলেন। স্বামীও পরমানন্দে তাহাতে সম্মতি দিলেন এবং একটি পরমাসুন্দরী কন্যার জন্য দেশেদেশে ঘটক প্রেরণ করিলেন। কত দেশে কত পাত্রীই দেখা হইল, কিন্তু ঠিক মনের মত আর হয় না; অবশেষে মধ্যবাঙ্গালার কলাবতীপুরে গঙ্গাধর করণের কন্যা অন্নপূর্ণাই সকলের পসন্দসই হইল।

গঙ্গাধর করণ গুণবান্ বলিয়া বিখ্যাত না হইলেও কুবেরের মত ধনবান্ বলিয়াই বিখ্যাত। তাঁহার উপর্য্যুপরি সাতটী পুত্র, তাহার পর সবে মাত্র এই একটি কন্যা। অন্নপূর্ণা বাপমার বড়ই আদরের মেয়ে। রঘুনাথ যেমন সর্ব্বগুণান্বিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পাত্র, অন্নপূর্ণাও

তাহার সর্ব্বাংশে উপযুক্ত পাত্রী। উভয় পক্ষের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেল, বিবাহের দিন-লগ্নও অবধারিত হইল। শুভবিবাহের অন্তত একমাস পূর্ব্ব হইতে কৃষ্ণচন্দ্র ও গঙ্গাধরের ভবনে আনন্দোৎসব আরম্ভ হইয়া গেল। নাচ গান বাজনা বাজিপোড়ানা প্রভৃতি আমোদপ্রমোদ পুরাদমে চলিতে লাগিল। দীয়তাং ভুজ্যতাং রবের তো আর বিরামই নাই। নিরূপিত দিনে শুভবিবাহও সম্পন্ন হইয়া গেল। রঘুনাথ অন্নপূর্ণাকে লইয়া গৃহে আসিল। বধূর মুখ দেখিয়া কমলার আর আনন্দ ধরে না। তিনি পুরন্ধ্রীগণের উলুউলু মঙ্গলধ্বনির মাঝে বরকন্যা বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের গৃহ একা কমলার রূপের আলোকেই এতদিন আলোকিত ছিল, আজ আবার অন্নপূর্ণার রূপের আলোকে অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

হইল সব,— সংসারী লোকে যাহা চায়—পুত্র পুত্রবধূ হইল সব, কিন্তু ভাগ্য তো কাহারও হাতধরা নয়, কৃষ্ণচন্দ্রের অদৃষ্টচক্রের কেমন আকস্মিক পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। এত সুখ তাঁহার কপালে সহিল না। কয়েক বৎসর অজন্মায় জমিদারীতে শস্য ভাল জন্মায় নাই, প্রজাদের কাছে খাজনা আদায় হয় না, তাহার উপর তাঁহার দয়ার শরীর, পীড়ন করিয়া খাজনা আদায় দূরে থাকুক, বরং প্রজাবর্গের দুঃখ দেখিয়া তিনি অবিশ্রান্ত ঘর হইতে তাহাদের শস্য অর্থ জোগাইতে লাগিলেন। এইরূপে দেখিতেদেখিতে তিনি ক্ষীণবিত্ত হইয়া পড়িলেন। দেশের জমিদার বা রাজাই তিনি। মানসম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য ব্যয়সংক্ষেপও করিতে পারেন না। কাজে-

কাজেই তাঁহাকে ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িতে হইল। ঋণের মত পাপ নাই। সেই মহাপাপ কৃষ্ণচন্দ্রের পুণ্যের সংসার অল্পদিনেই ছারখার করিয়া দিল। অবিশ্রান্ত দুশ্চিন্তায় কৃষ্ণচন্দ্রের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। নানা ব্যাধি আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিল। মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া তিনি পুত্র রঘুনাথকে নিকটে ডাকিলেন, তাহার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া কাতরস্বরে বলিলেন,—"বাবা! আমি চলিলাম, আমার একটি কথা রাখিও, যতক্ষণ পারিবে ঋণ পরিশোধ করিবে, দেখো যেন কাহাকেও ফাঁকি দিবার কথা কথনও প্রাণে না জাগিয়া উঠে; ভগবান্ তোমার মঙ্গল করিবেন।" কৃষ্ণচন্দ্র এই বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। পতিব্রতা কমলা পুত্রের নিকটে বিদায় লইয়া পতির সহগমন করিলেন। রঘুনাথের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার অবস্থা ভাবিলেও কষ্ট হয়। আহা! তাহার মাতাপিতার শোক অনুভব করাও কঠিন হইয়া পড়িল,—পাষাণহৃদয় পাওনাদারেরা তাহার গাত্রের মাংস ছিড়িয়া খাইতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা বড়লোকের আদরের মেয়ে। প্রায় পিত্রালয়েই থাকে। তাহার পিতা বা ভ্রাতৃগণ অত্যন্ত কৃপণ-স্বভাব। তাঁহারা লোক-পরম্পরায় রঘুনাথের অবস্থা শুনিয়াও শুনিলেন না। রঘুনাথও সহজ ছেলে নহে, সে তাঁহাদের অপেক্ষা আরও অনেক গুণে বড়-লোকের খবর রাখিয়া থাকে, তাই সাহায্যভিক্ষার জন্য শ্বশুরবাড়ীর দ্বারের ত্রিসীমাও মাড়াইল না। যাহা কিছু বিষয় বৈভব ছিল, তাহা দিয়া পিতার ঋণ পরিশোধ করিল। শ্বশুরবাড়ী হইতে যাহা যৌতুক-স্বরূপ পাইয়াছিল, তাহা পুরোহিতের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক দেবসেবার

বন্দোবস্ত করিয়া দিল এবং স্বয়ং ছিন্ন কন্থা ও কৌপীন সম্বল করিয়া গৃহের বাহির হইয়া পড়িল।

বিধাতারই লীলা। একটি বৃক্ষে দুইটী ফুল ফুটিতেছিল। আর অমনি কোথা হইতে দুরন্ত কালকাট আসিয়া তাহাদের বৃন্তে বাসা করিল। আহা! তাহাদের ভাল করিয়া ফুটিতেও দিল না; তাহারা অল্পবিস্তর সুষমা ছড়াইয়া, অল্পবিস্তর সৌরভ বিলাইয়া শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িল। এইবার রঘুনাথ! তোমার ফুটিবার দিন আসিয়াছে, তুমি ফোট। তুমি ভগবানের ভক্ত—পদ্মজাতীয় পুষ্প; দুঃখ-দারিদ্র্যের প্রচণ্ড তপনতাপেই তোমায় ফুটিতে হইবে; তুমি প্রস্ফুটিত হও! তোমার ঐ ছিন্ন মলিন বস্ত্রেই শৈবাল-সংবৃত পঙ্কজেরই মত তোমার শোভা শতগুণ বর্দ্ধিত হইবে,—তোমার ভক্তি-সৌরভে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া যাইবে। তোমার ফুটিবার দিন আসিয়াছে, ফোট রঘুনাথ! তুমি ফোট!

রঘুনাথ গ্রামেগ্রামে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কষ্টের আর অবধি নাই। বড়লোকের ছেলে। দুঃখ কাহাকে বলে জানিতেন না। একেবারে এত কষ্ট সহিবে কেন? একদিন গভীর রাত্রে এক বৃক্ষতলে বসিয়া রঘুনাথ মনেমনে বিচার করিতে লাগিলেন,—আমি এইরূপ গ্রামেগ্রামে অকারণ ঘুরিয়া বেড়াই কেন? কেবল পশুর মত আহার-নিদ্রাতেই বা লাভ কি? তাহার অপেক্ষা এক কাজ করা যাউক,—কোন পুণ্যক্ষেত্রে চলিয়া যাই, আর সেইখানেই ভগবানের নাম লইয়া জীবন যাপন করি। তাই বা যাই কোথায়? শুনিয়াছি,—

"সকল জীবের করতা। ভগতি-মুকতির দাতা॥
কমলাদেবী-প্রাণপতি। দীনবান্ধব জগজ্জ্যোতি॥
বিজয় শ্রীনীলকন্দর। কম্বু-রথাঙ্গ ধরি কর॥"

যিনি সকল জীবের কর্ত্তা, ভক্তি ও মুক্তির দাতা, যিনি কমলা-দেবীর প্রাণপতি, দীনের বন্ধু ও জগতের জ্যোতিঃস্বরূপ, তিনি শঙ্খ চক্র ধারণ করিয়া শ্রীনীলাচলে বিরাজ করিতেছেন। ভাল, সেইখানে চলিয়া যাই। সেই প্রভুর সম্মুখে যাইয়া সকল দুঃখ-ক্লেশের কথা বলি। তার-পর যাহা করিবার তিনিই করিবেন। আর কিছু না হউক, সাক্ষাৎ কৈবল্যস্বরূপ মহাপ্রসাদ ভোজন তো ভাগ্যে ঘটিবে? যদি তাহাই না-ই জুটে—অনশনেই মরি, তাহাতেও ত দুঃখ নাই; সেই মহাপুণ্যক্ষেত্রে মরিলেও ত পবিত্র হইব? এই পরামর্শই ভাল। বলিয়া রঘুনাথ নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অল্পদিনেই তথায় যাইয়া পঁহুছিলেন এবং শ্রীজগবন্ধুর মুখপদ্ম দর্শন করিরা কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—

"পিতা-জননী দুঁহে মলে। মোতে অনাথ করি গলে॥
এণুটি রঘু অরক্ষিত। তো পাদে শরণ বাঞ্ছিত॥
ভো প্রভু যাহা ইচ্ছা কর। কিনিলা দাস মুহিঁ তোর॥"

প্রভু হে! আমার পিতামাতা দুইজনেই মরিয়াছেন,—আমাকে অনাথ করিয়া গিয়াছেন। আজ রঘু 'অরক্ষিত'—রক্ষকহীন হইয়া পড়িয়াছে। তাই ইচ্ছা হয় প্রভু! তোমার পাদপদ্মেই শরণ গ্রহণ করি। আমার ইচ্ছা হইলেই বা কি হইবে? তোমার ইচ্ছাই তো ইচ্ছা? এখন তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। কেবল জানিয়া রাখিও, আমি তোমার ক্রীত-কিঙ্কর।

রঘুনাথ যেন দেখিতে পাইলেন, শ্রীপ্রভু পদ্মহস্ত তুলিয়া বলিতেছেন,—"রঘু! তোমার ভয় নাই, ভয় নাই, তুমি এইখানেই মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়া পরমানন্দে বিচরণ কর, আমি তোমায় ভৃত্য-বলিয়া স্বীকার করিলাম।" তিনি প্রভুর আশ্বাসবাণী শিরোধার্য্য করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। কোন দিন কোন বৈষ্ণবের গৃহে, কিংবা কোন দিন কোন মঠধারীর মন্দিরে, যেদিন যেখানে জোটে মহাপ্রসাদ ভোজন, আর যখন তখন প্রভুর পদ্মমুখ দর্শন, ইহাই হইল তাঁহার একমাত্র কার্য্য। বলিতে কি, রঘুনাথের প্রাণে এখন এতই আনন্দ যে, তাঁর আর পূর্ব্বের কথা কিছুই মনে পড়ে না—অন্নপূর্ণার সদা-প্রফুল্ল মুখকমলও একবার মনোমধ্যে জাগিয়া উঠে না।

এইরূপে কিছুদিন যায়, রঘুনাথের শ্বশুরালয়ে এই কথা প্রচার হইয়া পড়িল। একদিন গঙ্গাধর করণ স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া এ বিষয়ে এক পরামর্শসভা বসাইলেন। প্রথমেই তিনি বলিলেন;—ছিছি লজ্জার কথা লজ্জার কথা, হাড়হাবাতে জামাইটে কি না জগন্নাথে গিয়ে ভিক্ষে মেগে বেড়াচ্ছে? অতটা বিষয়-বৈভব, হতভাগা কি না সব নষ্ট ক'রে ফেল্লে? ওঃ, বাপের দেনা? বাপের দেনা তো তোর কিরে বাপু? আমি যে যৌতুকে অত ধনরত্ন দিয়েছিলাম, লক্ষ্মীছাড়া সেগুলো চুলোর দোরে দিয়ে পথের ভিখারী হোলো? হায় হায়, মাথা যতদূর হেঁট হবার তা হ'য়েছে। আর না আর না, আর তার নামও কেহ মুখে এনো না; এখন এক কার্য্য কর, অন্নপূর্ণার আবার বিবাহের আয়োজন কর। মনে কর যে, তার বিবাহ হয়ই

নাই। আহা, হতচ্ছাড়া জামাইটে বাপ খেয়েছে, মা খেয়েছে, বাড়ী-ঘর-দোর, টাকা কড়ি সব খেয়েছে, তার হাতে প'ড়লে কি মা আমার আর বাঁচবে? সে তা হ'লে মাকেও আমার টপ্ ক'রে খেয়ে ফেল্‌বে। না, না, তার নাম আর মুখে এনো না, মুখে এনো না, অন্নপূর্ণার নূতন বরেরই আয়োজন কর। আহা, মার আমার মলিন মুখ দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।

যেমন গুণধর গঙ্গাধর, তাহার স্ত্রীপুত্রেরাও তেমনই। গঙ্গাধরের মতেই সকলে সম্মতি দিলেন। আশ্চর্য্য! একথা কাহারও মুখ হইতে বাহির হইল না যে, ভাল, রঘুনাথকে আবার কিছু টাকাকড়ি দিয়া বাড়ী ঘর দোর করাইয়া কাছেই রাখা হউক না কেন? অধাৰ্ম্মিক কৃপণ করণ-পরিবার বিবাহিতা কন্যার বর খুঁজিতেই ব্যস্ত হইলেন। পাত্র পাইতেও বড় বিলম্ব হইল না। সেই রাজ্যের রাজমন্ত্রী; নাম বসু মহাপাত্র; তাঁহার পুত্রের সহিত অন্নপূর্ণার বিবাহ স্থির হইয়া গেল। মন্ত্রিপুত্র যার-পর-নাই দুর্ব্বৃত্ত ও অধাৰ্ম্মিকের অগ্রগণ্য। তাহার উপর অন্নপূর্ণার রূপজ মোহে সে এতই অভিভূত যে, বিবাহিতা কন্যার পাণিগ্রহণে একটুও ইতস্ততঃ করিল না। গঙ্গাধরও মন্ত্রিপুত্র উভয়েই ধনবান্ ব্যক্তি, সুতরাং তাঁহাদের কার্য্যে দেশের লোকেও কেহ প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইলেন না। জ্যোতিষী আসিয়া বিবাহের দিনও স্থির করিলেন, আগামী ফাল্গুনমাসের শুক্লাপঞ্চমীর দিন শুভ লগ্নে শুভ বিবাহ হইবে।

অন্নপূর্ণা সকলই শুনিতেছেন। তিনি আর তখন নিতান্ত

বালিকা নহেন; তাঁহার বয়স পঞ্চদশ পার হইয়া গিয়াছে। ব্যাপার বুঝিয়া তিনি নিতান্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কেবল ভাবেন,—হা ভগবন্! এ আবার কি করিলে?

"মো প্রাণনাথ থাউঁ থাউঁ। বিভা করিবে মোতে আউ॥
মুঁ পুনি ধরি এ শরীর। বদন চাহিঁবি কাহার?॥"

হায় প্রভু! একি অসম্ভব কথা; আমার প্রাণনাথ জীবিত থাকিতে-থাকিতে আমাকে আবার অন্যে আসিয়া বিবাহ করিবে? হা ঠাকুর! এ শরীর তো আর আমার নয়, আমি যে তাঁহারই চরণে সমস্ত সমর্পণ করিয়াছি; তবে এ শরীর ধরিয়া আবার অন্য কাহার বদন নিরীক্ষণ করিতে যাইব? হে প্রভু! তুমি বিপন্ন গজেন্দ্রকে উদ্ধার করিয়াছিলে, হে প্রভু! তুমি সতী দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলে। তুমি সর্ব্বান্তর্য্যামী, তোমায় আর আমি অধিক কি জানাইব, আমার বিপদ্ ত তুমি সকলই জানিতেছ। আমি সতী,—দ্বিচারিণী নহি: আমাকেও এই আসন্ন বিপদ্ হইতে উদ্ধার কর প্রভু! উদ্ধার কর।

অন্নপূর্ণা দিবানিশি কেবল ভগবানের কাছে এইরূপ প্রার্থনা করেন, আর বিরলে বসিয়া কাঁদেন। আহার-নিদ্রা হাস্য-পরিহাস কিছুই ভাল লাগে না। কাহারও কাছে বড় একটা যানও না। বাটীর পুরাতন পরিচারিকা,—সে-ই শৈশবে অন্নপূর্ণাকে মানুষ করিয়াছিল; অন্নপূর্ণা কেবল তাহারই কাছে আপন দুঃখের কথা বলিয়া থাকেন। দাসীকে তিনি সদাই বলেন,—ধাই মা! এ দেশের কি কেউ নীলাচলে যায় না? তা'হলে তাহারই হাতে পত্র

দিয়া পতিকে বিপত্তির কথা জানাই ; আর তিনি আসিয়া আমাকে এই বিষম বিপদ হইতে উদ্ধার করেন ?

দাসীও সংবাদ রাখে। একদিন সে আসিয়া বলিল, মা অনো! ওই ওপাড়ার কয়েকজন জগন্নাথ দর্শনে যাইতেছেন, পত্র দাও তো শীঘ্র দাও. আমি তাঁদের দিয়া আসি। অন্নপূর্ণাও আনন্দমনে তাড়াতাড়ি একখানা পত্র লিখিলেন,—

"বোইলা—আহে প্রাণেশ্বর। মুঁ যেবে দাসীটি তুম্ভর ॥
আসন্তা ফাগুন মাসরে। শুকলপক্ষ পঞ্চমীরে ॥
এ রাজ্য-পাত্রকুমরকু। বিভা করিবে মোকে তাকু ॥
এথকু চাহিঁ বেগে আস। মোঠারে অছি যেবে আশ ॥
আস না-আস তুম্ভ মন। মুঁ এবে গণু অছি দিন ॥
যেবে এ কণ্ট পরিযন্তে। দেখা ন দেব তুম্ভে মোতে ॥
প্রাণ চ্ছাড়িবি আত্মাঘাতে। লাগিব স্তিরীহত্যা তোতে ॥"

ওহে প্রাণেশ্বর! আমি তোমার শ্রীচরণের দাসী। আমার বিপদ্ শুন। আগামী ফাল্গুনমাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমীতে এই রাজ্যের মন্ত্রিপুত্র আমাকে আবার বিবাহ করিবে, স্থির হইয়াছে। যদি দাসীর আশা থাকে তো আর বিলম্ব করিও না, সত্বর চলিয়া আইস। অবশ্য আসা না-আসা তোমারই ইচ্ছা, আমি কিন্তু দিন গণনায় নিযুক্ত রহিলাম। ঐ নিরূপিত সময় পর্য্যন্ত আমি অপেক্ষা করিব ; যদি তাহার মধ্যে তুমি আসিয়া দেখা না দাও, তাহা হইলে আমি আত্মঘাতে প্রাণত্যাগ করিব। মনে রাখিও, এই স্ত্রীহত্যা-পাপে তোমাকেই লিপ্ত হইতে হইবে।

অন্নপূর্ণা পত্রখানি মুড়িয়া দাসীর হস্তে দিয়া বলিয়া দিলেন,—ধাই মা, 'আমার অনেক অনুনয়-বিনয় জানাইয়া তাঁদের বোলো যে, আমার স্বামী শ্রীক্ষেত্রে আছেন, তথায় সকলে তাঁকে 'রঘু অরক্ষিত' বলিয়াই জানে। তিনি তথায় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া জীবন ধারণ করেন। পত্রখানি তাঁহারই হস্তে দিতে হইবে। ধাই মা! তাঁদের হাতে ধ'রে আরও বোলো যে তাঁদের অনুগ্রহেই আমি জীবন দান পাইব, আর অনন্তকোটি জীবনেও আমি তাঁদের এ ঋণ কিছুতেই পরিশোধ করিতে পারিব না, তাঁদের ঋণে আমি চির-আবদ্ধ রহিব।

দাসী পত্র লইয়া চলিয়া গেল। তাঁহাদের কাছে গিয়া বিনয়-বচনে সকল কথাই বলিল। তাঁহারাও অন্নপূর্ণার দুঃখে দুঃখী; আগ্রহ করিয়াই পত্রখানি লইয়া নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কতকদিন পরে মাঘমাসের শেষা-শেষি তাঁহারা শ্রীধামে আসিয়া শ্রীপ্রভুর চন্দ্রমুখ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। তাঁহারা একটি বাসা ভাড়া করিয়া কিছু দিন তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভিখারী দেখিলেই তত্ত্ব করেন যে, এই সেই রঘু অরক্ষিত কি না? কিছুদিন যায়, হঠাৎ একদিন সিংহদ্বারের সম্মুখে তাঁহাদের সহিত রঘু অরক্ষিতের দেখা হইল। নাম-ধাম প্রভৃতির পরিচয় লইয়া তাঁহারা বুঝিলেন যে, হাঁ, এই ব্যক্তিই অন্নপূর্ণার স্বামী রঘুনাথ বটে। তাঁহারা তাঁহাকে বাসায় সঙ্গে করিয়া আনিলেন, আদর পূর্ব্বক মহাপ্রসাদ ভোজন করাইলেন এবং অন্নপূর্ণার পত্রখানি তাঁহার হস্তে দান করিলেন। রঘুও পত্রখানি আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া অতিমাত্র চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। হাত গণিয়া

হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, ফাল্গুন-শুক্লাপঞ্চমীর মাত্র দশটি দিন বাকী আছে। মাসেকের পথ, ইহার মধ্যে যাওয়া যায় কি প্রকারে? না গেলেও ত বিষম বিপদ্; সতী নিশ্চয়ই আত্মঘাতী হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে। অহো কি কষ্ট, দুরন্ত স্ত্রীহত্যা-পাতকে আমায় অনন্তকাল নরকযাতনা ভোগ করিতে হইবে? হা জগন্নাথ! ভবের কাণ্ডারী তুমি ভিন্ন এ দুস্তর চিন্তার সাগর কে আমায় পার করিয়া দিবে?

এইরূপ চিন্তার তাড়নায় কাতর হইয়া রঘুনাথ তাঁহার চিন্তামণি জগন্নাথের সম্মুখে গমন করিলেন। তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কপালে যুগল কর রাখিয়া বলিতে লাগিলেন,—

" বোইলা—নমো চক্রপাণি। চিন্তার্থিজন-চিন্তামণি॥
নমস্তে বাঞ্ছাকল্পতরু। কৃপাসমুদ্র মহামেরু॥
ভৃত্যকামনা-কামধেনু। ঘোর-বিপত্তি-তম-ভানু॥
মোর সঙ্কট নিবারণ। তুম্ভহুঁ—নাহিঁ অন্য জন॥"

সর্ব্বান্তর্য্যামিন্! তুমি তো সকলই জানিতেছ;—তোমা বই আর আমার কে আছে? এখন তুমি আমার সহায় স্বপক্ষ না হইলে কে আমায় রক্ষা করিবে বল?

এইরূপ কত কথা বলিয়া-কহিয়া রঘুনাথ তথা হইতে চলিয়া গেলেন এবং সিংহদ্বারের পার্শ্বে একস্থানে ছেঁড়া চট বিছাইয়া শয়ন করিলেন। তিনি মনেমনে শরণাগতবৎসল ভগবানের ভাবনা করিতে-করিতেই ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। জগন্নাথ তাহা জানিলেন, সেবকের ব্যথায় বড়ই ব্যথিত হইয়া পড়িলেন

এবং অধিক রাত্রে বেতালকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন,—বেতাল! যাও, শীঘ্র যাও; সিংহদ্বারে আমার পরম ভক্ত রঘুনাথ শয়ন করিয়া রহিয়াছে, তাহাকে শীঘ্র কলাবতীপুরে গঙ্গাধর করণের দ্বারে রাখিয়া এস। খুব সাবধানে লইয়া যাইও, দেখো যেন তাহার নিদ্রা ভঙ্গ না হয়, কেহ বহিয়া লইয়া যাইতেছে, এ কথা যেন সে জানিতেও না পারে। যাও, শীঘ্র যাও, আর বিলম্ব করিও না।

বেতাল 'তথাস্তু' বলিয়া, তখনি তথা হইতে চলিয়া গেল এবং রঘুনাথকে মায়াপালঙ্কে শয়ন করাইয়া শূন্যপথে হু-হু করিয়া লইয়া চলিল। চক্ষের নিমেষ না পড়িতে পড়িতে বেতাল তাঁহাকে কলাবতী-পুরে শ্বশুরবাটির দ্বারে শোয়াইয়া রাখিয়া জগবন্ধুর সমীপে ফিরিয়া আসিল এবং সকল কথা বলিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

এদিকে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গেসঙ্গেই রঘুনাথের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। চাহিয়া দেখেন,—এ আবার কোথায় আসিলাম? কই, সিংহদ্বার তো দেখিতেছি না? নীলাচলের অন্য কোন স্থান বলিয়াও তো বোধ হইতেছে না, এযে অন্য কোন দেশে আসিয়াছি দেখিতেছি? এ দেশের নাম কি? এই সম্মুখের বাড়ীই বা কাহার? সেখান থেকে এখানে আমায় আনিলই বা কে? এ তো বড় বিপরীত ব্যাপারই দেখিতেছি; কাহাকেই বা এসব কথা জিজ্ঞাসা করি?

রঘুনাথ মনেমনে এইরূপ নানা তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। বিবাহের পরে আর বড় একটা আসা হয় নাই বলিয়া তিনি চিনিতেও পারিলেন না যে,—ইহাই আমার শ্বশুরবাড়ী। একটু বেলা হইলে পথে লোকজনের চলাচলি আরম্ভ হইল। রঘুনাথ একে ওকে

জিজ্ঞাসা করেন,—হাঁগা, এদেশের নাম কি?—সম্মুখে এ প্রকাণ্ড অট্টালিকাই বা কাহার? সকলেই বলিল—এ কলাবতীপুর; আর এই বাড়ী গঙ্গাধর করণের। শুনিয়াই রঘুনাথ ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নয়ন হইতে দরদর অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কেবলই ভাবেন,—এ খেলা তোমারই প্রভু, তোমারই খেলা। আহা, আমার দারুণ বেদনা তোমার করুণ হৃদয়ে যাইয়া আঘাত করিয়াছে, তাই তুমি আমায় মায়া করিয়া এথায় পাঠাইয়া দিয়াছ। আহা ঠাকুর! এই খেলা অন্যের পক্ষে অসাধ্য হইতে পারে, কিন্তু তোমার আবার এ একটা কার্য্যই বা কি?

"ব্রহ্মাণ্ড যার খেলঘর। এ কথা কেতেক মাতর?"

এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড বিরাট-বিগ্রহ তোমার খেলার ঘর বই তো নয়; ইহাতে তুমি যেখানে-যেখানে খেলার পুতুল আমাদের লইয়া যে খেলা ইচ্ছা সেই খেলাই খেলিতে পার, তাহাতে আর কথাটা কি আছে?

রঘুনাথ আপনহারা হইয়া প্রভুর উদ্দেশে প্রাণেপ্রাণে এইরূপ কত কি বলিতেছেন, এমন সময় তাঁহার দুই-চারিজন শ্যালক বাটীর বাহিরে আসিলেন এবং দূর হইতেই রঘুনাথকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন। অমনি তাঁহারা তাড়াতাড়ি বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া মাতাপিতা ও অন্যান্য ভ্রাতাকে রঘু অরক্ষিতের আগমনবার্ত্তা জানাইলেন। সকলেই শশব্যস্তে বাটীর বাহিরে আসিয়া দেখেন যে, হাঁ, ছেঁড়া নেকড়াপরা সে-ই তো বটে। দেখিয়া অন্নপূর্ণার বড় আনন্দ হইল। তিনি মনেমনে ভগবান্‌কে শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন,

কিন্তু আর সকলের মুখ শুকাইয়া গেল, তাঁহারা ভাবেন—এ আপদ্ আবার কোথা হইতে আসিয়া জুটিল। যাহাই হউক, লোক-লজ্জার খাতিরে সকলে রঘুনাথকে বাটীর মধ্যে ডাকিয়া লইয়া গেলেন এবং ভৃত্যদ্বারা তৈলমর্দ্দন করাইয়া স্নান-মার্জ্জন করাইলেন। দিব্য বসনভূষণে ভূষিত করাও হইয়া গেল। সত্বর ভোজনের আয়োজন হইল। রঘুনাথ জগন্নাথকে অন্ন নিবেদন করিয়া ভোজনে বসিলেন। শ্যালকগণের কৃত্রিম হাস্যপরিহাসের সহিতই আহার শেষ হইয়া গেল। শ্বশুড় শ্বাশুড়ী ও শ্যালকগণ হৃদয়ে হলাহল রাখিয়া রঘুর চারিদিক্ ঘেরিয়া বসিয়া মুখে মিষ্টকথার অমৃতবর্ষণ করিতে লাগিলেন। জামাই-আদরের যেন আর সীমা পরিসীমা নাই। কিছুক্ষণ পরে 'একটু বিশ্রাম কর' বলিয়া সকলে চলিয়া গেলেন।

রঘুনাথ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিলেন। ব্রীড়াবনতা পতিব্রতা অন্নপূর্ণা ধীরে-ধীরে আসিয়া পতির পদতলে বসিলেন এবং কোমল-করে মৃদুমৃদু পাদসংবাহন করিতে লাগিলেন। কত কথাই সতীর মনে আসিল, কত কথাই বলিব-বলিব মনে হইল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া একটি কথাও বাহির হইল না, মনেই সকল কথা লয় পাইয়া গেল। রঘুনাথের দশাও ঠিক তাহাই হইল; তিনিও তাঁহাকে একটি কথাও কহিতে পারিলেন না। তবে কি দুজনে কোন কথাই হইল না? হইল বই কি। কথা হইল, ছলছল নেত্রের কলকল ভাষায়। দুই জনেরই পলকহীন নয়ন দিয়া প্রেমের জল গড়াইয়া পড়িল;—দুইজনেরই তাপিত প্রাণ শীতল হইয়া গেল।

এদিকে নীরবতার সুরবাহারে অশ্রুরেখার কোমল তারে

দম্পতীর মিলনগীতির আলাপ হইতে থাকিল, ওদিকে পিশাচপ্রকৃতি করণপরিবার নয়টি জিহ্বাযন্ত্র একস্বুরে বাঁধিয়া দম্পতীর চিরবিচ্ছেদের বজ্ররাগিণীর আলাপ জুড়িয়া দিলেন। এক নিভৃত কক্ষে বসিয়া গঙ্গাধর, তাঁহার স্ত্রী ও সপ্ত পুত্র পরামর্শ আঁটিলেন,—আজই রাত্রে বিষপ্রয়োগে রঘুনাথের প্রাণসংহার করিতে হইবে। অন্নপূর্ণার জন্য তো কিছু ভাবনা নাই, রঘুনাথ মরিলে সে তো আর অনাথা হই-তেছে না? মন্ত্রীপুত্রের সহিত বিবাহ হইলেই তাহার সুখসম্পদ্ ষোল কলায় পরিপূর্ণ হইবে।

যেমন পরামর্শ অমনি কাজ। গোপনে-গোপনে বিষ সংগ্রহ করা হইল। বন্দোবস্ত হইল,—খাদ্যদ্রব্যে বিষ মিশাইতে হইবে। সন্ধ্যা হইল। আহার্য্য প্রস্তুতেরও আয়োজন হইতে লাগিল। পাপাশয়া গঙ্গাধর-জায়াই বিষ মিশাইয়া-মিশাইয়া অন্নব্যঞ্জন পিষ্টক-পায়সাদি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। মাতাপিতা ও ভ্রাতার গুপ্ত পরামর্শ ও চুপিচুপি কথাবার্ত্তায় চতুরা অন্নপূর্ণার মনে কেমন সন্দেহ জন্মিল। তিনি রন্ধনকার্য্যে জননীর সাহায্য করিবার অছিলায় রন্ধনশালায় আসিলেন। মাতা অমনি বলিয়া উঠিলেন,—না মা, আজ আর তোমার কাজকর্ম্ম কিছুই করিবার দরকার নাই, কত-দিনের পর জামাই এসেছেন, যাও না তাঁহারই সেবা করগে। মাতার বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও অন্নপূর্ণা "একটু থাকি একটু থাকি" বলিয়া তথা হইতে নড়িলেন না। ব্যাপার বুঝিতে তাঁহার বড় বিলম্ব হইল না। বুদ্ধিমতী আঁচে-ওঁচেই সকল ব্যাপার বুঝিয়া ফেলিলেন। দুরন্ত চিন্তায় তাঁহার হৃদয় দুরুদুরু কাঁপিতে লাগিল।

ভাবিলেন, যাই, পতির কাছে সকল কথা বলিয়া সাবধান করিয়া দিই। কথা হইতে যাইবার জন্য তাঁহাকে আর কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে হইল না। মাতার ঘনঘন অনুরোধেই তাঁহাকে সে স্থান ত্যাগ করিতে হইল। গৃহে আসিয়া দেখেন, পতি বাহিরবাটীতে গিয়াছেন। অন্নপূর্ণার বড় চিন্তা হইল,—এখন করা যায় কি, কি উপায়ে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিই? কি প্রকারেই বা তাঁহার জীবন রক্ষা করি?

অনেকক্ষণ চিন্তার পর অন্নপূর্ণা স্থির করিলেন, এক কার্য্য করা যাউক, একখানি পত্র লিখি, কোন সুযোগে সেখানি পিষ্টকের মধ্যে রাখিয়া দিই। শ্বশুরবাড়ী থাকিবার সময় দেখিয়াছি, তিনি পিষ্টক বড় ভালবাসেন। অগ্রে পিষ্ট্ক খাইতে গেলেই পত্রখানি তাঁহার নজরে পড়িবে, আর অমনি তিনি সাবধান হইয়া যাইবেন; বিষ-মিশ্রিত অন্ন আর ভোজনই করিবেন না। অন্নপূর্ণা তাহাই করি-লেন, শ্রীহরি স্মরণ করিয়া এক টুক্‌রা তালপত্রে মাত্র দুইটী ছত্র লিখিলেন,—

"বিষ যে ভরিচ্ছন্তি এথে। ভুঞ্জিব নাহিঁ কদাচিতে॥"

তারপর তিনি তাড়াতাড়ি রন্ধনশালায় গিয়া দেখেন যে, রন্ধনের কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে, সুবর্ণপাত্রে সকল খাদ্য সাজানো হইতেছে। সাজানোও শেষ হইয়া গেল। অন্নপূর্ণার মাতা বলি-লেন,—"মা অনো! একটু দাঁড়াও তো মা, ঘরের ভিতর আহারের স্থান হইয়াছে, আমি সেখানে কতক কতক রাখিয়া আসি।" অন্ন পূর্ণাও তাই চায়। মা-ও কতক খাবার লইয়া চলিয়া গেলেন, অন্ন-

পূর্ণাও ক্ষিপ্রহস্তে পিষ্টকপাত্রের] উপরিস্থিত পিষ্টকের মধ্যে তালপত্র-টুকু পুরিয়া দিলেন।

অন্নপূর্ণার মাতা খাবার-দাবার পরিবেষণ করিয়া পরিচারিকার দ্বারা রঘুনাথকে অন্দরে ডাকাইলেন এবং আহারের জন্য অনুরোধ করিলেন। পাপীয়সীর ভিতরটা জামাতার মৃত্যুকামনায় পূর্ণ থাকিলেও মুখে যেন আদর আর ধরে না। রঘুনাথ এত ব্যাপার কিছুই জানেন না, তিনি পাদপ্রক্ষালন করিয়া আসনে বসিলেন এবং আনন্দমনে অন্নব্যঞ্জনাদি সমস্তই জগন্নাথকে নিবেদন করিয়া দিলেন। আচমনের জলও হস্তে গ্রহণ করিলেন। অন্নপূর্ণা দূর হইতে তাহা দেখিতেছেন, আর তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া-কাঁপিয়া উঠিতেছে। তিনি একবার ভাবেন—হায় যদি তিনি অগ্রে পিষ্টকটি না-ই গ্রহণ করেন, তাহা হইলে কি হইবে? আবার ভাবেন, যা থাকে কপালে, ধাইয়া গিয়া পতিকে বলিয়া আসি,—ওগো, ওসব কিছু খেওনা গো খেওনা, —সকল খাবার বিষে ভরা গো বিষে ভরা।

ভগবানেরই খেলা, অন্নপূর্ণাকে আর অধিক ভাবিতে হইল না, রঘুনাথ আচমন করিয়া সর্ব্বাগ্রে সেই পিষ্টকটিই হস্তে ধারণ করি-লেন। পিষ্টকটি ভাঙ্গিবামাত্র তাহার ভিতর হইতে তালপত্রের টুকরাটি পড়িয়া গেল। ছোট একটু তালপাতা বই তো নয়, অন্যে তাহা বড় একটা দেখিতে পাইলেন না। দেখিলেন কেবল রঘুনাথ এবং অন্নপূর্ণা। রঘুনাথ লেখাটুকু পড়িয়া সকল ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। এদিকে ভোজন আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া অন্নপূর্ণার জননী কৌশল করিয়া কন্যাকে তথা হইতে সরাইয়া দিলেন। বলিলেন,—

মা অনো! তুমি ততক্ষণ ধাইমার কাছে গিয়া গল্প করগে, আমি ডাকিয়া আনিব এখন। যাও মা! যাও। মনের ভাব,—'ও এখানে থাকিলে হয় তো কোন গোলযোগ বাধিতে পারে, আর গল্প করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়ে ত সকল লেঠাই চুকিয়া গেল।' অন্নপূর্ণাও যাইতে কোন আপত্তি করিলেন না, কেন না-তাঁহার বিশ্বাস, স্বামী যখন পত্র পাইয়াছেন, তখন আর ঐ বিষ মাখানো খাবার কিছুতেই আহার করিতেছেন না, তাঁহার জীবনের জন্য আর ভাবনা নাই।

রঘুনাথ কিন্তু বিষম সমস্যাতেই পড়িয়া গেলেন। তাঁহার হাতের পিঠা হাতেই রহিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—হায় আমি করিলাম কি? আমার প্রভুকে আমি বিষ ভোজন করাইলাম? হা প্রভু? আমার এ অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর নাথ, ক্ষমা কর। এখন বুদ্ধি দাও ঠাকুর! আমি কি করি?

"বুদ্ধি যে ন দিশই মোতে। প্রসাদ চ্ছাড়িবি কেমন্তে॥
জনম হোইলে নিয়ত। অবশ্য মরিবার সত॥
যেবে প্রসাদ চ্ছাড়ি দেবি। কালে কি অমর হোইবি?॥
কেবল প্রভু-অপরাধে। পড়িবি মহা নর্ক মধ্যে॥"

হা নাথ! কোন বুদ্ধিই যে আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না? আমি তোমার প্রসাদই বা ছাড়ি কি প্রকারে? যখন জন্ম লাভ করিতে হইয়াছে, তখন অবশ্যই একদিন মরিতেও হইবে, আর এই প্রসাদ পরিত্যাগ করিলেই কি অমর হইয়া যাইব, তা-ও তো নয়। বরং লাভের মধ্যে ইহাই হইবে যে, প্রভু! তোমার কাছে মহা অপরাধেই পতিত হইতে হইবে এবং সেই অপরাধে দুরন্ত নরক মধ্যে

যাইয়া পড়িব। ইহাতে আমার লাভই বা কি হইবে? না না, প্রসাদ আমি কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিব না, তা প্রাণ থাকুক আর যাউক।

রঘুনাথ পিষ্টকহস্তে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন। শ্বাশুড়ী রাক্ষসী মনে করিতে লাগিলেন, জামাতা বড় ভগবদ্ভক্ত, তাই বুঝি ভোজনের পূর্ব্বে ভগবান্‌কেই ভাবিতেছেন? রঘুনাথ জানিয়া-শুনিয়াও অবিচলিতচিত্তে সেই বিষমিশ্রিত অন্ন গোবিন্দ স্মরণ করিতে-করিতে ভোজন করিলেন, রেণুপ্রমাণও অবশিষ্ট রাখিলেন না। দেখিতে দেখিতে বিষ তাঁহার সর্ব্ব শরীর ঘিরিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে গিয়া চড়িল। আর রক্ষা নাই, রঘুনাথ অমনি অচেতন হইয়া ধরায় ঢলিয়া পড়িলেন এবং যাতনায় ছটফট করিতে-করিতে ইহলীলা সংবরণ করিলেন। দেখিয়া গঙ্গাধরগৃহিণী আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন, তাড়াতাড়ি স্বামী ও পুত্রকে ডাকিয়া আনিলেন। তাঁহাদের আনন্দই বা দেখে কে? সকলে মিলিয়া পরামর্শ আঁটিলেন, রাত্রি প্রভাত হইলেই ইহাকে মাটির ভিতর পুঁতিয়া ফেলিব এখন। কেহ জিজ্ঞাসা করে তো বলা যাইবে, কল্য রাত্রে সর্পাঘাতে ইহার মৃত্যু হইয়াছে। এই বলিয়া সেই ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া দিয়া সকলে চলিয়া গেলেন।

অন্নপূর্ণা মায়ের কথায় চলিয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তরে শান্তি নাই; প্রাণ যেন সদাই হারাই হারাই করিতেছে। পতির কোলে বিষমিশ্রিত অন্ন দেখিয়া কোন্ পতিব্রতার প্রাণ শান্ত থাকিতে পারে বল? তিনি কেবল কাতরভাবে শয়নগৃহে এদিক্-

ওদিক্ করিতেছিলেন। মাতা পিতা ও ভ্রাতার ফিস্‌ফাস্ কথা বলা এবং পা টিপে-টিপে চলা-বুলার ধরণ দেখিয়া তাঁহার প্রাণে সন্দেহ আরও জাগিয়া উঠিল, সকলে চলিয়া গেলে তিনি শয়ন-গৃহের বাহিরে আসিলেন। আস্তে আস্তে ভোজন-গৃহের দ্বারে গমন করিলেন। গৃহে প্রদীপ জ্বলিতেছিল, সেই আলোকে দ্বারের ফাঁক দিয়া দেখিলেন, তাঁহার জীবনধন ভোজনের আসনের উপর জীবনহারা হইয়া পড়িয়া আছেন। দেখিয়া সতীর শরীর থরথর কাঁপিতে লাগিল, তিনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, সেইখানেই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন। মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে চাহিয়া দেখেন, তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকারের মত চারিদিকেই সূচীভেদ্য অন্ধকার। দ্বারের অবকাশ দিয়া আবার দেখিতে গেলেন. দেখিলেন—গৃহের দীপও নিবিয়া গিয়াছে, সেখানেও জমাটবাধা অন্ধকার। অন্তরে ঘরে-বাহিরে সর্ব্বত্রেই অন্ধকারের রাজত্ব। এ অবস্থায় সতী কি করেন ; তিনি তাঁহার প্রাণের হরিকেই প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ভেরীর নিনাদ এক যোজন মাত্র যায়, বজ্রের ধ্বনি দ্বাদশ যোজন মাত্র গমন করিতে পারে, কিন্তু ভক্তের অন্তরের শব্দ মুহূর্ত্তমধ্যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া ফেলে। হরিপরায়ণা অন্নপূর্ণার অন্তরের কথা দেখিতে-দেখিতে বিশ্বব্যোম ভেদ করিয়া ভগবদ্ধামে চলিয়া গেল। প্রভুর রত্নসিংহাসন অমনি থরথর কাঁপিয়া উঠিল। ভক্তের হৃদয়ের ব্যথা ব্যথাহারী হরির হৃদয়ে যাইয়া দারুণ আঘাত করিল ; ভক্ত রঘুনাথের বিষম বিপত্তি বুঝিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বিদ্যুদ্-গতিতে কলাবতীপুরে গমন করিলেন। অকস্মাৎ ঘরের ভিতর হইতে

যেন কিসের শব্দ অন্নপূর্ণার কাণে আসিয়া বাজিল। ব্যস্তসমস্তভাবে তিনি দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখেন, দ্বারের ফাঁক দিয়া স্নিগ্ধ উজ্জ্বল আলোক বাহির হইয়া পড়িতেছে। তাড়াতাড়ি সেই ফাঁক দিয়া দেখেন যে, ঘরের কালো আঁধার ভেদ করিয়া কালো মাণিক জ্বলিয়া উঠিয়াছে! আহা, তাঁহার প্রাণের হরি তাঁহার প্রাণের পতিকে কোলে লইয়া স্নেহময় জনকজননীর মত সর্ব্বাঙ্গে পদ্মহস্ত বুলাইতেছেন, আর বলিতেছেন,—

"বোইলে—উঠ রে নন্দন। কিপাঁ তু নিদে অচেতন॥
যাহা সহায় পীতবাস। তার গরল চ্ছার কিস?॥"

ওরে আমার নয়নানন্দ রঘুনাথ! উঠে বোস্ বাছা উঠে বোস্। তুই নিদ্রায় অচেতন রহিয়াছিস্ কেন? এই দেখ্ বাছা আমি এসেছি। আমি যাহার সহায়, তুচ্ছ বিষ তাহার কি করিতে পারে? উঠে বোস্ বাছা উঠে বোস্।

জগজ্জীবনের সঞ্জীবন মন্ত্রে মৃত রঘুনাথ পুনর্জীবন পাইলেন। ঘুমন্ত রঘুনাথ যেন জাগরিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই আলোকও অদৃশ্য হইয়া গেল। অন্নপূর্ণা অন্ধকারে আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকার চিরতরে দূর হইয়া গেল। আলোকভরা আনন্দপোরা হৃদয় লইয়াই তিনি শয়নগৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

খুব গাঢ় নিদ্রার পর জাগরিত হইলে যেমন মনে হয়,—বড় সুখেই ঘুমাইয়াছি, কিছুই জানিতে পারি নাই; রঘুনাথের অবস্থাটাও এখন ঠিক তেমনই। তাঁহারও মনে হইতে লাগিল—বাঃ, খাসা

ঘুমাইতেছিলাম, কে আমার আনন্দনিদ্রা ভাঙ্গাইয়া দিল রে? তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখেন, কোথাও কেহ নাই, কেবল ঘুট্‌ঘুটে আঁধারে ঘরদ্বার ভরিয়া রহিয়াছে। ক্ষণ-পরেই তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল; ভাবিলেন,—তাইতো আমি সেই রঘুনাথ না? বিষভোজনে আমি না মরণাপন্ন হইয়াছিলাম? হাঁ হাঁ, তাইতো বটে, তাইতো বটে। ওঃ, কি অসহ্য যাতনা, কি বিষম দাহ-জ্বালা! মনে হইলে এখনও মূর্চ্ছিত হইতে হয়। হায়, সে জ্বালা আমার কে জুড়াইয়া দিল?—কে আমার প্রাণহীন শরীরে প্রাণের সঞ্চার করিয়া দিল? প্রাণনাথ! তুমি?—তুমিই কি? তুমি না হইলে ভৃত্যের প্রতি এত করুণা কাহার হইবে করুণাময়? হা প্রভু! তোমার খেলা তুমিই ভাল বুঝ; কোল হইতে আছাড় দিয়া ফেলিয়া দিতেও তুমি, আবার আদর করিয়া বুকে লইয়া মুখ চুমিতেও তুমি। তোমার এ লীলারহস্য অজ্ঞ মানব আমরা কি বুঝিব প্রভু! বুঝিবারই বা দরকার? দাও দাও নাথ!—ব্যথা দাও ব্যথা দাও, নিত্য নূতন নূতন ব্যথা দাও ব্যথা দাও, আমি মাথা পাতিয়াই লইব। প্রতি ব্যথার পশ্চাতে পশ্চাতে তোমার মমতা-মাখানো ব্যথা-জুড়ানো মূর্ত্তি তো দেখিতে পাইব! তাহা হইলেই হইল। তাহাই আমার পরম লাভ, পরম শান্তি। দাও দাও নাথ! ব্যথা দাও ব্যথা দাও।

ভক্ত রঘুনাথ তাঁহার ব্যথাহারী হরির উদ্দেশে এইরূপ কত কথাই বলিলেন,—কত হাসিলেন-কাঁদিলেন; তার পর গদ্গদ স্বরে 'রাম কৃষ্ণ হরি' প্রভৃতি নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নামের

নেশায় রঘুনাথের বাহ্য জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে রাত্রিও শেষ হইয়া আসিল। পাপপ্রকৃতি করণ পরিবারের আর নিদ্রা নাই। সারা রাত্রি বিছানায় পড়িয়া সকলেই এ-পাশ ও-পাশ করিতেছিলেন। রঘুনাথের বিষজ্বালার অপেক্ষা ইঁহাদের হৃদয়ের জ্বালা বোধ হয় আরও বেশী। যাহাকে যাতনা দেওয়া যায়, তাহার অপেক্ষা. যাহারা যাতনা দিবার মতলব আঁটে; তাহাদের যাতনা যে অনেকগুণে অধিক। রঘুনাথ বিষে অচেতন হইয়া পড়িলেন, তাঁহার জ্বালা আর তিনি জানিতেও পারিলেন না, কিন্তু গঙ্গাধর করণ, তাঁহার পত্নী ও পুত্রাদি কাল্পনিক চিন্তার জ্বালায় অধীর হইয়া পড়িলেন। ঐ কে বুঝি আমাদের আচরণ জানিয়া ফেলিল; ঐ কে বুঝি রাজদরবারে যাইয়া আমাদের কথা বলিয়া দিল, ঐ বুঝি আমাদের ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য সেপাই-সান্ত্রী প্রেরিত হইল; ইত্যাদি কত চিন্তাই তাঁহাদের হৃদয় জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিল। তাঁহারা একবার উঠেন একবার বসেন, এক-একবার জানালা দিয়া রাত্রি পোহাইল কিনা উঁকি মারিয়া দেখেন; কিন্তু রাত্রি আর প্রভাত হয় না;—সে যেন বাড়িয়া-বাড়িয়াই চলিয়াছে। এইবার অরুণ-আলোক দেখিয়া সকলেই তাঁহারা শয্যা ত্যাগ করিলেন এবং একত্রিত হইয়া শব লইয়া যাওয়া কিংবা মাটীর মধ্যে পুঁতিয়া ফেলা প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া ভোজনগৃহের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গুণধর গঙ্গাধরই তাড়াতাড়ি গিয়া দ্বার উদঘাটন করিলেন। তখন প্রভাত হইয়া গিয়াছে, সূর্য্যালোকে গৃহ-মধ্য উদ্ভাসিত হইয়াছে; সেই সুস্পষ্ট আলোকে তাঁহারা যাহা দেখি-

লেন, তাহাতে সহজে বিশ্বাসস্থাপন করা যায় না। তাঁহারা দেখিলেন,—রঘুনাথ ভোজনের আসনের উপর স্থির ধীরভাবে বসিয়া আছেন, তাঁহার সকল শরীর পুলকে পূর্ণ, বদনে দিব্য-জ্যোতি, নিশ্চলনয়নে জলধারা, ওষ্ঠাধর প্রকম্পিত, বিলম্বে বিলম্বে রসনায় অস্ফুট 'রাম কৃষ্ণ হরি' নাম উচ্চারিত। তিনি যেন এখানে থাকিয়াও এখানে নাই;—এ লোক ছাড়িয়া আর কোন্ লোকে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে বিস্ময়সাগরে ডুবিয়া গেলেন। ভাবেন—এ আবার কি বিচিত্র ব্যাপার! কাহারও মুখে কথাটি নাই। সকলে গৃহের ভিতর গমন করিলেন। তখনও রঘুনাথ অচল অটল। তাঁহাদের পদশব্দে ভাববিভোর রঘুনাথ যেন আর কাহার পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন। অমনি তিনি দুই বাহু প্রসারিয়া—'এস এস প্রভু!' বলিয়া আলু-থালু-ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখেন,—কই কোথায় প্রভু; হরিহরি এ যে তাঁহারই হন্তারক শ্বশুর শ্বাশুড়ী ও শ্যালকগণ!

মাতালের মত টলিতে টলিতে রঘুনাথ আবার সেই আসনেই বসিয়া পড়িলেন। তখন গঙ্গাধর প্রভৃতির মাথার টনক নড়িল। তাঁহারা ভাবিলেন,—এ তো বড় ছোটখাট লোক নয় দেখিতেছি। এত বিষ খাইয়াও কি মানুষ বাঁচে? এ বুঝি কোন দেবতাই হইবে? ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া তাঁহারা রঘুনাথের শরণাগত হইলেন এবং বিনয়বাক্যে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। রঘুনাথও হাস্য-প্রফুল্ল-বদনে বলিলেন,—

তুম্ভর কিচ্ছি নাহিঁ দোষ। পূর্ব্বে কাহাকু দেলি বিষ ॥"

তেঁই এ জন্মে কলি পান। অর্জ্জিলা কথা নোহে আন॥"

ইহাতে আপনাদের কিছুই দোষ নাই দোষ নাই; আমি বোধ হয় পূর্ব্বজন্মে কাহাকেও বিষ দান করিয়াছিলাম, তাই এ জন্মে আমাকে সেই বিষ আহার করিতে হইল। পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফল তো অন্যথা হইবার নয়; অবশ্যই তাহা ভোগ করিতে হইবে। তবে বিষ ভোজনেও যে আমি প্রাণ পাইলাম, সে কেবল আমার প্রাণপতি দারুব্রহ্মমূর্ত্তি ছিলেন বলিয়া। এখন আপনাদের কাছে আমার একটা নিবেদন আছে;—আপনারা আমার দারিদ্র্য দেখিয়া আপনাদের কন্যা অন্যের করে অর্পণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন; ভাল তাহাই হউক, আমায় দয়া করুন, আমি আসি; কিন্তু আর একটা কথাও বলি, যদি আপনাদের ধর্ম্মের ভয় থাকে, তবে আমার পত্নী আমাকেই দান করুন, সে আমার দুঃখীর সঙ্গিনী, তাহাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া যাই। দেওয়া না-দেওয়া অবশ্য আপনাদেরই ইচ্ছা, ইহাতে আমার কোন জিদ-জবরদস্তি নাই।

এই কথা বলিয়া রঘুনাথ উচ্চস্বরে 'মুকুন্দ মাধব মুরারি' প্রভৃতি ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিতে-করিতে গৃহের বাহির হইয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে রঘুনাথ একেবারে রাস্তায় হাজির। সপ্ত পুত্রসহ গঙ্গাধরও পাছু পাছু ধাইয়া গিয়া তাঁহাকে ধরিলেন। বলিলেন,—আজিকার দিনটা এখানে থাক, কল্য তোমার পত্নীকে তুমি সমভিব্যাহারে লইয়া যাইও, কোন আপত্তিই করিব না। রঘুনাথ কিন্তু আর সেই পাপ-পুরীতে কিছুতেই প্রবেশ করিলেন না, এক বৃক্ষমূলে যাইয়া বসিয়া রহিলেন।

গঙ্গাধর করেন কি, 'আচ্ছা আমি এখনই আসিতেছি' বলিয়া পুত্রসহ বাটির ভিতর প্রবেশ করিলেন। এদিকে অন্নপূর্ণা পিঞ্জর-রুদ্ধা পক্ষিণীর ন্যায় গৃহমধ্যে ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন; প্রভাতের ব্যাপার তিনি কিছুই জানেন না। দুর্ব্বৃত্ত পিতা ও ভ্রাতারা রাত্রি প্রভাত হইতে না-হইতে তাঁহার শয়নগৃহের দ্বার চাবি দিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। গঙ্গাধর—গৃহিণী ও পুত্রগণকে সঙ্গে লইয়া অন্নপূর্ণার শয়নগৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন এবং গৃহমধ্যে গমন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বল্ অন্নপূর্ণা! বল্, তুই তোর কাঙাল স্বামীর সঙ্গে যাইতে চাহিস্; না আমাদের কাছে থাকিতে ইচ্ছা করিস্?

অন্নপূর্ণা লজ্জাজড়িত-কণ্ঠে কিন্তু দৃঢ়তার সহিতই বলিয়া উঠিলেন,—পিতা! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন, আমি আমার পতির সহিতই গমন করিব। কাঙাল হউন, ভিখারী হউন, যাহাই হউন, আমি তাঁহারই গলে বরমালা অর্পণ করিয়াছি, তিনিই আমার একমাত্র গতি। পতির কথা বলিতে-বলিতে পতিব্রতার লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। অন্নপূর্ণা সিংহিনীর মত গর্জ্জিয়া উঠিলেন। তাঁহার নয়নে দপ্‌দপ্‌ অনল জ্বলিয়া উঠিল। অন্নপূর্ণা যেন আর সে অন্নপূর্ণা নাই, দানব-দলনীর মত তিনি সেই দুষ্ট দানব-দলকে নেত্রানলে ভস্ম করিতে উদ্যত হইলেন। কঠোর কর্কশ স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—পিতা পিতা! তোমরা আমায় দ্বিচারিণী করিতে চাও?—পতিকে বঞ্চিত করিয়া পরপুরুষের করে অর্পণ করিতে চাও? পারিবে না, পারিবে না; আমি তেমন মেয়ে নই,—আমি সতী; প্রাণ থাকিতে

আমায় তাহা পারিবে না পারিবে না। নিশ্চয় জানিও, তাহা হইলে আমি আত্মঘাতিনী হইব। সতীর অভিশাপে তোমার সাধের সংসার ছারেখারে যাইবে।

জলের উত্তাপ কতক্ষণ থাকে? শৈত্যগুণই যে তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম! সরলা অন্নপূর্ণার কোপও অধিকক্ষণ রহিল না। তিনি আবার পিতার চরণ ধারণ করিয়া কাতর-কোমল-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—ক্ষমা করুন পিতা! ক্ষমা করুন! আমার পতির সহিত আমাকে যাইতে দিন।—

"মুঁ যোগী সে মোহর থাল। মোতে রখিলে অমঙ্গল॥"

দেখুন, আমি যেন যোগী, আর পতি হইতেছেন আমার ভিক্ষা-পাত্র, তিনিই আমার একমাত্র সম্বল। আমাকে এখানে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে আপনার মঙ্গল নাই জানিবেন। তাই মিনতি করিয়া বলি, আমাকে আমার পতির সহিত যাইতেই অনুমতি দান করুন।

গঙ্গাধর তাঁহার পত্নী ও পুত্রগণ একে রঘুনাথের প্রভাব দর্শনে ভীত-ভীত ছিলেন, তাহার উপর অন্নপূর্ণার অবস্থা দেখিয়া আরও অধিক ভীত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে অনেক পরামর্শের পর সকলেই স্থির করিলেন যে, রঘুনাথের সহিতই অন্নপূর্ণাকে যাইতে দেওয়া হউক। তখনই অন্নপূর্ণাকে সাজানোগোজানো হইল। গঙ্গাধর স্বয়ং ধনরত্নসহ কন্যার করে ধরিয়া রঘুনাথের সমীপে লইয়া গেলেন এবং বিনয়বচনে বলিলেন,—নাও বাবা! তোমার পত্নী তুমি গ্রহণ কর। আর আমাদের প্রতি দয়া করিয়া

যাও, যেন কোন অমঙ্গল না হয়। তবে একটা বড় দুঃখ রহিল, বাপ-মা থাকিতে-থাকিতে বাছার আমার ঘর-সংসার লোক-লজ্জা কিছুই রাখিলে না।

বলিতে-বলিতে বাষ্পবেগে গঙ্গাধরের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। তিনি অশ্রুবর্ষণ করিতে-করিতে রঘুনাথের করেকরে অন্নপূর্ণাকে সমর্পণ করিয়া দিলেন এবং বলিলেন,—বাবা! এই নাও তোমার পত্নী নাও, আমার অন্নপূর্ণা আজ হইতে তোমার হইল—আজ হইতে ইহার সকল ভার তোমার উপর পড়িল। বলিয়া তিনি কাঁদিতে-কাঁদিতে চলিয়া গেলেন।

অন্নপূর্ণাও পতির চরণতলে পতিত হইয়া একান্তভাবে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। উঠিয়া কপালে হাত দুইটি রাখিয়া বলিলেন,—প্রাণনাথ! এখানে আর একটুও বিলম্ব করিবেন না, কোথায় যাইবার ইচ্ছা চলুন, দাসী আপনার অনুগমন করিতে প্রস্তুত। রঘুনাথও প্রীতিভরে পত্নীর হস্তধারণ করিয়া 'জয় জগন্নাথ' বলিয়া নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তাঁহারা দুইজনে চলিলেন। গঙ্গাধর-প্রেরিত কয়েকজন দাস-দাসীও তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিল। রঘুনাথের বারংবার নিষেধে অনেকেই ফিরিয়া গেল বটে; ফিরিল না কেবল অন্নপূর্ণার সেই ধাই-মা, আর যাহারা আশৈশব অন্নপূর্ণাকে বড় ভালবাসে, এইরূপ দুই'চারিজন দাসদাসী। তাহাদের সহিত কড়ার হইল যে, তাহারা বরাবর সঙ্গে যাইতে পাইবে না, গ্রামের সীমা পার করিয়া দিয়াই ফিরিয়া আসিবে।

গঙ্গাধর বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। অন্নপূর্ণাকে বিদায় দিয়া তাঁহার প্রাণে আজ একটুও শান্তি নাই। তিনি বিষণ্ণ-মনে অন্তঃপুরে পত্নীসমীপে গমন করিলেন। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন,—হায়, আমার সাধের অন্নপূর্ণা ভিখারীর করে তুলিয়া দিয়া আসিলাম। তিনি আর অধিক কিছু বলিতে পারিলেন না, সেইখানেই বসিয়া-বসিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

অন্নপূর্ণার পাষাণী জননীর প্রাণ কিন্তু কিছুতেই গলিবার নয়; মাগীর বড়ই দুঃখ যে, সে অত ক'রে বিষ মিশায়ে খাবার দাবার প্রস্তুত করিল,—সকাল বেলা কি কি বোলে কেঁদে কেঁদে পাড়া মাৎ ক'রে দেবে, সারা রাত জেগে জেগে তার একটা প্রকাণ্ড পালা বাঁধিল; আর ফুস মন্ত্রের চোটে তাহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেল! হায় হায়, এ দুঃখ রাখিবার কি আর স্থান আছে? তাই তিনি অন্নপূর্ণার বিদায়কালে একটুও বিচলিত হন নাই। দুইটা মিষ্ট কথা বলিয়াও অন্নপূর্ণাকে আশ্বস্ত করেন নাই; আর এখন পতির মুখে তাহার বিদায়বাণী শুনিয়াও তিনি একটুও বিচলিত হইলেন না, পতির বেদনায় সমবেদনা জানাইলেন না। বরং উত্তেজনার স্বরে পতিকে বলিয়া উঠিলেন,—বসিয়া-বসিয়া কাঁদিবার সময় এ নয়; এখন যাও সেই মন্ত্রিপুত্রের কাছে সত্বর এই সমাচার পাঠাইবার ব্যবস্থা করগে; এখনও সময় আছে—চেষ্টা করিলে এখনও অন্নপূর্ণার উদ্ধার হইলেও হইতে পারে; যাও, শীঘ্র যাও, মন্ত্রিপুত্রের নিকটে দূত পাঠাইতে আর কালবিলম্ব করিও না।

স্ত্রৈণ গঙ্গাধর স্ত্রীর আদেশ অমান্য করিতে পারিলেন না; সত্বর

বহির্ব্বাটিতে আসিয়া দূতপ্রেরণের বন্দোবস্ত করিলেন। একখানি পত্র লিখিয়া দূতের হস্তে দেওয়া হইল। দূতও দ্রুতগতি মন্ত্রিভবনে চলিয়া গেল। মন্ত্রিপুত্রের অগ্রে গিয়া প্রণামপূর্ব্বক বলিল,—"হুজুর, আমি মহানুভব গঙ্গাধর করণের দূত, তাঁহার এই পত্র গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হয়।" মন্ত্রিপুত্র মহা আগ্রহসহকারে দূতের হস্ত হইতে পত্রখানি লইয়া পাঠ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িলেন। সিংহগর্জ্জনে বলিয়া উঠিলেন,—কি, এত বড় স্পর্দ্ধা, শৃগাল হইয়া সিংহের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া যাইবে? তাহা কখনই হইবে না। দূত! তুমি যাও, তাঁহাকে আমার অভিবাদন জানাইয়া বলিও যে, তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে বটে, কিন্তু আমার চেষ্টা কিছুতেই ব্যর্থ হইবার নয়। এই সসৈন্য যাত্রা করিলাম, এখনই সেই চোরের উপযুক্ত শাস্তি দিয়া অন্নপূর্ণাকে উদ্ধার করিয়া আনিতেছি। এই পথেই তো আছে, পলাইবে কোথায়?

দূত চলিয়া গেল। এদিকেও সাজ সাজ রবের মহা সাড়া পড়িয়া গেল। মন্ত্রিপুত্র রণসাজে সাজিয়া সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। যেমন পুত্র, পিতাও তেমনই; পুত্রের সাহায্যকল্পে তিনিও চলিলেন। সকলেই অশ্বারোহী। পবনবেগে অশ্ব সকল ছুটিল। তাহাদের খুরোত্থিত ধূলিতে চারিদিক অন্ধকার হইয়া পড়িল। ঘনঘন সিংহনাদে ও তুরী-ভেরী প্রভৃতি রণবাদ্যের তুমুল শব্দে আকাশ মেদিনী ছাইয়া ফেলিল। "এ আবার কি ব্যাপার!" ভাবিয়া রঘুনাথ পালটিয়া দেখিতে না দেখিতে মন্ত্রিপুত্র সদর্পে যাইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল এবং কর্কশস্বরে বলিয়া উঠিল,—আরে রে বর্ব্বর! তুই কি না

আমার হৃদয়ের ধন চুরি করিয়া লইয়া পলাইতেছিস্? তোর যদি জীবনের সাধ থাকে তো সুন্দরীকে আমার হস্তে অর্পণ করিয়া পলায়ন কর, নচেৎ এখনই আপন কর্ম্মের উচিত শাস্তি লাভ করিবি, আমি তোকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইব। ছি ছি ছ্যাথ্ দেখি, এই ভাস্কর হীরকহার কি তোর মত বানরের গলায় শোভা পায়? যা, যদি জীবনের সাধ থাকে তো প্রাণ লইয়া পলাইয়া যা, আমি তোকে প্রাণ ভিক্ষা দিতেছি।

রঘুনাথ তো দেখিয়া শুনিয়া অবাক্! পশ্চাতে চাহিয়া দেখেন, অগণিত সৈন্য ধাইয়া আসিতেছে। এ আবার প্রভুর কি লীলা, ভাবিয়া তিনি ভাব-বিভোল হইয়া মন্ত্রিপুত্রের দিকে নির্ভয় নেত্রে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন। অন্নপূর্ণার কিন্তু বড় ভয় হইল। তিনি পতিকে জড়াইয়া ধরিয়া ভীতি-কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন,—স্বামিন্! ঐ সেই মন্ত্রিপুত্র; ঐ দুর্ব্বৃত্তের হস্তেই আমার পিতামাতা আমাকে সমর্পন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঐ কালান্তক যমের হস্তে তো আর নিস্তার নাই; ও নিশ্চয়ই তোমাকে বধ করিয়া আমাকে লইয়া যাইবে। ও পাপ আমায় স্পর্শ করিলে কিন্তু আমি এ প্রাণ কিছুতেই রাখিব না। পতিই সতীর গতি। এ বিষয়ে আপনার কি বক্তব্য আছে, শুনিতে চাই। আর এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায়ই বা কি স্থির করিতেছেন, তাহাও জানিতে চাই।

সতীর ভীতিমাখা কথা শুনিয়া রঘুনাথ আরও অধিক হাস্য করিতে-করিতে আশ্বাসবচনে তাঁহাকে বলিলেন,—

"মো প্রভু দারুব্রহ্মমূর্ত্তি। এ চ্ছার কেতেক বিপত্তি॥

যে তোতে মোতে ভেট করি। যে বিষতাপু কলে পারি ॥
এবে রখিবে সেহি মতে। ভো সখি! ভয় কিপাঁ চিত্তে ॥
ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি যার পাদে। ধ্যানে চিন্তন্তি অপ্রমাদে ॥
সে প্রভু থাউঁ থাউঁ মোর। কিপাঁ তু ডরু নারীবর ॥”

সখি লো! তোমার এত ভয় কিসের? তুমি কি জান না, আমার প্রভু যে সেই দারুব্রহ্মমূর্ত্তি জগন্নাথ। আর এই বিপদই বা কতটুকু বিপদ? সুন্দরী! যিনি তোমার আমার পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ করাইয়া দিয়াছেন, যিনি দুরন্ত বিষতাপ হইতে আমাকে পার করিয়াছেন, এ বিপদেও তিনিই আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন। তবে আর তোমার এত ভয়-ভাবনা কেন? ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি দেবগণ অপ্রমত্ত ভাবে ধ্যানযোগে যাঁহার পাদপদ্ম চিন্তা করিয়া থাকেন, আমার সেই প্রভু থাকিতে-থাকিতে তুমি অত ভীতই বা হইতেছ কি নিমিত্ত?

রঘুনাথ অন্নপূর্ণাকে এইরূপে প্রভুর গুণ স্মরণ করাইয়া সাহস দিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, দুইজন অশ্বারোহী ক্ষত্রিয় বীর তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। উভয়ের স্কন্ধে উত্তরীয়, পৃষ্ঠভাগে ঢাল, কটিদেশে ‘যমদাঢ়’ অস্ত্র দৃঢ় আবদ্ধ, যেন সাক্ষাৎ বিক্রম সিংহ মহারাজ। অশ্বের উপর হইতেই তাঁহারা জলদগম্ভীর স্বরে রঘুনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হাঁ-হে, তোমাদের বাড়ী কোন্ দেশে? কোথা হইতে আসিতেছ? যাইবেই বা কোথায়? সঙ্গে সুন্দরী রমণী দেখিতেছি, ইনি কে? আর ঐ যে পাছে পাছে অনেক সৈন্য সামন্ত ধাইয়া আসিতেছে, তাহারাই বা কে? ব্যাপারখানা কি বল দেখি?

রঘুনাথ তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া ধীরেধীরে বলিলেন,—

মহাশয়! এ বড় বিচিত্র ব্যাপার, আদ্যোপান্ত বলিতে গেলে একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে। সংক্ষেপ কথা,—ইনি আমার পরিণীতা পত্নী, আমি ইঁহাকে আপন স্থানে লইয়া যাইতেছি, আর ইহারা আমাকে মারিয়া ধরিয়া আমার পত্নীকে কাড়িয়া লইবার জন্য পাছে-পাছে তাড়া করিয়াছে। আমি তো অনাথ প্রাণী ; সখা-সাঙ্গাৎ বন্ধু-বান্ধব আমার কেহই নাই ; বল-ভরসা আছেন কেবল সেই নীলাদ্রি-চন্দ্রচূড়ামণি চক্রপাণি জগন্নাথ ; তিনি বই আর আমার শরণ লইবার—রক্ষা করিবার কেহই নাই ; তাই আমরা আকুল প্রাণে তাঁহারই কৃপা প্রতীক্ষা করিতেছি।

বীরদ্বয় বলিলেন,—বটে বটে, এমন ব্যাপার? ভাল, কই কে তোমাদের কাছে আসে,—মার ধর করে, একবার দেখি? ভয় নাই, ভয় নাই'—আমরা থাকিতে তোমাদের কোন ভয় নাই, ভয় নাই। আমরা তোমাদের আগুপাছু চলিতেছি, চল, তোমরা নির্ভয়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চল। শুনিয়া রঘুনাথও অন্নপূর্ণা 'প্রভুরই এ মহিমা' ভাবিয়া পরমানন্দে জননীর পক্ষাচ্ছাদিত পক্ষিশিশুর মত নির্ভয়ে গমন করিতে লাগিলেন। দাসদাসীরা ও অগ্রবর্ত্তী বীরের অগ্রেঅগ্রে চলিতে লাগিল। বীরযুগল বুঝি কিছু মায়া জানেন। তাঁহারা মাত্র দুইজন, কিন্তু মন্ত্রিপুত্র কিংবা সৈন্যসামন্ত সকলে দেখিতে লাগিল যে কোটিকোটি ক্ষত্রীয় বীর রঘুনাথ ও অন্নপূর্ণাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া সকলে ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িল এবং যে যেদিকে পাইল, প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল। সে পলাইবার রকমই বা কত?—

"ভেক ফণীকি দেখি যেন্হে। ভয়ে পলান্তি এণে তেণে॥

কেশরী দেখি মৃগ গজ। যেহ্নে হুয়ন্তি হতবীর্য্য ॥
গরুড় দেখি যেহ্নে ব্যাল। পলাই পশিলা কি বিল ॥
তেমন্তে প্রাণর আরতে। পলাই গলে যেঝামতে ॥”

সর্প দর্শনে ভেক যেরূপ এদিকে ওদিকে পলায়, কেহ কেহ সেইরূপ ছোড় ভঙ্গ হইয়া পলাইল। সিংহ দেখিয়া হরিণ ও হস্তী যেমন হতবীর্য্য হইয়া পলায়ন করে, কেহ কেহ সেই প্রকারে পলায়ন করিল। আর গরুড়কে দেখিতে পাইয়া সর্প সকল আকুলি বিকুলি করিয়া যেরূপ বিলের মধ্যে প্রবেশ করে, সে ভাবেও কেহ কেহ পলাইতে লাগিল। প্রাণের দায়ে কে যে কোথায় পলাইয়া গেল, তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই।

রঘুনাথ ও অন্নপূর্ণা কিন্তু ইহার তত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। আনন্দবিস্ময়ে তাঁহাদের হৃদয় ভরিয়া গেল। মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁহারা বীরযুগলের সঙ্গেসঙ্গেই চলিতে লাগিলেন। কেবল মনে হয়,—ইহারা দুইজন কে? কিন্তু কি আশ্চর্য্য, জিজ্ঞাসা করি করি করিয়াও তাঁহারা কিছুতেই জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

সেই রাজ্যের সীমা পার করিয়া দিয়া ক্ষত্রিয় বীরদ্বয় রঘুনাথকে বলিলেন,—“যাও, এইবার তোমরা নির্ভয়ে গমন কর, আর কোন চিন্তা নাই। আমরাও চলিলাম; আমাদের অনেক কার্য্য।” রঘু অরক্ষিত তাঁহাদিগকে শতশত প্রণাম করিয়া কহিলেন,—বীর-চূড়ামণি! আপনাদের দুইজনের কৃপাতেই আজ আমরা শত্রুহস্তে নিস্তার পাইলাম। আপনারা না রক্ষা করিলে দেখিতে দেখিতে এখনই আমাদিগকে যমালয়ে যাইতে হইত। আপনারা যে-ই হউন,

আপনারা আমাদের প্রাণদাতা। আপনাদের চরণে বারবার প্রণাম করি। জানিবেন, আমরা আপনাদেরই হইয়া রহিলাম।

বীরযুগল হাস্যমুখে 'বেশ বেশ' বলিয়া চলিয়া গেলেন। রঘুনাথও দাসদাসীকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া বিদায় দিয়া অন্নপূর্ণাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া চলিলেন। কিন্তু চিনিতে পারিলেন না যে, এই দুইটী ক্ষত্রিয়বীর কে? হায়, যদি রঘুনাথ চিনিতে পারিতেন যে, ইঁহারাই তাঁহার প্রাণনাথ বলভদ্র জগন্নাথ, তাহা হইলে কি আর রক্ষা থাকিত? তিনি তাহা হইলে তাঁহার সকল সাধ এইখানেই মিটাইয়া লইয়া তবে তাঁহাদের ছাড়িয়া দিতেন। যাঁহার মায়ায় অমরবৃন্দও বিমোহিত, সামান্য মানব তাঁহাকে চিনিবেই বা কি প্রকারে? মায়াধীশ জগদীশ ভৃত্যের দুঃখ দূর করিয়া নীলকন্দরে শুভবিজয় করিলেন। রঘুনাথ তাঁহাদের চিনিতে পারুন আর না-ই পারুন, করুণাময় জগন্নাথের করুণাতেই যে তিনি রক্ষা পাইলেন, এ বিষয়ে আর তাঁহার অণুমাত্র সংশয় রহিল না; তিনিও সেই প্রভুরই করুণা ভাবিতে ভাবিতে চলিতে লাগিলেন।

পথে বাহির হইলে আপদ্ বিপদ্ আছেই আছে। প্রভুরই করুণায় সকল আপদে পার হইয়া তাঁহারা কিছুদিন পরে শ্রীনীলাচলে গিয়া পঁহুছিলেন। আজ আর তাঁহাদের আনন্দের সীমা পরিসীমা নাই। উভয়ে শ্রীমন্দিরে যাইয়া তৃষিতনয়নে নীলাচলচন্দ্রের রূপসুধা পান করিলেন। পথের সকল ক্লেশ দূর হইয়া গেল। অন্নপূর্ণার পিতা আসিবার সময় যাহা কিছু ধন রত্ন দিয়াছিলেন, তাহা দিয়া তাঁহারা দেউলের দক্ষিণপার্শ্বে একটি বাটী খরিদ করিলেন এবং

তথায় পরমানন্দে বসবাস করিতে লাগিলেন। রঘুনাথ কিন্তু তাঁহার ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি প্রতিদিন প্রভুর শয্যো-ত্থান হইতে আরম্ভ করিয়া আবার শয়ন পর্য্যন্ত আরাত্রিক-ভোগ-শিঙ্গার প্রভৃতি লীলা দর্শন করেন, আর যে সময়ে দর্শন না হয়, সেই সময় ভিক্ষা মাগিয়া বেড়ান। ভিক্ষা করেন বটে, কিন্তু ভিক্ষার জন্য ক্ষেত্রসীমার বাহিরে কখনও গমন করেন না। কৃষ্ণকথা ছাড়া তাঁহার মুখে আর অন্য কোন কথা নাই; গোবিন্দগীতি ছাড়া আর অন্য কোন গান করা নাই। তা ভিক্ষাকালেই কি, শ্রীমন্দিরেই কি, আর গৃহেই বা কি। শ্রীমন্দিরে তিনি যখন 'কলারাট-ঘরে' (জগন্নাথের ঠিক সম্মুখে ভাণ্ডারঘরের দক্ষিণপার্শ্বে) করতাল বাজা-ইয়া গোবিন্দগীতি গাইতে-গাইতে নৃত্য করিতে থাকেন, আহা তাঁহার তখনকার সেই পুলকপূর্ণ অশ্রুস্নাত পূতমূর্ত্তি কি সুন্দর—কি সুন্দর! যে দেখে, সে জগন্নাথ দেখিবে, কি তাঁহাকে দেখিবে, কিছুই স্থির করিতে পারে না!

ভাবসাগর ভগবানের ভাব লইয়াই ভক্তের ভাব। ভক্তের ভাব আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু ভগবানের ভাব অধিকার করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ভগবান্ অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি,—ভাব-মাধুর্য্যের ভাণ্ডার। তাই তাঁহার রসে রসিয়া—তাঁহার ভাবে মজিয়া ভক্ত যখন বিভোর হইয়া নাচিতে গাইতে থাকেন, তখন তাঁহাকে দেখিলে পামরপাষণ্ডেরও নয়ন ভুলিয়া যায়—মন-প্রাণ গলিয়া যায়। ভাব-বিভোর ভক্তকে দেখিয়া ভগবান্কে দেখিলে সে-যে কি সুন্দর কি মনোহর দেখায়, তাহা যে দেখিয়াছে, সে-ই বুঝিয়াছে; অন্যকে

বুঝাইবার নহে। তখন যেন সেই ভগবান্ই আর এক রকম হইয়া পড়েন,—তখন যেন সেই কাষ্ঠ-পাষাণ-ধাতুমূর্ত্তি ভেদ করিয়া ভাবে-ভরা রসেপোরা কি এক মধুরমধুর মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে। এ মূর্ত্তি কখনও দেখিয়াছ কি ভাই? যদি না দেখিয়া থাক তো ঐ ভাব-বিভোর রঘুনাথকে মানসচক্ষে দেখ, আর তাঁহার সম্মুখে ঐ জগন্নাথকে দেখ—এঁকে দেখিয়া ওঁকে দেখ, আবার ওঁকে দেখিয়া এঁকে দেখ, চিরমধুর চিরনবীন মাধুর্য্য-সাগরে তুমিও ডুবিয়া যাইবে।

রঘুনাথ এইরূপে কখনও কলারাটগৃহে নৃত্য করেন, কখনও জগমোহনে আসিয়া গড়াগড়ি দিতে থাকেন, কখনও বা গরুড়ের পশ্চাতে দুই বাহু তুলিয়া দাঁড়াইয়া আপনার অন্তরের কথা প্রভুকে বিজ্ঞাপিত করেন। ফল কথা, তিনি অন্তরে-বাহিরে হরিময় হইয়া সেই হরিক্ষেত্রে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ভিক্ষা করিয়া যাহা পা'ন, তাহা পতিব্রতা অন্নপূর্ণার হস্তে আনিয়া দেন। অন্নপূর্ণা তাহা দেবী অন্নপূর্ণার মত পরমানন্দে পাক করেন এবং অতিথি-অভ্যাগত সাধুসন্ন্যাসীকে ভোজন করান; পরে পতিকে আহার করাইয়া অবশিষ্ট থাকিলে নিজেও ভোজন করেন। কিন্তু পতির ভোজন না হইলে সতী বারিবিন্দুও পান করেন না। পতিই তাঁহার পরমারাধ্য পরম দেবতা শ্রীপতি।

রঘু অরক্ষিতের ভাবময় নর্ত্তনগীতি ও ভগবানে ভক্তিই তাঁহাকে অল্পকালের মধ্যে সকলের প্রীতিশ্রদ্ধার পাত্র করিয়া তুলিল। বৈষ্ণব-সেবনের গুণেও অন্নপূর্ণার নাম দেশেদেশে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

তাঁহারা সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া হরিভজনে মজিয়া রহিয়া সেই হরিক্ষেত্রেই মানবজন্ম সার্থক করিতে থাকিলেন।

* * *

উৎকল-কবি বিপ্র রামদাস এই ভক্তচরিত্র বর্ণনার অবসানে দশেন্দ্রিয়াধিপতি মনের প্রতি সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—

"ভগত নিমন্তে শ্রীবৎস। হুয়ন্তি সে এড়ে সপক্ষ ॥
কেবল নির্ম্মল হৃদয়ে। ডাকিলে লক্ষে যোজনরে ॥
পাশে ডাকিলা প্রায়ে মনি। তাকু রখন্তি চক্রপাণি
কুটিল হৃদ যেউঁ নর। সে ডাকু রহিণ পাশর ॥
তাকু ববিরজন মতে। শুনন্তি নাহিঁ কদাচিতে ॥
এণু বিশ্বাস একা মুল। শুন হে মন মহীপাল ॥"

মন! তুমিই না এ দেহরাজ্যের রাজা। রাজার আদেশ প্রজার মত সকল ইন্দ্রিয়ই তো তোমার আদেশ অবনতমস্তকে বহন করিয়া থাকে। তাই তোমাকেই দেখাই,—তুমি দেখিলেই আর সকলেই দেখিতে পাইবে বলিয়া তোমাকেই দেখাই, দেখ দেখি একবার—ভক্তরক্ষার নিমিত্ত শ্রীবৎসলাঞ্ছন ভগবান্ কত সহায় কত সপক্ষ হইয়া থাকেন? আহা, সেই চক্রপাণি চিন্তমণি যদি লক্ষ যোজন দূরেও অবস্থান করেন, আর কেহ তাঁহাকে নির্ম্মল হৃদয়ে আহ্বান করিতে থাকে, তাহাহইলে তিনি—"বুঝি এই আমার পাশে হইতেই কেহ আমাকে ডাকিল" মনে করিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ রক্ষা করিয়া থাকেন। আর যদি কেহ কুটিল হৃদয় লইয়া তাঁহার গা-ঘেঁসাঘেঁসি থাকিয়াও তাঁহাকে গলাবাজি করিয়া ডাক দিতে থাকে, তাহা হইলে

সেই চিকণকালা কালারই মত সে কথা কখনও কাণে তুলেন না,—যেন শোনেনই নাই কিন্তু মন! জানিও, এ বিষয়ে বিশ্বাসই হইতেছে একমাত্র মূল। যদি বিশ্বাস কর তো সততই তাঁহার দয়ার হস্ত ইতস্তত দেখিতে পাইবে, করুণার অমিয়-ঝঙ্কারে কর্ণযুগল শীতল করিতে পারিবে। বিশ্বাস কর মন! বিশ্বাস কর। ঈশ্বরে—তাঁহার শক্তিতে—তাঁহার অলৌকিক আচরণে বিশ্বাস কর মন! বিশ্বাস কর। তাহা হইলে তোমাকে আর তাঁহার তত্ত্বনিরূপণ করিতে গিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে না।

আমরা আর কি বলিব, কেবল করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা করি, উৎকল কবির এই কোমল-কান্ত পদাবলী যেন অমূল্য মণি-মালিকার মত বিশ্ববাসীর কণ্ঠেকণ্ঠে বিরাজ করিতে থাকে—আর সরল বিশ্বাসের উজ্জ্বল আলোকে যেন সকলের অন্তর বাহির আলোকময় হইয়া উঠে।

দামোদর দাস।

দামোদর দাসের নিবাস কাঞ্চীনগরে। জাতিতে ব্রাহ্মণ। পুত্র নাই, কন্যা নাই, আছেন কেবল একমাত্র পত্নী। ভিক্ষাই তাঁহার জীবিকা। সমগ্র সংসার খুঁজিয়া তাঁহার মত আর একটি দরিদ্র ভিখারী পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া স্নান-আহ্নিক সারেন, দ্বাদশ অঙ্গে দ্বাদশ তিলক রচনা করেন, মস্তকের উপর নির্ম্মাল্য তুলসীদল ধারণ করেন এবং মুখে 'রাম কৃষ্ণ হরি' নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে ভিক্ষার নিমিত্ত নগরবাসীর দ্বারে দ্বারে পর্য্যটন করিতে থাকেন, আবার সন্ধ্যা হইলে গৃহে ফিরিয়া আসেন। ভিক্ষায় কিছু জুটিলে ভালই; না জুটিলেও প্রাণে অসন্তোষ নাই। তিনি ভিক্ষালব্ধ যাহা কিছু পতিপ্রাণা পত্নীর হস্তে আনিয়া দেন, পত্নীও পরমানন্দমনে তাহা পাক করেন এবং ভগবান্‌কে অর্পণ করিয়া উভয়ে প্রসাদ পাইয়া থাকেন। ইতিমধ্যে যদি কোন ক্ষুধার্ত্ত অতিথি আসিয়া উপস্থিত হন, তবে তাঁহারা তাঁহাদেরই অগ্রে সেবা করান, পরে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তো তবেই সেদিন তাঁহাদের উদর ভরণ হইল, নচেৎ উপবাসী থাকিতেও তাঁহারা কাতর নহেন, তাহাতেও তাঁহাদের পরমানন্দ।

পতি-পত্নীর প্রধান কার্য্য হইতেছে গোবিন্দ-ভজন। তাহাতেই তাঁহারা অহর্নিশ মাতিয়া আছেন। পরচর্চ্চা নাই, কাহারও গ্লানি করা নাই; হৃদয় তাঁহাদের জীব দয়ায় সদাই বিগলিত। অত

যে অভাব, কিন্তু ভগবানের কাছে তাঁহারা নিজের জন্য কিছুই চাহেন না, চাহেন কেবল জীবের মঙ্গল। পতিপত্নী হরিভজন করিতে করিতে যখনই হরির দেখা যেন পেয়েছি-পেয়েছি মনে করেন, তখনই তাঁহার কাছে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করেন,—মঙ্গলময়! জগতের জীব তো তোমার মঙ্গলময় মূর্ত্তি দেখিল না, মঙ্গল ভাবিয়া অমঙ্গলকেই তাহারা আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে, ঠাকুর! তাহাদের প্রতি দয়া কর;—তাহাদের ভ্রান্তি দূর করিয়া দাও,—তোমার আনন্দ-মন্দাকিনীর পূতধারায় তাহারা অভিষিক্ত হউক,—হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া সকলেই সকলকে ভালবাসিতে শিখুক, তোমার সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্য মূর্ত্তি সকলের হৃদয়ে-হৃদয়ে জাগরূক রহুক।

চর্ম্মমধ্যে আবদ্ধ থাকিলেও মৃগনাভির গন্ধ ফুটিয়াই বাহির হয়। দামোদর দাসেরও যশোগন্ধ সেই ছিন্নকন্থা বা জীর্ণ পর্ণকুটীরের আবরণ মানিল না, সে ও তাহা ভেদ করিয়া দেশেদেশে ছড়াইয়া পড়িল; এ দেশ ও-দেশ যাইতে-যাইতে ক্রমশঃ সেই আসল দেশে,—যে দেশে গেলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না—সেই আমাদের আসল দেশেও যাইয়া পঁহুছিল। সে দেশের রসিক রাজা অমনি সেই গন্ধ ধরিয়া কাঞ্চীনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উদ্দেশ্য—জিনিষটা আসল কি নকল, একবার বুঝে দেখা। রাজা বড় মায়াবী। আসিয়াই তিনি এক মায়া-সন্ন্যাসি-মূর্ত্তি ধরিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি, গলে রুদ্রাক্ষমালা, মস্তকে জটা, কর্ণে তাম্র-কুণ্ডল। দুর্ব্বল বৃদ্ধ শরীর—যেন একটি পা চলিবার শক্তি নাই।

যষ্টি-হস্তে ধীর-পদ-বিক্ষেপে তিনি দামোদর দাসের দ্বারদেশে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন।

এদিকে দামোদর দাস সেদিন ভিক্ষায় একমুষ্টি তণ্ডুলও পান নাই, রিক্ত-হস্তে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছেন; পতি পত্নী উভয়ে ক্ষুৎ-ক্ষাম দেহে ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া চিন্তামণির চরণ চিন্তা করিতেছেন। মনেমনে বলিতেছেন,—

"ভো প্রভু দীনজনবন্ধু। নাম করুণাময় সিন্ধু॥
অরক্ষ-রক্ষণ তো বাণা। ভৃত্য-দুরিত-বজ্র-সেহ্ণা॥
দুর্জ্জন-মণ্ডুকর ফণী। জগত-জন-চিন্তামণি
গর্ব্বিত-করীর কেশরী। সকল জীবে অধিকারী॥
তেণু শরণ গলি তোতে। আতঙ্ক রক্ষা কর মোতে॥
এড়ে নিষ্ঠুর সময়রে। যেবে অতিথি মোর দ্বারে॥
আসিন হইব প্রবেশ। তাহাকু দেবি মুহিঁ কিস॥"

ঠাকুর! তুমি 'প্রভু';—নিগ্রহ করিলে করিতে পার, অনুগ্রহ করিলেও করিতে পার। কিন্তু দীনের তো আর কেহই নাই, তুমিই তাহাদের একমাত্র বন্ধু। তাই না তোমায় লোকে করুণার অপার সাগর বলিয়া ডাকিয়া থাকে। যাহাদের আর রক্ষা করিবার কেহই নাই, তাহাদিগকে রক্ষা করিবে বলিয়াই না তুমি তোমার চক্রে 'বাণা' (নিশান) উড়াইয়াছ। ঠাকুর! তুমি বজ্রবর্ম্মের মত তোমার ভৃত্যের অঙ্গে রহিয়া তাহার সমস্ত দুরিত দূর করিয়া দাও। নাথ! তুমি দুর্জ্জন-রূপ ভেকের কালান্তক কালসর্প। তুমি বিশ্ববাসি-জনের অমূল্য চিন্তামণি। তুমি

গর্ব্বমদে মত্ত মানব-মাতঙ্গের বিনাশকারী কেশরী। তুমি সকল জীবেরই অধিপতি। তাই আজ এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবাধমও তোমার শরণাগত হইয়াছে। তাহাকে তাহার আতঙ্ক হইতে রক্ষা কর প্রভু! রক্ষা কর। আতঙ্ক আর কিছুই নয় ঠাকুর, এ দাস মহামহিম নামমন্ত্রের মহাপ্রভাবে জাগতিক তুচ্ছ আতঙ্ক কি, মরণভয়েও ভীত নহে, সে আতঙ্কনাশের জন্যও সে প্রার্থনা করিতেছে না। তাহার ভয়—যদি এই দুরন্ত সময়ে তাহার দ্বারে কোন অতিথি আসিয়া উপস্থিত হন, তবে তাঁহার সেবা নির্ব্বাহ হইবে কি প্রকারে?

যেখানেই বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা হয়! দামোদর দাস ও তাঁহার পত্নী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন। তাঁহাদের নয়নজলে ধরিত্রী আর্দ্র হইয়া যাইতেছে; আর এমনই সময় তাঁহাদের কর্ণে অতিথির করুণ স্বর যাইয়া প্রবেশ করিল,—"ঘরে কে আছ হে, আমি অতিথি তোমাদের দ্বারে অপেক্ষা করিতেছি। অতিথির কাতর কণ্ঠস্বর কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিবামাত্রই দামোদর দাস শশব্যস্তে বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন,—শ্রান্তক্লান্ত জরাজীর্ণ জ্যোতির্ম্ময় যোগী মহাপুরুষ। তিনি ভক্তিভরে তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং অতি বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, —স্বামিন্! দাসের প্রতি কি অনুমতি হইতেছে, অকপটে প্রকাশ করুন। মায়াযোগী বলিলেন,—বাপুহে! তোমার বড় কীর্ত্তি শুনি—তুমি নাকি অতিথি-অভ্যাগতকে পরমাদরে ভোজন করাও। আমি তো যার-তার বাড়ী আহার করি না; অতিথিসেবায়

যাহার শ্রদ্ধা নাই, সে আহারের জন্য যাচাযাচি করিলেও আমি তাহার দিকে ফিরিয়া দেখি না, কিন্তু শ্রদ্ধালু অতিথিভক্তের অন্নই আমি আপনি চাহিয়া ভোজন করিয়া থাকি। অতিথি সেবকের মধ্যে তোমার নামটা প্রায়ই কাণে আসে, তাই তোমার অন্নে বড় লোভ হইল; আজ মনে হইল—যাই একবার দামোদর দাসের বাড়ী ভোজন করিয়া আসি; তাই বাবা! এসেছি,—প্রাচীন শরীর চলা-ফেরা করা ভার, তবুও তোমার অন্ন ভোজনের লোভেই এসেছি, এখন একমুষ্টি অন্ন দিবে কি না বল।

হায় হায়, দামোদর দাস যে আশঙ্কায় অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই আশঙ্কাই তাঁহার উপস্থিত! অতিথির কথা শুনিয়া তিনি বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িলেন। কি করেন, শ্রীহরির যাহা ইচ্ছা, ভাবিয়া তিনি শীতল সলিলে যোগিবরের পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন এবং মিষ্টবাক্যে বলিলেন,—ঠাকুর! আপনাকে বড়ই পথশ্রান্ত দেখিতেছি, আপনি এই তৃণাসনে একটু বিশ্রাম করুন, আমি এখনই আসিতেছি। বলিয়া তিনি পত্নীর নিকটে গমন করিলেন এবং অনুচ্চস্বরে কহিতে লাগিলেন,—সতি! দ্বারে অতিথি উপস্থিত, ভোজন ভিক্ষা করিতেছেন, ঘরেও তো কিছুই নাই, এখন কি উপায় করা যায় বল?

পত্নী বলিলেন,—স্বামিন্! আমায় জিজ্ঞাসা করাই বৃথা। তোমার তো আর অজ্ঞাত কিছু নাই। ঘর-দ্বার বেচিলেও আমাদের এক পণ কৌড়ি হওয়া কঠিন। হায়, যদি একখানি বস্ত্র থাকিত, তাহা হইলেও তাহা বেচিয়া কিছু-না-কিছু পাওয়া

যাইত; তাহাও তো নাই নাথ! ছেঁড়া নেকড়া আর মাটীর জল-পাত্রই আমাদের একমাত্র সম্বল; তাহার বিনিময়ে কে আর আমাদের কৌড়ি দিতে যাইবে? এই বলিয়া সতী অধোবদনে অশ্রু-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিয়া দামোদর দাসের নয়নও অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কেবল বলিলেন,—তবে কি হবে সতি! তবে কি হবে? তবে কি অতিথিসেবা হবে না? হায় হায়, দ্বার হইতে অতিথিই যদি ফিরিয়া গেলেন, তবে আর ছার জীবনে প্রয়োজন? গোবিন্দ হে! এ কঠোর পরীক্ষা কেন প্রভু?

পতির অবস্থা দেখিয়া পতিব্রতার বড় ভয় হইল, ভাবনায় তাঁহার শরীর থরথর কাঁপিয়া উঠিল; তিনি একান্ত মনে আকুল-প্রাণে সেই অকুলের কাণ্ডারী শ্রীহরিকে ডাকিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে তিনি যেন চমকভাঙ্গা হইয়া পতির প্রতি হাসিহাসি-মুখে বলিয়া উঠিলেন,—স্বামিন্, অত কাতর হইতেছ কেন? আমাদের প্রভু যে সেই জগন্নাথ; নিশ্চয়ই তিনি অতিথির অন্ন দিবেনই দিবেন। এখন তুমি এক কাজ কর, শীঘ্র নাপিত-ভবনে গিয়া একখানি 'ক্ষুর' চাহিয়া আন। তাহার পর যাহা করিতে হইবে বলিতেছি।

দামোদর দাস কি করেন, তিনি তাড়াতাড়ি নাপিত-গৃহ হইতে একখানি ক্ষুর চাহিয়া লইয়া আসিলেন। পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বল, এখন কি করিতে হইবে? পত্নী হাসিতে হাসিতে তাঁহার কেশদাম দেখাইয়া বলিলেন,—দেখ, আমার এই কেশ-

রাশির অর্দ্ধাংশ ঐ কাতুরী দিয়া কাটিয়া ফেল, তার পর দু'জনে মিলিয়া চুল-বাঁধিবার দড়ি তৈয়ারি করিয়া ফেলি; আর তুমি গিয়া সেগুলি বেচিয়া কৌড়ি আন, অতিথিসেবার ভাবনা কিসের ?

দামোদর দাস মনেমনে সহধর্ম্মিণীর শত ধন্যবাদ দিতেদিতে স্বহস্তে তাঁহার মস্তকের চারিধারের কেশগুলি রাখিয়া দিয়া মধ্য-ভাগের কেশগুচ্ছ পুঁছিয়া কাটিয়া লইলেন এবং দুইজনে তাড়াতাড়ি দড়ি বিনাইতে বসিয়া গেলেন। যত শীঘ্র সম্ভব এক রকম মোটা-মুটি দড়ি বিনানো হইয়া গেল। দামোদর দাস তাহা বিক্রয় করিতে লইয়া গেলেন। ভাগ্যবশে পথেই একজন খরিদ্দার জুটিয়া গেল। পাচপণ কৌড়ি দিয়া দড়িগুলি সে কিনিয়া লইল। দামো-দরও মহানন্দ-মনে সরু চাউল, মুগের বিয়লী, ঘৃত, নবাত, দুগ্ধ, দধি, তরি-তরকারি প্রভৃতি কিনিয়া আনিয়া পত্নীর সমীপে হাস্য-মুখে উপস্থিত হইলেন। পতিব্রতা পাককার্য্যে বড়ই নিপুণা; দেখিতে-দেখিতে তিনি অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। দামোদর দাস মহা হর্ষমনে সাদর-সম্ভাষণে অতিথিদেবতাকে গৃহ-মধ্যে আনয়ন করিলেন। পতি-পত্নী উভয়ে মিলিয়া পরমাদরে তাঁহার চরণ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন। দুইজনে ভক্তিভরে সেই জল কিঞ্চিৎ পান করিলেন, কিঞ্চিৎ মস্তকে ধারণ করিলেন। আহা, এখন তাঁহাদের আনন্দ রাখিবার আর স্থান নাই।

অহো, আজ ইঁহাদের কি ভাগ্য! ব্রহ্মা আপন কমণ্ডলুতে ভরিয়া রাখিয়াও যে জল একবিন্দু লাভ করিতে পারেন নাই,

আর ইঁহারা কিনা আজ আপন ঘরে বসিয়া তাহা সাধ মিটাইয়া পান করিয়া লইলেন! কারণ আর কিছুই নয়,—

"ভাবকু নিকট গোসাইঁ। অভাবলোকে ভেট নাহিঁ॥"

অন্তরের বিশুদ্ধ ভাব লইয়াই কথা। যেখানে ভাব-কদম্ব ফুটিয়া উঠে, মধুলম্পট মধুকরের মত গোঁসাই (প্রভু—ভগবান) তাহার সেই ভাবগন্ধ ধরিয়া আপনি সেখানে যাইয়া উপস্থিত হন। কিন্তু অ-ভাব অর্থাৎ ভাবহীন ব্যক্তি কিছুতেই তাঁহার ভেট বা দর্শন লাভ করিতে পারে না। তাই না সাধক কবি রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন,—

"সে যে ভাবের মানুষ ভাব ব্যতীত অ-ভাবে কে ধ'র্ত্তে পারে?"

একখানা ভাঙ্গা পিঁড়া ছিল। পতিপত্নী তাহাই পাতিয়া দিয়া আদর করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন। একখানি কলাপাতা বিছাইয়া তাহার উপর অন্ন-ব্যঞ্জন পরিবেশন করিলেন। শ্রীগোবিন্দও মহানন্দে ভোজন করিতে লাগিলেন। বুড়া মানুষ, বড় বেশী খাইতে পারিবেন না, ভাবিয়া তাঁহারা অধিক অন্ন-ব্যঞ্জন তাঁহাকে দেন নাই; দেখিতে-দেখিতে সেই সামান্য অন্ন-ব্যঞ্জন সমস্তই মায়া-বৃদ্ধ উদরস্থ করিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন,—আর কিছু থাকে তো আমায় দাও, উত্তম পাক হইয়াছে; ভারি তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিতেছি। দামোদর দাসের পত্নী অমনি তাড়াতাড়ি গিয়া অবশিষ্ট অন্ন-ব্যঞ্জন যাহা কিছু ছিল সমস্ত আনিয়া অতিথির পাত্রে পরিবেশন করিলেন। অন্তর্য্যামী জানিলেন যে, ইহাদের ঘরে খাদ্যদ্রব্য আর কিছুই নাই, তিনি সেই অন্ন-ব্যঞ্জন

গুলি চাঁচপোচ করিয়া খাইয়া ফেলিলেন। পরে আচমন করিয়া বসিয়া-বসিয়া হরিতকী ভক্ষণ করিতে লাগিলেন, আর ভাবিতে থাকিলেন,—অহো, ইহাদের জীবন ধন্য! ঘরে কিছুই নাই, সম্বলের মধ্যে ছেঁড়া নেকড়া এবং ভাঙ্গা ভাঁড়, তবুও কিন্তু অতিথি-সেবায় কি অপূর্ব্ব অনুরাগ! এই যে আজ আমাকে সমস্ত অন্ন-ব্যঞ্জন আহার করাইয়া ইহারা উপবাসী রহিয়াছে, কই তাহা-তেও তো ইহাদের অসন্তোষ কিছুই দেখিতেছি না। আশ্চর্য্য! যে কেশের জন্য রমনী কতই না কি করিয়া থাকে, অতিথিসেবার জন্য সে কেশেও তো দামোদর-পত্নীর অণুমাত্র আসক্তি দেখা গেল না। ইহাদের জোড়া কি আর জগতে মিলে?

ভগবান্ ভক্তের ভাবে বিভোর হইয়া এইরূপ কত কি ভাবিলেন, কিছুক্ষণ পরে দামোদর দাসকে আপন সমীপে ডাকিয়া বলিলেন,—ওহে ভক্ত! তোমাদের সেবায় বড় সন্তোষ লাভ করিয়াছি; তা বাপু! দেখিতে-দেখিতে রাত্রিটাও হইয়া পড়িল, বৃদ্ধ শরীর, আজ আর চলিয়া যাওয়া পোসাইবে না দেখিতেছি, রাত্রিটা এইখানে কাটাইয়া কল্য প্রাতেই চলিয়া যাইব এখন। তা আমার জন্য আহারের আয়োজন বড় বেশী কিছু করিতে হইবে না, এই 'এক ওলি' (ছোট মাটির ভাঁড়ের এক ভাঁড়) অন্ন হইলেই আমার চলিয়া যাইবে।

দামোদর দাস 'যে আজ্ঞা' বলিয়া পত্নীর নিকট গমন করলেন এবং চিন্তা-মলিন-মুখে বলিলেন,—সতি! অতিথির আজ আর চলিবার শক্তি নাই, রাত্রিটা তিনি এইখানেই কাটাইবেন, বলিতে-

ছেন। আহারের জোগাড়ও তো চাই, এখন উপায়? পতিব্রতা হাসি-হাসি মুখে বলিয়া উঠিলেন,—তার আর চিন্তা কি? এই বাকি চুলগুলি কাটিয়া ফেল; আবার দু'জনে বসিয়া চুলবাঁধা দড়ি বিনাইয়া ফেলি, তার পর তুমি গিয়া সেগুলি বেচিয়া চাল দাল আদি কিনিয়া আন; তার আর অত ভাবনা কেন? পত্নীর কথা শুনিয়া দামোদর দাস তাঁহাকে শতশত সাধুবাদ দিলেন এবং কাতুরী (ক্ষুর) দিয়া তাঁহার মাথার সমস্ত চুলগুলি পুঁছিয়া কাটিয়া লইলেন। পরে দু'জনে বসিয়া দড়ি বিনাইয়া ফেলিলেন। পূর্ব্বের মত সেই দড়ি বিক্রয় করিয়া পাঁচ পণ কৌড়ি পাইলেন এবং তাহাতেই চাল দাল প্রভৃতি কিনিয়া আনিলেন। পত্নীও হর্ষভরে রন্ধন করিতে বসিয়া গেলেন। আহা, সধবার আজ বিধবার ভাব দেখিলে চক্ষু কাটিয়া জল বাহির হইয়া পড়ে। তিনি কেশহীন মস্তকে একটু 'কানি' বাঁধিয়া রাখিয়া দিয়াছেন মাত্র। পুণ্যবতী সতীর আত্মদানেই আজ অতিথিসেবা হইল, ভাবিয়া দামোদর দাস আনন্দ অনুভব করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহার দিকে দৃষ্টি পড়িলেই, সেই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তিনি আর আত্ম সংবরণ করিতে পারিতেছেন না।

রান্না-বান্না হইয়া গেল, আবার তাঁহারা অতিথিকে আদর করিয়া আহার করাইলেন। এবারেও ভগবান্ 'আরো দাও আরো দাও' করিয়া সমস্ত অন্ন-ব্যঞ্জনই খাইয়া ফেলিলেন, পিপীলিকার প্রত্যাশার মতও পাতে কিছুই রাখিলেন না। আচমনাদি হইয়া গেল। দামোদর দাস তাঁহার শয়নের জন্য এক-

খানি ছিন্ন তৃণাসন বিছাইয়া দিলেন। তিনিও তাহাতেই শয়ন করিলেন।—

"যার আসন নাগরাজ। আবার বিনতা-আত্মজ॥
মুনিঙ্ক হৃদয়কমল। রুদ্রদেবতা-বক্ষঃস্থল॥
সে পুনি ভগত-ভাবরে শোইলে তৃণশয্যাপরে॥"

হায় হায়, নাগরাজ অনন্তদেব, বিনতানন্দন গরুড়ের পৃষ্ঠদেশ, মুনিগণের হৃদয়-কমল এবং রুদ্রদেবতার বক্ষঃস্থল যাঁহার আসন, ভক্তের ভাবের বলিহারি যাই, আজ সেই ভাবের প্রভাবে তিনি কিনা তৃণশয্যায় শয়ন করিলেন! অহো, ধন্য সেই ভক্তের বিশুদ্ধ ভাব, আর ধন্য সেই ভাবাধীন ভগবান্!

দামোদর দাস তখন ধীরেধীরে প্রভুর পাদ-সংবাহন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার পত্নী ছিন্ন বসনের অঞ্চল দিয়া আস্তেআস্তে বাতাস করিতে থাকিলেন। আর ভাবে-ভোলা ভগবান্ বৈকুণ্ঠের সুখ তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনে করিয়া যেন নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

অতিথিকে নিদ্রিত দেখিয়া সুন্দরী তাঁহার স্বামীকে বলিলেন,—আহা, অতিথি ঠাকুর বড়ই বৃদ্ধ, এই অশক্ত শরীরে ইনি কালই বা কি প্রকারে পথ চলিয়া যাইবেন? কল্য প্রাতঃকালে উঠিয়াই তুমি ভিক্ষা মাগিতে গমন করিও, ভাগ্যে যাহা মিলিবে, তাহা দিয়াই ইঁহার সেবা করা যাইবে, তারপর আমরা আজিকার মত কল্যও উপবাসী রহিব। যেমন স্ত্রী, তেমনই স্বামী; তিনিও অমনি বলিয়া উঠিলেন,—হাঁ হাঁ, সেই কথাই ভাল।

জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার যিনি অতীত, তাঁর

আবার জাগাই বা কি, আর ঘুমানই বা কি? ভগবান্ শুইয়া-শুইয়া সকলই শুনিতেছেন, শুনিতে-শুনিতে তাঁহার নয়ন-কমল ছল-ছল করিয়া উঠিল! ঐ যে—ঐ যে নয়নের কোণ দিয়া করুণার ধারাও যে গড়াইয়া পড়িল। আহা, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, দুইজনকে মায়ানিদ্রায় অভিভূত করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন। দেখিলেন,—পতি-পত্নী তাঁহার চরণতলে পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিয়া করিলেন কি? প্রথমেই তিনি পতিব্রতার মুণ্ডিত মস্তকে শ্রীহস্ত বুলাইতে-বুলাইতে বলিতে লাগিলেন,—পতিব্রতে! মা! মা!—আহা কি মিষ্ট, কি মিষ্ট,—আবার বলি—মা! মা! তোমার মস্তক কুঞ্চিত-কেশ-কলাপে পূর্ণ হইয়া যাউক; মা! মা! তোমার সকল শরীর নানা মণিমাণিক্য অলঙ্কারে ঝলমল করিয়া উঠুক; মা! মা! তোমার অঙ্গেঅঙ্গে ষোড়শী রূপসীর সৌন্দর্য্যসুষমা তরঙ্গায়িত হইতে থাকুক। শ্রীহরির শ্রীমুখের কথা ফুরাইতে-না-ফুরাইতে তাঁহার তাহা-তাহাই হইতে লাগিল, দেখিয়া আনন্দময়ের আনন্দ যেন উত্তরোত্তর বাড়িয়া-বাড়িয়াই উঠিতে লাগিল। তিনি এইবার দাঁড়াইয়া উঠিলেন। চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন। করুণা-কম্পিত-কণ্ঠে কহিলেন,—কুটীর! তুমি অট্টালিকা হও। তাহাই হইল। প্রভু আবার এদিক-ওদিক চাহিয়া বলিলেন—গৃহ-দ্বার! ধনরত্নে পুরিয়া যাও। তাহাই হইল। প্রভু তখন হর্ষমনে পতি-পত্নীর মস্তকে দুইটি করপদ্ম রাখিয়া ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ-আশীর্ব্বাদের অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আধআধ মধুময় ভাষে বলিলেন,—

"জীবন্তে সুখী হোই থাও। অন্তে বৈকুণ্ঠ গতি পাও॥"
ওগো, তোরা সুখেসুখে জীবন অতিবাহিত কর, আর জীবন ফুরাইয়া গেলে বৈকুণ্ঠ-গতি লাভ কর। আমি তোদের জীবনে-মরণে সঙ্গের সাথী হইয়া রহিলাম।

ভক্তযুগলকে অমিয়ময় আশীর্ব্বাদে সম্বর্দ্ধিত করিয়া ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন। নিশার অবসানে সতীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। নয়ন মেলিয়া দেখেন,—এ কি আচম্বিত কথা, সেই আমি কি এই আমি? কই, আমার পরিধানের ছেঁড়া নেকড়া কোথায় গেল; এ যে দেখিতেছি, বহুমূল্য বস্ত্র? ওঃ, আমার গায়ে এত গহনা কোথা হইতে আসিল? মাথায় হাত দিয়া তিনি আরও অধিক বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন,—তাইতো এ নেড়া মাথায় রাতারাতি রাশিরাশি চুল গজাইল কি প্রকারে? তার পর সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া দেখেন—জীর্ণ শীর্ণ রুক্ষ দেহে আগু-যৌবনের ঢলঢল লাবণ্য কোথা হইতে আসিল? হায় হায়, আমি কি খেয়াল দেখিতেছি? কই, সেই অশক্ত-শরীর অতিথিই বা কোথায় গমন করিলেন? তাঁহাকেও তো দেখিতে পাই-তেছি না? সতী সেই ভূমিশয্যা হইতে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। এদিক-ওদিক চাহিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে আর তাঁহার বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রহিল না। দেখিলেন,—সে পর্ণকুটীর নাই, সে তৃণশয্যা নাই, সে ভগ্ন মৃত্তিকাভাণ্ড নাই, আর সেই শতগ্রন্থি বস্ত্রখণ্ডও নাই;—এ যে প্রকাণ্ড অট্টালিকার প্রশস্ত প্রকোষ্ঠ, মহামূল্য মণিমাণিক্য এবং ধন-ধান্য বসন-ভূষণে ভরিয়া

রহিয়াছে! অহো, পতিও যে আমার দিব্য কন্দর্পমূর্ত্তি হইয়াছেন। কি বিচিত্র ব্যাপার! অবলা ব্যগ্রভাবে নিদ্রিত পতির হস্ত ধরিয়া টানিয়া তুলিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—নাথ! দেখ দেখ কি বিচিত্র—কি বিস্ময়কর ব্যাপার! দামোদর দাস নিদ্রিত-নেত্রে 'কি কি' বলিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং দুই হস্তে দুইটি চক্ষু রগড়াইয়া লইয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। সতীর আর বিলম্ব সহিল না, তিনি ব্যস্তসমস্তভাবে পতির হস্ত ধারণ করিয়া বাহিরের দিকে টানিয়া লইয়া চলিলেন, আর বলিতে লাগিলেন,—ওগো, এখানকার দেখা-টেখা এখন রেখে দাও, চল—সত্বর বাহিরে দেখ্‌বে চল, সে অতিথি ঠাকুর গেলেন কোথায়? তিনি সামান্য লোক নন গো সামান্য লোক নন। দামোদর দাস অমনি উঠিপড়ি করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। দেখিলেন,—সাবেক আর কিছুই নাই, সকলই নূতন হইয়া গিয়াছে,—দুঃখদারিদ্র্যের ভস্মস্তূপ ভেদ করিয়া দেবদুর্ল্লভ ঐশ্বর্য্যের শীতল আলোকের রশ্মি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তিনি আর একটি পদও অগ্রসর হইলেন না, ভাববিভোর হইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। শরীরে ঘনঘন রোম-হর্ষ হইতে লাগিল, নয়ন-প্রান্তে অশ্রুবারি উছলিয়া পড়িল; ভক্তিগদগদস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—স্থির হও, সুন্দরি! স্থির হও; সেই বৃদ্ধ অতিথি কি আর মানুষ যে, তাঁহাকে বাহিরে খুঁজিতে যাইব? দয়া করিয়া ধরা দিলে ভিতরে থাকিয়াই তাঁহাকে পাওয়া যায়, আর ধরা না দেন তো ভিতর বাহির চুঁড়িয়া বেড়াইলেও কিছু হই-

বার যো নাই। সেই প্রাচীন পুরুষকে কোথায় খুঁজিয়া বেড়াইতে যাইব বল? তিনি আছেনও সব ঠাঁই, আবার নাইও কোথাও। দেখা দেন তো এইখানেই দিবেন, না দেন তো কোথাও দিবেন না। এখনও তাঁকে চিনিতেছ না সুন্দরি? যাঁহার পাদস্পর্শে কাষ্ঠের তরী সুবর্ণময় হইয়াছিল, যাঁহার শ্রীচরণসংস্পর্শে পাষাণী মানবী হইয়াছিল, যাঁহার অঙ্গ-সঙ্গে কুব্জা রূপসী হইয়াছিল, এ কার্য্য তিনি ছাড়া অন্য কেহ করিতে পারে কি? তোমার আমার চেহারা দেখিয়াও কি তাহা বুঝিতে পারিতেছ না? যিনি এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা, সেই আদি-পুরুষই এই প্রাচীন পুরুষ জানিও। এই আমূল পরিবর্ত্তন ব্যাপার সেই চক্রধারীর চক্রেই অনুষ্ঠিত হইতে পারে, অন্যের পক্ষে ইহা আকাশকুসুমের মত কল্পনারই সামগ্রী। সতি! সতি! এস আমরা তাঁহার শরণাগত হই, কাতর-কণ্ঠে তাঁহার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি। হায় হায়, আমরা তাঁহাকে সামান্য মানুষই মনে করিয়াছিলাম! হায় হায়, না জানি তাঁহার সেবায় আমাদের কতই না ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিয়াছে! হায় হায়, আমরা পেয়ে রত্ন হারাইয়া ফেলিলাম!—

"ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি সুরাসুর। স্তুতি করন্তি যা পয়র॥
কমলা যার পরিচার। মো চ্ছার কেতেক মাতর॥
ভো প্রভু করুণাসাগর। মো অপরাধ ক্ষমা কর॥
ভৃত্য হোইলে অপরাধী। তু নাথ করুণাবারিধি॥
তুম্ভে যে যে ব্রহ্মাণ্ডঠাকুর। জীবঙ্ক হৃদয়ে বিহর॥
এণু অপ্রাধ মোর যেতে। প্রভু ন ঘেন কদাচিতে॥"

হায় হায়, ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি দেববৃন্দ এবং অসুরগণ যাহার পাদ-পদ্মের স্তব করিয়া থাকেন, কমলা যাহার সেবাকার্য্যে নিযুক্তা, ছার আমি আবার তাঁহার নিকট একটা পদার্থই বা কি? প্রভু হে করুণাসিন্ধু! আমার অপরাধ ক্ষমা কর। ভৃত্য না হয় অপরাধীই হইয়াছে, কিন্তু তুমি তো ঠাকুর করুণার অপার পারাবার। তোমার করুণার তোড়ে সে অপরাধ তো তিষ্ঠিতেই পারে না। নাথ! তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধিপতি, সকল জীবের হৃদয়ে-হৃদয়ে তুমি বিহার করিয়া থাক, তোমার অজ্ঞাত আর কি আছে; তাই প্রার্থনা—আমাদের এই অজ্ঞানকৃত অপরাধ কখনও গ্রহণ করিও না প্রভু!

দামোদর দাস ও তাঁহার পত্নী বহুক্ষণ ধরিয়া প্রভুর এই-রূপ স্তবস্তুতি করিলেন, কত কাঁদিলেন, ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিলেন, তারপর প্রকৃতিস্থ হইয়া মহামহোৎসবের আয়োজন করি-লেন। ভগবানের সেবা, অভিন্ন-ভগবান্ ভগবদ্ভক্তের সেবা, গো-ব্রাহ্মণ-সেবা প্রভৃতি পুণ্যানুষ্ঠান করিতে-করিতে তাঁহারা গোণা-দিন ফুরাইয়া দিলেন। দেহাবসানে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া দিব্যদেহে বৈকুণ্ঠনাথের সেবা করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণপ্রিয়ার পত্র।

শ্রীবৃন্দাবনের পশ্চিমে জয়নগর রাজ্য। রাজা জয়সিংহ সেই রাজ্যের অধিপতি। তিনি নানা গুণে গুণী; ধনে কুবেরের মত, দাতৃত্বে কর্ণের মত, বীরত্বে অর্জ্জুনের মত, ধৈর্য্যে ধরণীর মত, বিদ্যায় সরস্বতীর মত এবং বুদ্ধিতে বৃহস্পতির মত ছিলেন। তাঁহার দ্বারে লক্ষাধিক অশ্ব নিরন্তর বাঁধা থাকিত, পদাতী সৈন্যের তো সংখ্যাই নিরূপিত হইত না। তিনি দীন-দুঃখীর মাতা-পিতা। মোলায়েম মিষ্ট কথা তাঁহার হাসিমুখে লাগিয়াই আছে। হরিভজনেও অনুরাগ যথেষ্ট ছিল। যেমন তিনি, সহধর্ম্মিণীও তেমনি। তিনিও রূপেগুণে ধন্যা ছিলেন। নাম চন্দ্রাবতী। তাঁহার মত স্বামিসেবায় অনুরাগ লক্ষের ভিতর একজনেরও হয় কি না সন্দেহ। রাজা-রাণীর একটি পুত্র ও একটি কন্যা। পুত্রটি যেন সাক্ষাৎ কন্দর্প। কন্যাও কম নন; বর্ণ যেন কাঁচা সোণা, মুখখানি সদাই হাস্যপ্রফুল্ল, যেন পূর্ণিমার পূর্ণ চন্দ্র। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন ভেঙ্গে-চুরে গড়া—সে শোভার আর তুলনা নাই। তাঁহার সেই কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিত কেশ-কলাপ, খঞ্জন-গঞ্জন নয়ন, বিদ্রুম-সুন্দর সুরঙ্গ অধর, মুকুতার মত দন্ত, উচ্চ বিস্তৃত বক্ষঃস্থল, কোমল বাহুলতিকা প্রভৃতি দেখিলে মুনির মনও টলিয়া যায়। এই বিশ্ববিজয়িনী সুষমার-অফুরন্ত-খনি রমণীমণির নাম শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রিয়া। মাতা পিতা পুত্রের অপেক্ষাও ইহাকে অধিক ভালবাসেন। বাসিবারই কথা, কেন না, যে সকল সদ্‌গুণ থাকিলে মানুষ মানুষকে ভালবাসিয়া থাকে, তাঁহাতে তাহা পূর্ণমাত্রাতেই ছিল।

কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণ ছাড়া কিছুই জানেনই না। কৃষ্ণকথা শুনিতে-বলিতে তিনি বড় ভালবাসেন। ভগবানের পবিত্র চরিত্র অনুক্ষণ পঠন ও শ্রবণ করেন। সাধু-বৈষ্ণবের সেবার জন্য মঠে-মন্দিরে গোপনেগোপনে ধন-দ্রব্য প্রেরণ করিয়া থাকেন। স্থানে-স্থানে সদাব্রত স্থাপন, শুদ্ধভাবে ও দৃঢ়চিত্তে বিবিধ ব্রত অনুষ্ঠান তো তাঁহার নিত্য কর্ম্ম। তীর্থভ্রমণকারী সাধু-মহাত্মার মুখে তীর্থকথা শুনিতেও তাঁহার একান্ত আসক্তি। একদিন কোন তৈর্থিকের মুখে কথায়-কথায় শ্রীজগন্নাথের কথা শুনিয়া তাঁহার মন-প্রাণ গলিয়া গেল। সেই অবধি তিনি যখন তখন জগবন্ধুর কথা মনেমনে ভাবনা করিতেন। ভাবিতে-ভাবিতে নীলাচলনাথের অপার করুণার কথা, মহাপ্রসাদের অপরিসীম মহিমার কথা ও প্রভুর রথযাত্রা প্রভৃতি লীলার কথা হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল, আর অমনি আনন্দে তাঁহার হৃদয় গলিয়া যাইত। প্রেমাশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে গদ্গদবচনে বলিতেন,—হায়, কবে আমি সেই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গমন করিব, কবে আমি সেই দারুব্রহ্মের দর্শনলাভ করিব, কবে আমার সর্ব্বপাপ বিমোচন হইবে, কবে আমার ভব-বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে? হায়, আমি যে ছার রমণীজাতি, আমার কি আর সে সৌভাগ্য ঘটিবে? নাথ! এ চর্ম্মচক্ষে তোমার সাক্ষাৎ দর্শন ভাগ্যে ঘটুক আর না-ই ঘটুক একদিন কৃপা করিয়া স্বপ্নেও কি দেখা দিতে পার না? স্বপ্নে দেখা পাইলেও অভাগিনী আমি মহাভাগ্য বলিয়া মনে করিব। কৃষ্ণপ্রিয়া প্রেমভরে এই কথা বলেন, আর তাঁহার নয়ন দিয়া দরদর প্রেমের ধারা বহিয়া যায়, বদনে বক্ষ ভাসাইয়া ধরাতল সিক্ত করিতে থাকে।

শ্রীজগন্নাথেরই ইচ্ছা বলিতে হইবে, ঐ সময় তাঁহার একজন সেবক জয়নগরে আসিলেন। জগন্নাথের সেবকগণ তাঁহার পার্ষদ-মধ্যেই পরিগণিত, তার উপর তিলিচ্ছ মহাপাত্রের ঘর বড়ই সম্মানিত। ইনি সেই তিলিচ্ছ মহাপাত্রের পূর্ব্বপুরুষ, নাম—বন্ধু মহাপাত্র। ধন্য ধনলালসা, বন্ধু মহাপাত্র সামান্য ধনের লোভে জগবন্ধুর সেবা ছাড়িয়া নানাবিধ পথক্লেশ সহ্য করিয়া সুদূর পশ্চিম প্রদেশে আসিয়াছেন। তিনি ধনবান্‌দিগের গৃহেগৃহে গমন করিয়া শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ-নির্ম্মাল্য দান করেন, তাঁহারাও আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়া প্রচুর ধনরত্ন দিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন। এইরূপে বন্ধু মহাপাত্র অনেক ধন উপার্জ্জন করিলেন। তিনি জয়নগরে থাকিতে থাকিতে রাজনন্দিনী কৃষ্ণপ্রিয়ার কীর্ত্তিকাহিনী শুনিতে পাইলেন। মনেমনে ভাবিলেন,—কৃষ্ণপ্রিয়ার যখন জগন্নাথে অত ভক্তি, তখন জগন্নাথের নামে তাঁহাকে একখানি পত্র লিখি, অনেক ধন পাওয়া যাইবে। তিনি তখনই কৃষ্ণপ্রিয়াকে একখানি পত্র লিখিলেন।—

"শ্রীজগন্নাথঙ্ক নিমন্তে। যে শ্রদ্ধা হেব তুম্ভ চিত্তে॥
দেলে সে আম্ভে ঘেনি যিবুঁ। প্রভু চ্ছামুরে নেই দেবুঁ॥

রাজবালা! আমি শ্রীজগন্নাথের সেবক—পারিষদ লোক, তোমার যদি শ্রদ্ধা হয়, শ্রীজগন্নাথের নিমিত্ত যদি কিছু দিবার ইচ্ছা হয়, তবে আমার কাছেই দিতে পার; আমি তাহা লইয়া গিয়া প্রভুর সম্মুখে ধরিয়া দিব।

বন্ধু মহাপাত্র একখানি মুড়িয়া লোকদ্বারা কৃষ্ণপ্রিয়ার নিকট

প্রেরণ করিলেন। লোক যাইয়া রাজনন্দিনীকে একখানি পত্র প্রদান করিল। জগন্নাথের পারিষদের পত্র শুনিয়া কৃষ্ণপ্রিয়ার আনন্দ আর ধরে না। তিনি পত্রখানি একবার বুকে ধরেন, একবার মাথায় ধরেন, মোড়কের মুখে আনন্দের সহিত ঘনঘন চুম্বন করেন; যেন সাক্ষাৎ জগন্নাথকেই পাইয়াছেন। মোড়ক খুলিয়া তিনি পত্রখানি পাঠ করিলেন। একবার নয়, শতশতবার পড়িলেন; তাঁহার নেত্র দিয়া অশ্রুর প্রবাহ বাহির হইয়া পড়িল। হস্ত থরথর কাঁপিয়া উঠিল। পুলক কদম্বে সকল অঙ্গ পূরিয়া গেল। বিন্দু বিন্দু স্বেদবারিও দেখা দিল। কণ্ঠস্বর গদ্গদ হইয়া আসিল। বিম্ব-বিনিন্দিত অধরোষ্ঠ থাকিয়া-থাকিয়া কাঁপিতে লাগিল। আবোল-তাবোল কত কি বলিতে-বলিতে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি ভাব-সাগরে নিমগ্ন হইলেন,—নিমীলিতনয়নে দেখিলেন,—শঙ্খ-চক্রধারী শ্রীহরি তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া বসিয়াছেন। আবার নয়ন মিলিয়া দেখেন,—তিনিই তাঁহার নয়নে-নয়নে। এইরূপে কিছুক্ষণ কাটিল। বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া তিনি মহা চিন্তায় পড়িয়া গেলেন; তাই তো করা যায় কি, আমি সেই জগন্নাথকে কি দ্রব্য দান করি? হায়, মহালক্ষ্মী যাঁহার ঘরণী, অষ্টনিধি যাঁহার পরিচায়ক, বিধাতা যাঁহার আজ্ঞাবহ, রত্নাকর যাঁহার নিজ নিবাস, তাঁহার আবার অভাব কিসের? এই বিশ্বসংসার ভরণ করেন বলিয়াই যিনি বিশ্বম্ভর, তাঁহাকে দিবারই বা কি আছে? হাস্যেরই কথা,—জগন্নাথকে কিছু দিতে হইবে।

অহো! যাঁহার দর্শনে পাপীর পাপ তাপ দূরে যায়, মহাপ্রলয়েও

যাঁহার পৃষ্ঠদেশ টলে না, সেই নীলাচল-পীঠ যাঁহার নিবাসস্থল, তাঁহাকে আমি আবার বসিবার কি পীঠ (পিঁড়া) প্রদান করিব? পতিতপাবনী সুরধুনী যাঁহার পাদসলিল, তাঁহার উপযুক্ত পাদ্য এ জগতে কোথায় মিলিবে? অম্লান-পারিজাত-মাল্য যাঁহার গলদেশে সতত বর্ত্তমান, তাঁহাকে আমি কোন নশ্বর পুষ্প উপহার দিতে যাইব? অমূল্য অগুরু চন্দন যাঁহার ভোগরন্ধনের ইন্ধন, তাঁহাকে দিবার চন্দন কি আছে? উজ্জ্বল কৌস্তুভমণি যাঁহার বক্ষে বিরাজিত, তাঁহাকে উপহার দিবার উপযুক্ত মণি কোথায় পাইব? পক্ষিরাজ গরুড় যাঁহার বাহন, অশ্ব গজাদি বাহনে তাঁহার কি হইবে? যাঁহার ফণায় ফণায় অমল মণি ঝলমল করিতেছে, সেই সহস্র-ফণ নাগরাজ যাঁহার শয্যা, আমাদের তুচ্ছ শয্যা কি তাঁহাকে সাজে? কোটি সূর্য্যসম-তেজোদীপ্ত সুদর্শন যাঁহার অস্ত্র, তাঁহাকে অস্ত্রশস্ত্রই বা কি দান করিতে যাইব? হে প্রভু! এই চতুর্দ্দশ ভুবনের কোন সামগ্রীই তো তোমাকে দিবার উপযুক্ত দেখিতে পাইতেছি না। হৃদ্বিহারি, তুমি হৃদয়ে-হৃদয়েই বলিয়া দাও'— কোন্ সামগ্রী তোমায় দিতে হইবে, কি বস্তু পাইলে তুমি প্রীত হও।

কৃষ্ণপ্রিয়া এইরূপ বলিতে-বলিতে যেন কিছুক্ষণ ধ্যান-স্তিমিত-নেত্র হইয়া রহিলেন। তারপর অকস্মাৎ হাসিতে-হাসিতে বলিয়া উঠিলেন,—হাঁ হাঁ, এইবার তোমার কিসের অভাব, তাহার হদিস্ পাইয়াছি পাইয়াছি।—

"আবর কুলকন্যাগণ। নাগরী চতুরী সিহান ॥

তুম্ভর মন নেলে হরি। রখিলে অতি গোপ্যকরি॥
যেতে মাগিল মহাবাহু। লেউটি ন দেলে সে আঁউ॥
ক্ষীর-নীরর প্রায় হেলা। মনরে মন মিশি গলা॥
খোঁজি ন পাই বর্ণ চিহ্ন। কেবল হেলা মহাশূন্য॥
আউ সকল দ্রব্য অছি। তোতে অপূর্ব্ব নাহিঁ কিছি॥
মন মাত্রক লব-লেশে। নাহিঁ তুম্ভর হৃদদেশে॥"

শ্রীবৃন্দাবনের চতুরী সিয়ানী নাগরী গোপকন্যাগণ তোমার মন হরণ করিয়া লুকাইয়া রাখিয়া দিয়াছে, তুমি কাকুতি-মিনতি করিয়া কতই না প্রার্থনা করিলে, কিন্তু কই তাহারা তো আর তোমার মন তোমাকে ফিরাইয়া দিল না। দুধে জলে মিশা-মিশির মত তাদের মনে আর তোমার মনে এমন মিশামিশি হইয়া গিয়াছে যে, আর তার বর্ণচিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া ভার। সে যেন শূন্যে শূন্য মিশিয়া মহাশূন্য হইয়া গিয়াছে। তাই মনে হয়, তোমার আর যত দ্রব্য থাকিতে হয় থাকুক, অন্য অভাবও কিছু না থাকুক, কিন্তু তোমার অন্তরে মনের ছিটে-ফোঁটাও নাই, সেই মনের খাঁকৃতিই তোমার একমাত্র অভাব।

বেশ কথা, উত্তম কথা, যাহার অভাব তাহাই তোমাকে দিতেছি। ধর, এই আমি আমার মন তোমাকে দান করিলাম। এখন হইতে আর আমি আমার নই, তোমার কেনা-দাসী হইয়া রহিলাম। এতদিন আমার মন আমাকে যাহা বলাইত তাহাই বলিতাম, যাহা করাইত তাহাই করিতাম, অতঃপর আর তাহা করিব না; তুমি আমায় যাহা বলাইবে তাহাই বলিব,

যাহা করাইবে তাহাই করিব। কোন আদেশের প্রতিবাদ করিব না।

সুন্দরী মনেমনে এই সকল কথা বলিয়া শ্রীজগন্নাথের নামে মনের দানপত্র লিখিতে বসিলেন। বসিলেন বটে, কিন্তু এ নয়নে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। অশ্রুতে নয়ন দুইটী ভরিয়া গেল, যেন কেমন ভিতরটানেও মুদিয়া আসিতে লাগিল। প্রেমরাজ্যের বুঝি সকলই অস্ফুট—সকলই আধো আধো। প্রেমের উদয় হইলে ভাষাও ফোটে-ফোটে ফোটে-না, ভাবও ছোটে-ছোটে ছোটে না, কথাও জোটে জোটে জোটে-না। প্রেম বুঝি সকল সামগ্রীই এলোথেলো করিয়া দেয়। প্রেমিকও বুঝি তাই এলোথেলো হইয়া পড়েন। কৃষ্ণপ্রিয়াও প্রেমের প্রাবল্যে এলোথেলো হইয়া কম্পিতকরে জড়িতজড়িত অক্ষরে দানপত্রখানি লিখিয়া ফেলিলেন।—

ওহে ও জগতস্বামি !

এ বিশ্ব-সংসার, সকলি তোমার,

তোমারে কি দিব আমি॥

(সুধু) মনটি তোমার নাই।

যত গোপনারী, রেখে দেছে হরি,

তাহা তো তোমার চাই॥

এই ধর নাও মন।

দিয়া হ'নু দাসী, নীলাচলশশি,

দানপত্র এ লিখন॥

কৃষ্ণপ্রিয়া মম নাম।
জয়সিংহ পিতা, চন্দ্রাবতী মাতা,
জয়নগরেতে ধাম ॥

পত্রখানি লেখা হইয়া গেল। আহা, নয়নজলে সেখানি ভিজিয়া জব্‌জবে হইয়া গিয়াছে। তিনি একখানি খামের মধ্যে প্রেমাশ্রুসিক্ত পত্রখানি রাখিলেন। অন্য জলের আবশ্যক হইল না, প্রেমাশ্রু-সলিলেই তাহা আঁটিয়া ফেলিলেন। তাহার উপর মোহর করিয়া দিয়া আপন মনের প্রতি বলিতে লাগিলেন,—

"বোইলে—শুন আরে মন। তূ ত দুর্জ্জয় মহাশূন্য ॥
নিশ্চল নোহু কদাচিতে। তেণু মা গুচ্ছি মুহিঁ এতে ॥
গোবিন্দচরণে রহিবু। নিশ্চল হোই একা থিবু ॥
এহি সুদয়া মোরে হেউ। লেউটি ন আসিবু আউ ॥"

আরে মন! তুই তো মহাশূন্য স্বরূপ, তোকে জয় করা তো সহজ নয়; কিছুতে তুই নিশ্চলও হইস্ না; তাই তোর কাছে প্রার্থনা করি,—তুই এখন নিশ্চল নিঃসঙ্গ হোয়ে শ্রীগোবিন্দের পাদ-পদ্মে থাকিবি, দেখিস্ যেন সেখান থেকে আর ফিরিয়া আসিস্ না; আমার প্রতি তোকে এইটুকু দয়া করিতেই হইবে।

কৃষ্ণপ্রিয়া সখী আনন্দাকে ডাকিয়া তাঁহার হস্তে সেই পত্রখানি এবং দশটি সুবর্ণমুদ্রা দিয়া বলিলেন,—সখি! যাও, শীঘ্র যাও, সেই শ্রীজগন্নাথের সেবকের হস্তে এই পত্রখানি দিয়া এস। তাঁহাকে আমার অসংখ্য প্রণাম জানাইয়া প্রণামীস্বরূপ সুবর্ণমুদ্রা দশটি দিও, আর বিনয়-বচনে বলিও, তিনি যেন দয়া করিয়া সেই নীলাদ্রিনাথকে

এই দানপত্রখানি দান করেন, আমার তাঁহাকে যাহা কিছু দিবার, তাহা এই পত্র মধ্যেই রহিল।

আনন্দা ত্বরিতগতিতে বন্ধু মহাপাত্রের নিকটে গমন করিলেন এবং বিনয়বাক্যে প্রণামী ও পত্র দিয়া কৃষ্ণপ্রিয়ার কাকুতি-মিনতি জানাইলেন। মাত্র দশটি সুবর্ণমুদ্রা দেখিয়া মহাপাত্র তো চটিয়াই লাল। আনন্দার কথার কোন উত্তর না দিয়া কেবল মাথা নাড়িয়া অভিমতি জানাইয়া সত্বর সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন। মনে মনে বলিলেন,—ওঃ, জয়সিংহের কন্যা তো ভারি দানশীলা দেখিতেছি, জগন্নাথের নাম করিয়া প্রার্থনা জানাইলাম, তাহার বিনিময়ে পাইলাম কিনা দশটী মুদ্রা। ধিক্ তার দানশীলতায়, ধিক্ তার বৃথা প্রশংসায়। দেখি পত্রখানি খুলিয়াই দেখি, এর ভিতরে আবার জগন্নাথকে যা দিবার কি অপূর্ব্ব সামগ্রী দিয়াছেন। মহাপাত্র পত্রখানির একবার এদিক্ ওদিক্ দেখিলেন, হাতে করিয়া নাড়িয়াচাড়িয়া ভারি কিনা পরীক্ষা করিয়া লইলেন; তারপর মুখভঙ্গী করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—হাল্কা ফন্‌ফনে একরত্তি পত্র, তার ভিতরে আবার কি থাকিবে বল; ও সব ভুয়া কথা, পত্রের ভিতর কিছুই নাই—কিছুই নাই। এই বলিয়া তিনি ফড়ফড় করিয়া খামখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং হিজিবিজি লেখা দেখিয়া দূর করিয়া পত্রখানি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

হায় ধনলুব্ধ পণ্ডা, তুমি ও-পত্রের কদর কি বুঝিবে? তোমার তো প্রেমনেত্র নাই, তুমি কি ও-লেখা পড়িতে পার? পড়িতে পারিলেও কি তোমার লোভকলুষিত হৃদয়ে উহার ভাব ধারণ করিতে

পারিবে? কখনই না,—কখনই না। কৃষ্ণপ্রিয়া যাঁহাকে প্রাণেপ্রাণে বসাইয়া এই পত্র লিখিয়াছেন, হয় তিনি, না হয় তাঁহার অনুগৃহীত জন ছাড়া অন্য কেহই এ পত্রের ভাব বুঝিবেন না,—বুঝিবেন না।

বন্ধু মহাপাত্র সেদেশে আর থাকিলেন না। যাহা কিছু ধনরত্ন পাইয়াছিলেন, তাহা লইয়াই স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং কয়েক মাস পরে শ্রীক্ষেত্রধামে আসিয়া পঁহুছিলেন। প্রথমেই দেউলে গিয়া শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিলেন এবং দুঃখসুখের কথা জানাইয়া আপন ভবনে চলিয়া গেলেন।

এদিকে হইয়াছে কি? বন্ধু মহাপাত্র যাই কৃষ্ণপ্রিয়ার পত্রখানি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছেন, সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বগত জগন্নাথও অমনি শ্রীহস্ত বিস্তার করিয়া সেখানি ধরিয়া লইয়াছেন। আহা, ভক্তের ভাবে ভোলা ভগবানের তাহাতে আনন্দই বা কত।—

"যেসনে অমি দীন জন। পাইলে অমূল্য রতন॥
যেতে আনন্দ মন তার। তহুঁ অধিক দামোদর॥
জন্মরু অন্ধ হোই থাই। সে যেহ্নে দিব্য চক্ষু পাই॥
কিঅবা শতে জন্ম যাএ। যেবা অপুত্র হোই থাএ॥
পাইলে উত্তম নন্দন। যেমন্ত হোএ তার মন॥
তহুঁ আনন্দ গলা বলি। তেসন হেলে বনমালী॥"

অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তি যদি অমূল্য রতন পায়, তাহার মনে তখন যে আনন্দ দামোদরের এ আনন্দ তাহার অপেক্ষাও অধিক। জন্মান্ধ ব্যক্তি দিব্যদৃষ্টি লাভ করিলে কিংবা শতজন্মের অপুত্র উত্তম পুত্র প্রাপ্ত হইলে যে-প্রকার আনন্দে মাতিয়া উঠে, বনমালীর এ আনন্দ তাহার চেয়েও অনেক বেশী

অহো, ভক্তগণ না-জানি কি-এক সামগ্রী মাথাইয়া ভগবান্‌কে সকল সামগ্রী সমর্পণ করেন, যাহা আত্মানন্দে পরিপূর্ণ আনন্দময়ের হৃদয়েও আনন্দের তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিয়া দেয়। ভক্তের নিজস্ব সেই অসীম-শক্তি সামগ্রীর জয় হউক!

করুণাময় করিলেন কি, কৃষ্ণপ্রিয়ার সেই পত্রখানি লইয়া পট্ট-সূত্র দিয়া বাঁধিলেন এবং প্রেমে গরগর হইয়া কণ্ঠে ধারণ করিলেন। কৌস্তুভমণির সহিত কৃষ্ণপ্রিয়ার পত্রখানিও তাঁহার হৃদয়মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল।

সেইদিনই রজনীযোগে জগন্নাথ বন্ধু মহাপাত্রের গৃহে গমন করিয়া স্বপ্নযোগে বলিলেন,—ওহে ও মহাপাত্র; তুমি যে সামান্য ধনের আশায় আমার সেবা ছাড়িয়া জয়নগরে গমন করিয়াছিলে, তাহার জন্য আমি তোমাকে কিছুই বলিতে চাহি না। তুমি নিজে যাহা উপার্জ্জন করিয়াছ, তাহার অংশ লইতেও আমি আসি নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে চাই, আমার ধনে তুমি আমাকে বঞ্চিত করিলে কি নিমিত্ত? কৃষ্ণপ্রিয়া তোমার হস্তে আমায় যাহা প্রেরণ করিয়াছিল, তাহা আমার অমূল্য রতন, তুমি কিনা তুচ্ছ পদার্থের মত তাহা দূর করিয়া ফেলিয়া দিলে? কৃষ্ণপ্রিয়ার পত্রখানিকে তুমি সামান্য মনে করিও না; তাহা আমার আকল্প সঞ্চিত ধন। আর তুমি কিনা সামান্য কাগজ মনে করিয়া তাহা ফেলিয়া দিলে? তুমি ফেলিয়া দিলেও আমার সম্পত্তি আমি ছাড়ি কি প্রকারে? এই দেখ বিপ্র! আমি তাহা তখনই লইয়া আসিয়াছি। এই দেখ,— আমার হৃদয়ের দিকে চাহিয়া দেখ, পরম আদরে তাহা হৃদয়েই

ধরিয়া রাখিয়াছি। ভক্তের উপহৃত 'হৃদয়'—হৃদয় ছাড়া আর কোন্‌খানেই বা রাখিব বল? আমার আদেশ'—তুমি কলাই একখানি সুবর্ণপদক প্রস্তুত করাইতে চাও, তাহার মধ্যে এই পত্রখানি অতি সন্তর্পণে রাখিয়া দিয়া সুবর্ণ-শৃঙ্খলে সংলগ্ন করিয়া আমার গলায় ঝুলাইয়া দিতে চাও। আদেশ সত্বর প্রতিপালন কর তো উত্তম, নচেৎ তোমার মঙ্গল নাই। এই বলিয়া জগন্নাথ অন্তর্হিত হইলেন। মহাপাত্রেরও নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি এদিক্‌-ওদিক্‌ তাকাইয়া দেখেন, কেহই কোথাও নাই। যাই হউক, তিনি আর শয্যায় থাকিতে পারিলেন না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন। অতি প্রত্যূষেই স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া শ্রীমন্দিরে গমন করিলেন। স্বপ্নের কথা তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া রহিয়াছে। তাই তিনি প্রভুর শ্রীমুখ না দেখিয়া অগ্রে সুদূরের দিকেই চাহিয়া দেখিলেন। দেখিয়া তাঁহার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না! ধন্য ভগবানের ভক্তবাৎসল্য, ভাবিয়া তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি তখন অশ্রুপূর্ণনয়নে দারুহরির বদন পানে চাহিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন,—দয়াময়! আমি মহা অপরাধী, আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আগে তো জানিতাম না যে, তোমার ভৃত্যের প্রতি এতই করুণা। তোমার ভক্তের বা ভক্তপ্রীতিরই প্রভাব বলিতে হইবে, তোমার ভক্ত কৃষ্ণপ্রিয়ার পত্রের ক্ষণিক সংসর্গ পাইয়াছিলাম বলিয়াই আজ আমার মোহান্ধকার বিদূরিত হইয়া গেল, তোমার এবং তোমার ভক্তের মহিমোজ্জ্বল মূর্ত্তির সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম'। নাথ! কই এতদিন তো তোমায় দেখিয়াও দেখিতে পাই নাই। তোমার ভক্ত

কৃষ্ণপ্রিয়ার পরম্পরা-সম্বন্ধেই আমার এই সৌভাগ্যের উদয় হইল। ঠাকুর! ধন্য তুমি, তোমার ভক্তও ধন্য ধন্য। যাঁহাদের পরম্পরা-সম্বন্ধের এত প্রভাব, তাঁহাদের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধের কথা তো চিন্তা-পথেই আনিতে পারি না। হায় প্রভু! আমি মহা মূর্খ, মহা অজ্ঞান. আমার অপরাধ ক্ষমা কর ক্ষমা কর। আমি এখনই তোমার স্বপ্নের আদেশ প্রতিপালন করিতেছি, আমায় ক্ষমা কর নাথ! ক্ষমা কর।

বন্ধু মহাপাত্র এইরূপে জগন্নাথের অনেক স্তবস্তুতি করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। তার পর শ্রীপ্রভুর গলদেশ হইতে সেই পত্রখানি খুলিয়া লইলেন এবং ঠিক সেই মাপের একখানি সুবর্ণপদক গড়াইয়া তাহার মধ্যে পত্রখানি পূরিয়া স্বর্ণহারে গ্রথিত করিয়া দয়াময়ের গলায় পরাইয়া দিলেন। ভক্তাধীন ভগবানের শোভা যেন তাহাতে শতগুণ বর্দ্ধিত হইল;—পদকের ছলে ভক্তের অপরি-সীম প্রশংসার সুবর্ণপদক ভগবানের বক্ষে জ্বল্‌জ্বল্‌ জ্বলিতে লাগিল।

* * * * *

পর-পর ঠাকুর! পদক পর। ও পদম তোমারই গলায় সেজেছে ভাল, তুমিই পর। তোমার ভক্ত যে মানমর্য্যাদা চায় না—স্তুতি-প্রশংসার ধার ধারে না, সে কি দিলেও পদক গলায় ঝুলাইত? সে পরিবে না বলিয়াই তো তুমিই পরিয়াছ,—ভালই করিয়াছ; পর-পর পদক তুমিই পর। পরিতেই বা ক্ষতি কি আছে? তাতে তোমাতে তো আর তফাৎ নাই,—তোমাদের যে হৃদয়ে-হৃদয়ে মরমে-মরমে জড়াজড়ি। তাই বলি, পদক তুমিই পর—সেজেছে ভাল তুমিই পর।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি ।

ভক্তের জয়

দ্বিতীয় উল্লাস

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী কর্ত্তৃক
বিরচিত ।

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

শ্রীগৌরপূর্ণিমা—চৈতন্যাব্দ ৪৫২ ।

প্রকাশক—
১১, চাল্‌তা বাগান সেকেণ্ড লেনস্থ
শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী হইতে
শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী কর্ত্তৃক প্রকাশিত ।

মূল্য ১।০ এক টাকা চার আনা মাত্র ।

প্রকাশকের নিবেদন

ভক্তের জয়—দ্বিতীয় উল্লাসের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল। প্রথম সংস্করণ অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষিত হওয়ায় পুস্তকখানি যে সুধী পাঠকবর্গের প্রাণে সাড়া দিতে পারিয়াছে ইহা প্রমাণিত হয়। প্রভুপাদ শ্রীযুত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সরল ও অনাড়ম্বর ভাষা, তাঁহার অনমুকরণীয় চরিত্র চিত্রণের ভঙ্গী এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার আদর্শ ধর্ম্মজীবনের প্রভাব তাঁহার বর্ণনাকে জীবন্ত করিয়া তোলে। এজন্যই তাঁহার রচিত বিভিন্ন গ্রন্থাবলী বাঙলা এবং বাঙলার বাহিরেও এরূপ সমাদর লাভ করিয়াছে।

প্রেসের সূচনাবধি সৎসাহিত্য প্রকাশ ও প্রচারের জন্য আমাদের অকৃত্রিম হিতৈষী সুহৃদ হোমিওপ্যাথিক্ ডাঃ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সিংহ, এম-ডি মহাশয় আমাদিগকে নানারূপ পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়া আসিতেছেন। তাঁহারই ঐকান্তিক আগ্রহে এবং প্রভুপাদের ইচ্ছায় "ভক্তের জয়" মুদ্রণ ও প্রকাশের দায়িত্ব আমরা সানন্দে গ্রহণ করিয়াছি। ইহার পর আমরা প্রভুপাদ সম্পাদিত শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সুধী ও ধর্ম্মপিপাসু পাঁঠকবর্গকে উপহার দিবার আয়োজন করিতেছি।

ভক্তমাহাত্ম্য—ভক্তই বোঝেন। ভক্তের স্বরূপ ৺বলাইকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় যেরূপ

সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—আমাদের বিশ্বাস—তাহা পাঠক মাত্রকেই আনন্দ দিবে।

হিন্দু মরিয়া মরিয়াও বাঁচিয়া রহিল—বোধ হয় তাহার ধর্ম্ম-পিপাসা এখনও মরে নাই বলিয়া। "ভক্তের জয়" যদি ভক্ত হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্র সে পিপাসা আরও জাগাইয়া তুলিতে পারে, তবে সে কৃতিত্ব ভক্তের ও স্বয়ং প্রভুপাদের।

৩৪এ বাদুড়বাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা
রাসপূর্ণিমা, ১৩৩৯ সাল

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সিংহ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

—ঃ*ঃ—

ভক্তের জয়,—ভক্তের জয়।

"ভক্তের জয়" এর আর একটি উল্লাস বাহির হইল।

যাঁহাদের ভিতরে ও যাঁহার ভিতর হইতে এ জয়ের উল্লাস বাহির হইয়াছে, উভয়েই তাঁহারা কৃতার্থ। যাঁহার ভিতর হইতে, তাঁহার যেমন মনে হইতেছে—ধন্য আমি,—ধন্য আমি; যাঁহাদের ভিতরে, তাঁহারাও তেমনই মনে করুন—ধন্য আমরা,—ধন্য আমরা।

বস্তুতঃ এ জয়োল্লাসে শ্রোতা বক্তা সকলেই কৃতার্থ।

ভক্তের জয়,—ভক্তের জয়।

বড় শুভলক্ষণ! বসুন্ধরার দুঃখের হাহাকার কে ঘুচাইবে? কিন্তু যেখানে দুঃখ ও দুর্গতি,—অশান্তি ও অসন্তোষ, ভক্তের জয়ঘোষণায় অচিরাৎ সেখানে সুখ ও সুগতি,—শান্তি ও সন্তোষ। ভক্তের জয়ে জগতের এক অখণ্ড কল্যাণের দিন আসন্ন, ইহা স্থির।

সকল ধর্ম্মই বলিবেন, ভগবত্তুষ্টিই চরম ধর্ম্ম;—ভগবানের তুষ্টিবিধান কর, তোমার পাপতাপ,—দুঃখশোক সমস্তই ঘুচিয়া

যাইবে। কিন্তু সে তুষ্টি তাঁহার, ভক্তের জয়ঘোষণায় যেমন, আর কিছুতেই তেমন নয়।

ভক্তের জয়,—ভক্তের জয়।

ভগবানের অনন্ত শক্তি,—ভক্তের জয়ধ্বনি করিয়া তবু তিনি আশ মিটাইতে পারেন নাই। সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত নিজে তো তিনি কত-রকমে ভক্তের জয়ডঙ্কা বাজাইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু পূর্ণকামের কামনা তাহাতে পূর্ণ হয় নাই। ভক্তের ভিতরেও তাই মাঝে মাঝে তিনি ভক্তের জয়নির্ঘোষের শক্তিসঞ্চার করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান জয়োল্লাসে সেই শক্তিসঞ্চারের লক্ষণ সুব্যক্ত। ইহারই মধ্যে এই জয়োল্লাসের সঙ্গে আনন্দোল্লাসের এক তর-তর তরঙ্গ জগতে উত্থিত হইয়াছে।

ভক্তের জয়,—ভক্তের জয়।

ভক্ত বড়,—ভক্ত বড়। যাঁর ভক্ত, তাঁর চেয়ে,—সেই ভগবানের চেয়েও ভক্ত বড়।

যিনি অধীন, তিনি যাঁর অধীন, তাঁর চেয়ে বড় হইতে পারেন না ;—যাঁর অধীন, তিনিই বড়। ভগবান্ যে ভক্তের অধীন, এইজন্য ভগবানের চেয়ে ভক্ত বড়। নিজের শ্রীমুখেই তো তিনি বলিয়াছেন—

অহং ভক্তপরাধীনঃ।

ভক্তের জয়,—ভক্তের জয়।

ভক্ত বড়,—ভক্ত বড়। নিত্যপ্রকাশ,—সর্ব্বপ্রকাশ,—স্বয়ং-প্রকাশকে প্রকাশ করিয়া ভগবানের চেয়ে ভক্ত বড়।

ভক্ত না হইলে ভগবান্‌কে কে প্রকাশ করিত? তিনি তো নিত্যই প্রকাশ পাইতেছেন, কিন্তু তাঁহার সে প্রকাশকে প্রকাশ করিয়া দিতেছেন ভক্ত।

ভগবান্ অদৃশ্য,—অপ্রকাশ্য। আমাদের বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, ইহারা ঘট, মঠ, পট,—পর্ব্বত, আকাশ, সমুদ্র,—নদী, কানন, প্রান্তর,—কাম, ক্রোধ, লোভ,—জন্ম, জরা, মৃত্যু,—সুখ, দুঃখ, তৃষ্ণা,—রাগ, দ্বেষ, ভয়, কত-ভাবে কত-কি দেখায়,—কত-কি প্রকাশ করে। এই প্রকাশ,—এই স্ফুরণ,—এই ভাতি হইতে কত—শত তত্ত্বান্বেষীর নিকটেও এই মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, চৈতন্যের আসনে,—চৈতন্যের পদে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তা হইলেও বস্তুতঃ ইহারা চৈতন্য নহে,—প্রকৃতপক্ষে ইহাদের প্রকাশ নাই। ইহাদের প্রকাশ্য এই মৃত্তিকার স্তূপ,—ওই পাষাণপিণ্ড যেমন জড়, নিজেও ইহারা তেমনই জড়। জড়ে প্রকাশ নাই,—জড় চৈতন্য নহে। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যে প্রকাশ,—যে চেতনা, তাহা তাহাদের নিজের নয়;—অন্যের। অতএব সেই অন্য যিনি,—অবাঙ্‌মনসগোচর যিনি, তাঁহাকে ইহারা প্রকাশ করিবে কিরূপে? প্রকাশ্য যে, সে প্রকাশককে প্রকাশ করিবে কেমন করিয়া? মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ভগবান্‌কে প্রকাশ করিতে পারে না।

তবে ভগবান্‌কে প্রকাশ করে কে ?—ভগবান্‌কে প্রকাশ করেন ভক্তি।

ভক্তিরেবৈনং নয়তি,—ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি।

ভক্তিই ইঁহার কাছে লইয়া যায়,—ভক্তিই ইঁহাকে দেখাইয়া দেয়।

নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ।

ভগবান্ নিত্যই অব্যক্ত,—মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় দিয়া কখন তিনি ব্যক্ত হইবার নহেন। তবু কিন্তু তিনি ব্যক্ত হন,—তবু কিন্তু তাঁহাকে দেখা যায়। দেখা যে যায়, সে তাঁর নিজের শক্তিতে ;—ইন্দ্রিয়ের, মনের, বুদ্ধির শক্তিতে নয়।

ভগবান্ স্বপ্রকাশ। আপনিই আপনাকে প্রকাশ করেন, তাই ভগবান্ স্বপ্রকাশ। আপনিই আপনাকে প্রকাশ করিবার শক্তি তাঁহাতে আছে, তাই আপনিই আপনাকে প্রকাশ করিয়া ভগবান্ স্বপ্রকাশ। এই যে স্বপ্রকাশতা-শক্তি,—আপনিই আপনাকে প্রকাশ করিবার শক্তি, ইহার নামান্তর শুদ্ধ সত্ত্ব। ত্রিগুণাত্মক অজ্ঞানের সত্ত্বের মধ্যে,—প্রকৃতির সত্ত্বের মধ্যে কথঞ্চিৎ ইহার একটি ক্ষীণ উদ্দেশ্য,—একটি অস্ফুট অস্পষ্ট সন্ধান হয় তো মিলিতে পারে, কিন্তু ইহার স্বরূপপরিচয় তাহার ভিতরে অসম্ভব। প্রকৃতির সত্ত্ব তো শুদ্ধ নয়,—মিশ্র—

অন্যোন্যমিথুনাঃ সর্ব্বে—

আর দুইটি গুণ,—রজ ও তম,—কিছু-না কিছু প্রকৃতির সত্ত্বের

মধ্যে মিশিয়া আছেই। শুদ্ধসত্ত্ব কিন্তু এরূপ নয়। এ সত্ত্বের সবটাই সত্ত্ব,—এ সত্ত্ব অখণ্ড সত্ত্ব—পূর্ণ সত্ত্ব। এই শুদ্ধসত্ত্ব,—ভগবানের স্বরূপপ্রকাশক এই স্বচ্ছ-সুনির্ম্মল শুদ্ধসত্ত্ব,—ভগবানের মতই প্রকৃতির সম্পর্কশূন্য,—ভগবানের মতই ইহা অপ্রাকৃত। অগোচর হইয়াও ভগবান্ যে আন্তরীণ শক্তিতে লোকলোচনের গোচর হন, শুদ্ধসত্ত্ব তাঁহার সেই নিজশক্তির,—স্বরূপশক্তির,—চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষ। ভক্তির সহিত এই শুদ্ধসত্ত্বের একাত্মক সম্বন্ধ শুদ্ধসত্ত্ববিশেষই ভক্তি,—শুদ্ধসত্ত্ববিশেষই ভক্তির স্বরূপ—

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা।

কিন্তু এই ভক্তি তো ভক্তেরই ভিতরে,—ভক্তি লইয়া তবে তো ভক্ত,—ভক্তি ছাড়িয়া তো ভক্ত নাই। তাই বলিয়াছি, সেই স্বপ্রকাশকে প্রকাশ করিয়া ভগবানের চেয়ে ভক্ত বড়।

ভক্তের জয়,—ভক্তের জয়।

ভক্ত বড়,—ভক্ত বড়।

ভক্ত না হইলে ভগবান্‌কে কে জানাইত,—কে জানিত? কে চিনাইত,—কে চিনিত?

ভগবান্ অসীম রহস্যের মধ্যে নিগূঢ়, তিনি

নিহিতো গুহায়াম্।

ভক্ত না হইলে তাঁহার সে অসীম রহস্য কে উদ্ঘাটন করিয়া দিত?— ভক্ত না হইলে সে দুর্গম-দুষ্প্রতর্ক্য গুহার ভিতর হইতে

কে তাঁহাকে সকলের সমক্ষে বাহির করিয়া আনিত? জীবের জীবত্ব যেমন, অনন্তকল্যাণগুণনিধি ভগবানের ভগবত্তাও সেইরূপ অবিদ্যায় উপহিত, তাই মুক্তির অবস্থায়,—জ্ঞানের অবস্থায়, জীবত্ব ও ভগবত্ত্ব, দুইটিই নির্গুণ নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মের মধ্যে লীন হইয়া যায়— শাস্ত্রের এই অপসিদ্ধান্ত,—এই কল্পিত কথাকে পুষ্ট-প্রতিষ্ঠিত করিবার শতচেষ্টা সত্ত্বেও, অনুরাগের অপার শক্তিতে বস্তুর যাঁহারা যথার্থ পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহাদের কাছে যাঁর মুক্তিতে অভাব নাই,— অদর্শন নাই; এখনও যেমন তখনও তেমন, যিনি সদা-সুস্থিত,— সদা-জাগ্রত; মুক্তজনকেও যিনি নিজগুণে আকর্ষণ করেন,— মুক্তজনেরও যিনি সেবনীয়-বন্দনীয়; যাঁহার নাম নাই,—রূপ নাই, গুণ নাই,—ক্রিয়া নাই, পরিণতি নাই,—বিকৃতি নাই, বিলাস নাই,—বিভ্রম নাই, তবু সত্যসত্যই যাঁর কত নাম, কত রূপ, কত গুণ,—কত ক্রিয়া, কত পরিণতি,—কত বিকৃতি, কত বিলাস,—কত বিভ্রম; এমন এক সত্য-সনাতন,—অজ্ঞান-কল্পিত নহে,—সত্য-সনাতন স্বচ্ছন্দবিহারী পরমবস্তু অতীত-অনাগত-আগত তিন কাল ব্যাপিয়া বিরাজমান, এ তথ্য ভক্ত না হইলে কি কেহ ধারণা করিয়া,—বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেন?—ভক্ত ভিন্ন এই বেদগুহ্য তথ্য কি জগতে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিতে পারিত? ভগবান্‌কে উড়াইয়া দিবার জন্য যে সকল কল্পিত মতবাদের উৎপত্তি, ভক্তের অভাবে তাহারা হয় তো চিরদিন মাথা তুলিয়া থাকিত,— ভক্ত না হইলে ভগবানের অস্তিত্বই হয় তো লুপ্ত হইয়া যাইত।

ভগবানের ভক্ত কোথায় নাই ?—আমাদের এই পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে,—প্রকৃতির বাহিরে পর্য্যন্ত ভক্ত তাঁর কোথায় নাই ? ভক্ত তাঁর সর্ব্বত্র। ভুবনে-ভুবনে ভগবানের নাম ও রূপ, গুণ ও লীলা অবিরাম গাহিয়া-গাহিয়া ভক্ত আপনার প্রিয়জনের সমুদয় রহস্য অনাবৃত করিয়া তাঁহার মহিমারসে সকলকে সিক্ত করিয়া বেড়ান। সে অমৃতরসসেকে তখন তোমার আমার মত দুঃখী যাহারা, তাহাদের দুঃখচ্ছেদ তো তুচ্ছ কথা ; পরন্তু দুঃখের যাঁহারা পারগত,—যাহার আনন্দী, তাঁহাদেরও আনন্দের মধ্যে নিত্যনূতন কি-এক অপূর্ব্ব লহরী লীলা উথলিয়া উঠিতে থাকে।

ভগবান্ প্রপঞ্চের অতীত,—প্রকৃতির অতীত। তা হইলেও ভক্ত কিন্তু তাঁহাকে সেই প্রপঞ্চের ভিতরে,—প্রকৃতির ভিতরে লইয়া আসেন। ভক্তের আকর্ষণেই প্রকৃতির ভিতরে,—প্রপঞ্চের ভিতরে ভগবানের প্রকাশ। তিনি আসেন ভক্তের আকর্ষণে,—তিনি আসেন ভক্তবিনোদের জন্য—

মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ।

কিন্তু সেই সঙ্গে সেই অব্যক্তের অভিব্যক্তি দেখিয়া,—সেই অপ্রত্যক্ষ কে প্রত্যক্ষ করিয়া লক্ষ-লক্ষ নরনারীর তখন—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।

লক্ষ-লক্ষ নরনারীর সকল অসম্ভাবনা,—সকল সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়। তাই বলিতেছিলাম, ভক্ত না হইলে ভগবান্‌কে

জানাইত কে,—চিনাইত কে? জানিত কে,—চিনিত কে?

ভক্তের জয়,—ভক্তের জয়।

ভক্ত বড়,—ভক্ত বড়।

ভক্ত বড়,—শ্রীবৃন্দাবনে তাই সকলের মুখে কথায় কথায়—রাধে রাধে !!

ভক্ত ভক্তির আধার। সেই ভক্তিতে ও ভাবে,—স্নেহে ও অনুরাগে,—প্রেমে ও প্রণয়ে আপ্তকামের অভাবসৃষ্টি করিয়া অনুক্ষণ কত যত্নে,—কত আদরে তিনি ভগবানের সেবা করেন। আনন্দসমুদ্র সে সেবায় দুলিয়া উঠে,—নিত্য তাহাতে অপরূপ বৈচিত্র্যের বিকাশ হইতে থাকে;—এক বহু, অখণ্ড খণ্ড, অপরিচ্ছিন্ন পরিচ্ছিন্ন, অলৌকিক লৌকিক হইয়া পড়েন। এই অসাধ্যসাধনে,—এই অপরিচ্ছিন্ন ও পরিচ্ছিন্নের, এক ও অনেকের, অখণ্ড ও খণ্ডের, অলৌকিক ও লৌকিকের যুগপৎ সম্মিলনে ভক্তের দক্ষতা অতুলনীয়। ভগবান্ ভক্তের অধীন এইজন্য,—ভক্ত ভগবানের অপেক্ষা বড় এইজন্য।

ভক্তের জয়,—ভক্তের জয়।

যিনি ভগবানের চরণাকাঙ্ক্ষী, আগে তাঁহাকে ভক্তের চরণে শরণ লইতে,—ভক্তের ভাবে বিভোর হইতে হইবে। ভাব শিখাইতে ভক্ত,—ভাব দিতেও ভক্ত।

রাগমার্গের সহিত যাঁহারা পরিচিত, এ কথার মর্ম্ম তাঁহাদের নিকট সুস্পষ্ট।

ভক্তের জয়,—ভক্তের জয়।

আবার যেখানে ভক্ত, সেখানে ভক্তি ; যেখানে ভক্তি, সেখানে ভগবান।

জয় ভক্তের জয়,—
জয় ভক্তির জয়,—
জয় ভগবানের জয়।

৬৮নং বলরাম দের ষ্ট্রীট,
সিমুলিয়া, কলিকাতা।
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী।

শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসেবাসংরত
শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দবংশ্য
শ্রীবলাইচাঁদ গোস্বামী।

শ্রীশ্রীগৌরবিধুর্জয়তি

ভক্তের জয়।

—:•:—

পূর্ব্ব-ভাষ।

এবার আর আমার বলিবার বড় বিশেষ কিছুই নাই। যাঁহাদের কৃপায় দ্বিতীয় উল্লাসের প্রকাশ, তাঁহাদের মহিমা-কীর্ত্তন এবার পূজ্যপাদ বলাইদাদাই করিয়াছেন। অমনটি তো আমি করিতে পারিতাম না। তাই মনে হইতেছে, তাঁহারও দয়া, আর যাঁহাদের জয়, তাঁহাদেরও দয়া। ভক্তচরিত্র-বর্ণনে আমাদের অযোগ্যতা প্রভৃতি প্রথমবারেই বলিয়া রাখিয়াছি। সুতরাং তাহাও আর বলিতে হইবে না। কেবল একটা কথা বলিলেই খালাস। সেটা হইতেছে—এই দ্বিতীয় উল্লাসের একটু পরিচয়। এই উল্লাসে এগারটি ভক্তচরিত্র গ্রথিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে দশটি সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক বঙ্গবাসীতে এবং একটি (নারায়ণ দাস) বিখ্যাত মাসিক "অবসর" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। শান্তোবা চরিত্রটি প্রখ্যাত ইংরেজি সাপ্তাহিক টেলিগ্রাফ পত্রের 'শান্তোবা'-শীর্ষক প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত। অপরগুলির অবলম্বন— দার্ঢ্যভক্তিরসামৃত। এবারকার কথা এইখানেই ফুরাইল। এখন তৃতীয় উল্লাসের প্রকাশের আশা অন্তরে পোষণ করিয়া আজিকার মত বিদায় লইলাম। ইতি।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী,
শ্রীগৌরাব্দ ৪২৫।
মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেন,
সিমুলিয়া, কলিকাতা।

ভক্ত-চরণরেণু-লোলুপ
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

ভক্তের জয়

—:০:—

সূচীপত্র।

মম ভক্তা হি যে পার্থ! ন মে ভক্তাস্তু তে মতাঃ।
মদ্ভক্তস্য তু যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥

শুন পার্থ! বলি তোরে যারা শুধু ভজে মোরে,
তারা মোর ভক্ত কভু নয়।
কিন্তু মোর ভক্তগণে, যারা অনুরাগ-মনে,
ভজে তারা ভক্ততম হয়॥

ভক্তের জয়

গৌরচন্দ্র

পরম পবিত্র সেতুবন্ধ রামেশ্বর ক্ষেত্রে ধর্ম্মরাজা নামক ধর্ম্ম-পরায়ণ নরপতি বাস করিতেন। তাঁহার রাজ্য শত যোজন বিস্তৃত। সংখ্যারহিত সৈন্য সামন্ত। কুবেরের তুল্য সম্পত্তি। শরীরে অসীম শক্তি। দেব-দ্বিজে অবিচলিত ভক্তি। তাঁহার ভার্য্যা পরমা সুন্দরী; নাম হৈমবতী। একটি পুত্র,—রামেশ্বর।

ধর্ম্মরাজার ধর্ম্মানুষ্ঠানই এক স্বতন্ত্র ব্যাপার। রাজ্যের চারিদিকেই ধর্ম্মশালা। তিন ক্রোশ অন্তর সদাব্রত। অতিথি-অভ্যাগতের আনন্দ-কলরবে সে সকল স্থান সর্ব্বদাই মুখরিত। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব দীনদুঃখী ভিখারী-ব্রহ্মচারী যিনিই আসুন না কেন, তাঁহার কাছে আসিয়া কাহাকেও রিক্তহস্তে ফিরিয়া যাইতে হয় না। রাজ্য জুড়িয়াই মহারাজের জয়জয় রব।

'আমি রাজা' এ অভিমান মহারাজ মনেও স্থান দিতেন না। সদাই ভাবিতেন,—আমি কে তুচ্ছ মানব, আমি আবার অধীশ্বর কিসের? শ্রীরামেশ্বরদেবই সকলের অধীশ্বর; তাঁহার ইচ্ছাতেই চরাচর চালিত। অবনীপতি অবিচলিত চিত্তে রামেশ্বরদেবের

সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। অমুক দেশে ভাল চাউল পাওয়া যায়, আনো রামেশ্বরের জন্য; অমুক দেশে উৎকৃষ্ট ঘৃত পাওয়া যায়, আনো রামেশ্বরের জন্য; অমুক দেশে উত্তম শর্করা পাওয়া যায়, আনো রামেশ্বরের জন্য; এইরূপে যেখানে যে ভাল জিনিসটি পাওয়া যায়, একবার কাণে শুনিতে পাইলেই হইল, অমনি তিনি সেখান হইতে সে সামগ্রীটি রামেশ্বরের জন্য সংগ্রহ করাইয়া আনাইতেন; তা তাহাতে যত অর্থই ব্যয় হউক, কিংবা যত ক্লেশই স্বীকার করিতে হউক। কিন্তু এত করিয়া সেবা করিয়াও তাঁহার আর কিছুতেই পরিতৃপ্তি হইত না। কেবলই ভাবিতেন,—হায় আমি অতি অধম, অতি অভাজন; শ্রীরামেশ্বরের উপযুক্ত সেবা কিছুই করিতে পারিলাম না। তিনি দিনে দশবার রামেশ্বরদেবের শ্রীমন্দিরে যাইতেন, শ্রীপ্রভুকে ভূমিলুণ্ঠিত মস্তকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন, হৃদয়ের দুঃখের সুখের সকল কথাই কৃতাঞ্জলিপুটে জানাইতেন। তাঁহার সেই কাকুতি-মিনতি ও স্তুতি-নতি দেখিলে-শুনিলে নাস্তিকের অন্তরেও ঈশ্বরবিশ্বাস না আসিয়া যায় না। ধর্ম্মরাজ তাঁহার অন্তর্যামী রামেশ্বরের সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন একটি সামান্য রাজকার্য্যও সম্পাদন করিতেন না; রামেশ্বরে তাঁহার এতই প্রীতি, এতই আন্তরিক ভক্তি। যাহা কিছু করিতে হইবে, আপনি কর্ত্তা হইয়া তাহার মীমাংসা না করিয়া তিনি অন্তরে অন্তরে অন্তর্যামী রামেশ্বরকেই তাহা বিনীত ভাবে জানাইতেন, আর অন্তর্যামী যেন 'এই কর' বলিয়া আদেশ প্রদান করিলে,

তবে তিনি তদনুরূপ কার্য্য করিতেন। মহারাজ নিজের বলিবার আর কিছুই রাখেন নাই, রামেশ্বরই তাঁহার সর্ব্বস্ব।

এইরূপে কিছুদিন যায়, একদিন দুই সহস্র নানাসম্প্রদায়ী বৈদিক সন্ন্যাসী নানা তীর্থ ভ্রমণ করিতে-করিতে রামেশ্বরক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাজ এই 'জমাউতের' আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াই স্বয়ং তাঁহাদের সমীপে গমন করিলেন এবং দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক অনেক আদর-অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহাদের আদেশানুরূপ ভূরি ভোজনের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া বিদায় লইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। সন্ন্যাসিবৃন্দও মহা-রাজের বিনয়-বিনম্র ব্যবহারে পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ দ্বারা সংবর্দ্ধিত করিলেন।

মহারাজা চলিয়া গেলে, সন্ন্যাসিগণ স্নানাদি সমাপন করিয়া সম্প্রদায়োচিত তিলকাদি চিহ্নে চিহ্নিত ও বেশভূষায় বিভূষিত হইলেন এবং পূজা-পাঠাদি নিত্য-কৃত্য সমাধা করিয়া সকলে মিলিয়া একত্রে উচ্চৈঃস্বরে হরিহরি হরহর রামরাম নাম করিতে-করিতে শ্রীরামেশ্বরদেবের দর্শনার্থ গমন করিলেন। তাঁহা-দের সেই দুই সহস্র কণ্ঠের হর্ষোচ্চারিত নামধ্বনি যেন মেদিনীমণ্ডল কাঁপাইয়া তুলিল। তাঁহারা আত্মহারা হইয়া দেউলে যাইয়া প্রবেশ করিলেন। সকলেরই দেব-দর্শনের ইচ্ছা এতই প্রবল যে, একবার মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া শ্রীপ্রভুকে দর্শন করিতে পারিলে হয়। কাজেই তখন কে যে কাহাকে ঠেলিয়া চলিয়া যান, কিছুরই ঠিক নাই। এদিকে দেউলের শান্তি-

রক্ষকগণ ঠেলাঠেলিতে পাছে কেউ মারা যায় বলিয়া শান্তিরক্ষা করিতে আসিয়া অশান্তির মাত্রা আরও বাড়াইয়া ফেলিলেন। কত নদ-নদী গিরিসঙ্কট অরণ্য-প্রান্তর অতিক্রম করিয়া,—অনাহার অনিদ্রা ও রৌদ্র বৃষ্টি প্রভৃতি পথক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়া যাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন, তিনি ঐ অদূরে দেউলের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন, আর একটু যাইলেই তাঁহার দেখা পাওয়া যায়; ঐ যে—উত্তোলিতহস্ত ভক্তমণ্ডলীর স্তুতিগীতি ও প্রচণ্ড তাণ্ডবের কেন্দ্রস্থলে শ্রীরামেশ্বরদেবের পুষ্পদলাদি-পূজিত পূত মূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছেন না?—হাঁ হাঁ, চল চল, শীঘ্র চল, সত্বর যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করি, চর্ম্মচক্ষু ও মনুষ্যজন্ম সার্থক করিয়া লই,—এই-ভাবে সকলেই বিভোর হইয়া উঠিতেছেন, আর ব্যাকুলভাবে ভিতরের দিকে গমন করিতেছেন, তখন আর শান্তিরক্ষক কিংবা অন্য কাহারও কোন কথা কর্ণে প্রবেশ করে কি? তাই তাঁহারা প্রহরীদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া উধাও হইয়া মন্দিরের ভিতর হুড়াহুড়ি করিয়া ঢুকিতে লাগিলেন। প্রহরিগণ কি করেন, অগত্যা ভীতি প্রদর্শনের নিমিত্ত বেত্র উত্তোলন করিলেন। তাহাই বা তখন দেখে কে,—মানেই বা কে; সকলেরই যে সকল ইন্দ্রিয় নয়নময় হইয়া পরমেশ্বরের দর্শনপ্রয়াসী। এই-বার প্রহরিবৃন্দ আস্তেআস্তে দুই এক ঘা বেত্র চালাইতে আরম্ভ করিলেন। তাহাও ব্যর্থ হইল। একনিষ্ঠার নিকটে যে সকলেই পরাভব স্বীকার করে। এইবার চারিদিক্ হইতে চট্‌পট্ রবে বেত্রপ্রহার আরম্ভ হইল। তাহাতেও কিন্তু হইল না। মাঝে

হইতে উভয় পক্ষের হুড়াহুড়িতে এবং বেত্রপ্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া একজন ক্ষীণকায় দুর্ব্বল বৈষ্ণব সন্ন্যাসী মারা পড়িয়া গেলেন। সন্ন্যাসীর মৃত্যুতে মন্দির-মধ্যে এক মহা হৈ হৈ রৈ রৈ রব পড়িয়া গেল। সন্ন্যাসিগণ তাঁহাকে দেউলের বাহিরে আনয়ন করিলেন এবং দ্বারের সম্মুখে শয়ন করাইয়া চারিদিকে ঘিরিয়া বসিলেন। সকলেই উচ্চকণ্ঠে রাম নাম ঘোষণা করিয়া সেই রামেশ্বরেরই উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন,—প্রভু হে! তুমি ভক্তের বাঞ্ছাকল্পতরু, শরণাগতের একমাত্র রক্ষক এবং অনাথ-জনের নাথ, তাই তোমার দর্শনে আসিয়াছিলাম; কিন্তু এ কি হইল ঠাকুর? আমাদের একজন জীবন হারাইল কেন? তুমি যদি ইহার বিচার না কর, ইহার সহিত আমরাও সকলে এইখানে জীবন বিসর্জ্জন দিব।

এইরূপ স্তুতি করিয়া সমস্ত সন্ন্যাসীই তদ্গতচিত্তে বসিয়া রহিলেন। সর্ব্বহৃদ্বিহারী ভগবান্ তাহা জানিতে পারিলেন। ভক্তের বেদনা তো তিনি সহিতে পারেন না; তাই লীলাময় তখন এক নবীন লীলা বিস্তার করিলেন। সকলে দেখিতে-দেখিতে দেউলের দরোজা বন্ধ হইয়া গেল। আর তাহার ভিতরে একটি ক্ষুদ্র মক্ষিকারও প্রবেশ করিবার যো নাই। শ্রীপ্রভুর সময়োচিত সেবা-পূজা সকলই বন্ধ। সেবকগণ বড় ভীত হইলেন। আর সেখানে থাকিতে পারিলেন না। সকলে এক-জোট হইয়া মহারাজার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চলা ফেরা করিয়া বেড়াইলেও সকলেই যেন অজ্ঞান অচৈতন্য;

সকলেরই প্রাণে কেবল হাহাকারধ্বনি—হায় কি হইল,—হায় কি সর্ব্বনাশ ঘটিল।

সেবকগণের সেই ভাব দেখিয়া মহারাজ বড় ব্যাকুল হইলেন এবং বারংবার জিজ্ঞাসা করিয়া সকল ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। তিনি আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না, যান বাহন আনয়নের অপেক্ষা না করিয়া পদব্রজেই দেউল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আহা তাঁহার নয়নে দরদর অশ্রুধারা, উত্তরীয় বস্ত্র ধুলায় লুটাইয়া যাইতেছে, কটির বসন খসিয়া পড়িতেছে, সেদিকেও দৃষ্টি নাই। উঠিপড়ি করিয়া তিনি দেউলে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। চারিদিক্ ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকল ব্যাপার দেখিয়া লইলেন। পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিলেন,—হায়! সর্ব্বনাশ হইয়াছে, রামেশ্বর আমায় বাম হইয়াছেন।

নৃপবর আর প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিলেন না; সেইখানেই একখানি কুশাসন বিছাইয়া শয়ন করিলেন। শুইয়া শুইয়া প্রাণেপ্রাণে প্রাণনাথকে বলিতে লাগিলেন,—বিশ্বেশ্বর হে! তোমার চরণে আমার কি অপরাধ হইল ঠাকুর! এ কথা হয় বলিয়া দাও, না হয় আমার প্রাণ লও; যদি না বলো তো আমার এই শয়ন শেষ শয়ন জানিও। এইরূপ বলিতে বলিতে নৃপতি নিদ্রিতের মত নীরবে পড়িয়া রহিলেন। ভাবগ্রাহী ভগবান্ তাহা জানিতে পারিলেন; তিনি স্বপ্নমার্গে আসিয়া তাঁহাকে আজ্ঞা দিলেন,—রাজন্! তুমি আমার আদেশ শ্রবণ কর। রাজ্যের হানিলাভ পর্য্যালোচনা করাই রাজার কার্য্য, কিন্তু তুমি তো

তাহা দেখ না। এই যে বৈষ্ণব সন্ন্যাসীটি আমাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, তোমারই ভৃত্যবর্গ তাঁহাকে আমারই সম্মুখে বেত্রাঘাতে মারিয়া ফেলিল, এ দোষ কাহার? এ সকল বিষয়ে যদি তোমার দৃষ্টি থাকিত, তাহা হইলে আর এমন ঘটনাটি ঘটিতে পারিত না। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এখন তুমি এক কার্য্য কর,—আমার সম্মুখে এক তীক্ষাগ্র শূল প্রোথিত কর, আর তোমার পুত্রটিকে বসন-ভূষণে ভূষিত করিয়া সেই শূলের উপর চাপাইয়া দাও, সত্বর এই কার্য্য করিতে পার তো তোমার রাজ্যের কুশল, তোমারও কুশল, নচেৎ সমগ্র রাজ্য ছারেখারে যাইবে, তোমারও জীবন নষ্ট হইবে।

এই বলিয়া রামেশ্বরদেব অন্তর্হিত হইলেন; নৃপতিও সেই বজ্রবৎ বাক্যে ব্যথিত হইয়া ত্বরিত-গতি গৃহাভিমুখে গমন করিলেন এবং অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক পত্নীর অগ্রে সকল কথাই বলিলেন। রাজমহিষী রামেশ্বরদেবের এই নিষ্ঠুর আদেশ শ্রবণ মাত্র মস্তকে করাঘাত করিতে-করিতে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন এবং মূর্চ্ছিতা হইয়া ধরণীতে ঢলিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার সংজ্ঞা হইল। তিনি অমনি মহারাজের চরণে ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিতে লাগিলেন,— মহারাজ! আমার সাতটি নয়, পাঁচটি নয়, সবে মাত্র একটি পুত্র, তাহাকে যমের হস্তে তুলিয়া দিয়া কাহাকে লইয়া থাকিব বল? ছার রাজ্যভোগ, রাজ্যভোগ আমি চাহি না, বাছা রামেশ্বরকে লইয়া বনেবনে ভ্রমণ করিতে হয়, তাহাও করিব, অনাহারে

মরিতে হয়, তাহাও মরিব, কিন্তু আমার কলিজার ধন আঁধলের নয়ন রামেশ্বর-রতনকে শূলে চাপাইতে দিতে পারিব না মহারাজ! —কিছুতেই পারিব না।

মহারাণীর বিলাপবাণী শ্রবণ করিয়া মহারাজ চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন কি করেন, কিছুই ঠিক নাই। স্নেহময়ী জননীর অঞ্চল হইতে অঞ্চলের ধন ছিনাইয়া লওয়া কি সহজ ব্যাপার? অথচ তাহাই হইল প্রাণারাধ্য দেবতার প্রীতিকর অনুষ্ঠান। একদিকে সংসারের স্নেহময় আকর্ষণ, অপর দিকে দেবতার আদেশ উল্লঙ্ঘন; ধর্ম্মরাজা বিষম সমস্যায় পড়িয়া গেলেন। এমন সময় তাঁহার ভগিনী হঠাৎ শ্বশুরালয় হইতে পুত্র-সহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বড় দয়ার শরীর; তিনি রাজা-রাণীর অবস্থা দেখিয়া আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। ব্যাকুল ভাবে এই আকস্মিক ভাবান্তরের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মহারাজাও তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনাই বলিলেন। বলিয়া শোকভরে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি যেন তখন কেমন একতর হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধি যেন সকলই লোপ পাইয়াছে। মুখে আর অন্য কথা নাই, কেবলই বলেন—হায়! আমার সবে মাত্র একটি পুত্র, তাহাকে মারিব কি করিয়া, মারিয়াই বা এ দেহ ধারণ করিব কি প্রকারে?

মহারাজের ভগিনী বড়ই বুদ্ধিমতী এবং ভগবানে তাঁহার অচলা ভক্তি। তিনি বুঝিলেন, এ আর কিছুই নয়, ইহা সেই

লীলাময় রামেশ্বরদেবেরই লীলা। ঠাকুর আমার ভক্তের দৃঢ়তা পরীক্ষার জন্য এইরূপ খেলাই পাতিয়া থাকেন বটে। সন্ন্যাসীও তিনিই আনিয়াছেন, প্রহরীদের দিয়া বেত্রও তিনিই প্রহার করাইয়াছেন, দুর্ব্বল সন্ন্যাসীটিকে তিনিই মারিয়া ফেলিয়াছেন, আর সেই অছিলায় মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহার ভক্ত-মহারাজের সাংসারিক আসক্তি ও স্ত্রীপুত্রাদির মমতা কতটা কমিয়া আসিয়াছে, একটু নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছেন। কম হউক, আর বেশীই হউক, মহারাজের তো রামেশ্বরদেবের উপর ভক্তি আছে, তখন তাঁহার আর বিনাশের অণুমাত্র আশঙ্কা নাই। এখন দেখা যাউক, ঠাকুরের এ খেলার দৌড় কতদূর গড়ায়। তিনি মনেমনে এইরূপ সিদ্ধান্ত আঁটিয়া মহারাজকে প্রকাশ্যে বলিলেন,—মহারাজ! অত অধীর হইলে চলিবে না, আমার একটা কথা শুনিতে হইবে, একটু স্থির চিত্তে ভাবিয়া চিন্তিয়াও দেখিতে হইবে। বলুন দেখি, মহারাজ! যে রামেশ্বর-দেবের প্রসাদে আপনি এই বিষয় বৈভব ভোগ করিতেছেন, যাঁহার আজ্ঞা মস্তকে ধারণ করিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন, আজ আপনি কোন্ প্রাণে তাঁহার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিবেন? এ আজ্ঞার অভ্যন্তরে কি যে ব্যাপার বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা কি সামান্য মানব আমরা বুঝিতে পারি? আর আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়াই বা লাভ কি আছে? পুত্র কিসের জন্য? অবশ্য বলিতে পারেন,—আত্মসুখের জন্য। দেবতার আদেশ অমান্য করিয়া সেই আত্মাকে কি রক্ষা করিতে পারিবেন মহারাজ? কখনই

নয়,—কখনই নয়। তবে এ অকারণ হা-হুতাশ করিয়া ফল কি আছে? মহারাজ! আপনি থাকিলে আবার কত পুত্র হইবে; কিন্তু এই একটি পুত্রকে রক্ষা করিতে গিয়া সকল নষ্ট করা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য? পুত্রও তো চিরদিন থাকে না মহারাজ মাতা-পিতা বর্ত্তমানেও তো অনেক পুত্র ইহলোক ছাড়িয়া চলিয়া যায়। তবে আবার সেই নশ্বর রামেশ্বরপুত্রের মমতায় অবিনশ্বর রামেশ্বরদেবের আদেশ অবমাননা করেন কেন?

ভগিনী এই প্রকারে মহারাজকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু অহো মহীয়ান্ মোহমহিমা, মহারাজ কিছুতেই আশ্বস্ত হইলেন না, ছলছল-নয়নে ভগিনীর দিকে চাহিয়াই রহিলেন। মুখে কথাটি নাই, যেন বোবা বনিয়া গিয়াছেন। রাজমহিষী ননদিনীর কথা শুনিয়াই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন, নচেৎ তিনি যে তাঁহাকে কি বলিতেন, বলা যায় না।

এইবার ভগিনী যেন ভক্তির প্রাবল্যে ফুলিয়া উঠিলেন, তাঁহার সমগ্র শরীর পুলকপূর্ণ হইয়া পড়িল, নয়নযুগল যেন দপ্‌দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; লজ্জাবস্ত্র কোথায় সরিয়া পড়িল; তিনি আলুথালুভাবে কিন্তু সমধিক উত্তেজনার সহিত উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—মহারাজ! এ সংসারে পুত্রই কি এত বড়? থাক্— আপনার পুত্র শতায়ু হইয়া বাঁচিয়া থাক্, তাহাকে শূলে চাপাইয়া কাজ নাই; এই নাও মহারাজ! আমার এই একমাত্র পুত্র গৌরচন্দ্রকে গ্রহণ কর, ইহাকে লইয়া শূলের উপর বসাইয়া দাও; নাও—নাও মহারাজ! দেবতার আদেশ প্রতিপালিত হউক,

রাজ্যের স্বস্তি—তোমার স্বস্তি সংসাধিত হউক। নাও—নাও মহারাজ! আমার আঁধার ঘরের মাণিক ধনকে তোমার করে সমর্পণ করিলাম।

যেমন মাতা, পুত্রও তেমনি। বয়সে অল্প হইলে কি হয়, জননীর সুশিক্ষার গুণে তাহার দিব্যজ্ঞান জন্মিয়াছিল। সে মাতার প্রস্তাব শুনিবামাত্রই হর্ষপ্রফুল্ল-মুখে বলিয়া উঠিল,—

"বোইলা—এড়ে ভাগ্য মোর। সত্তে করিবে রঘুবীর॥
এ মঞ্চপুরে দেহ ধরি। জন্মিলে কে অচ্ছি ন মরি॥
কে আগে অবা পচ্ছে যাই। নিশ্চল হোই কেহি নাহিঁ॥
মলে হেঁ যমদূতে আসি। গলে লগান্তি কালপাশী॥
যম-পাশকু ঘেনি যিবে। বিবিধ মাড়হিঁ মারিবে॥
নরকে পকাইবে নেই। তহুঁ উদ্ধার হেলি মুহিঁ॥
হে মাত্ত বেগে মোতে নিঅ। প্রভুচ্ছামুরে শূলি দিঅ॥"

হায় আমার কি এতই ভাগ্য হইবে, শ্রীরঘুবীর আমায় আত্মসাথ করিবেন? এই মর্ত্ত্যভূমে দেহধারণ করিয়া না মরিয়া কে-উ না থাকিতে পারে? কেহ আগে, কেহ বা পাছে গমন করে এইমাত্র; কিন্তু নিশ্চল হইয়া কেহই নাই। মরিয়া গেলে যমদূত আসিয়া গলায় কালপাশ লাগাইয়া যমের পাশে লইয়া যাইবে, নানা নির্যাতন করিবে, তারপর আবার নরকের মধ্যে ফেলিয়া দিবে; কিন্তু অহো ভাগ্য, আজ আমি তাহা হইতে নিস্তার লাভ করিলাম। মা গো! তুমি আর বিলম্ব করিও না; আমায় লইয়া চল, প্রভুর সম্মুখে শূলের উপর চাপাইয়া দিবে চল।

পুত্রের কথায় মাতার আর আনন্দ ধরে না। তিনি ধাইয়া গিয়া পুত্রের মুখচুম্বন করিলেন। মহারাজও ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়-সাগরে ডুবিয়া গেলেন। কৃতজ্ঞতায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। কিন্তু তাহা প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া না পাইয়া কেবল বলিলেন,—বৎস! ধন্য তুমি, ধন্য তোমার গর্ভধারিণী; তোমরা আমায় উদ্ধার করিলে; আমার বংশ রক্ষা করিলে পরের জন্য আপন প্রাণ উৎসর্গ সহজ ব্যাপার নয়। ইহার সংবাদ সেই দীনবান্ধবের দরবারে নিশ্চয়ই পঁহুছিবে। বৎস রে! তুমিই আমার কুলের নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র,—তুমিই আমার প্রকৃত পুত্র।

ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নরপতি তখন লীলাময় ভগবান্ রামেশ্বর-দেবের লীলা-মহিমা ভাবিতে-ভাবিতে অতিমাত্র বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। মনেমনে বলেন,—প্রভু! তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থ লইয়াই সংসার। এই স্বার্থে মজিয়াই জীব তোমায় ভুলিয়া আছে। এখানকার স্বার্থের নেশা না ছুটিলে তো তোমার করুণা অর্জ্জন করা যায় না। এই দুগ্ধপোষ্য শিশু যখন সেই স্বার্থের হাত এড়াইতে পারিয়াছে, তখন ইহার প্রতি করুণাময় তোমার করুণা তো অবশ্যম্ভাবী। স্বার্থ-ত্যাগীর বিজয়-পতাকা দেশে-দেশে উড়াইবার জন্যই বুঝি তুমি এই লীলার অবতারণা করিয়াছ প্রভু! ভাল, তাহাই হউক;—দেখি তুমি এই স্বার্থত্যাগীর আদর্শ শিশুকে কি ভাবে রক্ষা কর, কি ভাবে পুরস্কৃতই বা কর। ঠাকুর হে! আমরা তোমার খেলার পুতুল বই তো নই; যাই,—তুমি আমাদের লইয়া যে ভাবে খেলাও, সেই ভাবেই খেলিয়া যাই। নরনাগ

এইরূপ কত কথা বলিয়া, সত্বর সেই ভগিনীপুত্রকে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন।

"কর্ণযুগলে কর্ণাঞ্চল। কণ্ঠে লম্বাই রত্নমাল॥
বাহে বাহুটি সুকঙ্কণ। তহিঁ ঝটকে মণিগণ॥
হৃদে পদক, কণ্ঠ মাঝে। সুরত্নমেখলা বিরাজে॥
হেম-তোড়র বেনি-পাদে। চমকি পড়ু অছি নাদে॥
নানা কুসুমে বান্ধি গভা। কেশ দিশই অতি শোভা॥
ভালে সিন্দূরচিতা শোহে। কিঅবা অরুণ-উদয়ে॥
তাম্বূল বোল তা অধরে। বিম্ব বিদ্রুম নিন্দা করে॥"

তাহার কর্ণযুগলে 'কর্ণাঞ্চল' পরাইয়া দিলেন। কণ্ঠে রত্ন-মালা ঝুলাইলেন। বাহুদ্বয়ে বাহুটি ও উত্তম কঙ্কণ পরাইলেন; তাহাতে মণিগণ ঝলমল করিতে লাগিল। হৃদয়ে পদক ও কটিতটে রত্নের মেখলা (চন্দ্রহার) পরিধান করাইলেন। উভয় চরণে স্বর্ণের 'তোড়র' পরাইয়া দিলেন। তাহার জলুষই বা কত, শ্রুতি-মধুর ঝঙ্কারই বা কত। মস্তকে নানা পুষ্পে গ্রথিত 'গভা'* পরাইলেন। তাহাতে কেশের শোভা শতগুণ বৰ্দ্ধিত হইল। ললাটে সিন্দূরের টিপ পরাইয়া দেওয়ায় যেন অরুণের উদয় হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অধরে তাম্বূলরঙ্গিমা বিম্ব-বিদ্রুমের নিন্দা করিল।

* 'গভা'—গর্ভক। মস্তকে পরিবার মালা। "শিরোমাল্যে তু গর্ভকঃ।" প্রাচীন বাংলা ভাষায় কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। যথা,—"শিরে লটপটি পাগ—চম্পকের গাভা"—লোচনের চৈতন্যমঙ্গল, বঙ্গবাসী-সংস্করণ, ১০৪ পৃষ্ঠা।

এইরূপ মনোহর সাজে সজ্জিত হইয়া গৌরচন্দ্র মৃদু-মধুর হাস্য করিতে-করিতে রামেশ্বরদেবের শ্রীমন্দির অভিমুখে গজগমনে যাইতে লাগিল। একে গৌরকান্তি, তাহার উপর রত্নালঙ্কারের দীপ্তি, সর্ব্বোপরি পবিত্রতার বিমল জ্যোতি; তাহার সেই সম্মিলিত দিব্য প্রভায় প্রভাকরও যেন হীনপ্রভ হইয়া পড়িলেন।

গৌরচন্দ্র কৃতাঞ্জলি করযুগল মস্তকের উপর রাখিয়া দিয়া বিদ্যুদ্‌গতি চলিয়াছে, মুখে অন্য কথা নাই, কেবল উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে,—

"নমস্তে রাম কৃষ্ণ হরি। মুকুন্দ মাধব মুরারি॥
অনন্ত অচ্যুত গোবিন্দ। জগতব্যাপী সদানন্দ॥"

বড় ঘরের কথা, জলে তৈলবিন্দুর ন্যায় নিমেষে ছড়াইয়া পড়ে; রামেশ্বরদেবের আদেশে রাজা আপন ভাগিনেয়কে শূলে দিতেছেন, এই কথা দেখিতে-দেখিতে দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। রঙ্গ দেখিবার জন্য লোকতরঙ্গ অমনি গৌরচন্দ্রের পাছুপাছু ছুটিতে আরম্ভ করিল। গৌরচন্দ্রও যাইয়া শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইল। এমন সময় পরিজন-পরিবৃত হইয়া নরনাথও সেই স্থলে আগমন করিলেন; তাঁহার আদেশে তখনই শ্রীমন্দিরের সম্মুখে একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত তীক্ষ্ণাগ্র শূল প্রোথিত করা হইল। মুখেমুখে রামনাম উদ্ঘোষিত হইতে লাগিল। মহারাজও কৃতাঞ্জলিপুটে রামেশ্বরদেবকে অনেক স্তবস্তুতি করিয়া বলিলেন,—ঠাকুর! তুমি অগতির গতি জানকীর পতি, তোমার চরণে প্রণিপাত। তোমারই আজ্ঞাপ্রমাণে আমি এই বালকটিকে শূলে চাপাইয়া তোমার পূজা দিতেছি; দয়া

করিয়া গ্রহণ কর। আমার বংশধর একটি মাত্র পুত্র, তাই তাহার পরিবর্ত্তে আমার ভাগিনেয়কে আনয়ন করিয়াছি, তাহার মাতার প্রেরণাতেই আনয়ন করিয়াছি; তাহাতে যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা ক্ষমা কর প্রভু! ক্ষমা কর। এই বলিয়া নৃপতি সেই নির্ভীক হসন্মুখ বালকের হস্ত ধারণ করিয়া শূলের নিকটে লইয়া চলিলেন। চারিদিক্ হইতে অমনি শঙ্খ-মহুরী কাংস্য-করতাল মৃদঙ্গ-মর্দ্দল বাজিয়া উঠিল। জয়জয় হরিহরি ধ্বনিতে আকাশ-মেদিনী ভরিয়া গেল। কোমলপ্রাণা রমণীগণ উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া গৌরচন্দ্র তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন,—আপনারা কাঁদিতেছেন কেন? ক্রন্দনের তো কোন কারণই দেখি না।

"সমস্তে চিন্ত নারায়ণ। এ সর্ব্ব তাহাঙ্ক ভিআণ॥
মো জীব উদ্ধার নিমন্তে। করুণা কলে প্রভু মোতে॥"

আপনারা সকলে সেই নারায়ণকে চিন্তা করুন। এ সমস্ত তাঁহারই খেলা। আমি অতি অধম জীব, আমার উদ্ধারের নিমিত্তই সেই দয়াল প্রভু এই করুণার বিস্তার করিয়াছেন। আপনারা কাঁদিবেন না, কাঁদিবেন না।

গৌরচন্দ্র হাসিহাসিমুখে এই কথা বলিয়া জয়রাম জয়রাম রবে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া আপনি যাইয়া শূলের উপর চাপিয়া বসিল। আহা সতী যেন পতির সহগমনেই চলিয়াছে। শূল তাহার গুহ্যদেশ ভেদ করিয়া কটিতটে গিয়া ঠেকিল। তখনও তাহার রামনাম বলার বিরাম নাই। এই দুঃসহ দৃশ্য দেখিয়া

নৃপতি বড়ই বিকল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নয়ন দিয়া অজস্র অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। দেখিতে-দেখিতে বালকেরও বাক্য ফুরাইয়া গেল। সকলে হায়হায় করিতে-করিতে গৃহে গমন করিলেন। মহারাজও পাত্রমিত্র সমভিব্যাহারে আপন আবাসে চলিয়া আসিলেন।

গভীর রাত্রি। সকলে নিদ্রিত। এমন সময় সর্ব্বান্তর্যামী ভক্তবৎসল ভগবান্ সেখানে আসিলেন। স্বয়ং শ্রীহস্ত বাড়াইয়া ভক্তকে শূল হইতে নামাইলেন। স্নেহভরে তাহাকে কোলের উপর বসাইয়া একটি হস্ত চিবুকে অপর হস্ত মস্তকে স্থাপন করিয়া মধুর স্বরে আহ্বান করিলেন,—গৌরচন্দ্র!—বাবা!—উঠে বোসো বাবা! উঠে বোসো; এই দেখ আমি এসেছি; আর তোর ভয় কিসের? তুই আমার মুক্তিপদের প্রকৃত অধিকারী। তোর আত্মত্যাগের প্রতিদানে আমি আমাকেই তোকে দান করিলাম। বাছনি রে! আহা তোর কোমল অঙ্গে না জানি কত ব্যথাই লাগিয়াছে। আর ব্যথা নাই বাছা, তুই যে ব্যথাহারী আমার কোলে। এখন যা, এই রাজ্যের রাজা হ, কিছুদিন রাজ্যৈশ্বর্য্য ভোগ কর; অন্তে আমার কাছেই আসবি।

ভগবানের পদ্মহস্তস্পর্শে গৌরচন্দ্রের মৃত শরীরে প্রাণ ফিরিয়া আসিল,—যাতনার নিবৃত্তি হইল। সে যেন সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া, কোন্ রাজ্যের কোন্ মোহন সঙ্গীত শুনিতে-শুনিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া চাহিয়া দেখে— অহো! এ যে সেই ধনুর্ব্বাণপাণি রঘুবংশশিরোমণি ভগবান্

রামচন্দ্র ! দেখিয়াই গৌরচন্দ্র প্রেমপুলকিত হইলেন এবং বারংবার প্রণাম করিয়া কম্পিত জড়িত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,— ভক্তবৎসল ! তোমার বলিহারি যাই। হায়, কোথায় মুনীন্দ্র যোগীন্দ্রগণের দুর্লভদর্শন জানকীরঞ্জন তুমি, আর কোথায় মহাপাতকী নারকী মানব আমি। এত দয়া না থাকিলে কি আর তোমায় কেহ দয়াময় বলিয়া ডাকিত, না তোমার শরণাগতই হইত ? জয় জয় প্রভু ! তোমার ভক্তবাৎসল্যের জয়।

ভগবান্ ভক্তের স্তুতিবাণীতে সমধিক প্রীতিলাভ করিলেন এবং স্বহস্তে তাহার মস্তকে 'পাটশাড়ী' বান্ধিয়া দিয়া বলিলেন,— যাও, আজ হইতে তুমিই এই রাজ্যের নৃপতিপদে অভিষিক্ত হইলে। আমাতে যখন তোমার চিত্ত অর্পিত রহিয়াছে, তখন আর ভয় পাইবার কিছুই নাই। যাও, পরম সুখে কালাতিপাত কর।

না না—তুচ্ছ রাজত্ব চাহি না, তোমায় ছাড়িয়া বিষয়-রসে মজিয়া থাকিতে চাহি না ; গৌরচন্দ্র এই কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে না বলিতে ভগবান্ হাসিতে-হাসিতে অন্তর্হিত হইয়া পড়িলেন। ভগবানের হাসি তো সহজ হাসি নয়, সে যে—"হাসো জনোন্মাদকরী চ মায়া।" সেই সর্ব্বজনমোহিনী মায়ায় বিমুগ্ধ আনন্দ-জড় গৌরচন্দ্র 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাবে সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীরে তখন কোটিকন্দর্পের প্রভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার আলোকে সেই স্থানটাই আলোকময় হইয়া উঠিল। এদিকে ভগবান্ আপনার শ্রীমন্দিরের দ্বারে

আসিয়া পৌছিলেন। তিনি আসিবামাত্রই দেউলের রুদ্ধ দ্বার মুক্ত হইয়া গেল। তারপর সেই মৃত সন্ন্যাসীটির প্রতি তিনি কৃপাদৃষ্টি করিলেন। সন্ন্যাসীও অমনি চৈতন্য পাইয়া জয় রাম জয় রাম বলিয়া উঠিয়া বসিলেন। দেখিয়া সন্ন্যাসিবৃন্দ পরমানন্দিত হইলেন। তাঁহারা হরিহরি জয়জয় রবে পৃথিবী পরিপুরিত করিয়া ফেলিলেন এবং ভক্তবৎসল ভগবান্‌কে শতশত সাধুবাদ দিয়া যে যথায় ইচ্ছা চলিয়া গেলেন।

এদিকে নৃপবর গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র, একা তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া আত্মীয়-স্বজন সকলেই মহা আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। সকলেই বলেন,—ও মহারাজ! আপনি যে একাই ফিরিয়া আসিলেন, আমাদের প্রাণের গৌরচন্দ্রকে কোথায় রাখিয়া আসিলেন? হায়, তাহাকে না দেখিয়া আমাদের হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। বলুন,—বলুন মহারাজ! গৌরচন্দ্রের কুশল তো?

মহারাজ আর কি বলিবেন। শোকভরে তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তিই হইল না। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে কাহারও আর বাকি রহিল না। শোকের আতিশয্যে সে দিবস কেহ আর অন্ন ভোজন করিলেন না; সকলেই অনশনে শয়ন করিয়া রহিলেন। কত-কি চিন্তা করিতে-করিতে মহারাজের যেন একটু তন্দ্রাবেশ আসিল; ভগবান্‌ও অমনি তথায় আসিয়া স্বপ্নমার্গে তাঁহাকে আজ্ঞা করিতে লাগিলেন,—ধর্ম্মরাজ! আমার আদেশ শ্রবণ কর; গৌরচন্দ্রের জন্য ভাবিও না, সে জীবিত

আছে ; তুমি সত্বর যাইয়া তাহাকে লইয়া আইস,—এই রাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত কর। আজ হইতে তোমার বংশের কেহ আর রাজা হইতে পারিবে না, হইতে গেলে তাহার জীবন তখনই বিনষ্ট হইবে। তুমি যাও, শীঘ্র গৌরচন্দ্রকে মহা সমারোহে আনয়ন করিয়া রাজসিংহাসনে বসাইয়া দাও। তুমি যাইলেই দেখিতে পাইবে এখন, আমি তাহার মস্তকে রাজপদের 'পাটশাড়ী' বাঁধিয়া দিয়াছি।

এইরূপ আজ্ঞা দিয়া ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন, মহারাজও আস্তেব্যস্তে উঠিয়া চারিদিক্ চাহিয়া দেখিলেন—কেহই কোথাও নাই। তাঁহার বড় বিস্ময় জন্মিল,—তাই তো, গৌরচন্দ্রকে তো শূলে চাপাইয়া আসিলাম, সে তো মৃত্যুপুরে চলিয়া গেল, আবার তাহার আগমন কি প্রকারে সম্ভবে? ভাল, যাই না হয় এক-বার দেখিয়াই আসি—দয়াময় প্রভু আমার যদি জীবন-দান দিয়াই থাকেন। যাইয়া যদি তাহাকে জীবিত দেখিতে পাই, আমি তাহার ভৃত্য হইয়া থাকিব। এই বলিয়া নৃপতি চঞ্চল-চরণে শূল-স্থানে গমন করিলেন। গিয়া দেখিলেন,—অপূর্ব্ব ব্যাপার! গৌরচন্দ্রের দিব্য আলোকে সেই স্থানটা আলোকময় হইয়া গিয়াছে। আকাশের কলঙ্কিচন্দ্র আজ এ চন্দ্রের কাছে পরাভব স্বীকার করিয়াছে। আহা আহা কি বিমল স্নিগ্ধ আলোক গা! নৃপতি আরও দেখিলেন,—তাহার মস্তকে 'পাটশাড়ী' বাঁধা। আর সে পদ্মাসনে বসিয়া রাম-কৃষ্ণ-বনমালী প্রভৃতি ভগবানের নামাবলী মধুর-মধুর কীর্ত্তন করিতেছে। তাহার বাহ্যজ্ঞান

বিলুপ্ত ; আহা সে বুঝি আর ইহলোকে নাই ! দেখিয়া নৃপতির সকল শরীর পুলকপূর্ণ হইল। তিনি যেন আনন্দে আত্মহারা হইলেন। কিছুক্ষণ পরে আত্মসংবরণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—গৌরচন্দ্র রে! তুই ধন্য। তোকে যখন আমি দেখিয়াছি, তখন আমাকেও ধন্য বলিতে হইবে। হায় প্রভু! তোমার মহিমাও ধন্য। তুমি তোমার ভক্তের গৌরব রক্ষা করিলে। এ কার্য্য কি এ জগতে আর কেহ করিতে পারে প্রভু? এই মৃত শরীরে জীবনীশক্তির সঞ্চার কি সহজ কথা? এ কার্য্য এক তুমিই করিতে পার, আর করিয়াছও তুমিই। তোমার ভক্ত-প্রীতির বলিহারি যাই—প্রভু বলিহারি যাই।

মহারাজ ভক্তিভরে এইরূপ কত কথা কহিতে-কহিতে নিকটে গিয়া গৌরচন্দ্রের কর-ধারণ করিলেন। আহা আহা এ আবার কিসের—কোন্ হিমকিল-চন্দনের,—না উশীরলেপনের,—না পঙ্কজ-মৃণালের,—না তুষারোপলের, এ কিসের সুখদ শীতল স্পর্শ গো? এ যে সকল শরীর মন প্রাণ জুড়াইয়া দিল গো, জুড়াইয়া দিল। নৃপতি সাক্ষাৎ ভগবৎস্পৃষ্ট সেই গৌরচন্দ্রের অঙ্গ-সংস্পর্শে যেন কিছুক্ষণ অবশ অচেষ্ট হইয়া রহিলেন। তিনি তখন এ রাজ্যে কি আর কোথাও, কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। সংজ্ঞা হইবা মাত্র তিনি গৌরচন্দ্রকে বাহুযুগলে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন এবং তাহার মস্তক-আঘ্রাণ ও মুখ-চুম্বন করিয়া আদরভরে ডাকিলেন—গৌরচন্দ্র!—বাবা গৌরচন্দ্র! চল, চল বাবা গৃহে যাই, তোমাকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া আমরা আনন্দ-উৎসবে মত্ত হই।

গৌরচন্দ্র,—কিসের গৌরচন্দ্র? গৌরচন্দ্র কি তখন আর এ জগতের কোন সমাচার রাখিতেছে? তাহার সর্ব্বেন্দ্রিয় যে তখন হৃষীকেশের নামামৃত-পানে বিভোর। সে মুহুর্ম্মুহু সেই নামাবলীই বলিতে লাগিল। নৃপতির কিন্তু আর ত্বরা সহিল না। তিনি তাহাকে ক্রোড়ে করিয়াই আপন ভবনে আনয়ন করিলেন। মন্ত্রি-মিত্র প্রভৃতি সকলকে ডাকাইয়া আনাইয়া তখনই তাহাকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া দিলেন। পরে প্রজাবর্গকে আহ্বান করাইয়া সর্ব্বজন সমক্ষে যথাবিধি রাজদণ্ড ও রাজচ্ছত্র প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন,—সকলে শ্রবণ কর, আজি হইতে গৌরচন্দ্রই তোমাদিগের রাজা হইলেন এবং আমি ইঁহার আজ্ঞাবর্ত্তী হইলাম।

ধর্ম্মরাজার তখন আনন্দ দেখে কে? তিনি আনন্দের আতিশয্যে বলিয়া উঠিলেন,—কে কোথায় আছ, বাজাও বাজাও বাজানা বাজাও। গায়কগণ! গান কর, নর্ত্তকীগণ! নৃত্য কর, বন্দিগণ! নবীন মহারাজের স্তুতিগীতি আরম্ভ কর,—জয়জয় নাদে দিগ্‌দিগন্ত পূর্ণ কর।

তাহাই হইল; মহারাজের আদেশ প্রচার হইতে না হইতে তূরী-ভেরী শানাই-মহুরী মৃদঙ্গ-মর্দ্দলাদি বিবিধ বাদ্য মেঘমন্দ্রে বাজিয়া উঠিল। গৃহেগৃহে মঙ্গলশঙ্খ ধ্বনিত হইতে লাগিল। নর্ত্তকীগণের নৃত্যে ভট্ট-মাগধ-বন্দিগণের স্তুতিগীতিতে এবং গায়কগণের গানে সকল দেশ উৎসবময় হইয়া উঠিল। নবীন মহারাজ গৌরচন্দ্রের,—আত্মত্যাগীর আদর্শ গৌরচন্দ্রের,—ভগবানের একান্ত ভক্ত গৌরচন্দ্রের জয়জয় রবে ধরাধাম পূর্ণ ও ধন্য হইয়া গেল।

জগদ্বন্ধু মহাপাত্র

চারিশত বৎসরের কথা, উৎকলদেশাধিপতি মহারাজ প্রতাপ-রুদ্রদেবের আমলে শ্রীজগদ্বন্ধু মহাপাত্র নামে শ্রীজগবন্ধুর জনৈক সেবক পণ্ডা ছিলেন। ব্রাহ্মণ-সেবকগণের মধ্যে ইঁহারা অতিশয় খ্যাত,—তিলিচ্ছ মহাপাত্রের ঘর বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিশেষত জগদ্বন্ধু মহাপাত্র বিদ্যা-বুদ্ধি শৌচ-সদাচার ও সাধন-ভজনের গুণে সকলেরই শ্রদ্ধাভক্তির পাত্র এবং বিনয়-বিনম্র ছিলেন। তাঁহার সহ্যগুণ অসাধারণ, দেখিলে বিস্ময়ের উদ্রেক করিত। দীন-দুঃখীকে অত আদর করিয়া আহার করাইতে বুঝি আর কেহ পারিত না। মুখের কথাই বা কি মধুমাখা; শুনিলে কাণ প্রাণ জুড়াইয়া যায়।

সেবক প্রভুর সেবা করে, সাধারণত দেখা যায়—সে কেবল শরীর কিংবা বাক্য দ্বারাই প্রভুর সেবা করে, কিন্তু মনেমনে আপন স্ত্রীপুত্রাদির সেবাই করিয়া থাকে। জগদ্বন্ধু মহাপাত্র শ্রীজগদ্বন্ধুর এ প্রকার সেবক ছিলেন না; তিনি কায়মনোবাক্যে প্রভুর সেবক ছিলেন। তিনি জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা এই তিনের সেবা ভিন্ন অন্য কিছুই জানিতেন না। শ্রীপ্রভুদের শয্যোত্থান হইতে পুনরায় শয়ন পর্য্যন্ত যতকিছু সেবা, নিত্যই তিনি স্বহস্তে নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি প্রভুদের বসন-ভূষণ পরাইতেন, শ্রীঅঙ্গে গন্ধ-চন্দন-কস্তুরী লেপন করিতেন, তিলক রচনা করিয়া

দিতেন, ধূপ-আরতি করিতেন, কর্পূর-দীপ জ্বালিয়া দিতেন, তুলসী কিংবা পুষ্পের ধণ্ডামালা (বড়মালা) পরাইতেন, শ্রীমুখের 'সিংহার' (বেশরচনা) করিতেন। তিনি নিশিদিসি এই সেবা লইয়াই উন্মত্ত থাকিতেন। দারুহরিই তাঁহার গুরু ইষ্টদেবতা, দারুহরিই তাঁহার ধন-সম্পদ, দারুহরিই তাঁহার আত্মীয়-বান্ধব। তিনি তাঁহারই পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া তাঁহারই নাম ভজন করিতে-করিতে পরমানন্দে দিন যাপন করিতেন।

এইরূপে কিছুদিন যায়, একদিন মহারাজ প্রতাপরুদ্র অনেক সৈন্য-সামন্ত সঙ্গে লইয়া শ্রীপ্রভুর দর্শনার্থ আগমন করিলেন। সে ধুম-ধাড়াক্কা দেখে কে? আগে-আগে শতশত শঙ্খ বাজিতেছে, পাছেপাছে বীরতূরী সানাই-মহুরী মৃদঙ্গ-মর্দ্দলাদি তুমুল নিনাদিত হইতেছে। আশা শোঁটা ত্রাস-ছত্র প্রভৃতি রেসেলার তো সীমা-পরিসীমাই নাই। তারপর ভারেভারে শ্রীজীউর সেবার উপহার চলিয়াছে। "এই মহারাজ বিজয় করিতেছেন, এই মহারাজ বিজয় করিতেছেন" এই কথা মুখেমুখে কথিত হইতে-হইতেই মহারাজ একেবারে সিংহদ্বারে যাইয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবা-মাত্র সেবকবৃন্দ একসঙ্গে ধাইয়া গিয়া মহাপাত্রকে বলিলেন,— মহাপাত্র! মহাপাত্র! মহারাজ বিজয় করিতেছেন—বিজয় করিতেছেন। ঐ দেখুন, তিনি দেউলের মধ্যেই আসিয়া পঁহুছিয়া গিয়াছেন।

বলিতে-বলিতে মহারাজও প্রায় সেইখানে আসিয়া উপস্থিত। অকস্মাৎ মহারাজকে আসিতে দেখিয়া মহাপাত্র চমকিয়া উঠিলেন।

তিনি তাড়াতাড়ি প্রভুর সম্মুখে গমন করিয়া রত্নবেদীতে আরোহণ করিলেন। ব্যগ্রভাবে প্রভুর দিকে চাহিয়া দেখেন, তাঁহার কিরীটে কুসুম নাই। কি সর্ব্বনাশ! এখন আমি রাজাকে আশীর্ব্বাদ করি কি দিয়া? শ্রীপ্রভুর মৌলিস্থিত পুষ্পই যে 'রাজ-প্রসাদ'—মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিবার সামগ্রী। মহারাজও তো আসিয়া পড়িলেন দেখিতেছি। ফুল আনিয়া পরাইবার সময় নাই। হায়! হায়! এইবার আমার সকল মহত্ত্বই সরিয়া গেল। এইরূপ ভাবিয়া-চিন্তিয়া মহাপাত্র অতিমাত্র কাতর হইয়া পড়িলেন। অবশেষে অন্য উপায় নাই দেখিয়া আপনার মস্তক হইতে প্রভুরই প্রসাদী নির্ম্মাল্য লইয়া তাঁহার মস্তকে স্থাপন করিলেন। নৃপবরও অমনি সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি যথাবিধি শ্রীপ্রভুর দর্শনাদি সমাপনপূর্ব্বক প্রসাদ-পুষ্পের প্রত্যাশায় হস্ত প্রসারণ করিলেন। মহাপাত্র যথারীতি জলে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া শ্রীজগবন্ধুর মস্তক হইতে সেই পুষ্প লইয়া মহারাজের করে অর্পণ করিলেন। মহারাজও ভক্তিভরে গ্রহণ করিয়া মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার নগরে ফিরিয়া আসিতে দিবস শেষ হইয়া গেল। তিনি দিব্য সিংহাসনে বসিয়া বসিয়া সেই প্রসাদী নির্ম্মাল্য লইয়া একবার মাথায় রাখিতেছেন, একবার চক্ষে ধরিতেছেন, একবার আঘ্রাণ করিতে-ছেন, অমনি প্রীতিভরে চক্ষু দুইটি যেন বুজিয়া-বুজিয়া আসিতেছে, প্রাণে বিমল আনন্দের উৎস উঠিতেছে। কিছুক্ষণ এইরূপ করিতে-করিতে হঠাৎ তাঁহার নজর পড়িল,—সেই নির্ম্মাল্যের মধ্যে কএক

গাছি কালো কালো চুল রহিয়াছে। সাদায় তো কালো লুকাইবার যো নাই। সে সাদা ধপধপে জাতীফুলের গভা (শিরোমাল্য); কাজেকাজেই চুল ক'গাছা আর অধিকক্ষণ ছাপা থাকিল না; ধরা পড়িয়া গেল। মহারাজ ভাবেন,—এ কি বিপরীত ব্যাপার, মহাপ্রভু জগন্নাথের মাথার পুষ্প, ইহাতে চুল আসিল কি প্রকারে? নিশ্চয়ই এ মহাপাত্রেরই মাথার পরা পুষ্প প্রসাদ বলিয়া আমার করে অর্পিত হইয়াছে। ভাল, এ বিষয়ে একটা তদন্ত করিয়া দেখিতে হইতেছে। এই বলিয়া নরনাথ কয়েকজন লোককে পুরী অভিমুখে প্রেরণ করিলেন; বলিয়া দিলেন,—যাও, তোমরা সত্বর তিলিচ্ছ মহাপাত্রের নিকটে যাও, যতশীঘ্র পার তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আইস; খবরদার দেখো—বিলম্ব কর তো সবংশে বিনাশ করিব।

নৃপতির আজ্ঞা শ্রবণে তাহারা ক্ষিপ্রগতি দেউলে যাইয়া প্রবেশ করিল এবং মহাপাত্রকে সঙ্গে লইয়া মহারাজের অগ্রে হাজির করিয়া দিল। তাঁহাকে দেখিয়া মহারাজ কালভুজঙ্গের মত গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, বলিলেন—মহাপাত্র! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বলি—প্রভুর মস্তকে চুল উঠিল কত দিন? যদি জীবনের সাধ থাকে, শীঘ্র ইহার উত্তর দিতে চাও; নচেৎ নিশ্চয়ই মৃত্যুপুরে যাইতে হইবে, জানিও। এই দেখিতেছ কি,—আমার হস্তের দিকে চাহিয়া দেখ, এই প্রসাদী পুষ্প দেখিতেছ কি, ইহাতে চুল আসিল কোথা হইতে? বল,—তৎপর ইহার উত্তর বল।

নৃপতির উক্তি শুনিয়া মহাপাত্রের প্রাণ উড়িয়া গেল। এত দূর যে গড়াইবে, তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। অবশ্য ইহা প্রভুরই খেলা; ভাবিয়া তিনি মনেমনে তাঁহারই শরণাগত হইলেন,—মনেমনেই বলিলেন,—প্রভু হে! আমায় রক্ষা কর রক্ষা কর। মহাপ্রতাপী প্রতাপরুদ্র নরপতি, তাঁহার হস্তে আজ আর আমার নিস্তার নাই। তুমি না রাখিলে নিশ্চয়ই মরিতে হইবে দেখি-তেছি। ঠাকুর! মরি তাহে ক্ষতি নাই, ক্ষোভও নাই; কিন্তু তোমার সেবক আমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া মরিব, বড়ই লজ্জার কথা—মর্ম্মপীড়ার কথা। তাই বলি প্রভু! তুমি একটু করুণা-নয়নে চাহিয়া দেখিও, আমি তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এখন মিছা-কথায় রাজাকে বঞ্চনা করি; তারপর তুমি যাহা করিবে তাহাই হউক; কিন্তু দেখো নাথ! তোমার সেবকের যেন কলঙ্ক না হয়,—রাজদণ্ড যেন তাহাকে ভুগিতে না হয়। মহাপাত্র মনেমনে মনের অধীশকে এইরূপ বলিয়া কহিয়া প্রফুল্লবদনে প্রকাশ্যে প্রতাপরুদ্রকে বলিলেন,—মহারাজ! প্রভুর মস্তকে যে কেশ উঠিয়াছে, তাহা কি আপনি জানিতেন না?

ইহা শুনিয়া নৃপতি বলিলেন,—ভালই; তুমি আমাকে দেখাইয়া দিতে পারিবে কি? উত্তরে মহাপাত্র বলিলেন,—নিশ্চয়ই,—আপনি শ্রীজীউর দেউলে বিজয় করুন, আমি নিশ্চয়ই দেখাইয়া দিব। যদি না পারি, যে দণ্ড দিবেন, অবনত মস্তকে স্বীকার করিব। মহারাজ বলিলেন,—উত্তম; কল্যই তোমার কথার বুঝাপড়া হইবে। আজ এখন যাও। কাল যদি প্রভুর

মস্তকে কেশ দেখাইতে পার, তোমারই মঙ্গল; না পার তো এ রাজ্য তোমাকে ত্যাগ করিতে হইবে, জানিও। তোমাকে আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই; তুমি তো আমাকে উত্তমরূপে চেনো। এই বলিয়া নরনাথ তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

মহাপাত্র তথা হইতে আর গৃহে গমন করিলেন না। বরাবর শ্রীপ্রভুর সম্মুখেই আসিলেন। প্রভুর ভোগ আরতি বড়সিংহার পুষ্পাঞ্জলি প্রভৃতি নিত্যকৃত্য সমাধা হইয়া গেল। তিনি তখন সেই সেবকবৎসলের সম্মুখে একবার দাঁড়াইলেন, তার পর সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া উঠিয়া কপালে করসম্পুট রাখিয়া গদ্‌গদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—ওহে মহাবাহু! আমি আর তোমার সম্মুখে অধিক কি জানাইব। অন্তর্যামী তুমি সকলই তো জানিতেছ। ইতর লোককে উচ্চ পদ দিলে এইরূপই হইয়া থাকে প্রভু! ফলে হয় কি, কালে প্রভুর মহত্ত্বই খর্ব্ব হইয়া যায়। কুক্কুরকে প্রশ্রয় দিলে, সে তো বুকে পা দিয়া উঠিয়া মুখ চুম্বন করিবেই। সর্পকে অমৃত পান করাইলে সে তো বিষ বমন করিবেই। আমারও দশা ঠিক তেমনই হইয়াছে। হায়, যে তোমার পাদ-পদ্ম ব্রহ্ম-ইন্দ্রাদি দেববৃন্দ আনত-মস্তকে অহরহ বন্দনা করেন, কমলাদেবী নিরন্তর যে চরণ কমলের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত, যে চরণ-নিঃসৃতা সুরধুনী তিন লোক পবিত্র কারতেছেন এবং যে চরণ-বারি শিরে ধারণ করিয়া দেবাদিদেব মহাদেব আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেছেন, যে চরণ পদ্ম ধ্যান করিয়া যোগিগণ যোগসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন, শুক-সনকাদিও যে

পদারবৃন্দ সেবার যোগ্য কি না সন্দেহ, তুমি কি না, নগণ্য কীটাণুকীট মহাপাতকী মানব আমি, যে তোমার সম্মুখে যাইবারও যোগ্য নয়, সেই আমাকে তাহার সেবার অধিকার অর্পণ করিলে? ফলও উপযুক্ত হইয়াছে। আমি ও-পদের মর্য্যাদা রাখিব কি প্রকারে? তোমার সেবক-পদ পাইয়া আমি মদগর্ব্বে স্ফীত হইয়া পড়িলাম, লঘু গুরু জ্ঞান হারাইলাম, তোমার মহত্ত্ব বিস্মৃত হইলাম, অন্যে পরে কা কথা—তোমারই অবমাননা করিয়া বসিলাম,—আমার মাথায় পরা ফুল লইয়া তোমার মাথায় পরাইয়া দিলাম। হায় প্রভু! আমি আবার তোমার সম্মুখে মুখ ফুটিয়া এই কথা বলিতেছি? তুমি ঐ হস্তস্থিত চক্র দিয়া আমার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেল প্রভু! এখনই আমার পাপ জীবনের অবসান হইয়া যাউক। ঠাকুর হে! তোমায় স্পষ্টই বলিতেছি, আমি তোমার কাছে জীবনের ভিখারী নহি; তুমি যদি জীবন সংহার না কর, আমি এ জীবন রাখিবও না, বিষ-ভক্ষণে ত্যাগ করিব স্থির করিয়াছি। তুমি কেবল এইটুকু করুণা করিও; যেন রাজদণ্ড ভোগ করিতে না হয়। সর্ব্বান্তর্যামিন্! আমি রাজার নিকটে যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহা তো জানিতেই পারিয়াছ। এখন তুমি যদি দয়া করিয়া ইহার কোন বিধিব্যবস্থা না কর, তবে কল্য রজনী-প্রভাতেই রাজা আমাকে ধরাইয়া লইয়া গিয়া কঠোর দণ্ড বিধান করিবেন; তাহা কি আমি সহিতে পারিব,—না, সহিবার অপেক্ষা করিব? দয়াময়! তুমি ভৃত্যপ্রিয়,—লাঞ্ছিত তিরস্কৃত অবমানিত হইয়াও

তুমি ভৃত্যের মান বাড়াইয়া থাক। ঐ যে ভৃগুপদচিহ্ন তোমার বক্ষে জ্বলজ্বল জ্বলিতেছে, ও তো তাহারই নিদর্শন? সেই সাহসেই নাথ! নৃপতির নিকট মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। এখন তোমার যাহা ইচ্ছা। কিন্তু এ কথা সত্য জানিও যে, অদ্য রাত্রি মধ্যে কৃপা না করিলে নিশ্চয় বিষ-ভক্ষণে প্রাণত্যাগ করিব।

মহাপাত্র শ্রীজগন্নাথকে এইরূপ নিবেদন করিয়া তাঁহার চরণতলে সটান্ হইয়া শুইয়া পড়িলেন, তারপর উঠিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। শ্রীজগন্নাথেরও দেউলের দ্বার রুদ্ধ হইল। 'বেঢ়া-নিশোধ' করিয়া (মন্দিরের চারিদিক্ জন-মানব-শূন্য করিয়া) সেবকগণ চলিয়া গেলেন। মহাপাত্রও অত্যন্ত সন্তাপিত চিত্তে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। কিছু বিষ সংগ্রহ করিয়া কাছে রাখিলেন। কিছুই আহার করিলেন না। প্রভুর পাদপদ্মে মন-প্রাণ ঢালিয়া দিয়া শয়ন করিলেন। দু'নয়নে দর-দর অশ্রুধারা। সঙ্কল্প স্থিরই আছে,—প্রভু দয়া না করিলে রাত্রিপ্রভাতের পূর্ব্বেই বিষ-ভোজনে জীবন বিসর্জ্জন করিব।

চিন্তামণির চরণ চিন্তা করিতে-করিতে মহাপাত্র নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। জগন্নাথ তাহা জানিতে পারিলেন। তিনিও অমনি তাঁহার শয়ন-কক্ষে আসিয়া স্বপ্নযোগে আজ্ঞা করিলেন,—মহাপাত্র! তুমি আমার প্রিয়তম ভক্ত; তোমার অত চিন্তা কিসের? যে আমার মত প্রভুর সেবা করে সে আবার ছার অপর কাহার ভয় করিবে? আমি নীলাচলে

বসিয়া থাকিতে-থাকিতে একা নৃপতির কথা কি, কোটিকোটি জগতীপতি আসিয়াও তোমার কিছুই করিতে পারিবে না। আর তুমি যে মিথ্যা-কথার জন্য এত ভীত হইয়াছ; তাহা তো মূলেই মিথ্যা নয়। কেন, আমি কি নেড়া,—আমার মস্তকে কি কেশ নাই? এই দেখনা, কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশকলাপে আমার মস্তক ভরিয়া রহিয়াছে। তোমার কোন ভয় নাই, তুমি একটু রাত্রি থাকিতে-থাকিতে আমার কাছে আসিও; প্রত্যক্ষ আমার কেশ দেখিতে পাইবে, আর রাজাকে দেখাইয়াও তাহার মনের সন্দেহ মিটাইয়া দিতে পারিবে। এই বলিয়া ভক্তবৎসল চলিয়া গেলেন। দেউলে গিয়া স্বর্ণপর্য্যঙ্কে কমলাদেবীর অঙ্কে শয়ন করিলেন। ভৃত্যকে আশ্বস্ত করিয়া তবে যেন তাঁহার প্রাণে শান্তি আসিল। ভালবাসার ঠাকুর ভালবাসার আভাষ পাইলেও এতটা ভালই বাসেন বটে!

এদিকে মহাপাত্র নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দেখেন, আশে-পাশে কেহই নাই। প্রাণে বিমল আনন্দ। মনেমনে ভাবেন,—নিশ্চয়ই প্রভু দয়া করিয়াছেন। না, আর শয়ন করিব না। স্নানাদি সারিয়া সত্বর শ্রীমন্দিরে গমন করি। আমার দয়াময় প্রভুর দয়ার বিকাশ দর্শন করিগে। এই বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিলেন, নিত্যকৃত্য-স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক ত্বরিতপদে দেউলে যাইয়া প্রবিষ্ট হইলেন। তখনও রাত্রি এক প্রহর অবশিষ্ট রহিয়াছে। হইলে কি হয়, তিলিচ্ছ মহাপাত্রের আদেশ অন্যান্য সেবকগণ সম্মানের সহিত পালন করিয়া থাকেন। তাই

অসময়ে শ্রীমন্দিরের দ্বার উন্মোচন করাইতে বেগ পাইতে হইল না। তিনি দ্রুত-গতি দেউলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া একবারে যাইয়া রত্নবেদীর উপরে উঠিলেন। প্রাণে সংশয় আছে কি না, তাই প্রভুর অন্য অঙ্গের দিকে না দেখিয়া আগে মস্তকের দিকেই চাহিয়া দেখিলেন। দেখিয়া আনন্দ আর ধরে না। কৃতজ্ঞতায় অন্তর পূরিয়া গেল। অশ্রুতে নয়ন ভরিয়া গেল। পুলকে শরীর পূর্ণ হইয়া গেল। গদ্‌গদে বাণী রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি দেখিলেন কি? দেখিলেন,—শ্রীপ্রভুর মস্তক ভ্রমরকৃষ্ণ কেশপাশে ভরিয়া গিয়াছে। সেই কেশে আবার নানা ফুলের শোভন বেশ, পৃষ্ঠদেশ দিয়া সেই কেশগুচ্ছ রত্নবেদী স্পর্শ করিয়াছে। আহা আহা, যেন নবীন জলধরের উপর নক্ষত্র-খচিত নীল আকাশখানি খসিয়া পড়িয়াছে!

এইবার মহাপাত্রের মনের বল-ভরসা বাড়িয়া গেল, তিনি সংশয়-রহিত-চিত্তে শ্রীজগন্নাথের সেবাকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। এদিকে মহাপ্রতাপশালী প্রতাপরুদ্র প্রাতঃকাল হইতে না হইতেই শ্রীমন্দির অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি যতদূর সম্ভব সত্বর আসিয়া মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। মহাপাত্র সেইখানেই ছিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র মহারাজ বলিয়া উঠিলেন,—কই, কই বিপ্র! তোমার জগন্নাথের মস্তকে কেশ কই? মহাপাত্রও হাস্যমুখে বলিলেন,—মহারাজ! আমাকে আর জিজ্ঞাসা করিতে-ছেন কেন? প্রভু তো ঐ আপনার সম্মুখেই রহিয়াছেন; আপন ইচ্ছামত দর্শন করিতে পারেন। মহারাজও "বেশ বেশ"

বলিয়া শ্রীরত্নবেদীসমীপে গমন পূর্ব্বক প্রভুর দিকে চাহিয়া দেখেন,—অহো, কি সুন্দর কি সুন্দর! প্রভুর মস্তক কৃষ্ণকেশে ভরিয়া রহিয়াছে,—পৃষ্ঠদেশেও গুচ্ছগুলি লম্বমান হইয়া নিতম্ব স্পর্শ করিয়াছে।

মহারাজ দেখিলেন বটে, কিন্তু মনে বেশ বিশ্বাস জন্মিল না,—চুলগুলি অকৃত্রিম কি না। তিনি আবার বিপ্রবরকে জিজ্ঞাসিলেন,—মহাপাত্র! সত্য করিয়া বল, প্রভুর এই কেশগুলি কৃত্রিম কি না? বলি, মোম-টোম গালা-টালা দিয়া তো পরের কেশ প্রভুর মাথায় লাগাইয়া দাও নাই? এ যে বড় বিচিত্র কথা, সহজে বিশ্বাস করা যায় কি?

মহাপাত্র বলিলেন,—মহারাজ! যদি অবিশ্বাসই হয়, নিজেই তো পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। মহারাজও শশব্যস্তে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া প্রভুর মস্তকের গোটাচারি কেশ ধরিয়া ঝাঁকুনি দিলেন। আর বলিতে জিহ্বায় জড়তা আইসে, অমনি প্রভুর মস্তক হইতে ফিণিক দিয়া রুধিরধারা বাহির হইয়া পড়িল। দেখিয়া নৃপতি তো আর নাই; তিনি ঢলিয়া ধরণীতলে পড়িয়া গেলেন। সেবকগণ জলসেকাদির দ্বারা তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। সংজ্ঞা প্রাপ্তি-মাত্র মহারাজ মহাপাত্রের যুগলচরণে পতিত হইয়া কৃতাঞ্জলি-করযুগল মস্তকে রাখিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—দ্বিজবর! আমায় রক্ষা কর, রক্ষা কর। আমি মহা মূর্খ মহা অপরাধী। হায়, এইবার আমি সর্ব্বাংশে বিনষ্ট হইলাম। প্রভুর যে সেবকের প্রতি এত দয়া,

তাহা এতদিন জানিতাম না, কিন্তু আজ ভালই জানা গেল যে, ভগবান্ ও ভক্ত ভিন্ন নহেন; তাঁহাদের মরমে-মরমে মাখা-মাখি; ভক্তের মান-অভিমান সুখ-দুঃখ সম্পদ-বিপদ্ যাহা কিছু, ভগবানের অন্তরে-অন্তরে অনুভূত হইয়া থাকে। হায় হায়, মূঢ় আমি কি মন্দ কর্ম্মই করিলাম? আমি ভগবানের কাছে অপরাধী, ভগবানের ভক্তের কাছেও অপরাধী হইলাম। হায় হায়, আমি জ্বলন্ত অনলে আত্মাহুতি প্রদান করিলাম। সাধ করিয়া কালকূট বিষ খাইয়া ফেলিলাম। আর তো উদ্ধারের উপায় নাই উপায় নাই,—এখন ভক্তবর! তুমি যদি দয়া করিয়া আমায় রক্ষা কর, তবেই।

এইরূপ বলিতে-বলিতে মহারাজের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তাঁহার মস্তকের মুকুট কোথায় চলিয়া গেল। তিনি ব্রাহ্মণের চরণে মস্তক লুটাপুটি করিতে-করিতে চেষ্টাহীন হইয়া পড়িয়া রহিলেন। মহাপাত্রও মহারাজকে কোলে করিয়া তুলিয়া-ধরিয়া স্নেহ-সম্ভাষণে কহিলেন,—দণ্ডধর! তোমার কল্যাণ হউক, কল্যাণ হউক। দোষ তোমার নয়, আমারই হইয়াছিল। তবে কি জানি করুণাবারিধি দারুহরির কি মহিমা; তিনি আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া আপন কৃপাবৈভব বিস্তার করিয়াছেন। সেবকবৎসল প্রভু আমার—সেবক-রক্ষার জন্য কি না করিয়া থাকেন মহারাজ? তাঁহারই করুণাময় নামের—সেবক-সহায় নামের—দীন-দয়াময় নামের জয় দিন মহারাজ! জয় দিন।

উভয়ে এইরূপ বলাবলি করিতে-করিতে দারুব্রহ্মের দিকে

চাহিয়া দেখেন,—অহো, আর তাঁহার মস্তকে কেশ নাই, সে কেশের রাশি কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে! পতিতপাবনের এই অদ্ভুত লীলা দর্শন করিয়া নয়নাথের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাঁহার হৃদয় ভক্তিতে আর্দ্র হইয়া গেল। তিনি তখন গদ্‌গদ-কণ্ঠে প্রভুকে বলিতে লাগিলেন,—গোঁসাই হে! তুমি সব করিতে পার। তোমার মহিমার পার দেবতাগণই প্রাপ্ত হন না, সামান্য মানব আমি কি-ই বা জানিব বল? প্রভু! তুমি তো সকলেরই প্রভু। তোমার তো পর-অপর নাই। তাই বলি, তুমি আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর,—কৃপা করিয়া আপন ভৃত্য বলিয়া অঙ্গীকার কর। এই বলিয়া তিনি বারংবার প্রভুকে প্রণাম করিলেন। তার পর বাহিরে আসিয়া অনেক দান-পুণ্য করিলেন, দুই হাতে করিয়া ধনরত্ন বিতরণ করিলেন। প্রভুর সেবকগণকে ডাকিয়া সহস্রসহস্র মুদ্রার ভোগ লাগাইলেন। সে মহাপ্রসাদ ভোজনের মহামহোৎসবই বা দেখে কে! তার পর তিনি প্রসন্ন-মনে আপন ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। শ্রীজগদ্বন্ধু মহাপাত্র প্রভুর বলিহারি দিয়া নিয়মিত সেবায় নিযুক্ত হইলেন। অন্যান্য সকলে ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়সাগরে ডুবিয়া গেলেন। সকলেই বলেন,—জয় ভক্তবৎসল ভগবানের জয়,—জয় ভবপারের কাণ্ডারী শ্রীহরির জয়,—জয় অনাথের নাথ জগন্নাথের জয়।

———

গোবিন্দ দাস

এ সংসারের ভাল-মন্দ কিছু বুঝা যায় না। আজ যাহা ভাল, কাল তাহা মন্দ। আজ যাহা আমার একমাত্র আসক্তির সামগ্রী, কাল আমি তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করি। ইহা সামগ্রীর স্বভাব, কি আমার মনের স্বভাব, কি বলিব? বোধ হয়, যাহাকে ভাল বাসিলে সে আর কখনও মন্দ হইতে জানে না; যে এখনও যেমন, তখনও তেমন, সেই চির-নূতন চির-প্রীতিনিকেতন সামগ্রী এ জাগতিক সামগ্রীর মধ্যে নাই। তাই এখানকার কোন পদার্থ ই আমাদের চির-প্রিয় চির-মধুর হয় না। সেই নিমিত্তই তো উত্তর-খণ্ডবাসী গোবিন্দদাস আজ গৃহত্যাগী! অত যে তাঁহার সংসারে আসক্তি, আজ তাহা স্রোতের বেগে তৃণের মত কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণের সাজান ঘরকরণা;—স্ত্রী ছিল, একটি কন্যা দুইটি পুত্র ছিল, রোজকারপাতী ছিল, বার মাসে তের পার্ব্বণ ছিল,—বাগান-বাগিচা কোঠাবালাখানা সবই ছিল। কিন্তু এ সকল অধিক কাল তাঁহার মন মজাইতে পারিল না; কি জানি কিসের জন্য তিনি সকল ছাড়িয়া উধাও হইয়া ছুটিলেন। কেবলই ভাবেন—হায়, আমার জীবনে ধিক্। এতটা দিন বৃথাই অতিবাহিত করিলাম! বিনা-সূতার বাঁধনে আবদ্ধ রহিয়া,—মুখে মুখোস লাগাইয়া রহিয়াছি! হায়, এখানকার সবই তো ছেলেখেলার ঘরই দেখছি। এখানকার কেহই তো কাহারও

নয়? যত দিন দেহ সমর্থ, যত দিন গুণের বিকাশ, যত দিন ধন-সম্পদ, এখানকার আদর তত দিন—আপনার গৃহেও প্রভুত্ব তত দিন। কিন্তু একবার জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ হইলে হয়, তখন আর অর্থ-উপার্জ্জনের সামর্থ্য থাকে না, পুরজনের মনোরঞ্জনের ক্ষমতা থাকে না, বিদ্যাদিরও স্ফূর্ত্তি হয় না, ফলে তখন কাহারও কোন স্বার্থ-সিদ্ধি করিতে পারা যায় না; কাজেকাজেই তখন বন্ধু বিগড়াইয়া যায়,—সকলেই শত্রু হইয়া পড়ে। বুড়ো মানুষ, কথায়-কথায় ভ্রম,—কি করিতে কি করিয়া বশে, তাহার প্রতি-কার্য্যেই তখন সকলের রাগ,—সকলের ঠাট্টা বিদ্রূপ—নাকে হাত দিয়া হাসি। অধিক কি, নিজের হস্তে উপার্জ্জন করা ধনেও তাহার আর তখন অধিকার থাকে না; সে ধন তখন তাহাকে ছুঁইতেও মানা,—দেখিতেও মানা। তাহার কিছু খরচ করিলে তো আর রক্ষাই নাই; তখন বুড়ার মান বজায় রাখা কঠিন। তখন সে বুড়াও যা, আর একখানা শুক্‌ণা কাঠও তা। হায় কি সর্ব্বনাশ, আমি এই গৃহবাসেই ফাঁসিয়া গিয়াছি? অহো কি ভ্রান্তি; ছার সংসার-রসে রসিয়া আমি কি না সেই সারাৎসার শ্রীহরিকে ভুলিয়া রহিয়াছি? হায়, একবারও মনে হয় না যে, যিনি এই জগতের কর্ত্তা, সকল জীবের অন্নদাতা, তাঁহাকে একবার ভাবি? হায়, এ ভাবও একবার প্রাণে জাগে না যে,—কামধেনুর মত যিনি সকলের সকল কামনাপূরণ করেন, যিনি কর্ম্মরজ্জু ধরিয়া সকলের জন্ম মৃত্যু ও স্থিতির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, সেই ভাবগ্রাহীকে একবার ভাবি? কই, এমনও তো একবার মনে হয় না যে,—

এ পাপজীবনকে পুণ্যময় করিতে,—এ মরুপ্রান্তরকে কোকিল-কূজিত ভ্রমর-গুঞ্জিত নন্দন-কাননে পরিণত করিতে,—এ কালকূট-হলাহলকে অমৃতে অমৃত করিতে, যিনি বিনা অন্য কেহ পারেন না,—সেই মধুর-মধুর বড়ই মধুর,—সেই নূতন-নূতন নিতুই-নূতন,—সেই আপন-আপন সদাই আপন ঠাকুরকে ভজি? নাঃ—আর না; আমি আর এ গৃহবাসে থাকিব না। যাই,—আমার প্রাণের আরাধ্য দেবতা ঐ—ঐ আমায় আহ্বান করিতেছেন, আমি তাঁহারই উদ্দেশে যাই। ছার গৃহবাস,—ছার আত্মীয়-কুটুম্ব,—ছার ধনরত্ন; থাক্—থাক্—উচ্ছিষ্ট পত্রের মত পড়িয়া থাক্, আমি চলিলাম! আমার প্রাণের ভিতর সেই "রসিয়া বাঁশিয়া বদন" ভাসিয়া উঠিয়াছে,—সেই কুলনাশী ডাকাতিয়া বাঁশী বাজিয়া উঠিয়াছে; আর কি আমি রহিতে পারি? যাই,—যাই সেই আনন্দকন্দ নন্দনন্দনের পদারবিন্দ সেবন করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিগে।

গৃহের বাহির হওয়া বড় সহজ কথা নয়। 'হইব হইব' মনে করে অনেকে, কিন্তু হইয়া পড়া অতি কঠিন। হইয়া পড়িলেও বজায় রাখা আবার আরও কঠিন। 'গ্যাস' বা ধোঁয়ার জোর কম হইলেই ফানুযটা উঠিতে-উঠিতে নামিয়া পড়ে; কিন্তু পুরা 'গ্যাস' হইলেই উধাও হইয়া উড়িয়া যায়। এ কার্য্যেও সেইরূপ পুরা গ্যাসের প্রয়োজন;—ঈশ্বরে ও তাঁহার শক্তিতে বিশ্বাস, বৈরাগ্যে বিশেষরূপ দৃঢ়তা এবং সর্ব্বেন্দ্রিয় সংযম আবশ্যক। জিতেন্দ্রিয় গোবিন্দদাসের এইরূপ দৃঢ়তা এইরূপ ঈশ্বর-বিশ্বাসই

জন্মিয়াছিল, তাই তাঁহাকে আর ফিরিয়া আসিতে হয় নাই ; গৃহ ত্যাগ করিয়া তিনি নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ভালবাসার ধর্ম্ম,—যখন যাহাকে ভাল বাসা যায়, তখন তাহার স্থানটা পর্য্যন্ত মিষ্ট লাগে ;—তাহার একটু সম্বন্ধ-গন্ধ পাইলেই মধুলুব্ধ মধুকরের মত সেইখানেই উড়িয়া যাইতে প্রাণ চায় ; তাই যাঁহারা ভগবান্‌কে ভালবাসেন, তাঁহারা যেখানে-যেখানে তাঁহাদের ভালবাসার সম্বন্ধ পান, সেখানে-সেখানেই ভ্রমিয়া বেড়ান। আহা, এই সেই ধীরসমীর, এই সেই যমুনা-পুলিন, এই সেই নিকুঞ্জ-কানন, এই সেই রাসস্থলী,—এই সকল স্থলেই নিত্যলীল প্রভু আমার বিচরণ করেন ; আহা, তাঁহার প্রীতির স্থলে বেড়াইতে-বেড়াইতে যদি কোথাও তাঁহার একবার দেখা পাই, তবেই তো আমার সকল সাধ সকল আশা পূর্ণ হইয়া যায় ; আহা, এ সকল স্থান কি মিষ্ট কি মিষ্ট !—এইরূপ ভাবিয়াই পরমার্থভিখারী ভাগবতগণ তীর্থে-তীর্থে ঘুরিয়া বেড়ান। তাঁহারা যে তীর্থেই গমন করুন না কেন, সেইখানেই যেন তাঁহাদের প্রাণারাধ্য দেবতার সেইস্থানের উপযুক্ত লীলাসক্ত মূর্ত্তি তাঁহাদের নয়ন-সমক্ষে খেলিয়া বেড়ায়, আর তাঁহারাও আনন্দে-আনন্দে অধীর হইয়া উঠেন ;—লীলার অনন্ত বারিধির বিচিত্র লীলাতরঙ্গ দর্শনে ভাব-বিভোর হইয়া পড়েন। গোবিন্দদাসের তীর্থ-ভ্রমণও সেই নিমিত্ত।

উচ্চৈঃস্বরে হরিহরি বলিতে-বলিতে তিনি চলিয়াছেন। নির্ম্মম নিরহঙ্কার ভাব। মান-অপমান নাই। সকল জীবেই সমান দৃষ্টি ;

তা ছোটই বা কি আর বড়ই বা কি। প্রাণ আনন্দেই পূর্ণ। আহারের প্রয়াস নাই; যে দিন যেমন জোটে। উত্তম, শালি-অন্ন, বিবিধ ব্যঞ্জন, দুগ্ধ, দধি, সর, মিষ্টান্ন প্রভৃতি স্বাদু আহার জুটিলেও যা, ফল-মূল জুটিলেও তা-ই; আবার কিছু না জুটিলেও সেই ভাব। জলেরও বিচার নাই;—তা নদীরই হউক, পুষ্করিণীরই হউক, কিংবা কূপাদি যাহারই হউক, পিপাসার সময় একটু পাইলেই হইল। শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, বর্ষা নাই, বৃক্ষমূলেই বাস। কোন কিছুর কামনা নাই; দুঃখ যে কাহাকে বলে, তাহার অনুশোচনাও নাই। এইরূপে তীর্থ ভ্রমণ করিতে—করিতে তাঁহার শরীর ক্ষীণ ও মলিন হইয়া পড়িল, যেন অকালের কাঙ্গাল। দেখিলে অশ্রদ্ধা হয়। কাছে আসিলে সকলেই বলে,—আ- মোলো, এ পাগোলটা আবার কেথা থেকে এসে জুটলো?—দূর্ দূর্ মার্ মার্; সাবধান হে সাবধান, এখনই কারুর কিছু চুরি ক'রে নিয়ে পালাবে। এইরূপ দুর্ব্বাক্য বোলে সকলেই তাঁকে তাড়িয়ে দেয়। তাঁহার তাতে দুঃখ নাই, ক্ষোভও নাই। বলেন,—

"বোলে—মো পূর্ব্ব কর্ম্ম যেতে। সে সিনা করি অচ্ছি এতে?
ভল বা মন্দ হানি লাভ। যে পুর্ব্ব অরজন থিব॥
কে তাহা অন্যথা করিব? সে তাহা অবশ্য ভুঞ্জিব॥"

আমার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মই তো আমাকে এইরূপ নির্যাতন করাইতেছে? ভাল হউক, মন্দ হউক, হানি কিংবা লাভই হউক, পূর্ব্বের যাহা অর্জ্জন করা থাকিবে, কে তাহা অন্যথা করিবে? তাহা অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। আমার কৃত কর্ম্মের ফল

অন্য কেহ তো আর ভোগ করিতে আসিবে না? ইহাতে অকারণ লোকের দোষ দিতে যাইব কেন? কাহারও উপর রাগই বা করিতে যাইব কি নিমিত্ত

গোবিন্দদাস এইরূপে একেএকে গয়া, গঙ্গা, বারাণসী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র, অযোধ্যা, হরিদ্বার, বদরিকাশ্রম, দ্বারকা, প্রভাস, শ্রীরঙ্গক্ষেত্র, পুরুষোত্তম, সেতুবন্ধ রামেশ্বর প্রভৃতি পবিত্র তীর্থ পর্য্যটন করিয়া একদিন মনেমনে ভাবিলেন,—এইবার শ্রীলছমন দেবকে দর্শন করিতে যাইতে হইতেছে; তা তাহাতে যতই ক্লেশ হউক,—প্রাণ থাকুক আর যাউক। হায়, কতদিনে আমি তাঁহার শ্রীমুখ দর্শন করিব? কতদিনে আমার জন্মবন্ধন বিমোচন হইয়া যাইবে? এইরূপ ভাবিতে-ভাবিতে তিনি লক্ষ্মণ-ক্ষেত্র অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি তৈর্থিক সাধুর মুখে শুনিয়াছিলেন যে, দক্ষিণদেশের লক্ষ্মণদেব মহাপ্রতাপী; তাঁহাকে চর্ম্মচক্ষুতে দর্শন করিলেই অনায়াসে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়!

এইরূপে কিছুদিন যাইতে-যাইতে তিনি সেই ক্ষেত্রসীমায় আসিয়া পৌঁছিলেন। পথ অতি দুর্গম,—জনমানবহীন হিংস্র-জন্তু-পরিপূর্ণ নিবিড় অরণ্য। একাকী—সঙ্গে কেহ নাই; তিনি সেই অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন বর্ষাকাল। পিচ্ছিল পথ। শক্তিহীন বৃদ্ধশরীর লইয়া তিনি ধীর-পদবিক্ষেপে সেই পথে অবিশ্রান্ত চলিতেছেন;—বারংবার পড়িতেছেন, উঠিতেছেন। তথাপি চলিবার বিরাম নাই। বৃষ্টিতে তাঁহার শরীর ক্রমশ

অবসন্ন হইয়া পড়িল, জরাজীর্ণ ক্ষীণ তনুখানি শীতে থরথর কাঁপিতে লাগিল। দন্তে-দন্তে ঠক্‌ঠকি ধ্বনি হইতে থাকিল। জিহ্বায় জড়তা আসিয় গেল ; ক্রমেক্রমে বাক্‌শক্তিও বিলুপ্ত হইল। তখনও বৃদ্ধ ধীরেধীরে চলিতেছেন। কিন্তু এ ভাবে আর অধিকক্ষণ চলা চলিল না ; তিনি এক বৃক্ষতলে পড়িয়া গেলেন ; আর উঠিতে পারিলেন না। শরীর অবসন্ন হইলেও কিন্তু তাঁহার মন অবসন্ন হয় নাই। তাহার বল তখনও সমান, কি বোধ হয় পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। গোবিন্দদাস সেই মনের আসনে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্থাপন করিয়া, মনেমনেই বলিতে লাগিলেন,—ভগবন্! তুমি করুণার কনকগিরি। তুমি সকল জীবের গুরু জ্ঞানদাতা,—হিতসাধক—মাতা-পিতা ; তোমাকে আর আমি কি বলিব? তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ঠাকুর তুমি, তোমার তো অজ্ঞাত কিছুই নাই? প্রভু! তুমি সেই রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্রের অনুজ ; তোমার তেজ কোটিসূর্য্য অপেক্ষাও সমুজ্জ্বল, রূপ কন্দর্পের দর্পনাশক ; এ জগতে তোমার তুলনা মিলে না। আর্ত্তের আর্ত্তি ভীতজনের ভীতি বিনাশ করিবার নিমিত্ত তুমি যুগল করে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছ। এই জন্যই তো তোমার অবতার মহিমময়! তুমি সাক্ষাৎ সেই অনন্তদেব, তোমার রূপ-গুণাদির অন্ত নাই ; তুমি অনন্ত মূর্ত্তি ধরিয়া,—জীবের অন্তরে বাহিরে বিরাজ কর ; অতএব অন্তর্যামী তুমি সকলেরই অন্তরের কথা জানিতে পার। তোমায় নূতন করিয়া জানাইব আর কি? আমি তোমার ঐ অভয় পাদপদ্মের

শরণাগত,—আমার জীবন রক্ষা কর। এ জীবন ভিক্ষা জীবনের জন্য নয়,—জাগতিক তুচ্ছ বিষয় ভোগের জন্য নয়,—জগজ্জীবন তোমার শ্রীমুখ দর্শনের জন্য। অধিক নয়, একবার,—কেবল একটিবার তোমার চন্দ্রবদন আমাকে দেখাও, তারপর জীবন থাকুক আর যাউক; যা তোমার ইচ্ছা। হায়, এখন যদি একটু আগুন পাই, তাহার তাপে দেহটাকে ঠিক করিয়া লই; আবার তোমার দর্শনের জন্য প্রধাবিত হই। আগুন একটু মিলে না কি?

গোবিন্দদাস বৃক্ষতলে শুইয়া-শুইয়া এরূপ ভাবিতেছেন; রামানুজ লক্ষ্মণ তাহা জানিতে পারিলেন। শরণাগতির অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি; তিনি আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না; ভৃত্যের উদ্দেশে বেগে ধাবিত হইলেন। তিনি এক শবরের রূপ ধরিয়া, হস্তে একটি উনুন তাহাতে জ্বলন্ত আগুন লইয়া তৎপর গোবিন্দদাসের পার্শ্বে রাখিয়া জলদগম্ভীরস্বরে বলিলেন,—আহা, তোমার বড় শীত করিতেছে,—না? এই অনলের তাপ লও, শীতের ভয় দূরে যাইবে।

সেই স্নেহমাখানো স্বরে গেবিন্দদাসের চমক ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি চাহিয়া দেখেন,—সুন্দর শবরমুর্ত্তি; অদূরে অগ্নিপাত্র,—গন্‌গনে আগুন জ্বলিতেছে। দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। শবরকে কৃতজ্ঞতা জানাইতে গেলেন; শীত-জড় জিহ্বায় বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। অগ্নির উত্তাপ লইতে গেলেন, শীত-জড় শরীর চালাইতে পারিলেন না। তাঁহার নয়ন দিয়া অশ্রুর ধারা বাহির হইয়া পড়িল। অনেক চেষ্টার পর তিনি কাতরকণ্ঠে অস্পষ্টস্বরে,—

অনেকটা আকার-ইঙ্গিতেই বিনয়ভঙ্গীতে শবরকে জানাইলেন,—বাপু হে! আমার অঙ্গ চালাইবার ক্ষমতা নাই; একটু তুলিয়া বসাইয়া দিতে পার?

মায়াশবরও হাসিহাসি-মুখে তাঁহাকে হাতে ধরিয়া তুলিয়া বসাইয়া দিলেন, অগ্নির পাত্রটি তাঁহার গা ঘেঁসিয়া স্থাপন করিলেন। তাঁহার শ্রীহস্ত-সংস্পর্শে গোবিন্দদাসের শরীরের অবসাদ দূর হইয়া গেল, বল যেন শতগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। আর জিহ্বার জড়তা নাই। শরীরের জড়তা নাই। তিনি অগ্নির উত্তাপ লইতে-লইতে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—বাপু হে! বয়স অনেক হইয়াছে; মরণের জন্য দুঃখ ছিল না। কিন্তু প্রাণের একমাত্র সাধ,—চর্ম্মচক্ষুতে একবার শ্রীলছমন দেবকে দেখিয়া জীবন বিসর্জ্জন করি; সেই জন্যই জীবন রক্ষার বাসনা। নচেৎ এ পাপজীবন যাইলেই ভাল ছিল। তা বাপু! তুমি আজ যাহা উপকার করিলে, তাহা আর কি বলিব। আমি তোমাকে ধর্ম্মত পিতৃ সম্বোধন করিলাম; আজ হইতে তুমি আমার ধর্ম্মপিতা হইলে।

গোবিন্দদাস মনেমনে ভাবিলেন,—এ নিশ্চয় সেই করুণাময় প্রভুরই করুণার বিকাশ; তাহা না হইলে কি এই বিজন অরণ্যে শবর আসিয়া আমার জীবন দান করিত? ধন্য প্রভু! ধন্য তোমার মহিমা!

এইবার গোবিন্দদাসের মনের আনন্দ মুখে ফুটিয়া বাহির হইল। তিনি হাসিহাসি-মুখে শবরের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসিলেন, —ওহে ধর্ম্ম-পিতা! তোমার নাম কি? বাড়ি কোথায়? এখান

থেকে কত দূর? কে তোমাকে এখানে পাঠাইল? এই ঘোর বর্ষাকালে তুমি আসিয়া আমার জীবন দান করিলে। তোমার এ উপকার-ঋণ কোটিজন্মেও আমি পরিশোধ করিতে পারিব না। আহা, আমার জন্য তোমার বড়ই ক্লেশ হইতেছে,—না? না না, আর তোমার থাকিয়া কাজ নাই, ভারি কষ্ট হইতেছে বটে। তা তুমি কিছু মনে ক'র না। আমার প্রতি যেন অনুগ্রহ থাকে। গোবিন্দদাসের কথার উত্তরে মায়াশবর আর কিছু বলিলেন না, হাসিতেই প্রতি কথার প্রত্যুত্তর দিয়া হাসিতে-হাসিতে সরিয়া পড়িলেন।

প্রভুর মহিমায় তখন গোবিন্দদাসের অন্তর-বাহির ভরিয়া গিয়াছে। কি-যেন কি-এক নেশার আবেশে তিনি বিভোর হইয়া পড়িয়াছেন। সেই ভাবেই কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। তার পর তিনি আবেশ-ভাঙ্গা হইয়া পড়িলেন,—সেই অপ্রাকৃত ভাব-রাজ্য হইতে প্রাকৃত রাজ্যে আসিয়া পড়িলেন, অমনি তাঁহার শরীরে এখানকার ক্ষুধা-তৃষ্ণার আবির্ভাব হইল। তিনি অসহ্য ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িলেন। মনেমনে ভাবেন,—এই নিবিড় অরণ্যে ঘর নাই—গ্রাম নাই—বিপ্রগৃহও নাই; আমার অন্ন মিলিবেই বা কোথায়? তিনি মনকে এইরূপে প্রবোধ দিয়া বসিয়া-বসিয়া রাম-কৃষ্ণ-হরিনাম ভজন করিতে লাগিলেন। কৃপার সাগর দীন-বন্ধু তাহা জানিতে পারিলেন। জানিবেন না-ই বা কেন?

"গগন-চাতককু নিতি। বরষা-জল যেহু দ্যন্তি॥
গর্ভর বালককু অন্ন। যে দেই রখন্তি জীবন॥

কাষ্ঠকীটর পড়িদাতা। তাকু অপূর্ব্ব কেউ কথা ?"

যিনি শীত-গ্রীষ্ম সকল কালেই আকাশের চাতকপক্ষীকে বরষার জল যোগাইয়া থাকেন; যিনি গর্ভস্থ বালককে অন্নদান করিয়া বাঁচাইয়া রাখেন; কাষ্ঠের অভ্যন্তরে স্থিত ক্ষুদ্র কীটেরও যিনি প্রতিপালক, তিনি জানেন না, এমন কোন কথা থাকিতে পারে কি? দীননাথ অমনি এক বিপ্র-রূপ ধারণ করিয়া হস্তে বর্ষার প্রীতিপদ খাদ্য গরম-গরম খিচুড়ী, নূতন ভাণ্ডে নানাবিধ ব্যঞ্জন, আচার, দধি, ছানা প্রভৃতি লইয়া ক্ষিপ্রগতি চলিলেন। গোবিন্দদাসের পাশে আসিয়া বলিলেন,—ওহে বিপ্রবর! বসিয়া-বসিয়া ভাবিতেছ কি? অন্ন চাহিতেছিলে না?—এই নাও তোমার জন্য অন্ন আনিয়াছি, উঠিয়া ভোজন কর। শুনিয়া ব্রাহ্মণ তো আর নাই। বিস্ময়ে-বিস্ময়ে চাহিয়া দেখেন,—সত্যই তো, সুন্দর বিপ্রমূর্ত্তি, উত্তম খাদ্য সামগ্রী, আহা গন্ধে মন মাতিয়া উঠিতেছে হাত দিয়া দেখেন,—তাই তো গরমও রহিয়াছে; কি বিচিত্র কি বিচিত্র! তিনি হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। বলি-বলি করিয়াও কোন কথা বলিতে পারিলেন না। মনে হইতে লাগিল,—জননীর বাৎসল্যরসে যেন সে স্থানটা ভরিয়া গিয়াছে; মা যেন ক্ষুধার্ত্ত সন্তানের কোলে অন্নস্থালী ধরিয়া দিয়া স্নেহপূত দৃষ্টিতে বারংবার খাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। মনে হইল,—একবার জিজ্ঞাসা করি না কেন, শান্ত সৌম্য পুরুষ-মূর্ত্তিতে মায়ের মমতা মাখাইয়া তুমি কে আসিলে হে? কিন্তু আনন্দ-গদ্‌গদে তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তখনও সেই ভোজনের জন্য ইঙ্গিতে উত্তেজনা

সমভাবেই চলিয়াছে। তিনি কি করেন, কম্পিতকরে গ্রাসেগ্রাসে অন্ন উঠাইয়া মুখে দিতে লাগিলেন। অন্ন কতক মুখে যাইতেছে, কতক এদিকে ওদিকে পড়িয়া যাইতেছে; দৃষ্টি সেই চিত্তহারী বিপ্রমুর্ত্তির দিকে। কি খাইতেছেন কিছুই ঠিক নাই। কিন্তু এটা ঠিক—যা খাইতেছেন, তাহাই অমৃত। তাঁহার তখন অন্তর-বাহির সকলটাই অমৃতময়। বোধ হইতে লাগিল, সেই মুর্ত্তিরই দৃষ্টিটা যেন অমৃতে গড়া; সে দৃষ্টি যেখানে পড়িতেছে, সেইখানেই অমৃত-বৃষ্টি হইতেছে।

খাও—খাও গোবিন্দদাস! খিচুড়ি খাও খিচুড়ি খাও। আজ তোমার সকল খাওয়ার শেষের সে দিন, খিচুড়ী খাও। তোমার সাধের ঠাকুর আদর মিশায়ে নিয়ে এসেছেন, খিচুড়ী খাও। খাও—খাও গোবিন্দদাস! খিচুড়ী খাও খিচুড়ী খাও।

আনন্দে-আনন্দে গোবিন্দদাসের খিচুড়ী-খাওয়া শেষ হইয়া গেল। মুখের কথাও ফুটিয়া উঠিল। কথাগুলি কিন্তু মাতালের মত আড়ো-আড়ো। তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—তু-তু-তুমি কে বট হে? কো-কো-কোথা থেকে এলে বল দেখি, কে বট হে? ক্ষু-ক্ষু-ক্ষুধা পেয়েছে, কে বোলে দিল, তু-তু-তুমি কে বট হে? বা-বা-বামুন বোলে আমার বোধ হয় না, তু-তু-তুমি কে বট হে? বো-বো-বোধ হয় তুমি মোর লক্ষ্মণ, ব-ব-বল-বল তাই না কি হে? বলিতে-বলিতে বাষ্পবেগে ব্রাহ্মণের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তিনি আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। নয়নে প্রেমাশ্রুর পবিত্র

প্রবাহ। কিছুক্ষণ স্তম্ভিতের ন্যায় থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন,—তুমি আমার তাই বটে, তাই বটে। যাঁহার মায়া দেবতারও অগোচর, ছার মানব আমি তাঁহার স্বরূপ জানিব কি প্রকারে? কৃপাময়! কৃপা করিয়া তোমার প্রকৃত পরিচয় দাও, আমার তাপিত প্রাণ শীতল হইয়া যাউক। না দাও তো নিশ্চয় জানিও —আমি তোমার সম্মুখেই আত্মঘাতী হইব।

দয়াময় সকলই দেখিলেন, সকলই শুনিলেন; ব্রাহ্মণের বিশুদ্ধ ভাব দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। সুস্নিগ্ধ কোমল স্বরে বলিলেন,—গোবিন্দ-রে! ঠিকই ঠাওরাইয়াছ, আমিই সেই তোমার রামানুজ লক্ষ্মণ। ধন্য—ধন্য তোমার অনুভবশক্তি, ধন্য—ধন্য তোমার ভাব-ভক্তি। হাঁ, তুমি যথার্থ ভক্ত বটে, সংসার-সাগরের পারে যাইবার উপযুক্ত পাত্র বটে। আমি তোমার ভাব-মূল্যে কেনা হইয়া গিয়াছি, এখন বল কি করিতে হইবে? যাহা বলিবে, তাহাতেই প্রস্তুত আছি।

প্রভুর শ্রীমুখের কথা তো নয়, যেন অমৃতের ঝরঝর প্রস্রবণ। শুনিয়া গোবিন্দদাসের কাণ-প্রাণ জুড়াইয়া গেল। তিনি যে তখন কি বলিবেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না;—শাল্মলী-তরুর ন্যায় কণ্টকিত কলেবরে প্রভুর পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন। বারংবার প্রণাম করিয়া সাধ আর মিটে না। উঠিয়া কপালে করযুগল রাখিলেন। প্রেমাশ্রু-পরিপ্লুত নয়নে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। কাকুতি-মিনতি করিয়া কহিলেন,—ওহে অনাদি-কারণ পরমপুরুষ ভগবন্! তোমাকে প্রণাম—প্রণাম। আমার

চাহিবার আর কিছুই নাই; যাহা পাইবার, চাহিবার আগেই তাহা পাইয়াছি। দয়াময় তোমার এতই দয়া। কিন্তু প্রভু! মহাপাতকী মানব আমি; সংশয় যে আমাকে কিছুতেই ছাড়ে না; তোমার কৃপা-বৈভব পদেপদে অনুভব করিয়াও তো বেশ বুঝিতে পারিতেছি না যে—তুমিই আমার সেই রঘুবংশ-শিরো-ভূষণ লক্ষ্মণ। কৃপাময়, যদি এত কৃপাই করিলে, তবে আর একটু কৃপা করিয়া তোমার সেই ধনুর্ব্বাণপাণি শ্রীমূর্ত্তি একবার আমাকে দেখাও, আমার মনের সকল সংশয় ছুটিয়া যাউক,—প্রাণের সকল সাধ মিটিয়া যাউক।

ভক্তাধীন ভগবান্ তাহাই করিলেন,—ভক্তবাঞ্ছা পুরাইবার নিমিত্ত নিজ রামানুজ-রূপই ধারণ করিলেন। আহা কি মনোহর রূপ!—

"তনু কনকপ্রায় বর্ণ। গউর অঙ্গ শোভাবন॥
মুখ সম্পূর্ণ ইন্দু জিনি। কি আহাল্লাদ সে চাহানি॥
চক্ষু-শ্রবণ-নাসা-শোভা। কিস উপমা তহিঁ দেবা॥
রঙ্গ অধরে মন্দ হাস। সুন্দর শোহে পীতবাস॥
কম্বু আকৃতি গ্রীবামূল। অতি বিস্তার হৃদস্থল॥
কটি-ক্ষীণতা কহি নোহে। কি শোভা পাদপদ্ম দুহেঁ॥
বলিন শ্রীভুজে কোদণ্ড। তেজে গঞ্জই মারতণ্ড॥
শিরে সপত মণি সাজে। দ্বিতী ঈশ্বর প্রায়ে বিজে॥"

কিবা কনক-কমনীয় কান্তি! কিবা গৌর অঙ্গের অপূর্ব্ব শোভা! কিবা পূর্ণচন্দ্র বিজয়ী বদন! কিবা আনন্দমাখা চাহনী! কিবা নিরুপম চক্ষু কর্ণ নাসিকা! কিবা রক্তিম অধরে মন্দমন্দ

হাস্য! কিবা শোভন পীতবসন! কিবা শঙ্খের মত ত্রিরেখাঙ্কিত গ্রীবামুল! কিবা বিশাল বক্ষঃস্থল! কিবা কেশরী জিনিয়া ক্ষীণ কটি! কিবা সুন্দর পাদপদ্ম-যুগল! কিবা শ্রীহস্তে সূর্য্যতেজের গর্ব্ব-খর্ব্বকারী উজ্জ্বল ধনুর্ব্বাণ! কিবা মস্তকে সপ্ত মণির মহার্হ মুকুট! আহা, যেন সেই ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের দ্বিতীয় মূর্ত্তিই বিজয় করিয়াছেন! এই অপরূপ রূপ দর্শনে গোবিন্দদাসের নয়নযুগল প্রেমাশ্রুপূর্ণ হইল। সকল শরীর পুলকে পুরিয়া গেল। দেহে ঘনঘন ঘর্ম্মোদ্গম হইতে লাগিল। তিনি গদ্গদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—ওহে ভাবগ্রাহি! তোমাকে প্রণাম করি। হায় হায়, তোমার মত দয়াল ঠাকুর থাকিতে, লোকে আবার একে ওকে কেন যে ভজনা করে, কিছুই বুঝিতে পারি না। হায় হায়, তাহাদের জীবনে ধিক্—জীবনে ধিক্। বৃথাই তাহাদের দেহভার-বহন। হায় প্রভু! মূর্খ আমি; তোমার এ সেবকবাৎসল্যের সমাচার অগ্রে আমার জানা ছিল না। আজ আমি তোমার কৃপায় নিস্তার লাভ করিলাম নিস্তার লাভ করিলাম। এইরূপ বলিতে-বলিতে গোবিন্দদাস ভাব-বিভোর হইয়া পড়িলেন। চন্দ্রকান্ত মণি যেমন চন্দ্রদর্শনে দ্রবীভূত হইয়া যায়, তিনিও তেমনি শ্রীপ্রভুকে দেখিয়া কেমন যেন আলুথালু গদ্গদ হইয়া পড়িলেন। এইবার তাঁহার সকলই কোমল—সকলই মোলায়েম; খিচ্খাচ্ কিছুই নাই। এইবার তিনি প্রভুর সঙ্গে আপনাকে বেশ মাখামাখি মিশামিশি করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সকলটাই তখন প্রভুময় হইয়া উঠিল। কালও

তাঁহার পূর্ণ হইয়াছিল, তাঁহার মাটীর দেহ মাটীতে পড়িয়া গেল; সঙ্গেসঙ্গে দিব্যদেহে তিনি শ্রীবিষ্ণুলোকে গমন করিলেন। সহসা কি-এক অদ্ভুত অপূর্ব্ব বিমল জ্যোতিতে সেই অরণ্য-ভূমি আলোকিত হইয়া পড়িল। তা দেখিয়া বনের পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ সকলেই কি-এক অদ্ভুত ধ্বনি করিয়া উঠিল;—বন-ভূমির বৃক্ষে-বৃক্ষে কুঞ্জে-কুঞ্জে লতায়-লতায় পাতায়-পাতায় ফলে-ফলে ফুলে-ফুলে গুল্মে-গুল্মে তৃণে-তৃণে সেই স্বরলহরী খেলিয়া খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। ভক্তের দিব্যগতি দর্শনে আজ সমগ্র বনভূমিই যেন ভক্ত ও ভগবানের প্রীতিতে হরিহরি জয়জয় ধ্বনি দিয়া উঠিল।

গীতা-পণ্ডা

যার টান যেদিকে। কেহ বা বিষয় বৈভব ভালবাসে, কেহ বা কামিনীর কুটিল কটাক্ষেই প্রীতি অনুভব করে, কেহ বা পরমার্থ-চিন্তাতেই পরম আনন্দ পাইয়া থাকে। নিষ্কিঞ্চন ব্রাহ্মণ। ভিক্ষা জীবিকা। দুইটী কন্যা, একটী পুত্র ও ধর্ম্মপত্নী লইয়া তাঁহার ধর্ম্মের সংসার। তিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখ-পদ্ম-বিনিঃসৃত গীতা-মকরন্দ-পানেই সর্ব্বদা বিভোর। গীতাই তাঁহার ধ্যান, গীতাই তাঁহার জ্ঞান, গীতাই তাঁহার জপ, গীতাই তাঁহার তপ, গীতাই তাঁহার তন্ত্র, গীতাই তাঁহার মন্ত্র। তিনি ভবপারে যাইবার তরণীরূপে একমাত্র গীতাকেই অবলম্বন করিয়া রাখিয়াছেন। প্রতিদিনই তিনি সম্পূর্ণ আঠার অধ্যায় গীতা সুমধুর-স্বর-সংযোগে গান করেন। তদনন্তর ভিক্ষার আশে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিয়া যাহা-কিছু প্রাপ্ত হন, পত্নীর হস্তে অর্পণ করেন। পাককুশলা পত্নীও তাহা পরমানন্দে রন্ধন করেন এবং গোবিন্দকে নিবেদন করিয়া সকলে মিলিয়া ভোজন করিয়া থাকেন।

এইরূপ আনন্দেই দিন যায়। পুরুষোত্তমক্ষেত্রে নিত্য নিবাস হইলেও তথায় তাঁহাদের নাম বড়একটা কেহ জানে না। গীতার গায়ক বলিয়া ব্রাহ্মণকে 'গীতা-পণ্ডা' বলিয়া সকলে ডাকিয়া থাকেন,—একটু ভক্তি-শ্রদ্ধাও করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ যে

কেবল তোতা পাখীর মত গীতা পাঠই করিয়া থাকেন তাহা নহে, তিনি আপন ভক্তিশ্রদ্ধার প্রভাবে গীতার মর্ম্মার্থও অবগত হইয়াছিলেন। তাই সর্ব্বদাই মনে করিতেন,—এ সংসারে সকলই মিথ্যা!—

"এ বেউ পুত্র দারা ধন। এ সর্ব্ব মায়ার বিধান॥
কেহি যে নুহই কাহার। কেবল ভ্রম মাত্র সার॥"

পুত্র, দারা, ধন এ সকলও সেই মায়ারই লীলায়িত। এ সংসারে কেহই কাহার নহে, 'আপন আপন' বলিয়া বুদ্ধিটা কেবল একটা ভ্রম মাত্র। এইরূপ বিচার করিয়া তিনি শ্রীহরির ভজনই একমাত্র সার করেন। সাংসারিক সুখ-দুঃখ শোক-মোহ প্রভৃতি তাঁহাকে কিছুতেই অভিভূত করিতে পারে না। ভজনানন্দেই তাঁহার প্রাণে সদা আনন্দ।

এইরূপে কিছুদিন যায়। দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। দুইচারি গ্রাম ভ্রমণ করিয়াও এক মুষ্টি অন্ন মিলে না। পতি-পত্নীতে আজ কয়েকদিন উপবাসী। অতি কষ্টে শিশুদের খাদ্য সংগ্রহ হইতেছিল। সেদিন ব্রাহ্মণ ঘুরিয়া-ঘুরিয়া হায়রাণ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। কোথাও কিছুই পাইলেন না। তজ্জন্য মনে কিছু দুঃখ নাই। ভাবেন,—অদৃষ্টে পাইবার ছিল না তাই পাইলাম না। পাইবার হইলে পাইতাম বই কি? তজ্জন্য আর বৃথা চিন্তা কেন? প্রাণ ভরিয়া শ্রীহরির ভজন করি। সকলের প্রভু তিনি, যাহা করিবার তিনিই করিবেন।

সে দিনটা সকলেরই উপবাসেই কাটিয়া গেল। পরদিন

প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণ স্নান করিলেন, দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ধারণ করিয়া সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাপন করিলেন। তাহার পর দুই হস্তে গীতার পুঁথিখানি ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিলেন। তিনি একএকটী শ্লোক পাঠ করেন. হৃদয়ে তাহার অর্থের স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে, আর অমনি অঙ্গে পুলকাবলি উত্থিত হয়, নেত্রে জল-ধারা বহিয়া যায়, কণ্ঠস্বর গদ্‌গদ হইয়া আইসে, অধর-দশন থরথর কম্পিত হইতে থাকে। কখনও বা ব্যাকুল-স্বরে উচ্চকণ্ঠে কহিয়া উঠেন,—ওহে ভগবন্, আমি মহা পাতকী, মহা অপরাধী, তুমি আমার একমাত্র আশ্রয়; কৃপা করিয়া আপন বলিয়া অঙ্গীকার কর। তুমি ভিন্ন আর আমার কেহ নাই। এইরূপ বলিতে-বলিতে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। গীতার পুঁথিখানি হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল। নির্ব্বাতদীপের ন্যায় নিশ্চল আসনে তিনি বসিয়া রহিলেন।

এ দিকে হইয়াছে কি, ব্রাহ্মণের শিশু পুত্র এবং কন্যা দুইটী ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হইয়া মায়ের অঞ্চল ধরিয়া মহা কান্নাকাটি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে! সেই করুণ ক্রন্দনে জননীর হৃদয়ে বজ্র-বেদনা উপস্থিত হইল। তাহাদের সঙ্গে তিনিও কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং কাঁদিতে-কাঁদিতে পতির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের এ অবস্থায় পত্নী অন্য দিন তাঁহাকে কোন কথাই বলিতেন না, তাঁহার সাধন-ভজনের ব্যাঘাতও জন্মাইতেন না। কিন্তু আজ ক্ষুৎপীড়িত পুত্র-কন্যার উত্তেজনায় তিনি এ অবস্থাতেও পতিকে উত্ত্যক্ত করিতে বাধ্য হইলেন। ক্রন্দনমিশ্র

উচ্চস্বরেই তিনি বলিয়া উঠিলেন,—ওগো, তুমি ত গীতা গীতা করিয়াই পাগল হইলে, কিন্তু এদিকে যে ছেলে-পুলেরা ক্ষুধায় আকুল। তাহাদের দুঃখ যে আর আমি দেখিতে পারি না। যাও, তুমি শীঘ্র কোথা হইতে কিছু যোগাড় করিয়া আন, নচেৎ বাছাদের আর বাঁচাইতে পারিব না। হায়! বাছাদের মুখ দেখিয়াই আমি বাঁচিয়া আছি। তাহারা মরিলে আমি আর কি সুখে বাঁচিয়া থাকিব। মরণের পথ আমাকেও ধরিতে হইবে। ব্রাহ্মণীর বাক্যে ব্রাহ্মণের সাধের ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। একটু মিষ্ট হাসি হাসিয়া তিনি পত্নীকে বলিলেন,—ছিঃ মরিবে কেন?—

"সবুরি কর্ত্তা ভগবান। অবশ্য দেবেটি ভোজন॥"

ভগবান্ সকলেরই কর্ত্তা; তিনি কি আর উপবাসীই রাখিবেন? ভোজন তিনি দিবেনই দিবেন।

সময়ের গুণে পতির এই অমূল্য উপদেশ পত্নীর অন্তরে স্থান পাইল না। তিনি এ কথায় আশ্বস্ত না হইয়া বরং কিছু কুপিত হইয়া পড়িলেন। হাত নাড়িয়া, মুখ ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিলেন, —নাও, তোমার ওসব তত্ত্ব কথা এখন রেখে দাও। ফাঁকা কথায় আর পেট ভ'চ্চে না। তুমি এখানে বসিয়া-বসিয়া মরিয়া যাও, আর তোমার ঘরে ধনের জাড়ি হুড়হুড় করিয়া হাজির হইবে। ক্ষেপামির কথা আর কি!

ব্রাহ্মণ সেইরূপ হাসিতে-হাসিতেই আবার বলিলেন,—সুন্দরি, অত কাতর হ'ও না—কাতর হ'ও না। আমি যাহা বলি, তাহা একটু বেশ মাথা ঠাণ্ডা ক'রে বুঝে দেখ দেখি।—

"সবুরি জীবর জীবন । অটন্তি প্রভু ভগবান ॥
দেখ এ গীতা মধ্যে সার । শ্রীমুখ-আজ্ঞা প্রভুঙ্কর—॥
সমস্ত কর্ম্ম পরিহরি । যে মোর পাদে আশ্রে করি ॥
তাহার নির্ব্বাহর ভার । কন্ধরে রহিচ্ছি মোহর ॥
নিত্যে লাগই তাকু যেতে । সে চিন্তা কাহিঁ অচ্ছি তোতে ॥
একথা অটই প্রমাণ । বোলি অচ্ছন্তি নারায়ণ ॥"

দেখ সখি, সেই প্রভু ভগবান্ সকল জীবেরই জীবন। তাঁহার শ্রীমুখের আজ্ঞা একবার শুন দেখি। এই গীতার মধ্যেই তাঁহার সার উপদেশ একবার দেখ দেখি। ভক্তবৎসল প্রভু আমার ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বলিতেছেন,—যে সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার চরণ আশ্রয় করে, তাহার নির্ব্বাহের ভার আমার স্কন্ধে অর্পিত। তাহার যে দিন যাহা লাগিবে, সে চিন্তা তাহাকে করিতে হইবে কেন, আমিই তাহা চিন্তা করিয়া থাকি,—আমিই তাহা নিত্য যোগাইয়া থাকি। পতিব্রতে, এ কথা সেই নারায়ণেরই কথা। এ কথা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া জানিও। তাঁহার কথা—সেই সত্যস্বরূপ শ্রীহরির কথা যদি মিথ্যা হয়, তবে আর এ সংসারে সত্য আর কি আছে সুন্দরি! স্বতঃপ্রমাণ বেদবাণী যাঁহার নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস, সেই বেদপ্রতিপাদ্য পরমপুরুষ ভগবানের কথা যদি মিথ্যা হয়, তবে আর কাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, কোন্ ধ্রুব নক্ষত্র ধরিয়া, এই ভবসাগরের পর-পারে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইব? এ কথার উপর আর কোপের অবকাশই বা কোথায়?

পতির সুমধুর উক্তি পত্নী শুনিলেন,—কিন্তু তাঁহার মন

তাহাতে মানা মানিল না। তিনি সেই কোপের স্বরেই বলিয়া উঠিলেন,—হাঁ গো হাঁ, তোমার এ কথা কোন্ যুগের কথা। ও সেই দ্বাপরযুগের কথা। এটা হ'চ্চে কলিযুগ। এ যুগে আর অমনটি হ'তে হয় না যে, জগন্নাথ কাঁধে ভার ক'রে তোমার ঘরে তোমার দরকারি জিনিষ এনে হাজির ক'রে দেবেন, আর তুমি ব'সে-ব'সে দুই হাতে তুলে কপ্ কপ্ ক'রে ভোজন ক'র্‌বে। আমি এখনও ব'ল্‌ছি তুমি ওসব বাজে কথা ছেড়ে দাও। ওরূপ দুঃসাহসের বালির বাঁধে তুমি এ মরণের স্রোত কিছুতেই আট্‌কাতে পার্‌বে না। এখনও সময় আছে। চেষ্টা-চরিত্র ক'র্‌লে খোরাক যোটাতে পা'র্‌বে,—মৃত্যু-মুখ হ'তে সকলকে রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বে।

এ সংসারে সকলই সহিতে পারা যায়, কিন্তু ভালবাসার সামগ্রীর অপমান কিছুতেই সহ্য যায় না। প্রাণপ্রিয় গীতার কথার এরূপ মুখেমুখে প্রতিবাদ-অমর্য্যাদা ব্রাহ্মণ আর সহিতে পারিলেন না। তিনি কিঞ্চিৎ কোপাবিষ্ট হইলেন। তাড়াতাড়ি গীতার পাতা উল্টাইয়া—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥"—

শ্লোকটি বাহির করিলেন এবং অঙ্গুলিনির্দ্দেশ পূর্ব্বক পত্নীকে দেখাইয়া বলিলেন,—অয়ি দুষ্টে! হায় হায়, তুই এই প্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞাকে অবমাননা করিলি? আচ্ছা, যদি তোর মিছা বলিয়াই ধারণা, তুই কি ইহা চিরিয়া ফেলিতে পারিবি? উত্তরে

পত্নী বলিলেন,—তা কেন পারব না? তালপাতার পুঁথি বইত নয়; নিয়ে এস, একবার কেন একশত বার চিরে দেবো এখন। এই বলিয়া যুবতী রাগে গরগর করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ কোপ-মনে অঙ্গুলিস্পর্শ করিয়া সেই শ্লোকস্থান দেখাইয়া দিলেন, রমণীও লৌহলেখনী ধরিয়া সেই শ্লোকের উপর তিনটা রেখা টানিয়া চিরিয়া ফেলিলেন।

ব্রাহ্মণের বিশ্বাস ছিল না যে, তাঁহার পরিণীতা পত্নী এরূপ অপকর্ম্ম করিতে পারেন। এই ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার শরীর থরথর কাঁপিয়া উঠিল, তিনি উচ্চ কাতর চীৎকার করিয়া মস্তকে করাঘাত করিতে-করিতে বলিয়া উঠিলেন,—হায় হায়, কি করিলাম কি করিলাম? আমি প্রভুর কাছে অপরাধী হইলাম? হায়, আমি আবার আপন নয়নে এই দৃশ্য দর্শন করিলাম? ছার প্রাণ এদেহে এখনও রহিয়াছে? না, আর না, আর এখানে না; এ পাপ ক্ষেত্রে আর না। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন। মনের ভাব,—গৃহত্যাগ করিয়া কোথাও চলিয়া যাইবেন। কিন্তু উপবাসে ও মানসিক ক্লেশে শরীর এতই অবসন্ন যে, তিনি আর চলিতে পারিলেন না, তাঁহার মাথা যেন ঘুরিতে লাগিল। তিনি পার্শ্বগৃহে গমন করিয়া দ্বারে অর্গল দিয়া শয়ন করিলেন। তাঁহার রোদনের আর বিরাম নাই, শ্রীপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে ক্ষমা-ভিক্ষারও বিরাম নাই। তাঁহার পত্নীও বালকবালিকাগণকে সঙ্গে লইয়া গম্ভিরী-মধ্যে (গর্ভ-গৃহে) যাইয়া ভূমিশয্যায় শুইয়া পড়িলেন। শরীর কোপের

প্রকোপে থাকিয়া-থাকিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, অন্তরে গুরুতর চিন্তা—তাইত পুত্রকন্যাদের দশা কি হইবে? অশান্তির আর অন্ত নাই।

এ দিকে হইল কি, সেই সর্ব্বান্তর্যামী ভক্তবৎসল ভগবান্ ব্রাহ্মণের অন্তরের কথা সকলই জানিতে পারিলেন। দীনবন্ধু অমনি ভক্তের ব্যথায় ব্যথিত-হৃদয়ে ত্বরিতগতি তাঁহার আবাস অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এ যাত্রাটা আবার যেমন-তেমন নয়—অলক্ষ্যে-অলক্ষ্যেও নয়; প্রকাশ্য রাজপথে প্রকাশ্য মূর্ত্তিতেই তাঁহাকে গমন করিতে হইল। কি করেন, ভক্তের জন্য যে তাঁহাকে সকলই করিতে হয়। ভক্তের জন্যই যে তাঁহার মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহ রূপ ধারণ, ভক্তের জন্যই যে তাঁহার নৃসিংহমূর্ত্তি পরিগ্রহ, ভক্তের জন্যই যে তাঁহার হয়গ্রীবমূর্ত্তির আবির্ভাব। ভক্তের জন্য তিনি না করেন কি?

এবার ব্রাহ্মণের জন্য তাঁহাকে যে বেশ ধারণ করিতে হইল, তজ্জন্য তাঁহাকে বড় বেগ পাইতে হইল না। গোয়ালার ছেলে গোয়ালার মূর্ত্তি ধরিতে আর ক্লেশটা কি? নন্দমহারাজের বাধা বহিয়া-বহিয়া যিনি চির-অভ্যস্ত, তাঁহার আর সামান্য অন্য পদার্থ কাঁধে করিয়া বহন করিতে লজ্জাই বা কি? সকলে দেখিল, একজন অল্পবয়স্ক গউড় (গোয়ালা) কাঁধে ভার লইয়া হন্‌হন্ করিয়া কোথায় চলিয়াছে। ভারবাহক গোপবালক হইলেও এ গোয়ালা যেন আর কোন্ দেশের গোয়ালা! ভাগ্যবশে যাহার নয়ন তাঁহার উপরে পতিত হয়, সে আর নয়ন ফিরাইতে পারে না। সে যেন

কোন যাদুমন্ত্রে মোহিত হইয়া পড়ে। আহা কি সুন্দর সে গোপবালক-মূর্ত্তি !—

"নবীন নীল ঘন মুর্ত্তি।	সুইন্দ্র-নীলমণি কান্তি ॥
বদন পূর্ণ শশধর।	পঙ্কজ নয়ন রুচির ॥
অতি সুরঙ্গ বিম্বাধর।	সুপর্ণ নাসা মনোহর ॥
মুখে প্রকাশ মন্দ হাস।	তহি পূরিত সুধারস ॥
কস্তুরী-তিলক ললাটে।	সুগুঞ্জামাল কণ্ঠতটে ॥
হেমকঙ্কণ বেনি ভুজে।	রবিকিরণ-দর্প গঞ্জে ॥
মুদ্রিকা শোহই অঙ্গুলি।	ঝটকে নানা রত্নে ঝলি ॥
পীতবসন কটিমাঝে।	ঘনে কি দামিনী বিরাজে ॥
তথিরে সুবর্ণমেখলি।	হেম-ঘর্ঘরী নাদ বলি ॥
চরণে নূপুর বিরাজে।	চালন্তে রুণঝুনু বাজে ॥
শ্রীহস্তে লউড়ি শোভন।	যেসনে পালক গোধন ॥
মস্তকপরে শিখা-চূল।	তহি বেষ্টিত জামুডাল ॥
শ্রবণযুগলে কুণ্ডল।	নৃত্য করই গণ্ডস্থল ॥
নাসাপুটরে মোতি-শোভা।	অধরামৃত-পানে লোভা ॥
হোই অচ্ছন্তি তেজোবন্ত।	কহি নুহই অলোকিত ॥"

মূর্ত্তি ত নয়, সে যেন নব নীল জলধর। কিবা ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় কমনীয় কান্তি। পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বদন। প্রফুল্ল পঙ্কজের ন্যায় নয়ন। পক্ক-বিম্বের মত সুরঙ্গ অধর। পক্ষিচঞ্চুর ন্যায় মনোহর নাসিকা। মুখে মন্দমন্দ হাস্য। সে যেন সুধার রসে পরিপূর্ণ ॥ ললাটে কস্তূরী-তিলক। কণ্ঠে গুঞ্জার মালা। উভয় করে রবিকিরণগঞ্জন কনক-কঙ্কণ। অঙ্গুলিতে নানা রত্ন-খচিত অঙ্গুরীয়ক। পরিধানে পীতবাস। আহা, সে যেন নবঘনে দামিনীবিকাশ। কটিতটে সুবর্ণ-মেখলা, তাহাতে বাজন্ত-ঘুঙ্ঘুর

শব্দায়মান। চরণে নূপুর বিরাজিত; চলিবার কালে রুণুঝুনু করিয়া বাজিতেছে। শ্রীহস্তে সুন্দর লগুড়; যেন পাঁচনবাড়ি-হস্তে গোধনপালকই চলিয়াছে। মস্তকে ঝুঁটি-বাঁধা চুল, তাহার চারিদিকে জামডাল বাঁধা। যুগল কর্ণে কুণ্ডল, গণ্ডস্থলে দলমল করিয়া দুলিতেছে। নাসার অগ্রে মুকুতার নোলক, সে যেন অধরামৃত-পানের লোভেই অতীব চঞ্চল। তাঁহার সে শান্ত শীতল সমুজ্জ্বল তেজ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এমন রূপ বুঝি কেহ কখন দেখে নাই।

দামোদর এইরূপ দিব্য রূপ ধরিয়া স্কন্ধে ভার বহিয়া চলিয়াছেন। ভারের উভয় দিকে নানাপ্রকার দ্রব্য স্তরেস্তরে সজ্জিত। সরু চাউল, মুগের বিউলি, ঘৃত, নবাত, দুগ্ধ, দধি, হরিদ্রা, সরিষা, আদা, তিন্তিড়ী, হিং, মরীচ, ফুলবড়ি প্রভৃতি নানাপ্রকার খাদ্যসামগ্রী প্রচুর পরিমাণে তাহাতে সংরক্ষিত। তাহার উপর ধনরত্ন বসনভূষণও আছে। ভাবগ্রাহী ভগবান্ এইরূপ ভার বহিয়া যাইতে-যাইতে গীতা-পণ্ডার দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই জলদ-গম্ভীরস্বরে ধীরে ধীরে ডাকিতে লাগিলেন,—কে আছেন গা; গীতা-পণ্ডার ঘরে কে আছেন গা? শীঘ্র আমার নিকটে আসুন, আপনাদের খাদ্যসামগ্রী লইয়া যাউন।

ভগবদ্ভাবে বিভোর ব্রাহ্মণ এ কথা শুনিতে পাইলেন না। তাঁহার পত্নী ক্ষুধায় ও দুশ্চিন্তায় জাগিয়া বসিয়া ছিলেন। তিনি ডাক শুনিবা মাত্রই বাহিরে ধাইয়া আসিলেন এবং কবাট খুলিয়া সেই দিব্য গোপালমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। সে যেন কি দেখিতেছেন!

তাঁহার চর্ম্মচক্ষুতে আর পলক পড়িল না। তিনি বিস্ময়ে-বিস্ময়ে গোপবালককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হাঁ বাপু, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? আহা! তোমার স্কন্ধে বিপুল ভার দেখিতেছি, এ ভার শীঘ্র নামাইয়া রাখ, নামাইয়া রাখ। এ ভারে আছেই বা কি? প্রকাশ করিয়া বল।

জগন্নাথ বলিলেন,—আমি ত বিশেষ কথা কিছু জানি না। গীতা-পণ্ডার একজন মিত্র আমাকে ডাকিয়া কি কি সামগ্রী যোগাড়যন্ত্র করিয়া এই ভারে সাজাইয়া দিয়া আমাকে বলিলেন,—"বাপু, তুমি এগুলি গীতা-পণ্ডার বাটীতে দিয়া আইস। যার-তার হস্তে ত দিতে বিশ্বাস হয় না, সে যদি কম-সম করিয়া ফেলে।" আমি তাঁহার বড় বিশ্বাসের পাত্র। একদণ্ডও তাঁহার কাছ ছাড়া থাকি না। তাঁহার আজ্ঞা মান্য করিয়া থাকি। যেখানে পাঠান, সেইখানেই যাই। তাই তাঁহার আজ্ঞা প্রমাণে এই দ্রব্যগুলি দিয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি। আপনি এগুলি যত্ন করিয়া রাখিয়া দিন,—আমার প্রতি দয়া রাখিবেন। আর গীতা-পণ্ডাকে বলিবেন, তিনি যেন আমায় মনে রাখেন।

ভগবানের ভুবনভুলানো কথায় পণ্ডা-পত্নী ভুলিয়া গেলেন। কি উত্তর দেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। তিনি যে দয়ার সাগর জগদীশ্বর, তাহা চিনিতেও পারিলেন না। মনে করিলেন,—এ বুঝি আমাদের মত মানবই হইবে। ক্ষণপরে বলিলেন,—বাপু হে, তুমি ভারটি স্কন্ধ হইতে নামাইয়া রাখ, আহা তোমার অল্প বয়স, কোমল অঙ্গ, স্কন্ধে না জানি কতই

ব্যথা লাগিতেছে। এই কথা শুনিয়া ভগবান্ একটুকু মুচকি হাসিয়া স্কন্ধ হইতে ভারটি নামাইলেন এবং তাহা হইতে সামগ্রীগুলি সারিসারি সাজাইয়া নামাইতে থাকিলেন। সকল সামগ্রী নামান হইয়া গেল। চক্রপাণি হাসিতে-হাসিতে পণ্ডা-ঘরণীকে কহিলেন,—আপনি এইগুলি গৃহ মধ্যে লইয়া যান। ব্রাহ্মণীও ক্ষিপ্রহস্তে সেগুলি গৃহমধ্যে রাখিয়া আসিতে লাগিলেন। দেখিতে-দেখিতে তাঁহার ঘরদ্বার ভরিয়া গেল,—আর রাখিবার স্থান নাই। ভাবিলেন,—এ-ত বড় চমৎকার কথা,—এই সামান্য এক-ভার সামগ্রী, ইহাতেই ঘরদ্বার সমস্ত পূর্ণ হইয়া গেল! ঘরে আর রাখিবার একটুও স্থান নাই! অহো, এ ভারবাহকের জীবন ধন্য। সে এত সামগ্রী একভারে করিয়া আনিল কি প্রকারে? তিনি বিস্ময়ে-বিস্ময়ে বাহিরে আসিয়া ভারবাহককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হাঁ বাপু,—তোমার জাতি-গোত্র কি? ছেলে মানুষ দেখিতেছি। তুমি একা একভারে এত দ্রব্য বহিয়া আনিলে কি প্রকারে? শুনিয়া সহাস্যবদনে শ্রীহরি বলিলেন,—ওগো বিপ্র-রমণি, আমার পরিচয়টা দিই শুনুন।—

“আম্ভে গোপাল-পুঅ সিনা। ব্রজরাজঙ্ক সান জেনা॥
ঘরে মুঁ ন রহইঁ ক্ষণে। নিত্যে বুলইঁ এণে তেণে॥
বিশ্বাস-ভাব দেখেঁ যার। ভার মুঁ বহই তাহার॥
তাকু ন চ্ছাড়ে মোর মন। নিরতে থাএ সন্নিধান॥
সে মোতে পত্র পুষ্প দেলে। তাহা মুঁ মনে মেরু তূলে॥
অধিক কি কহিবি তোতে। নির্ম্মল ভাব লোড়া মোতে॥”

আমি হইতেছি গোয়ালার ছেলে। ব্রজরাজের কনিষ্ঠ কুমার।

আমি এক মুহূর্ত্তও ঘরে থাকিতে পারি না। নিত্যই এখানে-সেখানে ঘুরিয়া বেড়াই। যাহার বিশ্বাস-ভাব নজরে পড়ে, তাহার ভার বিনা বেতনে বহন করিয়া থাকি। আমার মন তাহাকে কিছুতেই ছাড়ে না। তাহার কাছে নিয়তই পড়িয়া থাকে। সে যদি আমাকে সামান্য পত্রপুষ্পও প্রদান করে, আমি তাহাকে সুবর্ণশৃঙ্গ সুমেরুর মতই মনে করিয়া থাকি। আপনাকে আর অধিক কি বলিব, নির্ম্মল ভাব দেখিলেই আমি ভুলিয়া যাই। তাহাই আমার একমাত্র লোভের সামগ্রী। এখন আপনি এক কার্য্য করুন, এই সকল সামগ্রী সাবধানে রাখিয়া দিন, আর আমাকে দয়া করিয়া বিদায় দিন, আমি এখন আসি।

ব্রাহ্মণী বলিলেন,—হাঁ বাছা, সেকি হয়। এত বড় একটী জমকাল ভার বহিয়া তুমি আমার বাটী আনিলে, আর আমি তোমায় কিছু খাইতে না দিয়া বিদায় দিব? একি একটা কাজের কথা? তুমি বাপু, এক দণ্ডকাল অপেক্ষা কর, আমি রন্ধন করিয়া তোমাকে অন্ন ভোজন করাইতেছি। তাহার পর তুমি চলিয়া যাইও। তাহাতে কিছু আপত্তি করিব না। অমনি-অমনি চলিয়া গেলে পাঁচজন লোকেই বা বলিবে কি, আর পণ্ডাই বা নিদ্রা হইতে উঠিয়া আমাকে বলিবেন কি? এ কথা শুনিয়া শ্রীহরি বলিলেন,—ওগো পণ্ডাউনি, আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য, তবে কিনা আমার থাকা যে আমার আয়ত্ত নয়। আমার যে নানা জঞ্জাল। পণ্ডা উঠিলে আমার

কথা তাঁহাকে বলিলেই তিনি সব বুঝিতে পারিবেন। তাঁহার অন্ন খাইতে ত কোন আপত্তি নাই, প্রাণ সদা খাইতেও চায়, কিন্তু হইয়াছে কি, আমার জিহ্বায় বড় ক্ষত হইয়াছে। এই দেখুন, তিন ধারে রুধির বহিতেছে। তাহার জ্বালায় আমি বড় অস্থির হইয়াছি। তাই আমি ভোজন করিতে পারিলাম না। পণ্ডাকে এই কথা বুঝাইয়া বলিবেন। আমি চলিলাম।

এই কথা বলিয়া জগন্নাথ ত্বরিতপদে চলিয়া গেলেন। পণ্ডা-পত্নীও তাড়াতাড়ি রাঁধা-বাড়া সারিয়া আনন্দমনে যাইয়া পতির আনন্দনিদ্রা ভাঙ্গাইতে লাগিলেন। তাঁহার সেই কোপ আর নাই। তিনি প্রীতিপূর্ণ-কোমল আহ্বানে বলিতে লাগিলেন,—প্রাণনাথ, তোমার কথা সত্য গো সত্য। তুমি তৎপর উঠিয়া ব্যাপারখানা একবার দর্শন কর। ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ অমনি উঠিয়া পড়িলেন। খিল খুলিয়া বাহিরে আসিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখেন,—অহো, ধন-রত্নে বসনে-ভূষণে বিবিধ ভোজ্য-সামগ্রীতে গৃহদ্বার ভরিয়া গিয়াছে! তিনি মহা বিস্ময় সহকারে পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বল, বল সুন্দরি! ব্যাপারখানা কি? পত্নী আদ্যোপান্ত সকল কথাই—সেই গোপকুমারের রূপ, বেশ, সুমিষ্ট সম্ভাষণ প্রভৃতি সকল কথাই পতির নিকটে বর্ণন করিলেন। ব্রাহ্মণের হৃদয় হর্ষ-বিষাদে ভরিয়া গেল। তাঁহার তখন এক ভাবই স্বতন্ত্র হইয়া পড়িল। আনন্দের আতিশয্যে তিনি দু'বাহু তুলিয়া নাচিতে লাগিলেন। মনেমনে বলেন,—হা হা, প্রভু বিশ্বম্ভর! এ লীলা তোমারই প্রভু তোমার। হায় হায়, তোমার

এত করুণা আমরা দেখিয়াও দেখি না। তোমার দীনবন্ধু নামের কাঙ্গালের ঠাকুর নামের নিষ্কিঞ্চননাথ নামের জয় হউক নাথ! জয় হউক।

ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ বাহ্যজ্ঞানহীন হইয়া রহিলেন। সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় পত্নীকে বলিলেন,—সতি! তোমার মত সৌভাগ্যবতী আর নাই; তুমি চর্ম্মচক্ষে সেই শুক-সনকাদির ধ্যানের ধনকে দর্শন করিয়াছ; আজ আমি তোমাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম, আমার সৌভাগ্যেরও আর সীমা নাই। কিন্তু একটি কথায় যে প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। এ হৃদয়বিদারক দুঃখের কারণও তুমিই। আহা, তুমি আমার প্রভুকে ক্লেশ দিয়াছ; তুমিই তাঁহার জিহ্বায় ক্ষত জন্মাইয়া দিয়াছ। হায় হায়, গীতা কি সামান্য তালপাতার পুঁথি? এ যে সাক্ষাৎ গোবিন্দগীতি—সাক্ষাৎ গোবিন্দের মূর্ত্তি। তুমি সেই গীতার অঙ্গে লৌহলেখনীর তিনটী আঘাত করিয়াছিলে, তাই প্রভুর আমার জিহ্বায় তিন-ধারে রুধির ঝরিয়া পড়িতেছে। হায়, না জানি প্রভুর কতই না বেদনা হইতেছে? চল চল সুন্দরি! আমরা শ্রীপ্রভুর দেউলে গমন করি এবং আর্ত্তস্বরে ক্ষমা ভিক্ষা করি; নচেৎ আর আমাদের নিস্তার নাই।

ব্রাহ্মণ এই বলিয়া পত্নী সমভিব্যাহারে সত্বর নীলাচলনাথের শ্রীমন্দিরে গমন করিলেন। উভয়ে মহা অপরাধীর মত কাঁদিতে-কাঁদিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। উঠিয়া শ্রীপ্রভুর শ্রীমুখের দিকে চাহিয়া দেখেন,—হায় হায়, তাঁহার সুরঙ্গ অধরে তিন-ধারে রুধির

বহিয়া পড়িতেছে। দেখিয়া তো তাঁহারা আর নাই। শ্রীপ্রভুর শ্রীচরণ উদ্দেশে সেইখানেই দণ্ডবৎ পতিত হইলেন এবং বারংবার সাষ্টাঙ্গ প্রণতি পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকিলেন। ব্রাহ্মণ কৃতাঞ্জলি করযুগল মস্তকে রাখিয়া ভক্তি-গদ্‌গদ-কণ্ঠে কেবলই বলেন,—হে প্রভু! হে মহামহিমার্ণব! তোমার মহিমা ছার মানব আমরা কি বুঝিব বল? তাই অপরাধ পদে পদেই করিয়া থাকি। কিন্তু বলিহারি প্রভু! তোমার শরণাগত-বাৎসল্য! তুমি শরণাগতের ভার আপনার স্কন্ধেই বহিয়া থাক বটে! মহিমময়! তোমার মহিমা অপেক্ষা কি অজ্ঞ মানবের মোহমহিমা আরও অধিক? সে কেমন করিয়া এমন দয়াময় ঠাকুরকেও ভুলিয়া থাকে? হায় প্রভু!—

"এমন্ত প্রভু-সেবা চ্ছাড়ি। যে অন্য মার্গে যাএ বঢ়ি॥
ধিকহুঁ ধিক সেহু নর। সে কাহিঁ ভবুঁ হেব পার॥"

তোমার মত ঠাকুরের সেবা ছাড়িয়া যে অন্য মার্গে প্রধাবিত হয়, সে মানবের জীবনে ধিক্,—ধিক্ ধিক্ শতেক ধিক্। হায়, সে এই সুদুস্তর ভবসাগরের পারে যাইবে কি প্রকারে? করুণাময়! আমার পত্নী অবলা স্ত্রীজাতি। সে তো কিছু জানে না—মহামূর্খা; তাই তোমার চরণে মহা অপরাধ করিয়া বসিয়াছে; তাহার সেই অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর নাথ! ক্ষমা কর। তুমি ক্ষমা না করিলে আর আমাদের নরক-নিস্তারের উপায় নাই যে ঠাকুর! আর আমরা কার কাছেই বা গিয়া দাঁড়াইব প্রভু! এ ব্রহ্মাণ্ডে যে তুমি ভিন্ন আর আমাদের কেহই নাই। দয়াময়! আমাদের

অপরাধ ক্ষমা করিয়া আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা তোমার নাম গান করিয়া দিন যাপন করিতে পারি।

প্রীতিভরে এইরূপ প্রার্থনা করিতে-করিতে ব্রাহ্মণ দেখিতে পাইলেন,—শ্রীপ্রভুর সেই রুধির-ধারা অদৃশ্য হইয়া গেল ;—তাঁহার পঙ্কজ-বদন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল ; তিনি যেন কর-সঙ্কেতে তাঁহাকে "তথাস্তু" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণের আনন্দ আর ধরে না। তিনি প্রভুর নিকটে বিদায় লইয়া পত্নীসহ প্রসন্নমনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। আসিয়া দেখেন, বালক-বালিকাবৃন্দ জঠরজ্বালায় ক্রন্দন করিতেছে ; তাহাদের লইয়া সকলে একত্র ভোজন করিলেন। কৃপাময়ের কৃপায় আর তাঁহাদের কিছুই অভাব নাই। আনন্দে-আনন্দেই তাঁহারা এখানকার খেলা শেষ করিয়া সেই লীলাময়ের খাস খেলার রাজ্যে যাইয়া প্রবেশ করিলেন।

শান্তোবা

(১)

মোগল সম্রাট্‌গণের শাসনকালে, দক্ষিণদেশে—“রঞ্জনম্‌” নামক পল্লীগ্রামে, শান্তোবা নামে জনৈক ধনবান্‌ ব্যক্তি বাস করিতেন। সংসারের সুখসমৃদ্ধি তাঁহার ষোল আনার উপর সতের আনা ছিল। দেশে সম্মান মর্য্যাদাও যথেষ্ট। অভাব কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না। দুনিয়ার মজা যেমন লুটিতে হয়, তাহা তিনি পূরা মাত্রায় লুটিতেন,—তাহাতেই সতত বিভোর হইয়া রহিতেন। এখানকার আনন্দ যে আনন্দই নয়,—আনন্দের কায়া নয়—ছায়ামাত্র, এ কথা একবারও তাঁহার মনে হইত না।

মহামায়ার বিচিত্রতাময়ী ভুয়াবাজীতে যাহাদিগের চক্ষে ধাঁধা লাগিয়াছে, তাহাদিগের সেই ধাঁধা ছুটাইতে পারেন—একমাত্র ভাগবতজনের করুণা, অথবা তাঁহাদের করুণাপ্রসূত অমৃতোপম উপদেশবাণী। একদিন কথায় কথায় পরম ভাগবত তুকারামের ভক্তিভরা উপদেশ-কথা শান্তোবার শ্রবণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। ভক্তচূড়ামণির সেই মহাশক্তিশালিনী কথা তাঁহার কাণের ভিতর দিয়া মরমে যাইয়া পশিল। সে কি-এক আনন্দে—কি-এক সুখে যেন তাঁহার ভিতরটা ভরিয়া গেল। একখানা যাদুমন্ত্রমাখা রংচঙে পরদা দিয়া কে যেন তাঁহার নয়ন ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, এইবার তাহা

সর্‌সর্‌ সরিয়া গেল। তিনি যেন নূতন নয়ন পাইলেন। এ নয়ন তাঁহাকে যাহা দেখাইল—তাহাও নূতন ; স্থধু নূতন নয়, মনেরও মতন। এই নয়নই তাঁহার নবজীবনেরও আরম্ভ করিয়া দিল।

আজ শান্তোবা যাহা দেখেন, পূর্ব্বের সহিত তাহার কিছুই সামঞ্জস্য নাই,—বরং বিপরীত। পূর্ব্বে যাহা অমৃতের মত বোধ হইত, আজ তাহা বিষবৎ। পূর্ব্বে যাহা 'আমি আমার' বলিয়া ভুলাইত, আজ তাহার এমন বিকট মূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহা আসক্তির পরিবর্ত্তে বিরক্তিরই উদ্রেক করে। আজ তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী যেন স্বতন্ত্র রাগ-রাগিণীর আলাপ জুড়িয়া দিয়াছে। তাহার ঝঙ্কার যেন মেঘমল্লারের মত শান্তোবার অহঙ্কারের দীপক-রাগ শান্ত শীতল করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার মাধুর্য্য যেন চির-নবীনতায় মাখানো। মনে হইলেই কেমন যেন চক্ষু বুজিয়া-বুজিয়া আসে।

শান্তোবা আজ নূতন মানুষ। তাঁহার চিন্তাও নূতন। এতদিন চিন্তা ছিল কেবল ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি-সাধনের কিংবা কামিনী-কাঞ্চনের, আজ তাহার গতি বিপরীত পথে চলিয়াছে। এখন চিন্তা,—তাই তো, তুচ্ছ স্থখে মানবজীবনের এতটা অমূল্য সময় অতিবাহিত করিলাম ? হায়, আমার গতি কি হইবে ? কি করিয়া শ্রীহরির পাদপদ্ম পাইব ? আর তো দিন নাই, গোণা দিন বই তো নয় ? ফুরাইলেই হইল। তা-ও তো নিশ্চয় নাই,—কবে বা কখন যাইতে হইবে ? অথচ একদিন এখান ছাড়িয়া যে যাইতে হইবে, ইহা তো ঠিক ? ঐ যে যমও তো দণ্ড-হস্তে সময়ের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়-

মান। তবে উপায়? কে আছ, কোথায় আছ, ব'লে দাও,—আমায় দয়া ক'রে ব'লে দাও, এখন আমি কি করি?

এইরূপ আকুলপ্রাণে ভাবিতে-ভাবিতে শান্তোবা চিন্তার কূল পাইলেন। অন্তর্যামীর প্রেরণায় তিনি তাঁহার আসক্তির সকল সামগ্রী,—জননী, পরিণীতা পত্নী, বিষয়-বৈভব প্রভৃতি পরিত্যাগ করিলেন। বেদজ্ঞ বিপ্রগণকে এবং ভৃত্যবর্গকে প্রচুর ধন-সম্পত্তি সমর্পণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে-করিতে গৃহের বাহির হইয়া গেলেন। আপনার বলিবার সঙ্গে রহিল কেবল একমাত্র কৌপীন। লোকলজ্জার অপেক্ষা না থাকিলে বোধ হয় তাহাও তাঁহাকে লইতে হইত না। তিনি নয়ন-নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে-চলিতে ভীমরথীনদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নদী দেখিয়া তাঁহার ভয় হইল না। হইবেই বা কেন? অপার সংসার-সাগর পার হইয়া যিনি অনন্তের পথে চলিয়াছেন, সামান্য নদী দেখিয়া তাঁহার অন্তর কি কখনও ভীতি-কম্পিত হইতে পারে? শান্তোবা সন্তরণ করিয়া নদীর পরপারে গমন করিলেন। দেখিলেন,—সম্মুখেই পর্ব্বত। তাহাতেও তাঁহার গতি ব্যাহত হইল না। তিনি বৃক্ষবল্লরী ধরিয়া—শিকড়-পাথর ধরিয়া সেই পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিলেন। সেখানকার শান্তিময় শোভায় তাঁহার মনঃ-প্রাণ ভুলিয়া গেল। কেবলই ভাবেন,—আহা হাহা, কি প্রাকৃতিক শোভাপূর্ণ নিভৃত স্থান! হায়, লোকালয়ে এ পবিত্র সৌন্দর্য্য—এ মাধুর্য্যভরা নিস্তব্ধতা কোথায়? আহা হাহা, অজস্র কণ্ঠভেদী চীৎকারেও সংসারে যাঁহার সাড়া পাওয়া যায় না, এখানে যেন এক-

ডাকে—কিংবা ডাক দিতে-না-দিতে তাঁহার দেখা পাওয়া যায়। আহা হাহা, ঝরণার জল—বিহঙ্গের দল কাহার কাছে গলা সাধিয়া এমন রাগিণী শিখিল রে? এ রাগিণীর নামই বা কি? আহা হাহা, কাণও জুড়াইয়া গেল, প্রাণও পরিতৃপ্ত হইল। আমি আর এ স্থান ছাড়িয়া অন্য কোথাও যাইব না; এই পর্ব্বতের গুহায় থাকিয়া সেই সর্ব্বগুহাবিহারী শ্রীহরিকে আরাধনা করিব।

তাহাই হইল। শান্তোবা পিঞ্জরমুক্ত পক্ষীর মত—কমলকোষমুক্ত মধুকরের মত সেই মুক্ত ক্ষেত্রে মুক্তপ্রাণে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রাণে আনন্দ কত! পাখী ডাকে, তিনিও হরি-হরি ধ্বনি করিয়া উঠেন। পেখম ধরিয়া ময়ূর নাচে, তিনিও দু'বাহু তুলিয়া নাচিতে থাকেন। নির্ঝরিণী গান ধরে, তিনিও মধুর-মধুর বঁধুর গানে বিভোর হইয়া পড়েন। পশু নাই, পক্ষী নাই, সে গান যে শুনে, সে-ই ভুলে,—সে-ই কি-এক অব্যক্ত অস্ফুট স্বরে সে গীতিকে তুমুল করিয়া তুলে। তাহার মাধুর্য্য যেন তাহাতে আরও অধিক বাড়িয়া যায়,—সুধাস্রাবী সঙ্গীত-লহরীতে সমগ্র বনভূমিই যেন ছাইয়া যায়। এই গানের গুণে বা টানে হিংস্রক অহিংস্রক সকল জীব-জন্তুই শান্তোবার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। তরু-লতা তৃণ-গুল্ম—তারাও বুঝি তাঁহার প্রেমে ডগমগ। নইলে অত ফুল অত ফল তো তাদের কোন কালে ছিল না? ওষধিরাও তো অত সুবাস আর কখনও ছড়াইত না? বনভূমিরও তো অত সুষমা অন্য কোনদিন দেখা যাইত না? শান্তোবার আজ শান্তির সংসার।

(২)

এ সংসারে একের ভাল কখনও সকলের ভাল হয় না। একের মন্দও কখনও সকলের মন্দ হয় না। একের যাহা ভাল অপরের হয় ত তাহাই মন্দ। আবার একের যাহা মন্দ অপরের হয় ত তাহাই ভাল। ইহাই যে এ রাজ্যের নিয়ম। তাই শান্তোবার এত শান্তি তাঁহার মাতা ও বনিতার অশান্তিরই কারণ হইয়া উঠিল। তাঁহারা কি উপায়ে শান্তোবার এই শান্তিময় সংসার ভাঙ্গিয়া দিয়া তাঁহাকে আপন অধিকারে আনয়ন করিবেন, কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে-ভাবিতে মাতার মাথায় মতলব আসিল। তিনি পুত্রবধূকে বহুমূল্য বেশ-ভূষায় বিভূষিত করিয়া পুত্রের সমীপে প্রেরণ করিলেন। ভাবিলেন,—এই অপরূপ রূপলাবণ্যবতী যুবতী পুত্র-বধূর রূপের ফাঁদেই পুত্রকে পাকড়াইয়া আনিবেন। হায় রে অপত্য-স্নেহ! পুত্রবিরহবিধুরা বৃদ্ধা জননী একবারও ভাবিলেন না যে, এই ফাঁদ কাটিয়াই যে তাঁহার পুত্র পলাইয়া গিয়াছে!

শ্বশ্রূর অনুমতি পাইয়া পতিব্রতা শান্তোবা-পত্নী লোকজন-সঙ্গে পতি ধরিতে চলিলেন। তাঁহার আজ আনন্দ দেখে কে? কেবলই ভাবেন,—আনিতে পারি আর না-ই পারি, এক-বার ত তাঁহার চরণ দর্শন পাইব। আমায় ছাড়িয়া যদি তিনি সুখে থাকেন, তাহাই আমার পরম সুখ। সে সুখে আমি বাধা দিতে চাহি না। একবার ত দেখা পাইব, তাহাই আমার পরম লাভ। এইরূপ ভাবিতে-ভাবিতে তিনি বহু কষ্টে সেই

দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া পতিদেবতার পদপ্রান্তে উপনীত হইলেন। লজ্জাবতী লতার মত অবনত মস্তকে তাঁহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। কত কথা বলিব-বলিব মনে করিলেন, কিন্তু বাষ্প-বেগে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, মুখ ফুটিয়া একটী কথাও বলিতে পারিলেন না।

অপরূপ রূপের ডালি লইয়া প্রিয়তমা পত্নী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, দেখিয়া শান্তোবার অণুমাত্র চিত্তক্ষোভ হইল না। তিনি অচল অটল ভাবে বসিয়া রহিলেন। এই ভাবেই কিছু-ক্ষণ কাটিয়া গেল। কাহারও মুখে কথাটি নাই। সতী কত কি ভাবিতে-ভাবিতে পুর্ব্বের কথা—শ্বশ্রূর অনুমতির কথা, সকলই বিস্মৃত হইয়া গেলেন। ফলে, ধরিতে আসিয়া তাঁহাকে ধরা পড়িয়াই যাইতে হইল। তিনি ধীরেধীরে পতির চরণতলে প্রণত হইয়া পড়িলেন এবং দুই হস্তে দুইটি চরণ ধরিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—দেব, আপনি আপনার ভগবানের আরাধনা করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, ভালই করিয়াছেন। কিন্তু প্রভু, আমার যে আর অন্য ভগবান্ কেহ নাই। আপনিই যে আমার প্রত্যক্ষ ভগবান্। তাই দাসী আজ আপনার চরণ সেবা করিতে আসিয়াছে, সেবিকাকে আশ্রয় দিয়া সেবা অঙ্গীকার করিবেন না কি?

অবলা আর অধিক কিছু বলিতে পারিলেন না। তিনি নিশ্চেষ্ট ভাবে পতি-পদতলে পড়িয়া রহিলেন। এইবার শান্তোবার মুখে কথা ফুটিল। কামের প্রেরণায় নয়, কর্ত্তব্যের প্রেরণায় তিনি

আন্তরিক দৃঢ়তার সহিত বলিয়া উঠিলেন,—বেশ, তুমি আমার নিকটে থাকিতে পার, কিন্তু আমার মত হইয়া থাকিতে হইবে। যদি তুমি তোমার অঙ্গের এই বহুমূল্য আভরণ ও বস্ত্রগুলি দূরে নিক্ষেপ করিয়া আমারই মত সামান্য বস্ত্রে অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে পার, তবেই এখানে থাকিতে পাইবে; নচেৎ যথা ইচ্ছা চলিয়া যাও, আমার তাহাতে আপত্তি করিবার কিছুই নাই। সতী পতির কথায় আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, তাঁহার প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন এবং সুশোভন বসন ভূষণ দূর করিয়া দিয়া সামান্য তাপসীর বেশে তপস্বী স্বামীর সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। আজ এই কঠোর পার্ব্বত্য ভূমিতে পতিব্রতার প্রাণে যে বিমল আনন্দ, এ আনন্দ তিনি বিলাস-বৈভবপূর্ণ সুকোমল আস্তরণ-সমাকীর্ণ সুরম্য প্রকোষ্ঠেও একটি দিন অনুভব করেন নাই।

(৩)

এইরূপ আনন্দেই পতি-পত্নীর দিন কাটিয়া যায়। একদিন শান্তোবার ইচ্ছা হইল, পত্নীর অবস্থা কতটা উন্নত হইয়াছে, সংযম-সাধনে তাঁহার কতটা দৃঢ়তা জন্মিয়াছে, একবার তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখেন। অন্যদিন বন্য ফল-মূলে ও ঝরণার জলে তিনি ক্ষুধা-পিপাসা শান্ত করিয়া থাকেন, সেদিন পত্নীর কাছে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন,—অনেকদিন রুটী-টুটী খাওয়া যায় নাই, গ্রাম হইতে কিছু ভিক্ষা করিয়া আনিতে পারিলে মন্দ হইত না। স্বামীর কথা শেষ হইতে-না-হইতে

পতিব্রতা বলিয়া উঠিলেন,—আদেশ পাইলে আমিই যাইয়া ভিক্ষা করিয়া আনিতে পারি। শান্তোবা বলিলেন,—ভাল, তুমি ভিক্ষার জন্য যাইতে পার, কিন্তু দেখো যেন আধখানার অতিরিক্ত রুটী কাহারও কাছে ভিক্ষা লইও না। আপনার যাহা অনুমতি, বলিয়া সতী ভিক্ষার্থ বহির্গত হইলেন। আজন্ম ঐশ্বর্য্যের মধ্যে প্রতিপালিতা, অন্তঃপুরের অবরোধে চির অবরুদ্ধা পতিব্রতা ভিক্ষা কাহাকে বলে জানেন না। কিন্তু কি করেন, পতি-দেবতার প্রীতি-উদ্দেশে আজ তিনি সেই কণ্টক-কঙ্কর-সঙ্কুল পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া গ্রামে ভিক্ষা করিতে চলিয়াছেন। তাঁহার অঙ্গে আভরণ নাই, পরিধানে বহুমূল্য বস্ত্র নাই, কেশের সংস্কারও নাই। ছিন্ন গৈরিক বসনে ও রুক্ষ কেশে আজ তাহার কতই না শোভা! যে দেখে সে-ই মনে করে বনদেবী যেন বনভূমি ছাড়িয়া গ্রামের মধ্যে গমন করিতেছেন। পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের দীপ্ত রাগে রমণী এমনই রমণীয় দেখায় বটে!

গ্রামের মধ্যে গমন করিয়া সাধ্বী দ্বারে দ্বারে রুটি ভিক্ষা মাগিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বেড়াইতে-বেড়াইতে তিনি তাঁহার ননদিনীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। ভ্রাতৃজায়ার ভিখারিণীর বেশ-দর্শনে তিনি ত কাঁদিয়াই আকুল। অনেক কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—হাঁ ভাই, এ দশা তোদের কতদিন? দাদার কি আমার বিষয়-বৈভব সমস্তই নষ্ট হইয়াছে? ননদিনীর কথার উত্তরে সতী পতির বিরক্তি ও গৃহত্যাগাদি—একে একে

সকল কথাই সংক্ষেপে বলিলেন এবং ক্ষুধার্ত্ত স্বামীকে ফেলিয়া আসিয়াছি, অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিব না, অর্দ্ধ খণ্ড রুটী ভিক্ষা দিতে হয় দান কর, নচেৎ আমি চলিয়া যাই,—বলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন; না না, একটু ব'স ভাই, একটু ব'স, বলিয়া ননদিনী প্রচুর পরিমাণে ঘৃতপক্ক লুচি, পুরি প্রভৃতি নানাবিধ খাদ্য চাঙ্গারি ভরিয়া আনিয়া দিলেন। ভ্রাতৃবধূও তাহা লইবেন না, ননদিনীও ছাড়িবেন না। এইরূপে অনেকক্ষণ ধ্বস্তা-ধ্বস্তি চলিল। ক্ষুধার্ত্ত পতির কথা পতিব্রতার মনে পড়িয়া গেল। তিনি আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। ননদিনীকে 'তবে ভাই! আমি আসি'—বলিয়া, খাবারের চাঙ্গারি লইয়া, চঞ্চলপদে চলিয়া গেলেন। তাড়াতাড়ি যাইলে কি হইবে? সে পথ তো আর সোজা নয়; সেই দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করিতে তাঁহাকে অশেষবিধ ক্লেশ পাইতে হইল। তিনি বার-বার পদস্খলন পতন ও পদতলে কণ্টকাদির বিদ্ধন সহন করিয়া, যতদূর সম্ভব শীঘ্রগতি পতিদেবতার নিকটে আসিয়া পঁহুছিলেন এবং তাহার পদপ্রান্তে চাঙ্গারিখানি রাখিয়া দিয়া আদেশ প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিলেন।

শান্তোবা প্রশান্ত-নয়নে সেই চাঙ্গারির প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার নয়নের প্রশান্তভাব প্রশমিত হইয়া গেল। তিনি কোপ-কষায়-নেত্রে অবলার দিকে চাহিয়া ভ্রূকুটী সহকারে কহিলেন,—এই ইন্দ্রিয়-তর্পণ ভোজনের আয়োজন তোমাকে কে আনিতে বলিয়াছিল? আনিতে বলিলাম,—রুটীর টুক্‌রা, আনিলে কিনা

লুচির চাঙ্গারা? যাও, এখনই এখান থেকে এ সকল খাদ্য লইয়া যাও,—যাহার জিনিষ তাহাকে ঘুরাইয়া দিবে যাও; আর যদি আনিতে পার তো বাড়ী-বাড়ী সাধিয়া রুটীর টুক্‌রা লইয়া আইস। পতিব্রতা পতির কাছে যথা-কথা খুলিয়া বলিলেন, তাঁহার ভগিনীর একান্ত অনুরোধে—অনিচ্ছা-সত্ত্বেই যে তাঁহাকে এই সকল আনিতে হইয়াছে, তাহাও কহিলেন, কিন্তু শান্তোবা তাহা স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন না, পূর্ব্বকৃত আদেশের এক বর্ণও প্রত্যাহার করিলেন না।

(৪)

দেবতায় যাঁহার ভক্তি আছে, দেবতার প্রীতির জন্য তিনি না পারেন কি? পর্ব্বতে চড়াই ও ওৎরাইয়ে ওঠা-নামা করিয়া, পথে নানা যাতনা সহিয়া, সতীর শরীর থরথর কাঁপিতেছিল, নাসিকায় ঘনঘন দীর্ঘশ্বাস বহিতেছিল, কিন্তু পতিদেবতার অনুমতি পাইবামাত্র তিনি আর মুহূর্ত্ত মাত্র অপেক্ষা না করিয়া সেই চাঙ্গারিখানি লইয়া আবার গ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনিও যে তাঁহার দেবতা পতির প্রতি ভক্তিমতী,—কায়মনো-বাক্যে তাঁহারই প্রীতির প্রার্থী।

স্বামি-সোহাগিনী গ্রামে আগমন করিয়া স্বামীর আদেশ প্রতি-পালন করিলেন;—সুমিষ্ট সম্ভাষণে ননদিনীকে খাবাবের চাঙ্গারি ফিরাইয়া দিয়া এবং কয়েক বাড়ী হইতে কয়েকখণ্ড রুটী ভিক্ষা করিয়া পর্ব্বতের দিকে চরণ চালাইলেন। কিন্তু, অহো কি দৈব-দুর্ব্বিপাক, কিছুদূর অগ্রসর হইতে-না-হইতেই প্রবলবেগে বৃষ্টি

আসিল। সে মেঘেরই বা হাঁকুনি-ডাকুনি দেখে কে? পথ চলা ভার। পতিব্রতা অতিকষ্টে গুটিগুটি পথ চলিতে লাগিলেন। তিনি অঙ্গবস্ত্র দিয়া রুটীর টুক্‌রা কয়টী ঢাকিয়াছেন। সে রুটী যে তখন তাঁহার কাছে আপন অঙ্গের অপেক্ষাও বহুমূল্য! তাহাতেই যে তাঁহার দেবতার প্রীতি-সম্ভাবনা। তিনি শীত-কম্পিত শরীরে ধীর-পদ-বিক্ষেপে পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়, নদীতীরে আসিয়া তাঁহার বল-ভরসা সকলই উড়িয়া গেল। পার্ব্বত্য নদী প্রবল জলে উছলিয়া পড়িয়াছে। পার করিবার তরী নাই—কাণ্ডারী নাই। রমণীর চিন্তার নদীও ভীম-রথীর সেই ভীমা মূর্ত্তির অপেক্ষাও মহা ভীমা মূর্ত্তি ধারণ করিল। বাহিরে ভীমরথী-নদীর উত্তাল তরঙ্গ-ভঙ্গ, অন্তরে চিন্তা-তরঙ্গিণীর তরঙ্গ-সংঘাত; অবলা বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িলেন। কোথায়, কে আছ; একাকিনী অসহায়া রমণী, আমাকে এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার কর, ইত্যাদি কত কি বলিয়া তিনি কাতরে চীৎকার-ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। হায় হায়,—কই, কেহই তো আসিল না। ভয়ে প্রাণ শিহরিয়া উঠিল; ভাবিলেন,—হায়, ঐ যে সন্ধ্যাও হইয়া আসিল, তবে,—তবে কি হবে; আমার অভুক্ত ক্ষুধার্ত্ত স্বামী—তাঁহার খাদ্য কে তাঁহাকে পঁহুছাইয়া দিবে? হায়, পাণ্ডব-সখা পাণ্ডুরঙ্গ দেব! তুমি একবার করুণা-অপাঙ্গে চাহিয়া দেখ;—কই, কোথায়—কোথায় তুমি?

পতিপ্রাণা প্রাণের প্রাণ পাণ্ডুরঙ্গকে ডাকিতে-ডাকিতে তাঁহার টনক নড়িল; ভক্ত-রক্ষার নিমিত্ত তিনি মহা ব্যস্ত

হইয়া পড়িলেন; সেবকবৃন্দের অসামান্য সেবা-সমাদর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সামান্য নাবিকের বেশে সেই জল-কর্দ্দম-দুর্গম পিচ্ছিল পথে—সতীর সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং জলদ-নাদে জিজ্ঞাসিলেন,—হাঁগা বাছা! এ দুর্যোগে তুমি একাকিনী বাটীর বাহির হইয়াছ কেন? আহা, ভিজিয়া ভিজিয়া তোমার শরীর যে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে! এত কষ্ট সহিয়া তুমি কোথায় যাইতেছ?

পতিপ্রাণার আর মুখ ফুটিয়া কথা বাহির হইতেছিল না; তিনি নয়ন মুদিয়া সেই ভবপারের কাণ্ডারীকে ভাবিতেছিলেন। এই কর্ণরসায়ণ কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া তিনি ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিলেন,—দেখিলেন—জনৈক প্রবীণ নৌকাবাহক। তিনি অনেকটা আশ্বস্তের ভাবে—আস্তে-আস্তে সমস্ত অবস্থা তাহাকে জানাইলেন। শেষ করুণা ভিক্ষা করিয়া বলিলেন,—দেখ বাপু! ভগবান্ পাণ্ডুরঙ্গই তোমাকে এখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তুমি দয়া না করিলে আমার আর পারে যাইবার উপায় নাই। তুমি পিতার মত বা অগ্রজের মত আমাকে একটু স্নেহপূত দৃষ্টিতে না দেখিলে চলিতেছে না। যেমন করিয়াই হউক, তুমি আমাকে নদী পার করিয়া দিয়া ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের অধিকারী হও। আহা, অভুক্ত পতি যে আমার ঐ নদীপারে পর্ব্বতের উপরে। আমি না যাইলে যে তাঁহার আহার হইবে না। এইরূপ বলিতে-বলিতে রমণীর কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তিনি আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। যেন ঢলিয়া পড়েন পড়েন।

আহা, ভামিনীর ভাব দেখিয়া ঐ যে মায়ানাবিকেরও নয়ন প্রান্তে করুণার রেখা দেখা দিয়াছে। নাবিক আর থাকিতে পারিল না;—স্নেহ-পালিতা কন্যার মত তাঁহাকে কোলে করিয়া পৃষ্ঠের উপর চাপাইয়া লইল এবং সন্তরণ-সাহায্যে নদী পার হইয়া—পতিরতার পতির তাপস-বাসে ছাড়িয়া দিয়া দেখিতে-দেখিতে অদৃশ্য হইয়া পড়িল। দুইটা কৃতজ্ঞতার ভাষা শুনিবারও অপেক্ষা করিল না।

কামিনীর কিন্তু এ সকলের খেয়ালই নাই, তিনি করিয়াছেন কি?—তিনি তাঁহার লজ্জাবস্ত্রখানি সমস্তই সেই রুটীর টুক্‌রার উপর জড়াইয়াছেন। নাবিক যত সাঁতার দিয়া জলে অগ্রসর হয়, সতীও তত রুটীর টুকরাগুলিতে বসনের ফের দেন। তিনি যে রূপযৌবনসম্পন্না কুলকন্যা, পর-পুরুষ যে তাঁহাকে পৃষ্ঠে করিয়া লইয়াছে, তাহার সঙ্গে যে আপন অনাবৃত অঙ্গের সঙ্গ ঘটিতেছে, পতিদেবতার রুটী-রক্ষার ব্যস্ততায় পতিব্রতার এ সকল কথা আলোচনা করিবার অবকাশই ছিল না। এইবার রুটীর ফাঁড়া কাটিয়া গিয়াছে দেখিয়া তাঁহার হুঁস হইল। ছি ছি, তাই তো নাবিক কি মনে করিল, ভাবিয়া তিনি লজ্জায় জড়সড় হইয়া পড়িলেন, রুটীর অঙ্গাবরণ কতকটা উন্মোচন করিয়া আপন অঙ্গ আবৃত করিলেন এবং পতির উদ্দেশে প্রধাবিত হইলেন।

(৫)

যে রুটীখণ্ডের জন্য এত কাণ্ড, সে রুটী কিন্তু শান্তোবার ভোগে আসিল না। শান্তোবাপত্নী সেই ক্লেশ-সমাহৃত এবং

প্রাণান্তপণে সংরক্ষিত রুটীর টুকুরাগুলি বসনের আবরণ হইতে বাহির করিয়া বিনীতভাবে পতির সম্মুখে লইয়া ধরিলেন। তিনি যেন তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না। সতীর শরীরের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া কেমন যেন তাঁহার বিস্ময়ের উদ্রেক হইল;—সুন্দরী যেন তাঁহার নয়নে আর কোন্ রাজ্যের সমুজ্জল সৌন্দর্য্যমাখা—ললিত-ললিত লাবণ্যমাখা—।ক এক কমনীয় পবিত্র সামগ্রী বলিয়া প্রতিভাত হইলেন। অঙ্গনার অঙ্গের পবিত্র গন্ধে শান্তোবার নাসারন্ধ্র ভরিয়া গেল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—যেন নব বসন্তের পূজার ডালি-মধু-ঢল-ঢল ফুল্ল-ফুলকলি লইয়া বনদেবীই দাঁড়ায়ে আছেন। তিনি তো জানেন না যে, যাঁহার শ্রীচরণ-সংস্পর্শে কাষ্ঠের তরণী সুবর্ণ হইয়াছিল, যাঁহার শ্রীঅঙ্গের সঙ্গ পাইয়া কুরূপা কুবুজা রূপদর্পে কন্দর্প-কামিনীকেও পরাভব করিয়াছিল, তাঁহার পত্নী সেই অপূর্ব্ব স্পর্শমণির স্পর্শ পাইয়াছে! তাই তিনি বিস্ময়েবিস্ময়েই বিদ্যুদ্-বরণী ঘরণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সাধ্বি! বল বল, তুমি এই দুরন্ত দুর্য্যোগে দুস্তর নদীর পরপারে আসিলে কি প্রকারে?

পতিব্রতা বলিলেন,—দেব! আপনার আশীর্ব্বাদে নদী-পারে আসিতে বিন্দুমাত্রও ক্লেশ পাইতে হয় নাই, অধিক কি, পারে আসার ব্যাপারটা যেন জানিতেই পারি নাই; কিন্তু পার হইবার পূর্ব্বে বড় উদ্বেগ বড় কষ্ট গিয়াছে। সে কষ্টের কথা কি বলিব। আপনার আদেশে আমি ত ননদিনীর নিবাসে যাইলাম। তাঁহাকে কত করিয়া বুঝাইয়া-সুঝাইয়া খাদ্যগুলি ফেরৎ দিলাম। তাহার

পর কতিপয় ভবনে ভিক্ষা মাগিয়া এই কয়েক খণ্ড রুটী সংগ্রহ করিলাম। একে আপনি অভুক্ত, তার উপর এতটা পথ একাকিনী আসিতে হইবে, ভাবিয়া তাড়াতাড়ি ফিরিবার পথ ধরিলাম। একটু না আসিতে-আসিতে প্রবল ঝড়-জল আরম্ভ হইল। পথ আর চলা যায় না। অনেক কষ্টে পা টিপিয়া টিপিয়া, কতবার পড়িয়া উঠিয়া, নদীতীরে আসিলাম। আসিয়া দেখি, নদী কাণে কাণ। তীরে তরীবাহক নাই, নীরে তরীও নাই। তরঙ্গিণীর ভঙ্গী দেখিয়া ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল। ওঃ, ভীমরথীর সে কি ভীষণা মূর্ত্তি! সে যেন রণরঙ্গিণী চণ্ডিকা—শুভ্রফেণার কপাল-মালা গলায় পরিয়া—তরঙ্গ-ভঙ্গে তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়া দিয়াছে! ঘোর ঘনান্ধকারে দিবাভাগেই নয়ন ধাঁধিয়া গেল। চপলার চমক, কি শ্মশানচুল্লীর জ্বলিত জ্বলন,—বৃষ্টির শব্দ, কি চিতাহুতাশনের চটপট-ধ্বনি,—অশনির গর্জ্জন, কি ভীমা-ভৈরবীর হুহুঙ্কার-নিস্বন, কিছুই বুঝিতে পারি না। কাণের কাছে হু হু হো হো আওয়াজ আসে, তাহা কি প্রবল পবনের, কিংবা ভূতপ্রেতের অট্টহাস্যের, কিছুই বুঝিতে পারি না। মড়মড় তড়-বড় শব্দ শুনিতে পাই, তাহা কি বৃক্ষপতনের, কিংবা পিশাচ-নর্ত্তনের, তাহাও বুঝিতে পারি না। মাঝে মাঝে ফেরুপাল ডাকিয়া উঠে। ভয়ে প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। জিহ্বায় যেন রস নাই, শরীরে যেন রক্ত নাই, এক পা অগ্রসর হইবারও যেন শক্তি নাই। প্রাণেপ্রাণেই পাণ্ডুরঙ্গদেবকে ডাকিতে লাগিলাম। তাঁহার কৃপায় অকস্মাৎ একজন লোক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

আমি তখন চক্ষু বুজিয়াই আছি। চাহিলেই বা দেখিব কি? কথায় কথায় বুঝা গেল, আগন্তুক একজন নাবিক। আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া কাণ্ডারীর করুণা হইল। সে শিশু কন্যার মত আমাকে পৃষ্ঠে চাপাইয়া পার করিয়া দিল এবং এই আশ্রমের পার্শ্বে ছাড়িয়া দিয়া চক্ষু না পালটিতে-পালটিতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

শাস্তোবা পত্নীর মুখে পারে আসিবার বর্ণনা শুনিতেছেন, আর কেমন যেন ফুলিয়া-ফুলিয়া উঠিতেছেন। তাঁহার সকল শরীর পুলকপূর্ণ। নয়নে দরদর অশ্রুধারা। গদগদ-ভাবে তিনি সহধর্ম্মিণীকে কহিলেন,—ভাগ্যবতি, তুমি একবার সেই নাবিককে আমায় দেখাইলে না? আমি যে তাঁহারই জন্য অন্তরে আসন বিছাইয়া এই প্রান্তরে পড়িয়া আছি। কই এতদূর আসিয়া এইটুকু আসিতে কি তাঁহার কষ্ট হইল? হউক হউক, তাহাই হউক, সুন্দরী, তুমি ও রুটীর টুকরাগুলি পশুপক্ষীকে খাওয়াইয়া দাও। সেই নাবিক আসিয়া দেখা না দিলে, আমি আর বারিবিন্দুও গ্রহণ করিব না। এই প্রাণভরা ব্যাকুলতা লইয়া বসিয়া রহিলাম, দেখি তিনি কেমন না আসিয়া থাকিতে পারেন? হায় সতি,—তুমিই ধন্যা! তুমিই তাঁহার অমূল্য অঙ্গ সঙ্গ লাভ করিয়াছে!

পতির অনুমতি সতীর শিরোধার্য্য। তিনি তৎক্ষণাৎ পতির আদেশ প্রতিপালন করিলেন। রুটীর টুকরাগুলি বনের পশু-পক্ষীকে খাওয়াইয়া দিয়া স্বামীর সম্মুখে প্রত্যাগমন করিলেন।

ভর্ত্তা যখন অভুক্ত ; তখন তিনিই বা আহার করেন কি প্রকারে ? ফলে,· পতি পত্নী দুইজনে অভুক্ত অবস্থায় সেইখানেই বসিয়া রহিলেন।

ইতিমধ্যে আর এক বিচিত্র ব্যাপার উপস্থিত হইল। ভক্ত শান্তোবা কয়েকদিন অভুক্ত ; ভক্তাধীন ভগবানের প্রাণে তাহা সহিল না। তিনি উক্ত পর্ব্বতের সমীপবর্ত্তী গ্রামবাসী জনৈক বৈশ্যকে স্বপ্ন দিলেন,—তুমি পর্ব্বতের উপরে যাও, ক্ষুধার্ত্ত ভক্ত শান্তোবাকে সত্বর আহারীয় সামগ্রী দিয়া অমিত পুণ্য অর্জ্জন কর। স্বপ্নাবসানে বৈশ্যের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া উৎকৃষ্ট মিষ্টান্নাদি লইয়া শান্তোবার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—মহাত্মন্! আমি জগদীশ্বরের আদেশে এই খাদ্যগুলি আপনার সমীপে আনয়ন করিয়াছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আহার করিতে আজ্ঞা হউক।

বৈশ্যের কথা শুনিয়া শান্তোবা আরও অধিক অধীর হইয়া পড়িলেন। কাঁদিতে-কাঁদিতে তাঁহাকে বলিলেন,—ওগো, তুমি যেই হও সেই হও, আমি তোমার এ খাবার-দাবার কিছুই খাইতেছি না। তুমি কি তোমার সেই খাবার-পাঠানোর হুকুম-করা ঠাকুরকে দেখাইতে পার? সেই হুকুম-করা ঠাকুর এখানে হাজির না হইলে আমি আর কিছুই খাইতেছি না। বৈশ্য অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়াও যখন দেখিলেন, শান্তোবার দৃঢ়তা একটুও টস্‌কাইবার নয়, তখন কাজেকাজেই তিনি তাঁহাকে প্রণাম

করিয়া গৃহমুখে গমন করিতে বাধ্য হইলেন। খাবারগুলি সেই-খানেই পড়িয়া রহিল।

আবার খাবার?—হায় ঠাকুর! এই খাদ্যের ক্ষুধা লইয়াই কি আমি বসিয়া রহিয়াছি? এখনি যাহা মল-মূত্রে পরিণত হইবে সেই খাদ্য দিয়াই কি তুমি চিরদিন ভুলাইয়া রাখিবে? যাহাতে চিরদিনের ক্ষুধা-পিপাসার শান্তি হইয়া যায়, সেই তোমার প্রেম-মকরন্দ কি এক বিন্দুও দান করিবে না? হায় হায় ঠাকুর, তুমি এতই কি নিষ্ঠুর? এত সাধি, এত কাঁদি, তবুও কি তোমার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হয় না? দেখা দাও,—দেখা দাও হৃদয়েশ্বর! দেখা দাও, দেখা দাও। বারবার বলি না,—দয়া ক'রে একটী-বার দেখা দাও, দেখা দাও। এইরূপ রুদ্ধ-শ্বাসে ক্ষুব্ধ-প্রাণে কত কি বলিতে-বলিতে শান্তোবা দু'বাহু তুলিয়া উচ্চ ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। দীনের ঠাকুরও অমনই মোহনবেশে তাঁহার নয়ন-সমক্ষে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিয়া শান্তোবার নয়ন-মন ভরিয়া গেল। তিনি প্রাণ ভরিয়া সেই রূপ-সুধা পান করিলেন, তাঁহার সকল ক্ষুধা সকল পিপাসা শান্ত হইয়া গেল। শান্তোবা বার বার প্রণাম করেন, ভূমে গড়াগড়ি দেন, উদ্দণ্ড নৃত্য করেন, আনন্দের আতিশয্যে কি যে করেন, কিছুই ঠিক পান না। দয়াময়ের দয়ার গুণ গাহিবার জন্য তাঁহার রসনা নাচিয়া উঠিল, কিন্তু কণ্ঠ তাহাতে বিষম বাধা দিল। সে যে তখন গদগদে রুদ্ধ! অনেক চেষ্টার পর অস্ফুট-অস্ফুট কথা ফুটিল। ভাবের তরঙ্গ ছুটিল। মহিমময়ের মহিমা-গানে শান্তোবা সেই স্থানটা সুধাসিক্ত করিয়া তুলিলেন।

ভক্তের এই বিশুদ্ধ-ভাবে ভগবান্ যার-পর-নাই প্রীতিলাভ করিলেন এবং তাঁহাকে আশীর্ব্বচনের অমৃতসেচনে অভিষিক্ত করিয়া হাসিতে-হাসিতে অন্তর্হিত হইয়া পড়িলেন। শান্তোবার নেশা এইবার বেশ জমিয়া গেল। তাহাতেই তিনি সতত বিভোর রহিয়া কায়-মনোবাক্যে বিশ্বপিতার সেবাকার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। তাঁহার গুণবতী পত্নীও তাঁহার সকল কার্য্যের সহায় হইয়া সহধর্ম্মিণী নাম সার্থক করিতে লাগিলেন।

(৬)

ফুল ফুটে; নিজেই নিজের গন্ধ লুটে না;—পাঁচজনকেও লুটায়। ভক্তের অন্তরে ভাবকুসুম বিকশিত হইলে, তাহার পবিত্র গন্ধে তাঁহার অন্তর ভরিয়া যায়, দূরদূরান্তরের পাঁচজনও তাহা উপভোগ করিয়া থাকে। শান্তোবার আন্তরিক শান্তি আপন অন্তরেই আবদ্ধ রহিল না; শতশত লোকে তাহা পাইয়া কৃতার্থ হইতে লাগিল। তাঁহার আদর্শে ও উপদেশে অনেকে আপন গন্তব্য পথ অবধারণ করিয়া সাধনরাজ্যে অগ্রসর হইতে লাগিল। সময়-সময় ভিক্ষা-ব্যপদেশেও তিনি গ্রামে গ্রামে গিয়া গৃহীর গৃহ কৃতার্থ করিয়া আসিতেন। একবার তিনি এক ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষার জন্য গমন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ বাড়ীতে নাই। ব্রাহ্মণী আসিয়া ভক্তিভরে প্রণামপূর্ব্বক ভিক্ষা দিলেন। আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া বিনয়বচনে বলিলেন,—মহাভাগ! আমার স্বামী যখনতখন অকারণ আমার সহিত বিবাদ করেন, আর আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার পদপ্রান্তে যাইয়া আশ্রয় লইবেন বলিয়া

শাসাইয়া থাকেন। যদি তিনি তা-ই যান, তবে আমার গতি কি যে হইবে, ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারি না। আমার তো আর কেহ নাই দয়াময়! আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমার স্বামীর মন যেন রোষরহিত এবং পবিত্র হয়।

শান্তোবা ব্রাহ্মণপত্নীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—মাতা! ইহার জন্য এত চিন্তা কেন? আমি ইহার প্রতিকার করিয়া দিব। তুমি এক কার্য্য করিও,—তোমার স্বামী এইবার যখন তোমার সহিত বচসা করিয়া আমার আশ্রমে যাইতে চাহিবেন, তখন তুমি তাঁহাকে তাহাই করিতে বলিও; তারপর যদি তিনি আমার কাছে গমন করেন, আমি তাঁহাকে ঠিক করিয়া পাঠাইয়া দিব, আর তিনি এক দিনের জন্যও তোমার সহিত কথার লড়াই করিবেন না।

এই বলিয়া শান্তোবা চলিয়া গেলেন। খাবারের বিলম্ব লইয়া আবার একদিন ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীতে খিটিমিটি বাধিল। ব্রাহ্মণ তাঁহার সেই বাঁধা বুলি আবার আওড়াইয়া বলিলেন,—না, তোমার জ্বালায় আর আমার এখানে থাকা পোসাইল না,—আমি শান্তোবার শান্তিময় আশ্রমে চলিয়া যাইব। আজ আর ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণের গলাবাজীটা চুপিচুপি হজম করিলেন না; তিনি মুখনাড়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—রোজ রোজ এক কথা শিখেছেন—চ'লে যাবো চ'লে যাবো; তা কোথায় যাবে যাওনা;—ঘড়ির কাঁটা ধোরে কে তোমায় খেতে দেয় একবার দেখে নিই?

মুখেমুখে জবাব পাইয়া ব্রাহ্মণের ভারি অভিমান হইল,—এইবার তাঁহার বৈরাগ্যের গাঙে ভাদ্রের বাণ ডাকিল। আহা,

তাঁহার মুখের খাবার পড়িয়া রহিল ; তিনি তাড়াতাড়ি একটা লোটা ও একখানা কম্বল লইয়া—"আচ্ছা তাই চলিলাম"—বলিয়া, এখানে একটা, ওখানে একটা পা ফেলিয়া ভুপ্‌ভুপ্‌ করিয়া চলিয়া চলিলেন। সে চলিবার ধরণ দেখে কে? হনুমানের মত শক্তি থাকিলে বোধ হয়, ব্রাহ্মণ আজ এক লম্ফেই শান্তোবার শান্তিনিকেতনে চলিয়া যাইতেন।

ব্রাহ্মণ তো যত শীঘ্র পারেন পর্ব্বতের উপরে গিয়া চড়িলেন। হাঁপাইতে-হাঁপাইতে শান্তোবার নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। মুখে কথা ফোটে না। একটু জিরাইয়া শান্তোবাকে প্রণাম পূর্ব্বক বলিলেন.—মহাশয়, আমার বাটীতে বড় অশান্তি, পত্নীর সহিত নিত্যই কলহ, তাই সংসারের মায়া ছাড়িয়া আপনার কাছে আসিয়াছি ; দয়া করিয়া শান্তির পথ চিনাইয়া দিন। শান্তোবা পরিচয়ে ব্রাহ্মণকে চিনিলেন—ইনিই সেই ব্রাহ্মণীর স্বামী। তিনি সুমিষ্ট-সম্ভাষণে তাঁহাকে বলিলেন,—দেখ, তুমি বৈরাগ্য লইয়া আসিয়াছ বটে, কিন্তু তোমার ঐ কাপড়-চোপড় ও লোটা-টোটা-গুলা বৈরাগীর উপযোগী নয়। তা বাপু, তুমি ঐ কাপড়-চোপড় গুলা খুলে ফেল, লোটাটা ঐ দিকে সরাইয়া রাখ। আর এই কাঠের জলপাত্রটা লইয়া ঝরণা হইতে জল ধরিয়া আন—হাতমুখ ধোও, বিশ্রাম কর।

ব্রাহ্মণের বৈরাগ্যের ঝাঁজটা তখনও মিয়াইয়া যায় নাই। তিনি তাঁহার কম্বল টম্বল গা হইতে খুলিয়া ফেলিলেন। সেগুলি এবং লোটাটা এক পাশে বেশ গোছাইয়া-গাছাইয়া রাখিয়া দিলেন।

পরিধানে রহিল—মাত্র একখণ্ড বস্ত্র। সেই অবস্থায় তিনি সেই কাষ্ঠপাত্র লইয়া জল আনিতে চলিলেন। ব্রাহ্মণ একে পেটুক, তায় মুখের খাবার ছাড়িয়া আসিয়াছেন, তাহার উপর এতটা পথ চলা,—ক্ষুধায় পিপাসায় তাঁহার শরীর ঝিম্‌ঝিম্‌ করিতেছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, শান্তোবার আশ্রমে গেলেই বুঝি পেট পূরিয়া খাইতে পাইব ; আমার অবস্থা দেখিয়া নিশ্চয় তিনি কিছু-না-কিছু আহার করিতে দিবেন-ই। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে আবার জল আনিতে যাইতে হইতেছে ;—বাপ, কি কষ্ট! ক্ষুধায় যে প্রাণ যায়! জল আনিতে যাইতে-যাইতে তাঁহার বৈরাগ্যের বেগ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে লাগিল। জল লইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় তো পা আর চলে না। ক্ষুধা তখন চরমে চড়িয়াছে ; বৈরাগ্যের আর সেখানে টেঁকা দায়। এবার বুঝি বৈরাগ্যকেই বৈরাগ্য লইতে হয়। ব্রাহ্মণ জল লইয়া ফিরিয়া আসিলেন, দেখিলেন,—শান্তোবা পত্নীসহ আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দেখিয়া তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। জঠরদেবের কঠোর অনুশাসনে তাঁহার শরমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। মরমের কথাও মুখ ফুটিয়া বাহির হইল। জলের পাত্র না নামাইয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন,—মহাশয় গো, প্রবল ক্ষুধা ; কিছু খাইতে দিন। আহা, ব্রাহ্মণ এক হস্তে পেট দেখাইয়া যেরূপ কাতরভাবে ক্ষুধার কথা জানাইলেন, তাহা ভাবিতেও কষ্ট হয়। মনে হয়—কেন বাপু, তুই ঘর-দোর ছাড়িয়া আসিয়াছিলি? ব্রাহ্মণের প্রার্থনায় শান্তোবা তাঁহাকে কিছু বন্য ফল খাইতে দিলেন। দেখিয়া ব্রাহ্মণের

মাথাটা কেমন চড়াং করিয়া উঠিল। তাঁহার সে ক্ষুধার খাণ্ডব-অনলে দুইচারিগাছি তৃণকুশে কি হইবে? তিনি তীব্র-স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—অ্যাঁ, আমি আপনার ক্ষুধার্ত্ত অতিথি, আমার জন্য এই সামান্য বন্যফলের ব্যবস্থা? ওতো আমার ঠোঁটে মাখিতেই কুলাইবে না।

ব্রাহ্মণের অবস্থা দেখিয়া শান্তোবার একটু কষ্টও হইল, হাঁসিও পাইল। তিনি তাঁহাকে গম্ভীর-ভাবেই বলিলেন,—বাপু হে, তুমি না বৈরাগ্য করিয়াছ?—সংসারের সকল সামগ্রী, সকল আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ? তা আহারের জন্য অত লালায়িত হইলে চলিবে কেন? এই পথে এ-ই আহার—যখন যাহা জুটিবে তাহাই আহার। তা বন্যফলই বা কি, আর লুচি-মণ্ডাই বা কি? অল্পই বা কি, আর প্রচুরই বা কি?

শান্তোবার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের হরিভক্তি উড়িয়া গেল। আর তাহার বৈরাগ্য বজায় রাখা চলিল না। গৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রাণটা খাবি খাইতে লাগিল। তিনি তাঁহার কাপড়-চোপড় ও লোটাটার দিকে দৃষ্টি চালিত করিলেন। ভাবখানা—আর বৈরাগ্যে কাজ নাই বাবা, কাপড়-চোপড় প'য়ে ঘরের ছেলে ঘরে যাই। কিন্তু হায় কি সর্ব্বনাশ, তাহার যে নামগন্ধও সেখানে কিছুই নাই! লোটাটী দূরে নিক্ষিপ্ত, আর কাপড়-চোপড়গুলি টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া ইতস্ততঃ বায়ু-বিচালিত! বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণের জল আনিবার অবকাশে শান্তোবাই সে গুলির এইরূপ অবস্থা করিয়াছেন। উদ্দেশ্য—মর্কটবৈরাগীকে টিট করিয়া ঘরে পাঠানো।

তাঁহার উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইল। ব্রাহ্মণ যখন দেখিলেন,—তাঁহার কাপড়-চোপড়গুলি সকলই নষ্ট হইয়াছে, তখন তাঁহার আর দুঃখ রাখিবার স্থান থাকিল না। একে ক্ষুধা, তার উপর এই লোকসান। গা'টাও কেমন শীতশীত করিতেছিল। দুঃখে ক্ষোভে তিনি বালকের মত কাঁদিয়া উঠিলেন। বৈরাগ্যের কঠোরতা এইবার তাঁহার প্রাণেপ্রাণে অনুভূত হইতে লাগিল। তিনি কাঁদিতে-কাঁদিতে শান্তোবাকে কহিলেন,—মহাশয়, বাড়ীতে থাকিলে এতক্ষণে আমার পত্নী আমাকে দু'একবার আহার করিতে দিতেন। আমার মূর্খতা আমি এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু ঠাকুর! আমি তো তাঁহাকেও চটাইয়া চলিয়া আসিয়াছি। এখন আমি কোন্ পথে যাই, কি করিয়া জঠরের জ্বালাই বা জুড়াই, তাহারই উপযুক্ত উপদেশ দিয়া আমাকে আশ্বস্ত করুন।

শান্তোবা বলিলেন,—বাপু হে, বৈরাগ্যের পথ বড় বিষম পথ। এ পথে আসিলে সংযমের সবিশেষ আবশ্যক। যে ফুঁকা শিশির মত টুস্‌কির ভর সহিতে পারে না, কথায়-কথায় কচি-খোঁকার মত প্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া ফেলে, সে যেন কখনও এ পথের ত্রিসীমা না মাড়ায়। মর্ম্মান্তিক দৃঢ়তার যষ্টি অবলম্বন করিয়া অতি সতর্ক-পদে এই শাণিত-ক্ষুরধারা-সমাস্তিত পথে বিচরণ করিতে হয়। বাবা, তোমার এখনও সময় হয় নাই—এ পথে আসিবার যোগ্যতা জন্মে নাই। গৃহের পথই এখন তোমার প্রকৃত পথ। গৃহে থাকিয়াই এখন তুমি যথাযথ গৃহস্থের ধর্ম্ম প্রতিপালন কর। তাহাতেই তোমার কল্যাণ হইবে, যে খাস্ত

লাভ করিলে সকল ক্ষুধা দূরে যায়, ধর্ম্মে নিষ্ঠা থাকিলে ক্রমে ক্রমে তাহার পরিচয় পাইয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে। চল, আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছি। তোমার পত্নীকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া তাঁহার সহিত তোমাকে মিলিত করিয়া দিয়া আসিতেছি। এই বলিয়া শান্তোবা ব্রাহ্মণকে লইয়া তাঁহার আবাসে গমন করিলেন এবং তাঁহার পত্নীর সহিত বিবাদ মিটাইয়া দিয়া চলিয়া আসিলেন। আসিবার সময় ব্রাহ্মণকে শেষ কথা বলিয়া আসিলেন,—দেখ, সাবধান, তুমি আর যেন সহধর্ম্মিণীর সহিত অকারণ বচসা করিওনা। শ্রীহরির কৃপায় তোমাদের সংসার শান্তিময় হউক।

পতি-পত্নী ভক্তিভরে শান্তোবার শ্রীচরণে প্রণত হইলেন। পতিব্রতা পরমাদরে পেটুক পতিকে আহার করাইলেন। তাঁহার ধড়ে যেন প্রাণ আসিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—বাপ নাকে খৎ, বৈরাগ্যের নাম আর কখনও মুখে আনিব না;—অন্তত পোড়া পেটের জ্বালাটাকে যতদিন জয় করিতে না পারি।

(৭)

পণ্ঢারপুর সে দেশে প্রসিদ্ধ তীর্থ—ভূস্বর্গ বলিয়া বিখ্যাত। শ্রীএকাদশীর দিন সেখানে মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হয়। শত শত—সহস্র সহস্র—কখনও বা লক্ষ লক্ষ ভক্তমণ্ডলী সমবেত হইয়া ভগবানের নামসংকীর্ত্তনে উন্মত্ত হইয়া উঠেন। শান্তোবার ইচ্ছা হইল, তিনি পণ্ঢারপুরে থাকিয়া কিছুদিন সেই আনন্দ উপভোগ করেন। তিনি তাঁহার পত্নী এবং কয়েকজন ভক্ত ব্রাহ্মণকে সঙ্গে

লইয়া বিবিধ বাদ্য সহযোগে শ্রীহরির নাম-গানে শুষ্ক-মরুময়-সংসারে স্বর্গীয় সুধা ঢালিতে-ঢালিতে সেই পার্ব্বত্য আশ্রম হইতে চলিতে লাগিলেন। এইরূপ নামসুধা বিলাইতে-বিলাইতে তাঁহারা নরসিংহ-পুরম্ নামক গ্রামে আসিয়া পৌছিলেন। সে দিন দশমী তিথি। রাত্রি-কাল। পণ্ঢারপুর ও নরসিংহপুরম্ উভয়ের মধ্যে এক নদীর ব্যবধান। প্রবল বর্ষায় নদীতে বন্যা আসিয়াছে। তরঙ্গ-আবর্ত্তে তৃণখণ্ডও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। নৌকা নাই, নাবিক নাই। এক সন্তরণ ভিন্ন পারে যাইবার অন্য উপায় নাই। নদীর বিভীষিকা-ময়ী মুর্ত্তি দেখিয়া সহজে তাহার কাছে যাইতেও সাহস হয় না। অথচ রাতি পোহাইলেই একাদশী। প্রাতেই পণ্ঢারপুরে গিয়া বিঠ্ঠলদেবের পূজা করা চাই। সুতরাং তখনই নদী পার হইতে হয়। শান্তোবা দেখিলেন,—তাঁহার সঙ্গিগণ তরঙ্গিণীর তরঙ্গভঙ্গ দর্শনে বড়ই বিচলিত হইয়াছেন! তিনি তাঁহাদিগকে সাহসের ভাষায় উচ্চকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন,—তোমরা কি এই ক্ষুদ্র নদীর দুইটা ক্ষুদ্র তরঙ্গ দেখিয়া ভীত চকিত হইয়াছ? যাঁহার নাম লইলে অপার ভববারিধি গোষ্পদ-তুচ্ছ হইয়া যায়, আমাদের সেই সর্ব্ববলে বলীয়ান ভগবান্ শ্রীহরি থাকিতে কি এই সামান্য নদী-পারের চিন্তা করিতে হইবে? চিন্তা ছাড়,— চিন্তা ছাড়,—সকল চিন্তা সেই চিন্তামণিময় করিয়া লও। মুখে তাঁহারই নাম লও, আর এস, আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অগ্রসর হও। বাঁচা-মরার কথা ভাবিও না, সে ভাবনা যিনি ভাবিবার তিনিই ভাবিবেন। এস আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া এস,—হরিনামের উচ্চরোলে নদীর

জল গগনমণ্ডল কাঁপাইয়া তোল। এই বলিয়া শান্তোবা হরিহরি-ধ্বনি করিয়া নির্ভয়ে জলে নামিলেন। তাঁহার স্ত্রী ও ব্রাহ্মণগণও সমস্বরে হরিহরি বলিয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন! কাহারও প্রাণে ভয় নাই। সকলেই আত্ম-বিস্মৃত। সকলেই কি-এক আনন্দে উৎফুল্ল। হইবারই কথা। আনন্দময় হরি যে তখন সকলেরই অন্তর জুড়িয়া। তাঁহাদের সেই উচ্চকণ্ঠের হরিনাম নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে, তীর-তরুর পত্রে পত্রে, নভস্থলীর নক্ষত্রে নক্ষত্রে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নামময়—হরিময়! যে নাম, সে-ই নামী। নামের আগমনে নামীর আগমন হইল। নামের দয়ায় নামীর দয়া হইল। দেখিতে-দেখিতে নদীর অতলজল একহাঁটু হইয়া গেল। পার হইতে আর কাহাকেও ক্লেশ পাইতে হইল না। সুদৃঢ় বিশ্বাস করিতে পারিলে এইরূপ হয় বটে? বিশ্বাস-তো সহজ নয়। সেই গভীর অন্ধকার রাত্রে, সেই তরঙ্গ-সমাকুলা ভীষণা নদী। প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া, এক নামের বল ধরিয়া তাহাতে আত্মসমর্পণ করা কি সহজ? এ বিশ্বাস কি সহজ বিশ্বাস?

নদীর পরপারে গমন করিয়া তাঁহারা পরমানন্দে ভজন-গান জুড়িয়া দিলেন। তাঁহাদের সেই ভৈরবরাগের প্রভাতী-সঙ্গীতে চারিদিকটা যেন কি-এক মাদকভাব মাখানো হইয়া গেল! সে গান যাহার কর্ণে প্রবেশ করিল, তাহার ভিতরের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলেও চোখের কোলের ঘুমের ঘোর যেন আরও ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। দেখিতে-দেখিতে পূর্ব্ব-গগনে অরুণদেবের উদয় হইল।

পাখী সব ডাকিয়া উঠিল। তারাও যেন ভৈরব-রাগে ভজন-গান ধরিল। শান্তোবা সপরিকরে চন্দ্রাবতী (চন্দ্রভাগা ?)- নদীর পবিত্র জলে যাইয়া অবগাহন করিলেন। সকলেরই দেহ-মন পবিত্র হইয়া গেল। পবিত্র বসন পরিধান পূর্ব্বক তাঁহারা দেবমন্দিরে গমন করিলেন। প্রথমেই পুণ্ডলীক বা পুণ্ডরীককে পূজা করিয়া তৎপরে সকলে পাণ্ডুরঙ্গ বা বিঠ্ঠলদেবের পাদপদ্মে প্রণত হইলেন। ভগবান্ শ্রীহরি এই পুণ্ডলীককে বরদান করিবার জন্যই পাণ্ডু-রঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তাই তাঁহার পূজা সর্ব্বাগ্রে। তাঁহার শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে বারবার দণ্ডবৎ প্রণাম করেন, গড়াগড়ি দেন, কত স্তবস্তুতি পড়েন, হাসেন কাঁদেন চীৎকার করিয়া উঠেন, বাহু তুলিয়া গীতিনৃত্য করিতে থাকেন,—সে আনন্দ-উল্লাস দেখে কে ?

এইরূপে কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। শান্তোবা অন্তরে-অন্তরে এতদিন যাঁহার আরাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন, আজ বাহিরে তাঁহাকেই বিঠ্ঠলরূপে বিরাজিত দেখিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। বারবার শ্রীমূর্ত্তিকে দেখেন আর ভাবেন,—হায় প্রভু! এতদিনে দেখা দিলে,—এতদিনে কি অধম ব'লে মনে হ'ল ? কৃপাময়! তোমার কৃপাশক্তির জয় হউক — জয় হউক! শান্তোবার জিহ্বা এইবার প্রভুর মহিমা গাহিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল; কিন্তু তাহার কেবল ব্যাকুলতাই সার; সে কিছু বলিতে পারিল না। কণ্ঠ যে পূর্ব্ব হইতেই গদগদে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। শান্তোবা কাঁদিয়াই অস্থির; চোখের জল

আর থামে না, জলে জলে চক্ষের দ্বারও বন্ধ হইয়া গেল। তিনি সেই বোঁজা-চোখেই দেখিলেন,—বিঠ্‌ঠলদেব তাঁহার সকল ইন্দ্রিয় সকল মন সকল প্রাণ জুড়িয়া বসিয়া আছেন। তিনি প্রাণেপ্রাণেই প্রার্থনা জানাইলেন,—প্রিয়তম! আমি তোমারই তরে সর্ব্বত্যাগী, দেখো যেন ভুলোনা, চরণে স্থান দিয়া আবার যেন চরণচ্যুত ক'রো না। ওহে ও শ্যামল-সুন্দর! তোমার মহিমার সীমা নাই পার নাই। অনন্তদেব সহস্র-বদনে গান করিয়াও অদ্যাবধি তাহার অন্ত পাইলেন না, তখন আমরা আর তাহার কি বুঝিব বল? তোমার মহিমার গুণেই শান্তোবা গৃহত্যাগী,—তোমার মহিমার গুণেই শান্তোবা পর্ব্বতবাসী,—তোমার মহিমার গুণেই শান্তোবা বৎসপদের মত এই ভীষণ নদীর পারে আগমনে সমর্থ,—আর তোমার মহিমার গুণেই শান্তোবা আজ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি তোমাকে পাইয়া কৃতার্থ। হায় প্রভু! তোমার মহিমার গুণেই কি শান্তোবা তোমার চরণ-কমলের চির-অনুচর হইয়া থাকিতে পারিবে না? তাই কর নাথ! তাই কর। আর কিছু প্রার্থনা করি না,—তাই কর নাথ! তাই কর।—তোমার একান্ত আশ্রিত শান্তোবাকে তোমার চরণের চির-অনুচর করিয়া রাখিয়া দাও।

প্রাণনায়ককে এইরূপ প্রাণের কথা জানাইতে-জানাইতে শান্তোবার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখিলেন,—বিঠ্‌ঠলদেব দুইটি হাত কোমরে দিয়া অপূর্ব্ব ভঙ্গী ধরিয়া তাঁহার হৃদয়-মন্দিরে দাঁড়ায়ে আছেন, আর হাসি-হাসি মুখে বলিতেছেন,—প্রিয়তম! থাক-থাক তুমি এইখানেই

থাক, তোমাকে পাইয়া আজ আমার আনন্দ আর ধরে না। এখানে থাকিয়া তুমি এই আনন্দ আস্বাদন কর। আমিও দেখিয়া সুখী হই।

শ্রীহরির আদেশে শান্তোবা পত্নীসহিত সেই পণ্ঢারপুরেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার দয়া-বিগলিত আলুথালু ভাব,—নাম-গানে অসাধারণ অনুরাগ দর্শনে অনেকেই তাঁহার অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। মহৎসঙ্গের অব্যর্থ ফলে অনেকেই আপন জীবন মধুময় করিয়া তুলিলেন।

জগন্নাথ দাস

জগন্নাথদাস জাতিতে ব্রাহ্মণ। নিবাস পুরুষোত্তমধামে। তিনি একজন অতীব শিষ্টস্বভাব জ্ঞানবান্ পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। অকপট ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রভাবে নিরানন্দ কাহাকে বলে জানিতেন না, কিন্তু তাঁহার একমাত্র বিষম ভয়—এই ঘোরতর সংসার কিরূপে পার হইব। তিনি দিন নাই রাত্রি নাই কেবল ওই কথাই আলোচনা করেন, আর মনেমনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন,—প্রভু হে, এই অপার ভব-পারাবার পার হইবার কাণ্ডারী তুমি—কৃপা করিয়া তুমি পার না করিলে এ অধম জীবের নিস্তারের উপায় আর নাই। নাথ! আমি তোমার ঐ চরণে শরণাগত, আমায় নিজগুণে উদ্ধার কর,—ভজনহীনে বিমল ভজন শিখাইয়া আত্মসাৎ কর।

এইরূপে কিছুদিন যায়, একদিন শয়নের সময় জগন্নাথদাস শ্রীহরির পাদপদ্মে মনেমনে প্রার্থনা জানাইলেন,—প্রভু হে! তুমি আমার প্রতি কিঞ্চিৎ করুণা বিস্তার কর,—ভক্তি না দাও—প্রেম না দাও—তোমার মহিমা আমাকে কিঞ্চিৎ দেখাও, তাহা হইলেই আমি আরও অধিকতর বিশ্বাসের সহিত তোমার ভজন করিতে পারিব। দয়াময়! আমি তোমার একান্ত অনুগত। দীনবন্ধু! তুমি ভিন্ন আর আমার কেহই নাই। আমি প্রাণের কথা তোমায় জানাইলাম, এখন তোমার যাহা ইচ্ছা। এইরূপ

বলিতে-বলিতে,—চিত্তে চিন্তামণির চরণ চিন্তা করিতে-করিতে জগন্নাথদাস নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। নারায়ণ তাহা জানিলেন। শরণাগতের অভয়দাতা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তখনই তিনি দাসের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চতুর্ভুজে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম। মস্তকে উজ্জ্বল কিরীট। কর্ণে মকরকুণ্ডল দোদুল্যমান। পরিধানে পীতবসন। অঙ্গে অঙ্গে নানা আভরণ। অধরে মধুর হাস্য। তিনি মেঘ-নির্ঘোষে বলিলেন,—প্রিয়তম! তোমার এত চিন্তা কেন? তুমি যখন আমাকে একান্ত ভাবে আশ্রয় করিয়াছ, তখন আর তোমার ভয়-ভাবনা কিসের? এই এস আমি তোমায় দীক্ষা দান করিতেছি—ইহাতে তুমি উদ্ধার লাভ করিবে। সকল শাস্ত্রের মধ্যে সার একাক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ এই প্রণবমন্ত্র তোমাকে দান করিলাম, গ্রহণ কর। এই মন্ত্রই 'ভাগবত' নাম দিয়া আমি অনন্তকে দান করিয়াছিলাম। তিনি ব্রহ্মাকে দান করেন। বিধাতা বহুদিন অন্তরে অন্তরে জপ করিয়া এই মন্ত্রই চতুঃশ্লোকীরূপে প্রকাশ করেন। তিনি আবার নরনারায়ণকে তাহা উপদেশ করিলেন। নরনারায়ণ তাহাকে দশটি শ্লোকে বিস্তৃত করিয়া নারদ-মুনিকে কহিলেন। নারদ আবার শত শ্লোকে পরিণত করিয়া বেদব্যাসের অগ্রে কীর্ত্তন করিলেন। তিনি আঠার হাজার শ্লোকে বিস্তার করিয়া আপন পুত্র শুকদেবকে শিখাইলেন। তিনি আবার অগণিত মুনি-ঋষির সমাজে প্রায়োপবিষ্ট মহারাজ পরীক্ষিতের সমীপে তাহা কীর্ত্তন করিলেন। তাহাতেই মহারাজ পরীক্ষিত এই ভীষণ ভবসাগরের পারে গমন করিয়া পরম-কারণ আমাকে

প্রাপ্ত হইলেন। এই মহাপুরাণ ভাগবতই ভবসাগরের পারে যাইবার একমাত্র পরম উপায়। তুমি প্রাকৃতবন্ধে এই পুরাণের গীতি রচনা কর; আপনি নিশ্চয় পবিত্র হইবে, অশেষ প্রাণীকেও পবিত্র করিবে। তোমার এই ভাগবত যে একবার কর্ণে শ্রবণ করিবে, সে তৎক্ষণাৎ পবিত্র হইয়া যাইবে। নাও, তুমি আর বিলম্ব করিও না; কার্য্য আরম্ভ করিয়া দাও,—জগতের মঙ্গল করিয়া পরম মঙ্গলের অধিকারী হও। জগন্নাথদাস প্রভুর শ্রীমুখের এই আজ্ঞা পাইয়া—স্বপনেই তাঁহাকে জানাইলেন,—দয়াময়! আমি মহামূর্খ, তোমার এ আদেশ কিরূপে প্রতিপালন করিব? যে ভাগবতের মহিমা মহানুভব মুনিগণের অগোচর, তাহার তত্ত্ব আমি কি প্রকারে প্রাকৃতবন্ধে প্রকাশ করিব? শুনিয়া ভগবান বলিলেন,—প্রিয়তম! তুমি কিছুমাত্র চিন্তা করিও না। ভীতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক গীতিরচনায় প্রবৃত্ত হও, —আমি তোমার হৃদয়কমলে বসিয়া যাহা যাহা বলিয়া দিব, তাহাই পত্রের উপর ছত্রেছত্রে লিখিয়া যাও। প্রফুল্ল-মুখে এই বলিয়া শ্রীহরি অন্তর্হিত হইলেন। এমন সময় জগন্নাথদাসেরও নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন। প্রভুর সাক্ষাৎ কৃপা লাভ করিয়া তাঁহার আর আনন্দ ধরে না। অন্তর-বাহির আনন্দে গরগর। তখনই তিনি লেখনী-পত্র লইয়া লিখিতে বসিলেন। লিখিবেন কি; অশ্রু প্রবাহে নয়ন অবরুদ্ধ;—বাহিরের কিছু দেখিতেই পাইলেন না। অন্তরের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন,—অন্তরবিহারীর দিব্য মূর্ত্তি তথায় দেদীপ্যমান। এইবার তাঁহার সকল

ইন্দ্রিয়ের দ্বারে কবাট পড়িয়া গেল। তিনি যাঁহাকে দেখিবার,—সকল ইন্দ্রিয় দিয়া—মন দিয়া—প্রাণ দিয়া তাঁহাকেই দেখিতে লাগিলেন। এদিকে ছত্রেছত্রে পত্রকলেবর পূর্ণ করিয়া তাঁহার লেখনী অবিরামগতি চলিতে লাগিল। কত পল মুহূর্ত্ত প্রহর দিন পক্ষ মাস বা বৎসর অতিক্রান্ত হইল, কেহ জানে না,—স্বয়ং লেখক জগন্নাসদাসও তাহা জানেন না, ফলে অষ্টাদশসহস্র-শ্লোকাত্মক শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণের পরম রমণীয় ভাষা-গীতি বিরচিত হইয়া গেল। এইবার জগন্নাথদাস অন্তর হইতে অন্তরিত হইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলেন। চাহিয়া দেখেন,—কি অদ্ভুত কি অদ্ভুত, অহো, সম্পূর্ণ দ্বাদশ স্কন্ধেরই ভাষানুবাদ হইয়া গিয়াছে! কি অদ্ভুত কি অদ্ভুত,—অহো, কঠিন কঠিন—অতি কঠিন স্থলেরও প্রাঞ্জল কোমল-কান্ত পদাবলী রচিত হইয়া গিয়াছে! তবে আর কেন,—যাই, প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করি,—এই শ্রবণমঙ্গল ভাগবতগীতি গান করিয়া জীবের পাপ-তাপ বিনাশ করিয়া বেড়াই।

জগন্নাথদাস ভাগবত গান করিয়া দেশেদেশে ঘুরিয়া বেড়ান। সে গান শুনিয়া মানবের কথা কি,—পশু পক্ষীও ভুলিয়া যাইতে লাগিল। ভুলিবারই কথা বটে,—সামান্য অর্থ বা ধনের লালসায় যাহারা গান করিয়া থাকে, তাহাদেরই গ্রাম্য-গীতি যখন এত মিষ্ট লাগে, তখন একমাত্র পরমার্থ লক্ষ্য করিয়া—জীবের কল্যাণ কামনা করিয়া, সেই জগতের নাথ জগন্নাথকে জগন্নাথদাস যে অপ্রাকৃত ভাগবত-গীতি শ্রবণ করাইতেছেন, তাহা সুধা-সুমধুর

না হইবে কেন ? সে গানে নিখিল প্রাণীর প্রাণে কাণে সুধাধারা ঢালিয়া না দিবে কেন ? তরুর মূলে জল নিষেচন করিলে, বৃক্ষের স্কন্ধ শাখা পত্র পুষ্প ফল বল্কল সকলই প্রীতিলাভ করে। জগন্নাথদাস সেই বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীহরির পাদমূলে যে গীতি-সুধা ঢালিয়া দিতেছেন, তাহাতে বিশ্ববাসী কেন না প্রীতিলাভ করিবে ?

রমণীগণ কিছু অধিক গীতি-প্রিয়। তাঁহারা জগন্নাথের গানে কিছু বেশীবেশী বিমোহিত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। পথ দিয়া জগন্নাথদাস ভাগবত-গীতি গাহিতে গাহিতে চলিয়াছেন। তাঁহার শরীর পুলকিত। নয়ন অশ্রুসিক্ত। অঙ্গেঅঙ্গে ভাব-তরঙ্গ। শিশুর দল মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার মুখ-পানে তাকাইয়া অবাক হইয়া চলিয়াছে। বড়বড়-ঘরের রমণীগণ তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেই লজ্জা-সরম ছাড়িয়া বাহিরে ছুটিয়া আসেন, তাঁহাকে আদর করিয়া অন্দরের মধ্যে লইয়া যান, সকলে মণ্ডলীবদ্ধ হইয়া ঘিরিয়া বসেন, আর যেন কত আত্মীয়ের মত তাঁহার কাছে শ্রীকৃষ্ণের নানা লীলার গান শুনিবার আবদার করেন। জগন্নাথ-দাসও ভাবে বিভোর হইয়া বিষয়-বিষের মহৌষধি—পদে-পদে সুধার নদী ভাগবতগীতি-সুধায় তাঁহাদিগকে অভিষিক্ত করিতে থাকেন। সেই অশেষ জন্মের পাপহারিণী হরিলীলা শ্রবণ করিয়া নারীবৃন্দ পরম আনন্দ লাভ করেন। অনেক ধন-রত্ন বসন-ভূষণ দিয়া বিনয়-বচনে তাঁহাকে বলেন,—ওগো, তুমি প্রতিদিন আমাদের আবাসে একবার করিয়া আসিও,—শ্রীকৃষ্ণের মধুরমধুর লীলা-গান শুনাইয়া পবিত্র করিয়া যাইও।

জগন্নাথদাসের গোবিন্দগীতি শ্রবণের জন্য সকলের এতই আগ্রহ,—কিন্তু বিধাতার স্বতন্ত্র সৃষ্টি খলজনের তাহা ভাল লাগে না। জগন্নাথদাসের আদরযত্নটা যেন তাহাদের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিল। তাঁহার অযথা কুৎসা প্রচারের জন্য তাহাদের জিহ্বাগুলি নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। পরের প্রশংসার পরিবর্ত্তে নিন্দা প্রচার করাই যে তাহাদের স্বভাব,—উৎকৃষ্ট বস্তুকে অপকৃষ্ট বলিয়া পরিচিত করাই যে তাহাদের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম্ম।—

"কাক-চাণ্ডাল যেউঁ পরি। উত্তম দ্রব্য ভ্রষ্ট করি॥
শ্বান-চাণ্ডাল যেহ্নে দাণ্ডে। ধাইঁণ বাউথান্তি চাণ্ডে॥
দেখিলে তুলসীবৃক্ষরে। চরণ টেকি মূত্র করে॥
মূষিক যেহ্নে দিব্য বাস। দন্তে কাটিণ করে নাশ॥
কিঞ্চিতে ন করে আহার। নাশিবা কথা মূল তার॥
সেহি প্রকারে মূঢ় নরে। দোষ দিঅন্তি সাধুঠারে॥

উত্তম সামগ্রী নষ্ট করাই কাকের কার্য্য। তুলসীবৃক্ষ দেখিলে দৌড়িয়া গিয়া তাহার অঙ্গে মূত্র ত্যাগ করাই কুক্কুরের ধর্ম্ম। দিব্য বস্ত্র দন্তে করিয়া কাটিয়া নষ্ট করাই মূষিকের ব্যবহার। সেই প্রকার সাধুর দোষ উদ্ঘাটন করাই জ্ঞানহীন খলের একমাত্র অনুষ্ঠান।

জগন্নাথদাসের এই অন্দরমহলের আদর ব্যাপারটা খলের দল কল্পনার তুলিকায় অতিরঞ্জিত করিয়া মহারাজ প্রতাপরুদ্রের গোচরে আনয়ন করিল। বলিল,—মহারাজ! দেখুন—আপনার এই পুণ্যক্ষেত্রে কি অপবিত্র অনুষ্ঠানই আরম্ভ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ জগন্নাথদাস ছাপা তিলক মালা ধরিয়া কপট-ব্রহ্মচারীর বেশে

অনেক স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করিতেছে। সে কক্ষে একখানি পুস্তক রাখিয়া সকল ঠাঁই ঘুরিয়া-ঘুরিয়া বেড়ায়। যেখানে রমণীবৃন্দ দেখিতে পায়, আনন্দ মনে সেইখানেই বসিয়া সেই পুস্তক হইতে গান গাহিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। মাথা নাড়িয়া—হস্ত ঘুরাইয়া তাহার সেই গানের নানামত ব্যাখ্যারই বা বাহার দেখে কে? সরলা অবলাগণ তাহার সেই গানের ফাঁদে পড়িয়া যায়, আর নানা প্রকারে তাহার সেবা করিতে আরম্ভ করিযা দেয়। বুঝি বা পতিকেও তাহারা এত সেবা করে না। মহারাজ, আমাদের কথা সত্য কি মিথ্যা, দূত প্রেরণ করিলেই আপনি সকলি জানিতে পারিবেন।

এই কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতি অতিশয় কুপিত হইলেন। দূতের প্রতি আদেশ দিলেন,—যাও, শীঘ্র যাও, সত্বর জগন্নাথ-দাসকে ধরিয়া লইয়া আইস। ব্যাপারখানা একবার আমাকে বুঝিয়া দেখিতে হইতেছে। রাজার আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্রেই দিকে-দিকে দূতের দল ধাবিত হইল। দেখিতে-দেখিতে জগন্নাথদাসকে ধরিয়া আনিয়া নৃপতির সম্মুখে হাজির করিল। নরনাথ তাঁহাকে দেখিয়াই কোপস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—হাঁ হে জগন্নাথদাস, এ তোমার কিরূপ আচরণ? তুমি নাকি পুরুষ-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী-সমাজে গান গাহিয়া বেড়াও? তুমি নাকি দিবা-রাত্রি রমণী-সঙ্গে অবস্থান কর? বল, সত্য করিয়া বল, এ কথা সত্য কি না?

নৃপতির কথা শুনিয়া জগন্নাথদাস একবার নয়ন মুদিয়া চিত্তে চিন্তামণির চরণ চিন্তা করিলেন, তার পর বলিলেন,

—মহারাজ, খলের বচন শ্রবণ করিয়া নিরপরাধের নিগ্রহ করা রাজার ধর্ম্ম নহে। আমার অন্তরের ভাব আপনার নিকট ব্যক্ত করিয়া বলি, শ্রবণ করুন। মহারাজ! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র কিংবা অন্ত্যজ জাতি, যে কেহ আমাকে আদর করিয়া ডাকে, আমি তাহারি কাছে বসিয়া ভাগবত গান করিয়া থাকি। তা স্ত্রী নাই পুরুষ নাই, বালক নাই বৃদ্ধও নাই। দণ্ডধারি! আমি ব্রহ্মচারী। আমি পুরুষের কাছে পুরুষ, রমণীর কাছে রমণী। তাই শ্রীহরির কৃপায় আমার কোন সঙ্গে ভয় করিবার কিছুই নাই।

জগন্নাথের কথা শুনিয়া নৃপতির শরীর ক্রোধভরে থরথর কাঁপিয়া উঠিল। তিনি দন্তে অধর চাপিয়া, রোষভরে বলিয়া উঠিলেন,—হাঁহে হাঁ—খুব পাকা পাকা কথা কয়টা বলিয়া ফেলিলে বটে, কিন্তু তোমার এ কথায় বিশ্বাস করি কি প্রকারে? তুমি যদি পুরুষের কাছে পুরুষ, রমণীর কাছে রমণী, তবে কই তোমার রমণীর স্বরূপটা একবার আমাদের দেখাও দেখি? যদি দেখাইতে পার উত্তম, না পার বিপ্র-টিপ্র মানিব না,—সমুচিত দণ্ড দান করিব। প্রহরিগণ! যাও শীঘ্র এই কপটীরে লইয়া কারাগারে রাখিয়া দাও। এই বলিয়া নৃপতি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। প্রহরিগণও সাধু জগন্নাথ দাসকে লইয়া বন্দিশালায় বদ্ধ করিয়া রাখিল।

সাধুর স্বর্গ নরক সকলই সমান। সকল স্থানেই তাঁহার হৃদয়ে-হৃদয়ে হৃদয়েশ্বরের সুখদ সঙ্গ। তাই বন্দিগৃহেও

জগন্নাথদাসের আনন্দের অসদ্ভাব নাই; তিনি পরমানন্দে সেই আনন্দকন্দ নন্দনন্দনের পদদ্বন্দ্ব ধ্যান করিতে লাগিলেন। তিনি আপন মনে মনের ঠাকুরকে কত কথাই বলেন। কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন। কখনও উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করেন। কখনও দুবাহু তুলিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে থাকেন। কখনও বা নিবাত-নিষ্কম্পদীপের ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করেন। আবার কখনও বা একান্ত আর্ত্তের ন্যায় কাতর-স্বরে প্রভুর করুণা ভিক্ষা করেন। বলেন,—গোপীনাথ! আমায় রক্ষা কর। আমার জন্য আমাকে রক্ষা করিতে বলি না, —তোমার ভক্তের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য আমায় রক্ষা কর। তুমি দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছ। আমারও লজ্জা,— শুধু আমার নয় তোমার ভক্ত-জগতের লজ্জা নিবারণ কর। তুমি আমার পুরুষস্বরূপ ঘুচাইয়া দিয়া স্ত্রীস্বরূপ করিয়া দাও; তা দেখিয়া প্রতাপরুদ্র নরপতি লজ্জায় মস্তক অবনত করুক, আর খলের মুখে চুণ-কালী পড়ুক। প্রভু হে, তুমি মূর্খের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া সাধুর মহিমা প্রকাশ কর।

প্রাণনাথকে এইরূপ কত কথা বলিতে-বলিতে জগন্নাথদাস ঘুমাইয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রাণনাথও অমনি সেই বন্দিঘরে আসিয়া তাঁহার মস্তকে অভয়-পাদপদ্ম অর্পণ করিয়া কহিলেন,— জগন্নাথ, প্রিয়তম, তুমি কি ভীত হইয়াছ? আমি যাহার সহায়, সামান্য এ রাজ্যের রাজার কথা কি, তাহার ভয় করিবার কোথাও কিছু আছে কি? এই দেখ, আমার হস্তের দিকে চাহিয়া দেখ, এই তেজোদীপ্ত সুদর্শন দর্শন কর। ইহাকে তোমাদের ভয় দূর

করিবার জন্যই রাখিয়াছি। ছার প্রতাপরুদ্র, তাহাকে আবার ভয় কিসের? তোমার যখন রমণীর স্বরূপ ধারণ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে,—তাহা সিদ্ধ হইবে। আমার ত আর স্বতন্ত্র কিছু ইচ্ছা নাই,—তোমাদের ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। তোমরাই আমার 'স্ব'—আপন জন। তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করি বলিয়াই আমি 'স্বেচ্ছাময়'। ভাল, তোমার যখন ইচ্ছা হইয়াছে, তখন তোমার নরতনু যাইয়া নারীতনু হউক। এই বলিয়া অন্তর্য্যামী অন্তর্হিত হইলেন। দাসেরও নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি মনেমনে ভাবিলেন,—শরণাগতবৎসল শ্রীহরি আমার বিপত্তি দেখিয়া নিশ্চয় করুণা করিয়া গিয়াছেন। আহা, তাঁহার শ্রীচরণের অমিয়ময় স্পর্শ যেন এখনও অনুভব করিতেছি! কই,—দেখি, আমার পুরুষমূর্ত্তির কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিনা? তাহা হইলে প্রকৃত বুঝা যাইবে, ইহা প্রভুর করুণালীলা, কি স্বপ্নের খেলা। মনেমনে এইরূপ বলিয়া জগন্নাথদাস আপনার দেহের দিকে চাহিয়া দেখেন,—অহো, কি বিচিত্র কি বিচিত্র, এ যে কমনীয় কামিনী-মূর্ত্তি! আনন্দ-বিস্ময়ে তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন। কৃতজ্ঞতায় অন্তর ভরিয়া গেল। মনেমনে ভাবেন,—অহো, শ্রীপ্রভুর পাদপদ্ম-স্পর্শে আমার জীবন ধন্য হইয়া গেল!—

"যেবণ পাদপদ্ম লাগি। অহল্যা হেলা মোক্ষভাগী॥
যেউঁ চরণ লাগি করি। কুব্‌জা হোইলা সুন্দরী॥
যেবণ পাদপদ্ম ভলে। ফণী-মণিকি চিত্র কলে॥
যেবণ পাদপদ্ম-বারি। শঙ্কর মউলিরে ধরি॥

সংসারে গঙ্গারূপে বহি। অশেষ প্রাণিঙ্কি তারই ॥
সে পাদপদ্মরজ পাই। পবিত্র হেলি আজি মুহিঁ ॥”

যে চরণকমল-স্পর্শে অহল্যার উদ্ধার, যে পাদপদ্মের সম্বন্ধে কুব্‌জা রূপসী, যে শ্রীচরণ-সরোজ-সংস্পর্শে কালীয়ের মস্তকমণি চিত্র-বিচিত্র, ত্রিভুবন-তারণকারী যে পাদপঙ্কজবারি শঙ্কর জটায় ধরিয়া গঙ্গাধর, অহো, আজ আমি সেই চরণরজের স্পর্শ পাইয়া পবিত্র হইলাম! আর আমার ভয় কি? আমার প্রভু তো অমিত বলে বলীয়ান্! এইবার যাই, একবার সকলকে প্রভুর প্রভাবটা দেখাইয়া দিই। এই বলিয়া তিনি আনন্দমনে রাম-কৃষ্ণ-হরি-নাম কীর্ত্তন করিতে-করিতে বন্দিমন্দিরের বাহিরে আসিলেন। রাজ-দূত ও প্রহরিগণকে ডাকিয়া বলিলেন,—চল, তোমাদের রাজার দরবারে চল, আমার স্ত্রীমূর্ত্তি দেখাইয়া তাঁহার কোপের শান্তি করিয়া আসি। দূত-দৌবারিকবৃন্দ এই আচম্বিত ব্যাপার দর্শনে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইয়া গেল এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নৃপতির নিকট উপস্থিত হইল। মহারাজ তাঁহার সেই কমনীয় কামিনীমূর্ত্তি—সেই রমণী-সুলভ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হাবভাব প্রভৃতি দর্শন করিয়া মহা বিস্মিত হইলেন। মনেমনে বলেন,—অহো, কি অতুলনা ললনামূর্ত্তি! এ মূর্ত্তি দেখিলে মুনি-ব্রহ্মচারীরও মন ভুলিয়া যায়। জগন্নাথদাস কেমন করিয়াই বা এমন মূর্ত্তি ধারণ করিল? এ নিশ্চয় সেই গোবিন্দেরই মায়া বলিতে হইবে।

এইরূপ বিচার করিয়া মহারাজের মনে একটু ভয় হইল;—তাই তো আমি কাজটা বড় ভাল করি নাই। পরে ভাবিলেন,

—ভাল, একবার ব্যাপারখানা বুঝাই যাউক। তিনি প্রকাশ্যে তাঁহাকে বলিলেন,—ওহে জগন্নাথদাস! তুমি তো খুব বুজরুকি জাহির করিয়াছ, দেখিতেছি। তা শুধু ও রমণীর মুর্ত্তিখানি দেখাইলে চলিতেছে না, কিছু স্বভাবের পরিচয়ও দিতে হইতেছে। না হ'লে বেশ বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।

নরনাথের কথা শুনিয়া জগন্নাথ একবার তাঁহার প্রাণনাথকে মনেমনে ভাবিয়া লইলেন, তারপর নৃপতির পানে নয়নকোণে চাহিয়া, ফিক্‌ফিক করিয়া শরমের হাসি হাসিয়া, অবনত-আননে কহিলেন,—মহারাজ! আমাকে আর কত পরীক্ষা করিবেন? এই দেখুন,—দেখাইতে লজ্জা হয়, এই আমার বসনের দিকে চাহিয়া দেখুন; কিছু দেখিতে পাইতেছেন কি?

জগন্নাথদাসের অদ্ভুত প্রভাব! দেখিতে-দেখিতে সর্ব্বজন-সমক্ষে তাঁহার বস্ত্র বিবর্ণ হইয়া গেল,—রমণীর ঋতুকালীন লক্ষণ প্রকাশ পাইল। দেখিয়া নৃপতি প্রভৃতি পরম বিস্মিত হইলেন। সভাসদ্‌গণ সকলেই বলিয়া উঠিলেন,—মহারাজ! আর পরীক্ষায় প্রয়োজন নাই। আমাদের মনের ভ্রম দূর হইয়াছে। জগন্নাথ-দাস নিশ্চয়ই সেই নীলাচলনাথ জগন্নাথের দাস। সাধু-অপরাধে অপরাধী হইলে সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে।

সকলের কথা শ্রবণ করিয়া মহারাজ জগন্নাথদাসের চরণে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন; বিনয়-বচনে ও বসন-ভূষণে তাঁহার প্রীতি সম্পাদন করিলেন এবং বলিলেন,—আপনি যদি আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন, তবে তাহার নিদর্শন স্বরূপ শ্রীমুখে

াগবতগীতি শুনাইতে আজ্ঞা হউক; আমার কর্ণ মন পবিত্র হউক, অশেষ জন্মের পাপতাপও বিনষ্ট হউক।

জগন্নাথদাস আনন্দমনে নৃপতির প্রার্থনা স্বীকার করিলেন। আচ্ছা, আমি স্নানাহ্নিক সারিয়া গান করিতেছি, বলিয়া পুষ্করিণীর জলে যাইয়া প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি জলমধ্যে গিয়া প্রাণনায়ককে প্রাণেপ্রাণে ডাকিলেন,—আবার পুরুষস্বরূপ প্রাপ্ত হইবার প্রার্থনা জানাইলেন। ভগবান্ যাঁহাদের হাতধরা, তাঁহাদের কোন্ প্রার্থনাটাই বা ভগবান্ অপূর্ণ রাখেন? ভগবানের কৃপায় তখনই জগন্নাথদাসের পুরুষস্বরূপ হইয়া গেল। তিনি স্নান সমাপন করিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে পুরুষমূর্ত্তিতে জল হইতে উঠিলেন। পূজা-আহ্নিকাদি সারিয়া রাজসভায় গিয়া তাঁহার সেই প্রাকৃত-ভাগবত গান করিতে লাগিলেন।

ভাগবত ভক্তিশাস্ত্র। ভক্তিই ভাগবতের প্রাণ। ভাগবতের ব্যাখ্যা বল, যাহা বল, সকলের মূলে ভক্তি চাই। জগন্নাথ সেই ভক্তি মাখাইয়া ভক্তিগ্রন্থ ভাগবত গান করিতে লাগিলেন। সে গানে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের হৃদয় দ্রবীভূত হইল, সভাজনের মনপ্রাণ গলিয়া গেল। আনন্দে-আনন্দে যেন সেই স্থানটা ছাইয়া ফেলিল। জগন্নাথের গান থামিয়া গেল। কিছুক্ষণ সকলে যেন কেমন এক-তর হইয়া—বাক্যহীন স্পন্দহীন হইয়া রহিলেন। তাহার পর নরনাথ আপন অঙ্গের সকল অলঙ্কার খুলিয়া জগন্নাথদাসের পদপ্রান্তে রাখিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক জড়িত-কণ্ঠে কহিলেন—প্রভু! আমি আজি হইতে আপনার শরণাগত, আমায়

মনে রাখিবেন। পরে তিনি চন্দ্রার্ক-নামক স্থানে গৃহ-সহিত ভূসম্পত্তি সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

জগন্নাথদাস হরিগুণ গান করিতে-করিতে চলিয়া গেলেন। এদিকে মহারাজ সেই দুষ্টবুদ্ধি সাধুনিন্দক খলের দলকে ডাকাইয়া আনিলেন। তাহাদের কাহাকে 'চাঙ্গে' চাপাইয়া (উচ্চমঞ্চ হইতে অস্ত্রের উপর ফেলিয়া দিয়া*), কাহাকে চাবুক-পেটা কাহাকে বা লাঠিপেটা করাইয়া রাজ্যের বাহির করাইয়া দিলেন। আর ঘোষণা করাইলেন যে, আজ হইতে আমার রাজ্যে যে কেহ সাধুর নিন্দা বা সাধুর দ্রোহ আচরণ করিবে, আমি তাহাকে সবংশে বিনাশ করিব।

প্রায় চারিশত বৎসর হইয়া গেল, জগন্নাথদাস নশ্বর শরীর ছাড়িয়া শাশ্বত ধামে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আজিও ৺পুরী-ধামে সমুদ্রকূলে শ্রীলহরিদাসঠাকুরের সমাধির অনতিদূরে তাঁহার সমাধিমন্দির বিরাজিত রহিয়াছে। আজিও তাঁহার ভাষা-ভাগবত উৎকলবাসীর গৃহেগৃহে গৃহদেবতার মত পূজিত, ইষ্টমন্ত্রের মত নিত্য আবর্ত্তিত—পঠিত, মুখেমুখে আলোচিত ও উদ্গীত হইতেছে। এই ভাষাভাগবত উৎকলদেশে উৎকল-লিপিতে মুদ্রিত হইয়াছে; মেদিনীপুরজেলায় কাঁথি হইতে বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে। এ ভাগবতের আদর দেশে-দেশে।

* শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ৯ম পরিচ্ছেদে এই চাঙ্গে-চাপানোর উল্লেখ আছে। যথা,—একদিন লোক আসি প্রভুরে নিবেদিল। গোপীনাথকে বড় জানা চাঙ্গে চঢ়াইল॥ তলে খড়্গ পাতি তার উপরে ডারি দিবে। প্রভু রক্ষা করেন যবে তবে নিস্তারিবে॥"

জগন্নাথদাসের সম্প্রদায়—বৈষ্ণব-সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় 'অতিবড়ী-সম্প্রদায়' বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভক্ত হইবেন—বিনয়ের খনি, দীনতার অবতার। ভক্ত প্রভুদত্ত শক্তিতে সর্ব্বসমর্থ হইলেও সে শক্তি গোপনে-গোপনেই রাখিবেন; কাহারও কাছে প্রচার করিবেন না। কেননা, তাহা প্রচার হইয়া পড়িলেই সর্ব্বনাশ! প্রতিষ্ঠার দায়ে তখন তিষ্ঠানো ভার; অভিমান আসিয়া গেলে তো আরও অধিক সর্ব্বনাশ। তাই শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর জন্য যখন রেমুণার শ্রীগোপীনাথ ক্ষীর চুরি করেন, তখন তিনি সেস্থান হইতে রাতারাতি পলাইয়া গিয়াছিলেন। পাছে কেউ টের পায়। জগন্নাথদাস কিন্তু রাজসভায় আপনার বড়াই দেখাইয়া আপনাকে জাহির করিয়াছিলেন। তাই বিশুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজে তিনি বা তাঁহার সম্প্রদায় 'অতিবড়ী' বলিয়া পরিচিত, কিছু অনাদৃতও বটেন।* ৺পুরীধামের উৎকলমঠ বা উড়িয়ামঠ এই অতিবড়ীসম্প্রদায়ের প্রধান স্থান। এই মঠের 'তোড়ানী' (আমানী) সে দেশে দুরারোগ্য রোগনাশের জন্য প্রসিদ্ধ। প্রবাদ,—অন্যূন আড়াই শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে এই 'তোড়ানী' অতি যত্নে ও অতি পবিত্রভাবে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

---

* কেহ কেহ বলেন,—'তিলকসেবাবিষয়ে শ্রীচৈতন্যপ্রভুর সহিত ইঁহার বাদানুবাদ হয়, তিনি প্রভুর মতে সম্মত হন নাই, এই জন্য প্রভু বলিয়াছিলেন,—তুমি অহঙ্কার পরবশ হইয়া আমার মতের অন্যথা করিলে, তুমি বড় লোক, ইত্যাদি। এই নিমিত্ত ঐ সম্প্রদায় 'অতিবড়ী বলিয়া বিখ্যাত হন।" এই মত ভ্রান্ত এবং ভিত্তিহীন।

গঙ্গাধর দাস

"না না, আমি আর কাহাকেও মুখ দেখাইব না, দেখাইব না।"

"কেন, কেন,—কি হ'য়েছে, কি হ'য়েছে ?"

"হবে আর কি ? আমি অভাগিনী, আমার মুখ কাহারও দেখিয়া কাজ নাই।"

"সুন্দরি ! আজ আমার প্রতি অকারণ এ অকরুণ সম্ভাষণ কেন ?"

"অকারণ আবার কি ?"

"কারণ থাকিলেও আমার তাহা জানা নাই। শুনিতে পাই না কি ?"

"জানা থাকিবে না কেন ? ব'লে ব'লে আমার মুখ যে ভোঁতা হ'য়ে গেছে।"

"ভাল, আর একবার না হয় ব'ল্লে। সত্য বলিতেছি সতি, আমার কিছুই মনে পড়ে না।"

"না, আমি আর বলিতেও চাই না, মুখ দেখাইতেও চাই না।"

এই বলিয়া শ্রী ভাল করিয়া মুড়ি-সুড়ি দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া কেবল বলিল,—হুঁঃ, আমার কথা মনে পড়িবে কেন ?

পত্নীর অবস্থা দেখিয়া গঙ্গাধর বড় চিন্তাতেই পড়িয়া গেল। আহা,.বেচারি সারাদিন খাটাখাটুনীর পর পতিব্রতার দুইটা মধু-মাখা কথা শুনিয়া প্রাণটা ঠাণ্ডা করিতে আসিয়াছিল, ভাগ্য-দোষে আজ তাহার—"অমৃত গরল ভেল"—অমৃত গরল হইয়া গেল!

গঙ্গাধর গরীব গৃহস্থ। জাতিতে বেণিয়া। শুঁট পিপুল প্রভৃতি কটু দ্রব্য ফিরি করিয়া বিক্রয় করাই তাহার বৃত্তি। সংসারে এক পত্নী ছাড়া কেহই নাই। পুত্র কন্যা হয় নাই, হইবার বয়সও নাই। তজ্জন্য তাহারা তত ভাবে না। ভাবে কেবল ভাবে-ভাবে ভগবান্‌কে। পতিপত্নী উভয়েরই উভয়ে সমান প্রীতি—উভয়েরই উভয়ে আজ্ঞানুবর্ত্তী। সুতরাং গরীব হইলেও সুখেরই সংসার। সে সংসারে অতিথিসেবা আছে, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেওয়া আছে, বিপন্নকে যথাসাধ্য সাহায্য করাও আছে। আজ সেই সুখময় শান্তিময় সংসারে সহসা বচসার ভাষা কি প্রকারে প্রবেশ লাভ করিল,—সুধা-ঢলঢল সুধাকরের মধ্যভাগে কালকূটের কালান্তক কটুতা কি করিয়া প্রবিষ্ট হইল, ভাবিয়া গঙ্গাধর বড় অধীর হইয়া উঠিল।

গঙ্গাধর কি করে, সে অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্থির করিল, কে বা কাহারা তাহার পত্নীর অন্তরে দারুণ ব্যথা দান করিয়াছে; এ কটূক্তি সেই ব্যথারই অভিব্যক্তি। নচেৎ স্বভাব-সরলা স্ত্রীর হৃদয়ে এ গরলভরা ভাব আসিবে কেন? গঙ্গাধর নানা অনুনয়ে তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিল,—স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিল যে যদি সর্ব্বস্ব

যায় তাহাও স্বীকার, তথাপি তোমার অন্তরের ব্যথা অন্তর্হিত করিবই করিব।

এইবার শ্রী পতিদেবতার পদতলে মস্তক অবলুণ্ঠিত করিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিতে লাগিল,—স্বামি গুরু দেবতা! এ অভাগিনীর অপরাধ লইও না। এ পাপীয়সীর তা'হ'লে আর নিস্তার নাই। নাথ! কত মহাপাতকের ফলে অপুত্রপ্রসবিনী রমণী হইতে হয়, জানি না। জানিলে সকলকে সাবধান করিয়া যাইতাম, সে মহাপাপ যেন কেহ না করে। হায় পতি! তুমিই সতীর একমাত্র গতি, দুঃখের কথা আর কাহাকে জানাইব, তোমাকেই জানাই,—আমার তো আর ঘাটে-বাটে যাওয়া ভার হ'য়ে প'ড়েছে। পথে আমায় যে দেখে, সে-ই মুখনাড়া দিয়া মুখ ফিরায়। কাছে কেহ দাঁড়ায়না; কেবলই বলে,—হায় হায়, ক'র্লাম কি, সকালবেলায় আঁটকুড়ির মুখ দেখ্‌লাম, না জানি ভাগ্যে কি আছে? কেহ বা বলে,—আ মর্ আঁটকুড়ি, ভোর না হ'তে হ'তে রাস্তায় বেরিয়ে প'ড়েছে। কেহ কেহ বলে,—দে দে আঁটকুড়ির মুখ পুড়িয়ে; রাস্তায় বেরুতে লজ্জা করে না? স্বামিন্! এইরূপ কত কথা যে কত লোকে বলে, তাহা আর কত বলিব? মনে বড় কষ্ট হয়,—আমি তো স্বপ্নেও কখনও কারুর অনিষ্ট চিন্তা করি নাই, উঁচু-গলা করিয়া কাহারও সহিত কথা কহি নাই, কেবল বিধাতা পুত্র-কন্যা দেন নাই বলিয়াই কি আমার এত অপরাধ এত অপমান? আজ আমায় গোয়ালাবৌ যে অপমানটা করিয়াছে, তাহা আর কি বলিব। প্রাতঃকালে আমি জল তুলিতে ঘাটে গিয়া-

ছিলাম, সে জ্বলন্ত আগুনের নুড়া লইয়া আমার পাছেপাছে তাড়া করিয়াছিল। আর তার গালাগালির বহরই বা দেখে কে? তা তুমি যদি এর একটা প্রতিকার কর ভালই, না হয় আমাকে অগত্যা আত্মহত্যাই করিতে হইবে দেখিতেছি।

গঙ্গাধর এতক্ষণে সকল রহস্য বুঝিতে পারিল। দুঃখে ক্ষোভে তাহার হৃদয় যেন শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল। সুদীর্ঘ তপ্তশ্বাস ত্যাগ করিয়া পত্নীকে বলিল,—সাধ্বি! এ অসাধ্য ব্যাধির প্রতিকার—বিধাতার অনুগ্রহ ভিন্ন আর কি আছে? যদি কিছু থাকে, বল, আমি এখনই তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। পতির সমবেদনায় পতিব্রতার হৃদয় গলিয়া গেল। স্ত্রী এইবার ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল এবং স্বামীর করে ধরিয়া বলিতে লাগিল,—হৃদয়েশ্বর! ঈশ্বর যখন সন্তান দিলেন না, তখন আপন গর্ভে সন্তান-লাভের সম্ভাবনা নাই, তবে তুমি এক কার্য্য করিতে পারো; হয় একটি ব্রাহ্মণপুত্রকে ভিক্ষাপুত্র করিয়া দাও, না হয় আমাদের কুলের কোন দরিদ্রের ঘর হইতে কিছু টাকা-কড়ি দিয়া একটি পুত্র ক্রয় করিয়া আনো, আমি তাহাকেই পুত্রের মত প্রতিপালন করিব। সেই অপত্যই আমার নরকপাত নিবারণ করিবে,—পরের অপবাদ হইতে আমায় মুক্ত করিয়া দিবে।

ভাল ভাল, তাহাই হইবে; পুত্র প্রতিপালন করিতে চাও তাহাই আনিয়া দিতেছি;—বলিয়া গঙ্গাধর কিছু টাকাকড়ি লইয়া বাটীর বাহির হইল। তাহার বাসস্থান গোবিন্দপুর হইতে নীলাচলধাম নিকটেই। সে চঞ্চলপদে সেই নীলাচলে চলিয়া গেল এবং

রূপকারের গৃহ হইতে একটী প্রিয়দর্শন শ্রীকৃষ্ণপ্রতিমা ক্রয় করিয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইল। আসিয়া সানন্দ-সম্ভাষণে পত্নীকে বলিল,—সতি! এই নাও তোমার প্রার্থিত সামগ্রী গ্রহণ কর।—

"এহিটি গতি-মুক্তি-দাতা। এহিটি জীবর করতা॥
এহাঙ্কু পুত্রবুদ্ধি করি। যশোদা দেবী গলে তরি॥
ব্রহ্মাদি সর্ব্ব দেবগণে। এহাঙ্কু ভাবু থান্তি মনে॥
এ প্রভু বিনা অন্য জনে। নাহিঁ জীবর উদ্ধারণে॥
এণু কেবল হৃদগতে। বিশ্বাসে সেব একচিত্তে॥
যাহা বাঞ্ছিব তোর মন। তাহা করিবে এহি পূর্ণ॥"

এইটিই গতি-মুক্তির দাতা। এইটিই সকল জীবের কর্ত্তা। ইঁহাকে পুত্রবুদ্ধি করিয়া যশোদাদেবী তরিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মা-আদি দেবগণ মনেমনে ইঁহাকেই ভাবিয়া থাকেন। এই প্রভু ছাড়া জীব উদ্ধার করিবার আর অন্য কেহ নাই। তুমি সরল বিশ্বাসের সহিত একমনে একপ্রাণে ইঁহাকে সেবা কর, তোমার মন যখন যাহা চাহিবে এই পুত্রই তোমার তাহা পূর্ণ করিয়া দিবে।

যেমন স্বামী, স্ত্রীও তেমনি। দুই জনের দুইটি দেহ হইলে কি হয়, হৃদয় যে একটি। গঙ্গাধরের যে হৃদয় অন্য নশ্বর পুত্র না আনিয়া কৃষ্ণপ্রতিমাকে পুত্ররূপে আনাইয়াছে, তাহার অর্দ্ধাঙ্গহরা শ্রীর হৃদয় তো সেই হৃদয়েরই আধখানা! তাই, এই কৃষ্ণপ্রতিমা পাইয়া শ্রীর একবারও মনে হইল না যে, এটি একটি সামান্য প্রতিমা মাত্র। শ্রী সেই ইন্দ্রনীলমণির দ্যুতিগঞ্জন খঞ্জননয়ন কৃষ্ণধনকে ধাইয়া গিয়া প্রসারিত-হস্তে বক্ষে তুলিয়া লইল। প্রেমাশ্রুর পূতপ্রবাহে

তাঁহাকে অভিষিক্ত করিতে-করিতে বদনে ঘনঘন চুম্বন করিল। বারবার বক্ষে চাপিয়া-চাপিয়া ধরিল। পরে বাষ্পগদগদ-রুদ্ধ-স্বরে বলিল,—বাপ্‌রে গোপাল, তুই কি আমায় মা বলিয়া ডাকিবি? বাপ্‌রে নীলমণি, তুই কি অভাগিনীর অপবাদ মোচন করিবি? বাপ্‌রে, বাপ্‌রে আমার, তুই কি কাঙ্গালের এই আঁধার ঘরের উজ্জ্বল-আলো কালো-মাণিক হইয়া রহিবি?

পতি-পত্নীর কৃষ্ণপ্রতিমাতেই পুত্রের নেশা জমিয়া গেল। জমাইতে বড় বিলম্বও হইল না। হইবেই বা কেন, যিনি এই নশ্বর মনুষ্য-বিগ্রহে পুত্রত্বের আরোপ করাইয়া মানবকে মমতাবিহ্বল করিয়া দেন, এক্ষেত্রে আপনি তিনিই যে পুত্রপ্রীতির ভিখারী;—গঙ্গাধর এবং শ্রীর বিশুদ্ধ ভক্তির আকর্ষণে তিনিই যে আজ প্রতিমারূপে আপনি আসিয়া উপস্থিত! শ্রী তখন করিল কি;—বিশ্বমোহনকে বক্ষ হইতে নামাইল। স্নান করাইয়া, গা পুঁছাইয়া, দিব্য আসনে বসাইল। উত্তম ক্ষীর সর নবনীত ভোজন করাইল। তাহার অশান্ত প্রাণ আশ্রয় না পাইয়া এতদিন কেবল শূন্যেশূন্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিল, আজ উপযুক্ত আশ্রয় পাইয়া সে শান্ত হইল। শ্রীর আর আজ আনন্দ ধরে না, পত্নীর আনন্দে গঙ্গাধরও আজ আনন্দে অধীর।

এইরূপে কিছুদিন যায়। বণিক্‌দম্পতী কায়মনোবাক্যে সেই কৃষ্ণপ্রতিমার সেবা করিতে লাগিল। এ প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠার জন্য পুরোহিতের মন্ত্র-আবৃত্তির প্রয়োজন হইল না, উভয়ের প্রাণঢালা অনুরাগেই তাহা সিদ্ধ হইয়া গেল। এ প্রতিমা সতত

সজীব। সাধক যাহা বলে, তাহা শুনে। অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি আজ বণিক্‌দম্পতীরই একান্ত অনুরক্ত, তাহাদেরই ক্রীড়া-পুত্তলিকা। বিশুদ্ধভাবের এমনই প্রভাব বটে।

পতি-পত্নী পুত্রের মত সেই প্রতিমাকে প্রতিপালন করিতে লাগিল। তৈল-কুঙ্কুম মাখাইয়া স্নান করাইয়া দেয়, অঙ্গে কর্পূর-চন্দন লেপন করে, সুদৃশ্য সুবাসিত কুসুমের বেশ করিয়া দেয়, নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করে, ললাটে চিত্রবিচিত্র তিলক পরাইয়া দেয়, আরও কত কি শোভন সাজে সজ্জিত করে। বালকের স্বভাব—ফল বড় ভালবাসে। কুল, কয়েতবেল, কলা, কাঁঠাল প্রভৃতি একবার গ্রামে বেচিতে আসিলে হয়, শ্রী কিম্বা গঙ্গাধর যাহার নজরে পড়ে, সে তাহা গোপালের জন্য কিনিবেই কিনিবে; তা তাহার মূল্য যতই লাগুক। গঙ্গাধর যখন কোন বিদেশে ব্যাপার করিতে যায়, সেখানে যাহা-কিছু উত্তম খাদ্যদ্রব্য মিলে, তাহা কিনিয়া আনে। আনিয়াই গোপালের হাতে দেয়। তাহাতেই তাহাদের মহা সুখ। গোপালকে সমর্পণ না করিয়া তাহারা কিছুই উদরস্থ করে না। শ্রীর আবার অনুরাগ আরও অধিক। সে নয়নে-নয়নে গোপালকে রাখিয়াও যেন সদাই হারাইয়া-হারাইয়া ফেলিতেছে। গৃহকৃত্য আর তাহার ভাল লাগে না। দৈবাৎ কার্য্যান্তরে যাইতে হইলে দণ্ডে দশবার ফিরিয়া আসে। একটু অধিক বিলম্ব হইয়া গেলে তো আর রক্ষা নাই; হন্ হন্ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া গোপালকে বক্ষে লইয়া চন্দ্রবদনে ঘনঘন চুম্বন করে, আর আপনাকে আপনি গালি পাড়ে। বলে,—আমার

মুখে আগুন, মুখে আগুন, আহা বাছাকে আমার একলা ফেলে আমি অলক্ষণী এতক্ষণ চোলে গিয়াছিলাম, আহা বাছার আমার না জানি কত কষ্টই হ'য়েছে!

গঙ্গাধরদাস গোপালপ্রতিমার প্রীতে পড়িয়া আর অধিক দূরদেশে ব্যাপার করিতে যাইতে পারে না। অথচ মাঝে-মাঝে না যাইলেও চলে না। হয় তো যাইব-যাইব মনে করে, আজ যাইব কাল যাইব করিয়া আর যাওয়া হয় না। গোপালকে ছাড়িয়া যাইতে তাহার প্রাণ যেন দেহবিচ্যুত হইয়া পড়ে, কাজেই যাওয়া হয় না। এবার সাময়িক সওদার খাতিরে তাহাকে সুদূর বিদেশে যাইতে হইতেছে। বিষম চিন্তা,—কি করে। পত্নীর করে ধরিয়া বলিয়া দিল,—আমার গোপাল রহিল, আর তুমি রহিলে; দেখো যেন তাহার কোন অযত্ন না হয়! তুমি সর্ব্বদা বাছার কাছে-কাছে থাকিবে; একবারও চক্ষের আড় করিবে না। এইরূপ বলিয়া-কহিয়া গোপালের কাছে বিদায় লইয়া— কাঁদিতে-কাঁদিতে গঙ্গাধর বাটীর বাহির হইল। শ্রীও অনন্যকর্ম্মা হইয়া আহারনিদ্রা ছাড়িয়া গোপাল-সাগরে নিমগ্ন রহিল।

বিদেশে গঙ্গাধরদাসের তিনদিন কাটিয়া গেল। বাপ, তিন দিন কি, এ যে অনন্ত কোটী কল্প!—এইরূপই তাহার মনে হইতে লাগিল। সে আর থাকিতে পারিল না, ব্যাপার করাও আর পোষাইল না; গোপালের নিমিত্ত ভাল ভাল খাবারদাবার কিনিয়া গৃহমুখে যাত্রা করিল। 'গোপাল গোপাল' করিয়াই পাগল, চোখে কিছু দেখিতে পায় না। কর্ণে কিছু শুনিতে পায় না।

কোথা দিয়া যাইতেছে, কেমন করিয়া যাইতেছে, কিছুই ঠিক নাই। কেবল বায়ুবেগে চলিয়াছে। পথক্লেশে শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে; তবুও চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে কাষ্ঠপাষাণাদির আঘাত পাইয়া পড়িয়া যাইতেছে, শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইতেছে, তবুও চলিতেছে। গোবিন্দপুর গ্রামের কাছাকাছি আসিয়া বৃদ্ধ গঙ্গাধর একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে ঠোক্কর লাগিয়া পড়িয়া গেল। এই পড়াই তাহার শেষ-পড়া। আর তাহাকে উঠিতে হইল না। কৃষ্ণ রে—বাপ্ রে আমার, আর তোমায় দেখিতে পাইলাম না, বলিতে-বলিতে সে নয়ন নিমীলন করিল।

এদিকে গঙ্গাধরের গৃহিণী গোপালকে বুকে করিয়া শুইয়া আছে। কয়েকদিন নিদ্রা নাই, একটু তন্দ্রার আবেশ আসিয়াছে। হঠাৎ যেন তাহার মনে হইল,—কৃষ্ণধন আমার—ক্রন্দন করিতেছে। সে অমনি "বাপ্! বাপ্!" করিয়া উঠিয়া পড়িল। কেন, কেন কি হ'য়েছে, কি হ'য়েছে, বলিয়া গোপালের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। এমন সময় কয়েকজন গ্রাম্য লোক আসিয়া তাহাকে বলিল,—ও বেণেবৌ! তোর কপাল ভেঙ্গেছে লো কপাল ভেঙ্গেছে; ঐ গ্রামের বাহিরে গিয়ে দেখ্‌গে—তোর ভাতার ম'রে প'ড়ে আছে; আমরা এই স্বচক্ষে তাকে দেখে আস্‌ছি। শ্রী এই কথা শুনিয়া,—"অ্যাঁ বাবা গোপাল! ওরা বলে কি" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

মূর্চ্ছাবসানে শ্রী উঠিয়া বসিল। একবার ভাবিল,—একি স্বপ্ন? এ ভাবনা তাহার অধিকক্ষণ তিষ্ঠিল না। আরও কতকগুলি

গ্রামবাসী আসিয়া তাহাকে তাহার পতির মৃত্যু-বার্ত্তা জানাইল। ভীতিভরে সতীর শরীর থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল,—চারিদিকটা যেন ঘুরিতেছে। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। কোল হইতে গোপালকে নামাইয়া তাহার চরণতলে লুটাপুটি খাইতে লাগিল। সে কান্নার কথা কি বলিব, শ্রবণে বজ্রও বিদীর্ণ হয়। কান্নায় আর কোন কথা নাই,—কেবল হা গোপাল, যো গোপাল। হায় গোপাল, আমার কি করিলি? হায় গোপাল, তুই পিতৃহীন হইলি? হায় গোপাল, আমি এখন কি করি বল? হায় গোপাল, আমি তোরে ছাড়িয়াই বা কোথায় যাই? এইরূপ বিলাপবাণী এবং করুণ-ক্রন্দনে সে স্থানটা করুণরসের পরিস্ফুট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল।

ঐকান্তিক ভাবের কাছে ভগবান্ সর্ব্বদাই আত্মবিক্রয়ী। গোপাল আর থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার শ্রীমুখে কথা ফুটিল। মাতৃ-প্রীতির অমৃতসিক্ত সুমধুর সম্ভাষণে তিনি বলিলেন,—ওমা, মাগো! তুই এত কাঁদিস্ কেন মা?—তুই এত ভাবিস্ কেন মা? তোর কান্না দেখে আমার যে বড় কান্না আসে মা! কাঁদিস নে মা, ভাবিস্ নে। বাবা তো মা! মরে নাই। বুড়ো মানুষ; পথশ্রমে ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে প'ড়েছে। আমি ব'ল্ছি, তুই যা; বাবাকে গিয়ে ব'ল্গে—"হ্যাগা তুমি তোমার একলা-ঘরের একটি ছেলে গোপালকে ফেলে এখানে শুয়ে র'য়েছ কেন? শীগ্গির এস গো শীগ্গির্ এস; গোপাল যে তোমার কেঁদে কুটিপাটি ক'র্ছে।" যা মা! যা; শীগ্গির বাবাকে সঙ্গে ক'রে

নিয়ে আয়, না হ'লে আমি কাঁদ্‌বো, খাওয়াদাওয়া কিছুই ক'রবো না।

সকল প্রীতির মূল প্রস্রবণ ভগবান্। অপরে প্রীতি তো তাঁহারই সম্বন্ধে। তাই পতিব্রতা শ্রী—পথিমধ্যে পতির প্রেত-শরীর পড়িয়া আছে, শুনিয়াও গোপালকে ছাড়িয়া এক-পা নড়িতে পারে নাই। কিন্তু সেই সকল-প্রীতির মূলাধার গোপালই যখন বলিতেছে,—মা! তুমি না গেলে আমি কাঁদবো, আহারাদি কিছু ক'রবো না; তখন আর কি সতী পতির কাছে না যাইয়া থাকিতে পারে? শ্রী গোপালের কথাতেই গোপালকে ছাড়িয়া পতির উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল। গিয়া দেখিল,—স্বামী অজ্ঞান অচৈতন্য, শরীর শীতল; দেহে প্রাণ নাই। দেখিয়া হৃদয় দুরুদুরু কাঁপিয়া উঠিল। আশানৈরাশ্যের আলোক-আঁধারে তাহার অন্তরে এক অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হইল। তথাপি সে গোপালের কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া পতির মস্তকে অতি সন্তর্পণে হস্তার্পণ করিল, শীতকাতর স্থবিরের মত অর্পিত কর থরথর কম্পিত হইতে থাকিল, কম্পিতকণ্ঠেই কহিল,—সতীর সর্ব্বস্বধন! ধূলায় অচেতন হইয়া পড়িয়া কেন? উঠ, নয়ন মেলিয়া দেখ, তোমার চরণসেবিকা শ্রী আমি তোমাকে লইতে আসিয়াছি। বাপ গোপাল আমার তোমার তরে কাঁদিয়া আকুল। আর বিলম্ব করিও না, চল—শীঘ্র চল, বাছা আমার একাকী গৃহে পড়িয়া আছে, আমিও এখানে একাকিনী অসহায়া আসিয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় গঙ্গাধর প্রাণ পাইল। সে যেন নিদ্রার

অবসানে উঠিয়া বসিল। দুই হস্তে চক্ষু রগড়াইয়া এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখিল। পার্শ্বে শ্রীকে দেখিয়া মহা বিস্মিত হইল। পরক্ষণেই গোপালের কথা মনে পড়িয়া গেল। একা পত্নী এখানে, তবে কি গোপালের কোন অমঙ্গল হইয়াছে?—ভাবিয়া তাহার বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল। আবেগভরে বলিয়া উঠিল,—প্রাণ-সখি! তুমি এখানে, আর আমার বাছা গোপাল? এই বলিয়া গঙ্গাধর যেন মূর্চ্ছিত হয় হয় হইয়া পড়িল। পত্নী—'ভয় নাই ভয় নাই—গোপাল আমার কুশলে আছে'—বলিয়া পতিকে আশ্বস্ত করিল এবং একে-একে সকল কথা কহিয়া স্বামীকে সঙ্গে লইয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। পথে চলিতে-চলিতে দুজনার মুখে গোপালের প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কোন কথাই নাই। শতমুখে গোপালের গুণ গাহিতে-গাহিতে উভয়ে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল।

গঙ্গাধরদাস দ্বার হইতেই—বাবা গোপাল, গোপাল,—ডাক ছাড়িতে-ছাড়িতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। বিদেশ হইতে যে সকল অপূর্ব্ব সামগ্রী গোপালের জন্য আনিয়াছিল, গঙ্গাধর সর্ব্বাগ্রে তাহা গোপালের সম্মুখে ধরিয়া দিল। তারপর কোলে তুলিয়া রাতুল অধরে চুম্বন আরম্ভ করিল। সে চুমা-খাওয়া আর ফুরায় না। শ্রীও চুপ করিয়া রহিল না, সে-ও যথার্থ অর্দ্ধাঙ্গহরার মত পতির এই আনন্দে অর্দ্ধেক ভাগ বসাইল। সে একবার পতির কোল হইতে গোপালকে কোলে লইয়া ঘনঘন চুমা খায়, পতিও আবার তাহার কোল হইতে গোপালকে কোলে লইয়া চুমা খায়। দীর্ঘ-

কাল এইরূপ কাড়াকাড়ি করিয়া চুমা-খাওয়াই চলিতে লাগিল। সে আনন্দ-উল্লাস দেখে কে? পতি-পত্নী আজ কয়দিনের ক্ষুধা-পিপাসা এক চুম্বনেই পূরণ করিয়া লইল। রোগ-শোক-সমাকীর্ণ—স্বার্থের সংঘর্ষে সতত সমুদ্বিগ্ন সংসারের তো নয়, এ আনন্দ বুঝি আর কোন্ দেশের,—আর কোন্ আনন্দসাম্রাজ্যের? এই অপ্রাকৃত আনন্দের সমুদ্রে পতিপত্নী পরমানন্দে সন্তরণ করিতে লাগিল।

এইরূপ আনন্দে আনন্দে দিবসের অবসান হইয়া গেল। রাত্রিকাল। শয়নের সময় গঙ্গাধর তাহার গোপালকে বলিল,—কৃষ্ণ হে! শুনিতে পাই, তুমি নাকি কমলার পতি, অখিল ব্রহ্মাণ্ডের পতি, সকল জীবের কর্ত্তা এবং চতুর্ব্বর্গফলদাতা? বাবা, তুমি যখন আমার তনয়, তবে এ বৃদ্ধ বয়সে আমার এত ক্লেশ কেন? দেখ বৎস! পোড়া পেটের দায়ে পয়সা পয়সা করিয়া প্রত্যহই আমাকে দেশেদেশে ভ্রমিয়া বেড়াইতে হয়। দুঃখের কথা বলিব কি বাবা, উপবাস করিয়া পড়িয়া থাকিলে, একদিন আহা বলিবারও আমাদের কেহই নাই। হাঁ বাপ, এ বৃদ্ধের দুঃখ কি ঘুচিবে না? এইরূপ বলিতে বলিতে গঙ্গাধর ঘুমাইয়া পড়িল। সে স্বপ্নে দেখে,—তাহার মুরলীধর আসিয়াছে, হাসিতে-হাসিতে বলিতেছে,—বাবা বাবা! আমি যার পুত্র, তার আবার দুঃখ কিসের বাবা? তুমি যখন যাহা চাহিবে, তখনই তাহা পাইবে। এই দেখ বাবা, ধনরত্নে তোমার গৃহপ্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ করিয়া দিলাম। আর তোমার ভয় কিসের, চিন্তা কিসের?

যে ভগবান্‌কে চাহে, আবার বিষয় প্রার্থনাও করে, তাহার মত মূর্খ জগতে আর নাই। মূর্খ গঙ্গাধর গোপালের কাছে বিষয় মাগিয়া গোপালকে হারাইয়া ফেলিল। হায়, হায়, লোভে পোড়ে হতভাগ্য লাভে-মূলে সকলই খোয়াইল। তাহার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিবামাত্রই সে উঠিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি চারিদিকে চাহিয়া দেখে,—ঘরদ্বার ধনরত্নে ভরিয়া গিয়াছে! কৃতজ্ঞতায় তাহার অন্তর পূরিয়া উঠিল। গোপালের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাইতে গিয়া দেখে, গোপাল নাই। হায় কি সর্ব্বনাশ, বলিয়া বৃদ্ধ আছাড় খাইয়া পড়িল। উচ্চ চীৎকারে শ্রীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। নিদ্রাস্তিমিত-নয়নে সে 'কি কি?' বলিতে-বলিতে সেখানে আসিয়া পড়িল। ব্যাপার বুঝিতে তাহার বড় বিলম্ব হইল না; পতির আর্ত্তির মুখেই সকল কথা প্রকাশ হইয়া গেল। শ্রীও মস্তকে করাঘাত করিতে-করিতে ক্রন্দন করিতে লাগিল। গঙ্গাধর আর গোপালের বিরহ-বেগ সহ্য করিতে পারিল না। হায় গোপাল, কোথা গেলে গোপাল, আমায় সঙ্গে ল'য়ে চল গোপাল, আর আমি ধন চাহিব না গোপাল, বলিতে-বলিতে তাহার কথা-বলা চিরতরে ফুরাইয়া গেল।

শ্রীর সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ। পুত্র অন্তর্হিত, পতি পর-লোকগত। হা গোপাল! এ আবার তোমার কি লীলা, বলিয়া পতিব্রতা পতির মস্তক কোলে তুলিয়া লইল এবং মর্ম্ম-নিকৃন্তন করুণ বিলাপে বজ্র-পাষাণকেও বিগলিত করিতে লাগিল। আহা, তাহার ব্যথা যে বিষম ব্যথা। পুত্রহীন দরিদ্র গৃহস্থ, অন্তরে আনন্দ ছিল না—ছিলই না। তাহার পর যদি আনন্দ আসিল

তো একবারে বরষার বন্যার মত হুড়্‌হুড়্‌ করিয়া। তাঁহাদের কপালে এত আনন্দ সহিবে কেন? আলেয়ার আলোর মত সেই আনন্দ ক্ষণিক দীপ্তি দেখাইয়া অমিত অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়া কোথায় সরিয়া পড়িল। পতি-পুত্র-হীনা শ্রী এ বেদনা আর সহিতে পারিল না। কর্ত্তব্য-বুদ্ধি তখন তাহার কাণেকাণে যাহা বলিল, সে তাহাই অনুষ্ঠান করিল। রজনী প্রভাত হইবামাত্র সে ব্রাহ্মণ-সজ্জন অতিথি-ফকির দীন-দরিদ্র ডাকিয়া সমস্ত ধনরত্ন দুই হস্তে বিতরণ করিয়া ফেলিল। পতির দেহ মহা সমারোহে গ্রাম-প্রান্তে লইয়া গেল। চন্দনের চিতা প্রস্তুত করিল। তাহাতে গব্যঘৃত সমর্পিত হইল। যথাবিধি অগ্নি-সংযোগে চিতা দাউদাউ জ্বলিয়া উঠিল। সে অগ্নির নিকটে যায় কাহার সাধ্য? শ্রী এইবার স্নান করিয়া বিচিত্র ভূষণে ভূষিত হইল। তাহার পর পতিকে লইয়া হরিহরিধ্বনি করিতে-করিতে সেই জ্বলন্ত চিতার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল। চারি-দিকে অসংখ্য দর্শক, তাহাদের বদনেও উচ্চ হরিহরি-নিনাদ। হরিহরিধ্বনি ভিন্ন অন্য শব্দ আর সেখানে নাই। সেই শব্দ ভেদ করিয়া শ্রীর অন্তিম প্রার্থনার বাণী সমুচ্চারিত হইল। সকলে নিস্তব্ধ হইয়া সেই কথা শুনিতে লাগিল। কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রী বলিল,—ওহে অগ্নিদেব! তোমায় নমস্কার। ওহে চন্দ্র সূর্য্য! তোমাদের নমস্কার। ওহে পৃথিবী! তোমাকে নমস্কার। ওহে ইন্দ্রদেব! তোমায় নমস্কার। ওহে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঠাকুর হরি-হর-বিরিঞ্চি! তোমাদের নমস্কার। আমি তোমাদের শরণাগত। আমি

আমার স্বামীর সঙ্গে যাইতে চাই। তাঁহার সহিত অনলমধ্যে আত্মসমর্পণ করিতে চাই। তোমরা আমায় আশীর্ব্বাদ কর, যেন আত্মহত্যা-দোষে আমায় লিপ্ত হইতে না হয়। এই বলিয়া সতী বিদায়ের ভঙ্গীতে সকলের কাছে চিরবিদায় লইয়া হাসিহাসিমুখে পতির সহিত অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি প্রদান করিল। দেখিতে-দেখিতে সকলই ফুরাইল। দর্শকের দল হরিহরিনাদে বিশ্বব্যোম পূর্ণ করিয়া ফেলিল।

গঙ্গাধরদাস ঐশ্বর্য্যনিষ্ঠ ভক্ত। তাহার সহধর্ম্মিণীও তা-ই। তাহাদের প্রীতির আকর্ষণে বৈকুণ্ঠধাম হইতে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সেখানে আসিলেন। তাহারা নয়নেনয়নে তাহা দেখিল। অনল-কুণ্ডই তাহাদের তুষার-চন্দন-শীতল সুধাকুণ্ড হইয়া উঠিল। সতী-শিরোমণি লক্ষ্মীদেবী শ্রীকে এবং সতীনাথ নারায়ণ সতীপতি গঙ্গা-ধরকে কোলে করিয়া দিব্যরথে আরোহণ করাইলেন। দেখিতে-দেখিতে দিব্য রথ আকাশমার্গ অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠধামে উপনীত হইল। সকলে দেখিল,—বিদ্যুতের মত কি একটা চিতা হইতে উঠিয়া আকাশে মিশিয়া গেল। তাহারা সমস্বরে সতীর জয়জয় দিয়া উঠিল এবং অন্তরে অন্তরে সতীর পবিত্র প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সতীর কথা সতীর ভাব কহিতে কহিতে ভাবিতে-ভাবিতে আপন-আপন ভবনে গমন করিল। সতীর সতীত্বের পারিজাতসৌরভে চারিদিক ভর্‌ভর্‌ ভরিয়া গেল!

মণি দাস

মালাকার মণিদাসের নিবাস নীলাচলে। সে জাতীয় বৃত্তি দ্বারাই জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত। অনেকগুলি পরিবার। তাহার উপর অতিথি-অভ্যাগত আছে। সুতরাং সংসার বড় স্বচ্ছল ছিল না। সামান্য ফুলের মালা বেচিয়া আর কত পয়সা রোজগার হইবে? মণিদাসের মনটা কিন্তু রাজারাজড়ার চেয়েও দরাজ। খরচের ভয় করিত না। রোজগারপাতি যত হউক আর না-ই হউক, যোগেযাগে দিনটা কাটিয়া গেলেই হইল। ভবিষ্যতের চিন্তা সে ভগবানের উপর দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিত। তাই প্রাণে আনন্দেরও অভাব হইত না।

বিধাতার কি যে নির্ব্বন্ধ বলা যায় না, মণিদাসের সংসারবন্ধনগুলি একে একে শিথিল হইয়া যাইতে লাগিল। তাহার স্ত্রী-পুত্রাদি একে একে পরলোকে চলিয়া গেল। সংসারে আসক্তি তো একে ছিলই না, তাহার উপর যাহাদের লইয়া সংসার, তাহারা সকলে চলিয়া যাওয়ায়, তাহার আসক্তির মূলটুকু পর্য্যন্ত মরিয়া গেল। বৈরাগ্যের বিমল আলোকে তাহার অন্তঃকরণ আলোকিত হইয়া উঠিল। সে মনে করিতে লাগিল,—ওঃ, কি যেন একটা ভারী বোঝা আমার মাথা হইতে নামিয়া গিয়াছে। যেখানে যাইতে চাই, কি যেন একটা কঠিন বাঁধনে টানিয়া-টানিয়া রাখিত; সেটা যেন কাটিয়া গিয়াছে। এখন এই বাঁধন-কাটা

হাল্কা শরীরে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারি। হে নীলাচল-নাথ! ধন্য তোমার করুণা। সংসারের দাসত্ব-মুক্ত আমি আজ প্রাণ ভরিয়া তোমার দাসত্ব করিতে পারিব। হায় প্রভু, এতদিন আমি কা'দের দাসত্ব করিতেছিলাম?—স্ত্রী-পুত্রাদির? এই তো তা'দের ব্যবহার? তাহাদের বিনা-বেতনের নিত্য-কিঙ্কর আমাকে তাহারা একটীও আশার কথা না বলিয়া যে যেখানে সরিয়া পড়িল। এমন নির্ম্মম নিষ্ঠুর মনিবের দাসত্ব কথনও করিতে আছে কি? কিন্তু হায় প্রভু, এমনই মোহ-মদিরার অদ্ভুত মাদকতা যে, আমরা নেশার বশে প্রেমময় আনন্দময় দয়াময় তোমার দাসত্ব ছাড়িয়া সেই স্ত্রী-পুত্রাদিরই দাসত্ব করিতে যাই। ফলও সেইরূপ হয়। তোমার দাসত্ব ছাড়িয়া সংসারের দাসত্বে প্রবৃত্ত হইলেই মায়া-পিশাচী অমনই আসিয়া গলায় ত্রিগুণ-রজ্জুতে বন্ধন করে, আর নানাপ্রকার নির্য্যাতন করিতে থাকে। করুণাময়! তোমার করুণা-প্রভাবেই আমি আজ সংসারের দাসত্বে অব্যাহতি পাইয়াছি। আশীর্ব্বাদ কর, আর যেন সাধ করিয়া সে দাসত্ব অঙ্গীকার না করি। চিরদিনই যেন তোমার দাস হইয়া, তোমার ভুবন-মঙ্গল নাম অবলম্বন করিয়া, নাচিয়া-গাহিয়া বেড়াইতে পারি।

মণিদাসের কথা কেবল কথাতেই পর্য্যবসিত হইল না। সে দিব্য-দৃষ্টিতে দেখিতে পাইল, এই সংসারের কেহই কাহার নহে। এখানকার প্রীতি-মমতা সকলই মিথ্যা। এই অসার সংসারে সার হইতেছে—একমাত্র ভগবানের নাম। মণিদাস কায়মনো-

বাক্যে ভগবানের সেই নামই আশ্রয় করিল। বিষয়-বৈভব বিলাইয়া দিয়া ডোর-কৌপীন ধারণ করিল এবং হরিভজন করিয়া দিবা-যামিনী যাপন করিতে লাগিল। এখন আর সে রাত্তি পোহাইতে-না-পোহাইতে বাগানে-বাগানে ফুল তুলিয়া বেড়ায় না। পয়সার আশা করিয়া ফুলের মালা গাঁথে না। আর সেই মালা বেচিবার জন্য নগরে-নগরে ঘোরাঘুরি করে না। সে এখন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া স্নান করে। দ্বাদশ অঙ্গে তিলক করে। কণ্ঠে তুলসীর মালা; কটিতে কৌপীন; হস্তে দুইটা নারিকেলমালার করতাল; এই অবস্থায় সে জগন্নাথের শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই নারিকেলমালার করতাল বাজাইয়া পতিত-পাবনদের সম্মুখে বাহির হইতেই কিছুক্ষণ নৃত্য-গীত ও দণ্ডবৎ প্রণাম করে। তাহার পর সিংহদ্বারে প্রবেশ করিয়া বরাবর শ্রীজগমোহনে চলিয়া যায়। গরুড়স্তম্ভের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া প্রাণ ভরিয়া শ্রীপ্রভুর শ্রীমুখ দর্শন করে। বারংবার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করে। উঠিয়া কপালে কৃতাঞ্জলি করযুগল রাখিয়া গদগদস্বরে বলে,—প্রভু হে! তোমার করুণার বলিহারী যাই, বলিহারী যাই। আমি যেন তোমার ওই চন্দ্রবদন চাহিতে-চাহিতে তোমার বালাই লইয়া মরিতে পারি। হায় প্রভু, তুমিই আমার জীবনের জীবন—তুমিই আমার কাঙ্গালের রতন। তুমি বই আমার কেউ নাই কেউ নাই,—কেউ থাকিয়াও কাজ নাই কাজ নাই। তুমিই আমার—আমার আমার, আমার তুমি—তুমিই আমার।

ভক্ত মণিদাস গরুড়ের পাছে রহিয়া পিপাসিত-নয়নে চাহিয়া-চাহিয়া প্রাণ-বঁধুর বদন সুধা পিয়িয়া-পিয়িয়া ভাবের নেশা জমাইয়া লয়। আর উচ্ছ্বাসময় ভাবের গান গাহিতে-গাহিতে নারিকেলমালার করতাল বাজাইয়া মস্তক হেলাইয়া মহা নৃত্য জুড়িয়া দেয়। সে জগমোহনের শেষ সীমা—যেখানে চন্দনকাষ্ঠের অর্গল আছে, সেই পর্য্যন্ত একবার নাচিতে নাচিতে গমন করে; আবার গরুড়স্তম্ভ পর্য্যন্ত পাছু হাঁটিয়া নাচিতে-নাচিতে আসিতে থাকে। নয়ন আর কোন দিকে নাই, সে সেই ভাবনিধি ভগবানেই তন্ময় হইয়া আছে। এইরূপ নাচিতে-নাচিতে সে ভাবেভাবে অধীর হইয়া পড়ে। কখনও কম্প, কখনও ঘর্ম্ম, কখনও অশ্রু, কখনও পুলক, কখনও স্বরভেদ, কখনও বৈবর্ণ প্রভৃতি ভাব-ভূষণে ভূষিত ভক্ত মণিদাসের সে এক ভঙ্গীই স্বতন্ত্র। মণিদাস এইরূপ নাচিতে-নাচিতে কখনও উচ্চৈঃস্বরে জয়জয়-কার দিয়া উঠে। কখনও দু'বাহু তুলিয়া ঢলিয়া-ঢলিয়া পড়ে। কখনও বা দুই হস্তে মস্তক ধারণ করিয়া স্তবস্তুতি করিতে থাকে। সে ভাবভোলে বলে,—ওহে ও কাল-বরণ! তোমার জয় হউক। ওহে ও গুঞ্জা-বিভূষণ! তোমার জয় হউক, জয় হউক। বনমালি হে! তোমার গলায় নানা ফুলের মালা দোলে। আহা, সে শোভা দেখিলে মন-প্রাণ ভুলে যায় গো ভুলে যায়। তোমার কমলার লীলাভূমি বক্ষঃস্থলে কমল-মালা দোদুল্যমান। অঙ্গেঅঙ্গে রত্নের অলঙ্কার ঝলমল করিতেছে। শ্রবণে মকর-কুণ্ডল, যেন দুইটী রবিমণ্ডল দিব্যজ্যোতিতে গণ্ডস্থল উজ্জ্বল করিতেছে। মাথায়

রত্নমুকুট, আহা যেন নবগ্রহের পংক্তি। তোমার সুধাংশুবদন দেখিলে ভক্ত-হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না। তোমার ওই প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্ম-সদৃশ সুন্দর নয়নযুগল যেন তোমার দাসের দুঃখসাগরের পারে যাইবার ভেলার মত শোভা পাইতেছে। তোমার ওই শ্রীহস্ত দুইটি যেন জগজ্জীবের অশেষ কল্যাণ সাধনের জন্যই অগ্রসর হইয়া রহিয়াছে। তাহাতে আবার কি বিচিত্র শঙ্খ-চক্র, দেখিলে আর নয়ন ফিরাইতে সাধ হয় না। তোমার ওই ভক্ত-রক্ষায় ব্যগ্র সুদর্শনচক্র-শোভিত শ্রীকরের উপর নির্ভর করিতে পারিলে আর কি কাহাকেও ভীত-চকিত হইতে হয়? হে প্রভু, তোমার অভয় পাদপদ্ম শরণাগতের সর্ব্বভয় নিবারণ করিয়া থাকে। তোমার ওই চরণ-কমল ছাড়া আমার আর অন্য শরণ অন্য ভরসা কিছুই নাই। হে সর্ব্ব-মনোহর সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর প্রভু! আমি তোমার সর্ব্বভাবে শরণাগত। তোমার দাসত্বে যেন কখনও বঞ্চিত হইতে না হয়।

এইরূপ বলিতে-বলিতে মণিদাস উন্মত্তের মত নৃত্য করিতে থাকে। তাহার পদতলে মেদিনীমণ্ডল টলটল কাঁপিতে থাকে। নারিকেলমালার করতালের ধ্বনি ও বিবিধ বিকৃত-কণ্ঠস্বরে সেই স্থানটা পরিপূরিত হইতে থাকে। আর তার মুখ দিয়া শুভ্র ফেনা গড়াইয়া-গড়াইয়া পড়িতে থাকে। তাহার ভঙ্গী দেখিলে কেবলই মনে হয়,—সে যেন ভাব-বারিধি ভগবানের একটী ভাব-তরঙ্গ—বারবার নানা রঙ্গের অবতারণা করিয়া নাচিতে-গাহিতে আসিতেছে ও যাইতেছে। আর তার ফেনোদগম-

সহকৃত গম্ভীর গর্জ্জনে সমগ্র জগমোহন প্রতিধ্বনিত হইতেছে। মণিদাস প্রতিদিনই শ্রীজগমোহনে এইরূপ নাচিয়া-গাহিয়া শ্রীজগন্নাথের আনন্দ সম্পাদন করিয়া থাকে। আপনার মনেই যায়, আপনার মনেই গায়, আপনার মনেই নাচে, আপনার মনেই চলিয়া আসে। কেহ কিছু মহাপ্রসাদ দিল তো খাইল, নচেৎ কোন মঠে আসিয়া পড়িয়া রহিল। আবার খেয়াল হইল তো শ্রীজগমোহনে আসিয়া নাচনা-গাহনা জুড়িয়া দিল। ফলে সে তাহার এই কৃষ্ণদাসত্বে সম্পূর্ণ স্বাধীন। সংসারের দাসত্বে কিন্তু এমনটী ছিল না।

এইরূপে কিছুদিন যায়, একদিন হইল কি, শ্রীজগবন্ধুর জগ-মোহনে পুরাণপণ্ডা (পুরাণপাঠক) বসিয়া পুরাণ ব্যাখ্যা করিতেছেন। অনেক লোক শ্রবণ করিতেছেন। পণ্ডাঠাকুর ব্যাখ্যাচাতুর্য্যে সকলেরই মন অপহরণ করিতেছেন। এমন সময়ে ভক্ত মণিদাস সেই নারিকেলমালার করতাল বাজাইতে-বাজাইতে উচ্চস্বরে 'রামকৃষ্ণহরি-নাম' গাহিতে-গাহিতে জগমোহনে আসিয়া প্রবেশ করিল। শ্রীদারুব্রহ্মকে দর্শন করিয়া তাহার আর উল্লাসের সীমা-পরিসীমা রহিল না। সে আনন্দভরে উদ্দণ্ড নৃত্য জুড়িয়া দিল। নাচিতে-নাচিতে পুরাণপণ্ডার নিকটে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল এবং পাগলের মত আবোল-তাবোল কত কি বকিতে থাকিল। তাহার তো আর পুরাণ-পণ্ডা বলিয়া ভয় নাই, সংজ্ঞাও নাই। ভয়ের ভয়—ভয়হারীর অভয়-পদে তাহার যে মনের লয় হইয়া গিয়াছে। পুরাণপণ্ডা কিন্তু

মণিদাসের এই ব্যবহারে ভীষণ চটিয়া গেলেন। তিনি তাড়াতাড়ি পুঁথিখানি বাঁধিয়া ফেলিলেন। মহা হাঁক-ডাক জুড়িয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—আরে মূর্খ, এই বিষ্ণুপরাণ-পুঁথি সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ; তুই কিনা সেই পুঁথির কাছে ঠ্যাং তুলিয়া নাচিতেছিস্? তোকে কেউ কিছু বলে না ব'লে,—না? যত ভাল-ভাল লোক এখানে ব'সে র'য়েছেন, দেখতে যেন দেবতার মত শোভা হ'য়েছে, তোর সেদিকে একটুও দৃষ্টি নাই; তুই কিনা গরবভরে পায়ে ঘুমুর বেঁধে নৃত্য জুড়ে দিয়েছিস্,—এখানে প'ড়ে-প'ড়ে আবোল-তাবোল ব'কে মচ্ছিস? পুরাণ শুন্‌তে তোর কাণে কি হ'য়েছিল? পুরাণপণ্ডা কোপভরে এইরূপ কত কি বলিয়া গালাগালি দিতে লাগিলেন। মণি দাসের কর্ণে তাঁহার একটি কথাও প্রবেশ করিল না। সে যে তখন তাহার প্রভুকে লইয়া আপনাহারা হইয়া আছে। সুতরাং তাহার গলা-বাজি বা গড়াগড়ি কিছুই থামিল না,—সমভাবেই চলিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া শ্রোতার ভিতর আর পাঁচজনেরও বেজায় রাগ হইল। তাহারা একজোটে আসিয়া মণি দাসকে আক্রমণ করিল। সে চীৎকার-চেঁচামেচির চোটটাই বা কত। তাহারা ধাক্কার উপর ধাক্কা দিয়া মণি দাসকে বলিতে লাগিল,—আরে রে আহাম্মক, পুরাণপণ্ডা ব'লে তোর একটুও প্রাণে ভয় নাই? উনি কি একটা যে সে লোক? রোস্, তাঁর কথা না শোনার ফলটা তোকে ভাল ক'রে দেখিয়ে দিচ্ছি। তোর কোন্ বাপ্ এসে তোকে রক্ষা করে একবার দেখে নিই। আরে ভণ্ড, এখনও

ব'লছি, তুই এখান হ'তে ভালয়-ভালয় এখনই চম্পট দে, না হ'লে ভাল ক'রে টেরটা পাইয়ে দেবো,—এখানে এসে নাচুনী-কু দুনি একেবারে বের ক'রে দেবো,—তোকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে তবে ছাড়বো।

এই মহা মার-মার কাট-কাট রবে ও ঠেলাঠেলি-ধাক্কাধাক্কিতে মণিদাসের ভাবের নেশা ছুটিয়া গেল। সে যেন কেমন চমকভাঙ্গা হইয়া থতমত খাইয়া উঠিয়া বসিল। তখনও তাহার উপর অজস্রধারে গালাগালি-বর্ষণ চলিতেছে,—দুইএকটা ধাক্কাধাক্কিও চলিতেছে। ব্যাপার বুঝিতে তাহার বড় বিলম্ব হইল না। অভিমানে তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল। সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া সজল-নয়নে কমলনয়নের দিকে চাহিয়া-চাহিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রাণের কথা প্রাণেপ্রাণেই জানাইতে লাগিল। বলিল,—ওহে মহাবাহু, তুমি না শরণাগতকে রক্ষা করিবে বলিয়া দুই বাহু প্রসারিয়া বসিয়া আছ? এই কি তোমার শরণাগতের রক্ষা? হায় প্রভু, আমি যে সকল ছাড়িয়া তোমাকেই সার করিয়াছি, তোমারই শরণ লইয়াছি, তাহা কি তুমি জান না? আজ সেই আমারই প্রতি তোমার যখন এতই উপেক্ষা, তখন তুমি যে কত শরণাগত-প্রতিপালক, তাহা ভালই বুঝা গিয়াছে। আজ তোমার প্রভুপণাও জানিলাম, আর তুমি তোমার ভৃত্যের প্রতি যে কতই করুণ, তাহাও জানিলাম। মণিদাস এই বলিয়া অভিমানভরে সেই নারিকেলমালার করতালযুগল শ্রীপ্রভুর সম্মুখে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ত্বরিতপদে চলিয়া গেল। হায়, প্রভু আমার প্রতি

উদাস হ'য়েছেন, তবে আর আমার আশা-ভরসা কিসের, এই ভাবিয়া উদাস-প্রাণে সে একটা মঠে যাইয়া প্রবেশ করিল এবং ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিয়া শয়ন করিয়া রহিল। দেখিতে-দেখিতে দিবা অবসান হইয়া গেল। শ্রীপ্রভুর সন্ধ্যা-ধূপ (রাত্রিকালের ভোগ) আরম্ভ হইল। মণিদাস মনের বিরসে আর শ্রীমন্দিরে গমন করিল না, অন্নাদিও কিছুই ভোজন করিল না, উপবাসেই শয়ন করিয়া রহিল। অধিক রাত্রে শ্রীহরির শয়নলীলাদি সমস্ত সেবা সমাপ্ত হইয়া গেল। ভাণ্ডারঘর বন্ধ হইল। দেউল 'নিশোধ' (জনমানবশূন্য) করা হইয়া গেল। কবাট বন্ধ করিয়া সেবকগণ যে যাহার আলয়ে চলিয়া গেলেন। এদিকে ভক্তবৎসল ভগবান্ পুরীরাজের প্রাসাদ অভিমুখে বিজয় করিলেন। রাজা তখন নিদ্রায় অভিভূত। শ্রীপ্রভু তাঁহাকে স্বপ্নযোগে আজ্ঞা করিলেন,—রাজন্! তোমাকে তো বড়ই অজ্ঞানে মত্ত দেখিতেছি। তুমি তোমার রাজ্যের লাভ-লোকসান কিছুরই খবর রাখ না। দেখ, আমার পরম ভক্ত মণিদাস প্রতিদিন জগমোহনে আসিয়া নারিকেলমালার করতাল বাজাইয়া কত নাচগান করিয়া থাকে। আমিও তাহাতে কতই আনন্দ পাইয়া থাকি। সে আনন্দের কথা কি বলিব। যেমন কাহারও পাঁচ-সাতটী ছেলে আছে। তাহার মধ্যে যেটী সর্ব্বকনিষ্ঠ—এখনও বৎসর পূরে নাই, সে যেমন পা ঘেঁসিয়া আসিয়া অমৃত-সমান আধোআধো বচনে পিতামাতার আনন্দ বর্দ্ধন করে, মণিদাস আমার কাছে আসিয়া নাচিলে-গাহিলে আমি তাহার

অপেক্ষা অনেক অধিক আমোদ উপভোগ করিয়া থাকি। ভক্ত যখন প্রেমভরে ঢলিয়া-ঢলিয়া আমার সম্মুখে নাচিতে থাকে, আমার তখন সেই শিশুর চরণ-চালনের অপেক্ষাও তাহা সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। ভক্তের গদগদ অস্ফুট কণ্ঠস্বর আমার সেই শিশুর আধোআধো বাণীর অপেক্ষাও সুমধুর বলিয়া মনে হয়। আহা মহারাজ! আজ তোমার পুরাণপণ্ডা আমার সেই কনিষ্ঠ-কুমারের মত প্রিয়তম মণিদাসকে আমার সম্মুখ হইতে মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। বাছা আমার সেই যে অভিমানভরে চলিয়া গিয়াছে, আর আমার সম্মুখে আসে নাই। তাই, আমারও আজ মনে একটুকুও সুখ নাই—খাওয়া-দাওয়াও হয় নাই। তাহার অভাবে আমি যেন চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি। ক্ষণে-ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছি। তুমি এক কার্য্য কর,—আমার সেই প্রাণাধিক প্রিয়তম ভক্ত মণিদাসকে ডাকাইয়া আন এবং সম্মান-গৌরব-সহকারে স্বয়ং তাহাকে জগমোহনে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও, আর সকলকে বলিয়া দাও,—কেহ যেন তাহার নর্ত্তন-কীর্ত্তনে বাধা না দেয়। সে আবার আনন্দভরে নাচিতে-গাহিতে আরম্ভ করুক। আমারও প্রাণ বিমল আনন্দে মাতিয়া উঠুক। তবে আমি আবার আহার করিব। রাজন্, আমার এই কথা অকাট্য সত্য বলিয়া জানিও। তোমাকে আরও একটী কথা বলি,—আমার এই যে জগমোহন, ইহা ভক্তজনের হিতের নিমিত্তই বিশ্বকর্ম্মা আনন্দ-মনে নির্ম্মাণ করিয়াছে। ভক্তগণের স্বচ্ছন্দ-নর্ত্তনকীর্ত্তনের জন্যই ইহার এত বিস্তৃতি। নানা দেশের ভক্ত-

সকল জগমোহনে আসিয়া আমার রক্তিম অধরের দিকে চাহিয়া-চাহিয়া—আমার চরণকমল ধ্যান করিয়া-করিয়া করতালাদি বাজাইতে-বাজাইতে নানা রঙ্গে নৃত্য করিতে থাকিবে,—আমার নাম-গানে আপনি মাতিয়া অপরকে মাতাইতে থাকিবে,—ভাবভরে গড়াগড়ি দিতে থাকিবে,—আবার উঠিয়া কপালে যুগলকর রাখিয়া অনেক স্তবস্তুতি করিতে থাকিবে,—সুখতুঃখের সকল কথা জানাইতে থাকিবে, ইহাতে তাহাদেরও আনন্দ, আমারও আনন্দ। আর এই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্যই তজগমোহন? আজি হইতে পুরাণপণ্ডা আর যেন আমার জগমোহনে পুরাণপাঠ না করে। পড়িতে হয় তো লক্ষ্মীর মোহনে যাইয়া প্রতিদিন পুরাণ পাঠ করুক। আমার ভক্তকে অপমান করা—তাড়াইয়া দেওয়া আমি অমনি-অমনি কিছুতেই সহিতে পারিব না।

পুরীরাজকে এইরূপ আদেশ দিয়া—পুরুষোত্তম জগন্নাথ ভক্ত মণিদাসের নিকটে বিজয় করিলেন। তাহার শীর্ষস্থানে গিয়া সুমধুর স্নেহ-সম্ভাষণে বলিলেন,—প্রিয়তম মণিদাস! তুমি উপবাসে রহিয়াছ কেন? আমার যে বড় কষ্ট হইতেছে। দেখ, তোমার উপবাসে আমিও উপবাসী রহিয়াছি। অভিমান ছাড়,—উঠ,—ভোজন কর। তোমার অপমানের উপযুক্ত প্রতিশোধের বন্দোবস্ত করিয়াছি। কল্য প্রাতেই তাহা জানিতে পারিবে। শ্রীনিবাস মণিদাসকে এইরূপে আশ্বাসবচনে আনন্দিত করিয়া শ্রীদেউলে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। মণিদাসও প্রভুর আদেশ অমান্য করিতে পারিল না। দয়াময়ের দয়া দেখিয়া তাহার

অভিমান ছুটিয়া গেল। সে আনন্দমনে প্রভুর গুণ গাহিতে-গাহিতে মহাপ্রসাদ ভোজন করিল। বলা বাহুল্য,—এই প্রসাদ-গুলি শ্রীপ্রভুই তাঁহার প্রিয়তম মণিদাসের জন্য ধড়ার অঞ্চলে বাঁধিয়া আনিয়াছিলেন।

এদিকে নৃপতির নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি চারিদিক্ চাহিয়া দেখিলেন,—দুই হস্তে চক্ষু মুছিয়া আবার চাহিয়া দেখিলেন,—সে প্রকোষ্ঠে জনমানবও নাই। মনে মনে বিচার করিলেন,—অহো, নিশ্চয়ই করুণাময় জগবন্ধু করুণা বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। তিনি তখনই শয্যাত্যাগ করিয়া বহির্ব্বাটীতে আগমন করিলেন এবং পাত্রমিত্রদের ডাকাইয়া সকল কথা বলিয়া-কহিয়া বেগবান্ অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক অবিলম্বে পুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বেলা তখন প্রায় একপ্রহর, এমন সময় নরনাথ শ্রীজগন্নাথের দেউলের সম্মুখে—যে মঠে মণিদাস অবস্থান করিতেছিল, সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সাদর সম্ভাষণে মণিদাসকে আপ্যায়িত করিলেন। কোলে বসাইয়া অনেক গৌরব-সংবর্দ্ধনা করিলেন এবং হস্তে ধরিয়া শ্রীমন্দিরে লইয়া চলিলেন। তারপর পরমাদরে জগমোহনের মধ্যে লইয়া গিয়া তাহার মাথায় পাটশাড়ী বাঁধিয়া দিলেন, বলিলেন,—ওহে মণিদাস, তুমি একবার তোমার নারিকেলমালার করতাল বাজাইয়া নৃত্য-গীতি কর দেখি। শ্রীপ্রভুরও আনন্দ হউক, আমরাও আনন্দিত হই। করতালের কথা উঠিবামাত্র জগন্নাথের জনৈক সেবক মণিদাসের পরিত্যক্ত নারিকেলমালার করতাল-যুগল আনিয়া দিলেন। সে-ও আনন্দে

অধীর হইয়া ‘ঢমালী’ গান (খুব রসের মাতামাতির গান) ধরিয়া মহা নৃত্য জুড়িয়া দিল।

মহারাজের আদেশে সেই দিন হইতে পুরাণপণ্ডার জগমোহনে বসিয়া পুরাণ-পাঠ মানা হইয়া গেল। শ্রীমন্দিরের উত্তরপশ্চিমদিকে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর শ্রীমন্দির। সেই মন্দিরের মোহনে (দরদালানে) পুরাণপণ্ডার পুরাণ-পাঠের স্থান নিরূপিত হইল। ভক্ত মণিদাসকে উপলক্ষ করিয়া ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার জগমোহন ভক্তগণের স্বচ্ছন্দে নর্ত্তন-কীর্ত্তনের জন্য চির উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।

এ ঘটনা কতদিনের ঠিক বলা যায় না। কেননা উৎকল-কবি রামদাস কিম্বা অন্য কেহ তাহা স্পষ্ট করিয়া কিছুই লেখেন নাই। কিন্তু অদ্যাবধি এই নিয়ম অনুসৃত হইয়া আসিতেছে।

অহো ভগবন্! ধন্য তোমার ভক্তবাৎসল্য। তুমি ভক্তের জন্য কি না করিয়া থাক? ভক্তের ভাবের লোভে তুমি আপন সম্মুখ হইতে পুরাণপাঠও মানা করিয়া দিলে?—মালাকারের মালা বাজাইয়া নৃত্যগীতির নিকটে ব্রাহ্মণ পুরাণপণ্ডার পুরাণব্যাখ্যাও অপকৃষ্ট করিয়া দিলে? ভাবগ্রাহি জনার্দ্দন, তুমি ধন্য! আর অহো ধন্য আমরা! যিনি জাতি-কুল ধনসম্পদ্ বিদ্যা-বুদ্ধি প্রভৃতি কিছুরই অপেক্ষা না করিয়া কেবল একটু ভালবাসার বশীভূত,—একবার নাম লইয়া নাচিলে-গাহিলেই গলিয়া যান,—এমন প্রভুকেও আমরা ভুলিয়া আছি? আমাদের গতি কি হইবে প্রভু?

রাম বেহারা

রাম বেহারার বাড়ী কনকাবতীপুরে। কনকাবতীপুর একটী নগর—গোদাবরীতীরে অলকাপল্লী-নামক দেশে অবস্থিত। রাম-বেহারা জাতিতে মুচি। তাহার ভার্য্যার নাম মূলী। সে বড় পতিভক্ত। একটী পুত্র, সে-ও পিতামাতার একান্ত অনুরক্ত। এই তিন জন লইয়া তাহাদের সংসার। রাম বেহারা নিত্যই চর্ম্মপাদুকা তৈয়ারি করিয়া বাজারে বিক্রয় করিয়া আনে এবং তাহাতেই পরম সুখে জীবন যাপন করে। নীচ মুচি হইলে কি হয়, তাহাদের অন্তঃকরণ বড় ভাল। অতিথি-অভ্যাগতকে হাত তুলিয়া কিছু দেওয়া আছে, সকল জীবে দয়া আছে, হরি-ভজনও করা আছে। রাম বেহারার মুখে গীতগোবিন্দের পদ তো লাগিয়াই আছে। সে যে কোন কাজই করুক না কেন, গুন্-গুন্-গুন্-গুন্ করিয়া গীতগোবিন্দের পদ গাওয়ার আর তাহার বিরাম নাই। বেচারী লেখাপড়া জানে না, গীতগোবিন্দ কখনও পড়ে নাই। কাহারও মুখে শুনিয়া যাহা শিখিয়াছে—শুদ্ধ হ'ক অশুদ্ধ হ'ক তাহার অনুসন্ধান নাই—সে জোড়া-তাড়া দিয়া একরকম দাঁড় করাইয়া একটী পদ আপনার আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে, আর ভক্তিভরে সেইটীরই অনুক্ষণ সুর করিয়া আবৃত্তি চলিতেছে। সে পদটীর মূর্ত্তি এইরূপ,—

"সধীরে সধীরে সমীর। বহই যমুনার তীর॥
শ্রীবৃন্দবন বালীকূদ। যহি জন্মিত প্রেমানন্দ॥
বসতি বনে বনমালি। চিন্তি শ্রীরাধাকৃষ্ণ-কেলি॥

বলা বাহুল্য, এই পদটী শ্রীজয়দেব-বিরচিত গীতগোবিন্দের—"ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী"—এই পদের বিকৃত মূর্ত্তি। তা হউক, ভাবগ্রাহি-জনার্দ্দনের কাছে তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। মূর্খে 'বিষ্ণায়' বলিয়া প্রণাম করে, পণ্ডিতে 'বিষ্ণবে' বলিয়া প্রণত হইয়া থাকেন, কিন্তু ফল উভয়েরই তুল্য। ভগবান্ তো আর ব্যাকরণ-অভিধান দেখেন না;—অন্তরের বিশুদ্ধ ভাবেরই প্রতি তাঁহার দৃষ্টি। রাম বেহারার সরল প্রাণের এই গীতগোবিন্দ-গানে ভগবানের প্রাণে বড়ই আনন্দ হইত। তাঁহার আনন্দ হইত বলিয়াই বর্ণবহির্ভূত দরিদ্র বেহারার অন্তরেও আনন্দের আর অভাব হইত না।

একদিন সেই দেশের এক বড় লোকের বাড়ীতে চুরি হইল। চোরেরা তাঁহার ঘরে ধনরত্ন যাহা ছিল সকলই লইয়া পলাইল। এমন কি ঠাকুরঘরের দেবসিংহাসনটীও ছাড়িয়া যায় নাই। তাহারা অপহৃত সামগ্রী বিভাগের সময় বস্ত্রাবৃত দেবসিংহাসনটী বিভাগের জন্য বাহির করিল। মনে করিল—এতে কি-না-কি সামগ্রীই আছে। বস্ত্রাবরণ খুলিয়া দেখিল—দূর ছাই—এ যে কতকগুলা পাথরের নুড়ী! ফেলে দে, ফেলে দে, বলিয়া একজন সেগুলিকে দূর করিয়া ফেলিয়া দিল। হতভাগ্যেরা তো জানে না যে, এগুলি সেই মুনিঋষির দুর্ল্লভ ভক্তি-মুক্তির

একমাত্র প্রদাতা শ্রীহরির শালগ্রাম-মূর্ত্তি। সেই চোরের দলের একটী লোকের কিন্তু সেই শিলার প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি পড়িয়া গেল। সে দেখিল শিলাটী বড় সুন্দর ;—

"অতি পৃথুল মনোহর। লাবণ্য শিলা দামোদর॥
অঞ্জন-কলারু চিক্কণ। ঝলিরে অমূল্য দর্পণ॥
তমালদল নব-ঘন। কালিন্দীজলর সমান॥
ধিক করই ভৃঙ্গশ্রেণী। জ্যোতি নিন্দই নীলমণি॥
কস্তূরী-কলা ধিক্কারই। সমান এ সংসারে নাহিঁ।"

শিলাটী দামোদর-শিলা। আকারে যেমন বড়-সড়, দেখিতেও তেমনি মনোহর। লাবণ্য যেন গড়াইয়া পড়িতেছে। চাকচিক্যই বা কত, যেন একখানি অমূল্য দর্পণ। উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ। অঞ্জন বল, তমালের দল বল, নবীন মেঘ বল, কালিন্দীর জল বল, তাহার উপর চেক্‌নাই চড়িলে যেমন কাল হয়, এ কাল সেইরূপ কাল। তাহার উজ্জ্বল জ্যোতি ভৃঙ্গশ্রেণীকে ধিক্কার করে, নীলমণিকে নিন্দা করে, কস্তূরীকেও লজ্জিত করে। বলিতে কি, এ সংসারে তাহার তুলনা মিলে না। সেই চোর শিলা-সমষ্টির মধ্য হইতে এই দামোদর-শিলাটী বাছিয়া লইল। মনেমনে ভাবিল,—এই শিলা লইয়াই ঘুরিয়া বেড়াইব। শুধু শুধু মাগিলে কেহ তো বড়-একটা কিছু দিবে না ; শিলা সঙ্গে থাকিলে ভিক্ষায় প্রচুর লাভ হইবে। আমি আর এ শিলা কিছুতেই ছাড়িতেছি না। এই বলিয়া সে শিলাটী নিজের আলয়ে লইয়া গেল।

যে চোর—পরের সঞ্চিত ধন অপহরণ করিয়া জীবন যাপন করে, তাহার শালগ্রাম-শিলা লইয়া দ্বারেদ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া ভ্রমণ করা ভাল লাগিবে কেন? চুরির মত একটা চুরি করিতে পারিলেই যে তাহার সংবৎসরের খোরাক যোগাড় হইয়া গেল। সুতরাং তাহার আর পরামর্শমত কার্য্য করা হইল না—শালগ্রাম লইয়া ঘুরিয়া বেড়ান পোসাইল না। একবার তাহার একজোড়া পাদুকার দরকার। সে ভাবিল, দেখি যদি এই চক্‌চকে নুড়িটীর বদলে মুচির নিকট হইতে জুতা-জোড়াটী আদায় করিতে পারি। সে পাষণ্ডের তো আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই,—অনায়াসেই সে সেই শালগ্রাম-শিলাটী লইয়া রামবেহেরা মুচির মন্দিরে গমন করিল। গিয়া বলিল,—ওহে মুচির পো! ছাখ, কেমন একটী নুড়ী এনেছি, একবার তোমার যন্ত্র-টন্ত্র ঘ'ষে ছাখ, এমন শক্ত পাথর আর জন্মায় না। কিন্তু বাপু, ব'লে রাখ্‌চি, আমাকে একজোড়া ভাল দেখে 'চিপুলি' (জুতা) দিতে হইবে।

ভক্ত রামবেহেরা তখন ঘাড় নাড়িয়া-নাড়িয়া—'সধীরে সধীরে সমীর' গাহিতেছিল। সে আস্তেব্যস্তে হস্ত পাতিয়া শিলাটী গ্রহণ করিল। ভাল করিয়া দেখিতে-দেখিতে শিলা তাহার নয়ন-মন ভুলাইয়া ফেলিল। সে দেখিল,—আহা হা হা, এ যে সাক্ষাৎ মরকত-মণি! সামান্য শিলার কি এত লাবণ্য হয়? রামবেহেরা পরমাদরে দামোদর-শিলাটী রাখিয়া দিল এবং তাহাকে প্রার্থিত পাদুকা দিয়া বিদায় করিল। সেই দিন হইতে রামবেহেরা আর সাবেক পাথর-নুড়ি স্পর্শ করে

না ; যন্ত্র শাণাইতে হয় তো সেই শিলাতেই শাণাইয়া লয় ; চামড়া কাটিতে হয় তো সেই শিলার উপরেই রাখিয়া কাটে ; কিছু ঘষাঘষি করিতে হয় তো সেই শিলারই উপর ঘষিয়া থাকে। সেই দিন হইতে তাহার গীতগোবিন্দ-গানের মাত্রাটাও যেন আরও কিছু বাড়িয়া গেল।

এইরূপে কিছুদিন যায়, একদিন এক ব্রাহ্মণ সেই পথ দিয়া নদীতে স্নান করিতে যাইতেছেন। ব্রাহ্মণ বড় বিষয়ী, কিন্তু সদাচারনিষ্ঠ, নানা শাস্ত্রে বিচক্ষণ এবং বিষ্ণুপূজা-পরায়ণ। যাইতে-যাইতে হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি রামবেহেরার দিকে পড়িল। তিনি দেখিলেন,—সে একটী বর্ত্তুল কৃষ্ণোপল পায়ে চাপিয়া জল দিয়া অস্ত্র শাণাইতেছে। শিলাটীর বর্ণের একটু বিশেষত্ব ছিল। তাই ব্রাহ্মণ সেই শিলার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। দেখিয়া আর তাঁহার বিস্ময়ের সীমাপরিসীমা রহিল না। তিনি যেন কতকটা থতমত খাইয়া গেলেন। ভাবিলেন,—কি আশ্চর্য্য ; এই সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন শালগ্রামশিলার উপর কি না অবোধ মুচী অস্ত্র শাণাইতেছে ? হায় হায় ! কি সর্ব্বনাশ,—কি সর্ব্বনাশ !

ভাবিতে-ভাবিতে ব্রাহ্মণের নেত্র দিয়া অজস্রধারে অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল ;—তাঁহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না ; চোখের জল মুছিয়া, আত্মভাব গোপন করিয়া, রামবেহেরার নিকট গমন করিলেন। গিয়া বলিলেন,—ওহে বেহেরা ! তোমার কাছে আমার কিছু প্রার্থনা

আছে, পূরণ কর তো প্রভূত পুণ্য উপার্জ্জন করিবে। আহা দেখ, তোমার ঐ শিলাটী বড় সুন্দর; দেখিলে আর নয়ন ফিরানো যায় না। তা বাপু, আমি ব্রাহ্মণ, আমার ঐ শিলাটী দেখিয়া বড় লোভ জন্মিয়াছে; তুমি ঐটি আমাকে দান কর। আমি চিরদিন তোমার যশোঘোষণা করিয়া বেড়াইব।

রামবেহেরা তাহার গীতগোবিন্দ-গান একটু থামাইয়া বলিল,—ঠাকুর! ও কি কথা বলেন? শিলাটী আমার টাকার মাল,—কাজের জিনিষ! আপনাকে এটি দিলে আমার অস্ত্র শাণানো-টানানো চোল্‌বে কিসে বলুন? ব্রাহ্মণ অমনি ট্যাঁক হইতে পাঁচটী টাকা বাহির করিয়া ঝন্‌ঝন্ করিয়া তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন,—ভাল, তোমার টাকার মাল তো এই টাকা পাঁচটী লও; শিলা কি আর জুটিবে না,—না, তোমার আর নাই-ই? তাতেই তুমি কাজ চালিও। কি জান, শিলাটী দেখে আমার বড় লোভ হ'য়ে প'ড়েছে; তাই পাবার এত আগ্রহ।

ব্রাহ্মণের কথার অবকাশে রামবেহেরা "সধীরে সধীরে" গান ধরিয়াছিল; শিলাটী ছাড়িতেও তাহার প্রাণ চাহিতেছিল না। কিন্তু সে তো আর ধনবান্ নয়; রোজমজুরি ক'রে কোন রকমে দিন গুজরান্ করে মাত্র। চোখের সাম্‌নে পাঁচপাঁচটা টাকা! তাহার লোভ সে আর পরিত্যাগ করিতে পারিল না। কাজেকাজেই সে "সধীরে সধীরে" গান থামাইয়া আম্‌তা-আম্‌তা করিতে করিতে শিলাটী ব্রাহ্মণ-ঠাকুরের হস্তে তুলিয়া দিল।

ব্রাহ্মণের আর আনন্দের সীমা নাই। তিনি পরমাদরে

শিলাটী মাথায় করিয়া লইয়া আপন আবাসে প্রত্যাগত হইলেন। আসিয়া কূপোদকে স্নান করিলেন। পবিত্রভাবে সেই শিলাকে পঞ্চামৃতে স্নান করাইলেন। সিংহাসনে বসাইয়া প্রথমত তুলসী-দল পুষ্প-মাল্য গন্ধ-চন্দন ধূপদীপ-নৈবেদ্য দিয়া সাধারণভাবে পূজা করিলেন। তারপর আবার ষোড়শ উপচার এবং বিবিধ উপাদেয় নৈবেদ্য নিবেদন পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। পূজান্তে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণতি স্তবস্তুতি ও নৃত্য-গীতি করিয়া আনন্দ-নিমগ্ন হইলেন। সেই দিন বলিয়া নয়, ব্রাহ্মণ প্রতিদিনই আনন্দ-মনে সেই দামোদরশিলার বিবিধ বিধানে পূজা-আরাধনা করিতে থাকিলেন।

ব্রাহ্মণ বাহ্যতঃ ভগবানের পূজা করেন বটে, কিন্তু তাঁহার সেই পূজার ভিতর কিঞ্চিৎ ব্যবসাদারী ছিল। তিনি মনেমনে ভগবানের কাছে ঐশ্বর্য্য ভিক্ষা করিতেন। ভগবানের তাহা ভাল লাগিল না। চারিদিন না যাইতে-যাইতে সরল রামবেহেরার কাছে যাইবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি তাহার সেই গীতগোবিন্দ-গান ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—হউক রামবেহেরা মূর্খ, কিন্তু তাহার অন্তঃ-করণ অতি পবিত্র। সে উদর-ভরণের অতিরিক্ত আর কিছুই চাহে না, কল্পনার ছলনায় তাহার মন স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায় না। উদরভরণোপযোগী শাকান্নেই তাহার পরা পরিতৃপ্তি। তাহার উপর, শুদ্ধ হউক, অশুদ্ধ হউক, আমার নামগানেই সে অহরহ মত্ত হইয়া আছে। আহা, সে যখন

গীতগোবিন্দ গাহিতে-গাহিতে আমার মস্তকে জল দিয়া অস্ত্র ঘর্ষণ করিত, আমার মনে হইত—সে যেন আমায় পুরুষসূক্ত-মন্ত্র পড়িয়া স্নান করাইয়া অঙ্গ মুছাইয়া দিতেছে। আহা, সে যখন গীত-গোবিন্দ গাহিতে-গাহিতে পাষাণের উপর অন্ন রাখিয়া আমাকে দিয়া বাটিয়া লইত, আমার মনে হইত—সে যেন আমাকে শাস্ত্রীয় মন্ত্রে পবিত্র পায়সান্ন নিবেদন করিতেছে। আহা, সে যখন গীতগোবিন্দ গাহিতে-গাহিতে আমার মস্তকে পদার্পণ পূর্ব্বক চর্ম্ম কাটিতে প্রবৃত্ত হইত, আমার মনে হইত—সে যেন প্রীতির ভাষায় আমার অঙ্গ-কণ্ডূতির নিবৃত্তি করিতেছে। সে মূর্খ হউক, আমার আদর কদর না জানুক, কিন্তু তাহার বিশুদ্ধ ভাবে আমি তাহার কাছে পরাভব স্বীকার করিয়াছি, ভাব-মূল্যে সে আমায় কিনিয়া লইয়াছে। আর এই ব্রাহ্মণ আচার-পূত পণ্ডিত হইলে কি হয়, বিবিধ মন্ত্রে নানা উপচারে আমার পূজা করিলে কি হয়, ইহার ভাব তো ভাল নয়; ও ভাবহীন ভালবাসা আমার ভাল লাগে না। যে আমার জন্য আমাকে না ভজিয়া বিষয়বিভবের জন্য আমাকে ভজনা করে—ভালবাসা জানায়, তাহার ভালবাসা কি আর আমাকে ভালবাসা? সে ভজনা বা ভালবাসা বিষয়েরই ভজনা—বিষয়েরই প্রতি প্রীতি-প্রকাশ। আমার প্রতি অন্তরের টান থাকিলে, ভজনার রীতি না জানিয়াও আমায় ভজনা করা হয়,—আমাকে ভালবাসা হয়, আর অন্তরের টান বিষয়ের দিকে থাকিলে, ভজনার রীতি জানিয়া-শুনিয়াও আমায় ভজনা করা হয় না,—আমাকে ভালবাসা

হয় না। আমার রাজ্য ভাবের রাজ্য ;—বিশুদ্ধ ভাব লইয়াই এ রাজ্যের কারকারবার। ভাবহীন ব্রাহ্মণের গৃহে আর আমি থাকিব না ; যাই—সেই ভাব-বিভোর বেহেরার গৃহে চলিয়া যাই। ভগবান্ এই ভাবিয়া একদিন রাত্রিকালে ব্রাহ্মণকে স্বপ্ন দিলেন,—দেখ, তুমি কল্য রজনীপ্রভাতেই আমাকে লইয়া রাম-বেহেরার কাছে ফিরাইয়া দিয়া আসিতে চাও। তাহার বিশুদ্ধ ভাবে আমি বিমুগ্ধ হইয়াছি। তোমার এ ভাবহীন আড়ম্বরের পূজা আমার ভাল লাগিল না। তাহার ভাবময় গীতগোবিন্দ-গানে আমার যে আনন্দ, তোমার ভাবহীন স্তবস্তুতি নর্ত্তনগীতির মধ্যে তাহার ক্ষীণ আভাসও পরিলক্ষিত হয় না। আমার আশীর্ব্বাদে তোমার ঐশ্বর্য্যকামনা পূর্ণ হইবে। তুমি সত্বর আমাকে সেখানে রাখিয়া আইস, নচেৎ তোমার সর্ব্বনাশ জানিও।

ব্রাহ্মণ স্বপ্ন দেখিয়া ভীতিভরে থরথর কাঁপিয়া উঠিলেন। তাঁহার হৃদয় দুরুদুরু স্পন্দিত হইতে লাগিল। প্রাতঃকাল হইবা-মাত্র তিনি স্নানাদি সমাধা করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সেই শালগ্রামশিলা লইয়া রামবেহেরার গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। গিয়া দেখিলেন, সে আপন-মনে গীতগোবিন্দ-গানে মজিয়া আছে। তিনি তাহার সম্মুখে শিলাটী রাখিয়া দিয়া বলিলেন,—ওহে রামদাস, এই নাও তোমার ধন তুমি নাও। অহো, তোমার জীবন ধন্য। তুমি ভগবান্‌কে বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছ। এই নাও তোমার শিলা তুমি গ্রহণ কর। ইঁহাকে তুমি সামান্য শিলা মনে করিও না।—

"এহি সে অনাদি নরহরি। সকল ঘটে চ্ছন্তি পুরি॥
এহি সে জীবর করতা। এহি সে গতি-মুক্তি-দাত্তা॥
এহাঙ্ক পাদ আশ্রে কলে। জীব নিস্তার হেব ভলে॥"

ইনি সেই অনাদি নরহরি। ইনিই সর্ব্বঘটে সর্ব্বদা বিরাজমান রহিয়াছেন। ইনিই সেই সকল জীবের কর্ত্তা। ইনিই সেই গতি ও মুক্তির প্রদাতা। ইঁহারই পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে জীব অনায়াসে নিস্তার লাভ করে। ইনি তোমার বিশুদ্ধ ভাবে ও গীতগোবিন্দ-গানে তোমার কাছে—আত্ম-বিক্রয় করিয়াছেন। তাই আমাকে স্বপ্ন দিয়া আবার তোমার কাছে আগমন করিলেন; তুমি প্রস্তরবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাণভরিয়া ইঁহার পূজা কর। আমি মহাপাতকী, আমার সে ভাগ্য নাই, আমার পূজা ইঁহার পছন্দ হইল না। অহো রামদাস, তোমার জীবন পবিত্র হইয়া গেল। তুমিই ভবসাগরের পর-পারে গমন করিলে,—ভগবানের একান্ত ভক্ত বলিয়া গণ্য হইলে।

ব্রাহ্মণের কথাগুলি শুনিবামাত্রই কেমন রামদাসের দিব্য জ্ঞানের উদয় হইল। সে অনেক কাকুতিমিনতি করিয়া তাঁহার চরণে প্রণতি জানাইল। ব্রাহ্মণ তাহার সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে-করিতে চলিয়া গেলেন, সে-ও ভক্তিভরে গীতগোবিন্দ গাহিতে-গাহিতে শালগ্রামশিলা লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। গৃহে গিয়া তাঁহাকে দিব্য আসনে বসাইল। সম্মুখে শতশত দণ্ডবৎ প্রণাম করিল। চন্দনচর্চ্চিত তুলসীদল দিয়া—যা মনে আসিল তাই বলিয়া আনন্দমনে পূজা করিতে লাগিল। এইরূপ কিছুক্ষণ পূজা

করিয়া সে আর গুন্‌গুন্‌ করিয়া নয়, গলা ছাড়িয়া গীতগোবিন্দের গাহনা জুড়িয়া দিল। তারপর ভাববিভোল হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাইল,—হে প্রভু! আমি অতি অজ্ঞান—অতি দুর্জ্জন পতিত হীন ব্যক্তি। দিবারাত্রি চর্ম্ম কাটাই আমার কর্ম্ম। শৌচ নাই,—সদাচার নাই। গাত্রের দুর্গন্ধে প্রেতও পলায়ন করে। হায় প্রভু, মন্দমতি আমার মদ্যই হইল উপাদেয় খাদ্য। এহেন অস্পৃশ্য প্রাণীর প্রতি তুমি কি করিয়া করুণা বিস্তার করিলে বল দেখি? ইহা হইতেই জানিতেছি যে, তুমি যথার্থ ই করুণাময়—যথার্থ ই পতিতপাবন।

রামবেহেরা ঐদিন হইতে জাতীয় কর্ম্ম সমস্ত পরিত্যাগ করিল। পরিধানে ডোর-কৌপীন, কণ্ঠে তুলসীর মালা, করমূলে কঙ্কণ, চরণে ঘুঙঘুর ধারণ করিয়া করতাল বাজাইয়া উচ্চকণ্ঠে গীতগোবিন্দের পদ নাচিয়া-নাচিয়া গাহিতে লাগিল। আহা, সে যখন ভাবে গদগদ হইয়া নৃত্য করে, তখন আর তাহাকে অশুচি মুচি বলিয়া মনে হয় না; সে যেন কোন একজন প্রেমিক বৈষ্ণব প্রেমের প্রাবল্যে হেলিয়া-দুলিয়া নাচিতেছে! নর্ত্তন-সময়ে তাহার নয়ন দিয়া অনর্গল প্রেমাশ্রু নির্গলিত হইতে থাকে; পুলকে-পুলকে সকল অঙ্গ ছাইয়া ফেলে। সে কখনও থাকিয়া-থাকিয়া কাঁপিয়া উঠে; কখনও বা স্থাণুর মত স্থির হইয়া রহিয়া যায়; আবার কখনও মহা হুহুঙ্কার ছাড়িয়া লাফাইতে থাকে। সে কখনও হাহা-হাহা করিয়া অট্টহাস্যের উৎস ছুটাইয়া দেয়, কখনও বা ক্রন্দনের করুণ রোলে হৃদয়ের বেদন বেদন করে, আর কখনও

বা দুইটি হাত উর্দ্ধে তুলিয়া অন্তরের কথা জানাইতে থাকে। তখন বলে,—কম্পিত-কাতর-কণ্ঠে বলে,—ওহে ও বংশীবদন মদনমোহন! তোমায় নমস্কার নমস্কার। তোমার ঐ মদন-কদন বদনখানি কি আমায় একবার দেখাইবে না? ঐ সাগর-ছেঁচা-মাণিক-মাখা—ঐ চাঁদনিংড়ানো-অমিয়মাখা—ঐ টুক্‌টুকে ঠোঁটে হাসিটুকুমাখা মুখখানি কি একবার দেখাইবে না? জানি, জানি প্রভু, আমার এ আশা, বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার আশা অপেক্ষাও দুরাশা;—জানি, জানি প্রভু, তোমার দর্শন লাভ সুরমুনিসজ্জনেরও সুদর্লভ;—জানি, জানি প্রভু, বিরিঞ্চি-শঙ্কর বাঞ্ছা করিয়াও বাঞ্ছানিধি তোমার দর্শনে বঞ্চিত হন; তখন ছার অস্পৃশ্য মুচি আমি কোথায়? কিন্তু চিন্তামণি, তোমায় যে সাক্ষাৎ না দেখিয়া, আমি আর থাকিতে পারিতেছি না। ঐ ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক বিকাশের মত অন্তরে একবার ভাসিয়া উঠিলে, আর সাধ মিটাইয়া দেখিতে-না-দেখিতে শূন্যেশূন্যে মিশিয়া গেলে, এ দেখায় তো আর মনকে বুঝাইয়া রাখা যায় না প্রভু? তুমি অধমতারণ করুণার প্রস্রবণ বলিয়াই বলিতে সাহস হয়,—প্রভু, একবার দয়া করিয়া আমার নয়নসমক্ষে কিছুক্ষণের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াও; আমি সাধ মিটাইয়া তোমায় দেখিয়া লই। ঠাকুর হে, তুমিই তো আমার সাহস বাড়াইয়া দিয়াছ,—সদাচার-পূত বর্ণগুরু ব্রাহ্মণের গৃহ ছাড়িয়া অশুচি মুচির গৃহে আসিয়া তুমিই তো আমার সাহস বাড়াইয়া দিয়াছ। আর যদি দেখা না-ই দিবে, তবে এখানে আসিবার দরকারই বা ছিল কি? না আসিলে তো আমি তোমায়

বিরক্ত করিতে সাহসী হইতাম না? তোমার ভয় নাই ঠাকুর, ভয় নাই; আমি তোমার কাছে ধন জন বিষয়-বৈভব ইন্দ্রত্ব-চন্দ্রত্ব কিছুই চাহিব না,—সিদ্ধি-ঋদ্ধি ভুক্তি-মুক্তি কিছুরই প্রার্থী হইব না,—তোমার ভক্তের অধিকৃত অপ্রমিত সম্পত্তির নিমিত্ত লালসা জানাইব না,—তোমার ভয় নাই ঠাকুর, ভয় নাই। তুমি একবার এস। আমি কাঙ্গাল বটে, কিন্তু আর কিছুর নয়, তোমারই কাঙ্গাল—একবার তোমায় দেখিবার কাঙ্গাল। দাও দাও প্রভু, একবার সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া এ কাঙ্গালের সাধ পূর্ণ করিয়া দাও।

এই ভাবেই তাহার শালগ্রাম-উপাসনা চলিতে লাগিল। ক্রমে শ্রীহরির সাক্ষাৎ দর্শনের উৎকণ্ঠা তাহার এতদূর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে, সে আহার-নিদ্রা সমগ্র ত্যাগ করিয়া ফেলিল। দিন নাই, রাত্রি নাই,—কেবল কথা,—হায় প্রভু! দেখা দাও, দেখা দাও। ভগবান্ তাহা জানিলেন।—

"সে প্রভু ভকত-বৎসল। ভকতভাব তার মূল॥
ন ঘেণে ক্রিয়া অভিমান। ন ইচ্ছে যজ্ঞ তপ দান॥
তীর্থব্রতরে নোহে বশ। কেবল মূলটী বিশ্বাস॥
নিষ্কাম শুদ্ধ বুদ্ধি যার। সে অটে বান্ধব তাহার॥
নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা তার নাহিঁ। জাতি অজাতি ভিন্ন কাহিঁ॥

জানিবেন না-ই বা কেন? সে প্রভু যে ভক্তবৎসল;—ভক্তের বিশুদ্ধ ভাবই যে তাঁহার একমাত্র প্রীতির সামগ্রী। তিনি কাহারও ক্রিয়া কিংবা অভিমান গ্রহণ করেন না, যজ্ঞ-তপ-দানেও অভিলাষ রাখেন না। তিনি কাহারও তীর্থপর্য্যটন বা ব্রতা-

নুষ্ঠানের বশীভূত নহেন, কেবল একমাত্র বিশ্বাসেরই বশীভূত। যাহার বুদ্ধি বিশুদ্ধ এবং কামনাশূন্য, সে-ই তাঁহার বন্ধু'। তা তাহার নিষ্ঠা বা প্রতিষ্ঠা থাকুক আর না-ই থাকুক, তৎপ্রতি তিনি লক্ষ্য রাখেন না; জাতি বা অজাতিরও ভেদ-বিচার করেন না।

ভাবগ্রাহী রামবেহেরার বিশুদ্ধ ভাবের আকর্ষণে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি এক ব্রাহ্মণ-রূপ পরিগ্রহ করিয়া তাহার গৃহে গমন করিলেন। গিয়া দেখিলেন,—সে ভাবভোলে ঢলিয়া-ঢলিয়া নৃত্য করিতেছে; কখনও বা ত্রিভঙ্গ হইয়া গীত-গোবিন্দের পদ গাহিতেছে, আর কখনও বা মাথা নাড়িয়া নাচিতে-নাচিতে কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীশালগ্রামের সমীপে গমন করিতেছে এবং বাতুলের মত কত কি আবোল-তাবোল বকিতেছে। ভক্তের এই ভাব দেখিয়া আনন্দময়ের আর আনন্দ ধরে না। তিনি মন্দমন্দ হাস্য করিতে-করিতে যেন একটু বিদ্রূপের ভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ওহে ও রামদাস! বলি ব্যাপারখানা কি? তোমার এত নাচুনি-কুঁদুনির কারণটা কি, একটু খোলসা করিয়া বল দেখি? বলি বাপুহে, দিন নাই রাত্রি নাই, এত গান গেয়েই বা মর কেন; সে কথাটাও একটু স্পষ্ট করিয়া শুনাইয়া দাও দেখি? বলি, এই বাজখাঁই গলাবাজিতে তুমি কাহাকেই বা রাজি করিতে চাও?—ইহার জবাব পাইলে প্রকৃতই প্রীতি লাভ করিব।

রামবেহেরার সংজ্ঞা থাকা আর না-থাকা যাঁহার হাত, স্বয়ং

তিনিই যখন জিজ্ঞাসুরূপে তাহার সংজ্ঞা সম্পাদনে যত্নপর, তখন তাহার সংজ্ঞা না হইবে কেন? তাহার সেই ভাব-বিভোর অবস্থায় অন্য কেহ আহ্বান করিলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু ভগবানের আহ্বানে তাহার সে ভাবের অভাব ঘটিল, সে ভিতরের রাজ্য হইতে বহিরের রাজ্যে আসিয়া পড়িল। নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিল,—সম্মুখে দিব্য ব্রাহ্মণমূর্ত্তি। দেখিয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিল এবং বিনীতভাবে বলিল,—ঠাকুর, আমি মহা মূর্খ মহা নারকী, আমার অপরাধ লইবেন না। আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবার যোগ্যতাও আমার নাই। তবে যথাঘটনা আপনার নিকটে নিবেদন করি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক যদি শ্রবণ করেন।

এই বলিয়া সে তাঁহার সমীপে সেই শালগ্রামশিলার প্রাপ্তি হইতে আরম্ভ করিয়া সেই ব্রাহ্মণের ফিরাইয়া দিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত সকল ঘটনাই বর্ণনা করিল। তারপর কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল,—ঠাকুর হে! সেই ব্রাহ্মণ আমায় যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছিলেন,—ওরে, তুই এই শিলাকে সাক্ষাৎ ভগবদ্‌বুদ্ধিতে পূজা কর্,—তাঁহার দেখা পাইবি। ঠাকুর, আমি মূর্খ মুচি বই তো নয়, পূজা-টুজা কিছুই তো জানি না, যা মনে আসে তাই বলিয়াই পূজা করিতে বসি, তারপর যে আমি কেমনতর হইয়া যাই, কিছুই জানি না, কি বলিতে কি বলি, কি করিতে কি-ই বা করি, কিছুই জানি না। সেই ব্রাহ্মণ যে বোলে গেলেন,—তুই এঁরি পূজা কর্ ভগবানের সাক্ষাৎকার পা'বি, সেই উৎকণ্ঠাময় আশাতেই আমি ইঁহার কাছে

উচ্চকণ্ঠে চেঁচাইয়া থাকি। হায় ঠাকুর! দিন তো ফুরায়ে এলো, দেখা কি তাঁর পাবো না? ওগো তুমি বোলে দাও,—দেখা কি তাঁর পাবো না? হায় হায় প্রভু, দেখা দাও, দেখা দাও।

এইরূপ বলিতে-বলিতে রামবেহেরা যেন উন্মত্তের মত অধীর হইয়া উঠিল। বোধ হয় তখনও পরীক্ষার শেষ হয় নাই; তাই ব্রাহ্মণরূপী ভগবান্ তাহাকে আশ্বাসের অমৃতসেচনে অভিষিক্ত না করিয়া অনাশ্বাসের বিষদিগ্ধ বাণীতে বলিলেন,—বাপু হে! তোমার আশাও তো কম নয় দেখিতেছি? যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র সুরেন্দ্রও সমাধিযোগে যাঁহার দর্শনলাভ করিতে পারেন না, নীচ মুচি হইয়া তুমি তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখিতে চাও? আমি বলি, তুমি এমন দুরাশায় বিসর্জ্জন দাও,—গরীবের ছেলে গতর খাটাইয়া খাও-দাও, স্ফূর্ত্তি করিয়া বেড়াও।

ব্রাহ্মণের বাক্যবাণে রামদাসের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। সে আর থাকিতে পারিল না, ছোট-মুখে দুইটা বড় কথা কহিয়া ফেলিল। সে যাঁহার গরবে গরবিত, বড় গলা করিয়া তাঁহার—সেই পরম করুণ পতিতপাবনের করুণার বড়াই গাহিতে প্রবৃত্ত হইল। বলিল,—

“শুন হে ব্রাহ্মণ-গোসাঞি। কথাএ কহিবই মুহি॥
স্বামীর স্নেহ যেবে হেব। তা পত্নী অসুন্দরী থিব॥
কাণী কুবুজী ছোটী কেম্পী। হোইন থিব সে যদ্যপি॥
কিছ্ছিহিঁ গুণ তা ন থিব। স্বামীর দয়া প্রবল হেব॥
বলে সে কোলে নেই থরি। সুভাগী বোলাএ সে নারী

কেড়ে সে হেউ রূপবন্তী। শ্রদ্ধা ন করে যেবে পতি॥
কিঁ হেবে যেতে গুণ থিলে। এহা বিচার কর ভলে॥
সে দয়ানিধি ভগবান। অবশ্য দেবে দরশন॥
নোহিলে মোর প্রাণ যিব। হত্যা তাহার পরে হেব॥"

ওহে ব্রাহ্মণ-গোঁসাই! আপনি যাহা বলিতেছেন, সকলই সত্য; তবুও আপনাকে একটা কথা বলি। স্বামী যদি ভালবাসে,—স্বামী যদি আদর করিয়া কোলে তুলিয়া লয়, পত্নী যতই কেন কুরূপা কুব্জা কাণা খোঁড়া হাতনূলা বা গুণহীনা হউক, তাহাকে সকলে "সৌভাগ্যবতী" বলিয়া থাকে। আর স্বামী যদি প্রীতিমমতার দৃষ্টিতে না দেখে, পত্নীর যতই কেন রূপ গুণ থাকুক, তাহাতে কিছুই ফলোদয় হয় না। দরকার হইল—স্বামীর দয়া লইয়া। ঠাকুর, বলিব কি; আমার স্বামী ত অগাধ দয়ার অপার বারিধি,—অশেষ গুণের গুণনিধি, তিনি আমায় দেখা দিবেনই দিবেন। যদি দেখা না-ই দিবেন, তবে তিনি জোর করিয়া এ অশুচি মুচির ঘরে আসিবেন কেন,—এ কদাচারী কদাহারীকে সকল ছাড়াইয়া তাঁহার নামে মাতাইবেন কেন? তাঁহার সেই আদর-দয়ার পরিচয় পাইয়াই সাহসে বুক বাঁধিয়া আছি—দয়াময় আমায় দর্শনদান করিবেনই করিবেন। আর যদি তাই-ই হয়,—তিনি যদি দেখা না দিয়া মর্ম্মপীড়ার মুর্ম্মুর-দাহে দগ্ধবিদগ্ধই করেন, তবে আমি এ জীবন আর রাখিব না;—আত্মহত্যার অপ্রমিত পাতক তাঁহার উপর চাপাইয়া,—প্রাণভরা ব্যাকুলতা লইয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিব,—তাঁহারই অদর্শন-অনলে আত্মাহুতি প্রদান

করিব। এইরূপে মরিয়া-মরিয়া কোন-না-কোন জন্মে তো তাঁহার সাক্ষাৎকার পাইব ?

এইরূপ বলিতে-বলিতে বাস্পবেগে রামদাসের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। উৎকণ্ঠার আতিশয্যে—নৈরাশ্যের তীব্র তাড়নে সে যেন ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। আর তাহার নেত্র দিয়া দরদর অশ্রু নির্গত হইতে থাকিল। ভক্তের এই বিশুদ্ধ ভাব দর্শনে ভগবানের বড় আনন্দ হইল। তিনি আর তাহাকে দেখা না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি বীণাবিনিন্দিত-স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—ওরে রামদাস! তোরই জীবন ধন্য,—তুই ভাবমূল্যে আমায় কিনিয়া লইয়াছিস্। তুই একবার নয়ন মুদিয়া গ্যাখ্ দেখি,—তোর প্রীতির টানে কে আমি এসেছি ?

আনন্দময়ের অশ্বাসময় বাক্যে রামবেহেরা আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইল। নয়ন নিমীলন করিয়া,—কি সুন্দর কি সুন্দর,—মুরলীবদন মদনমোহন তাহার হৃদয় জুড়িয়া দাঁড়ায়ে আছেন। আহা, তাঁহার কি রসিয়া বাঁশী গো, সুধার রাশি হাসি গো, কি সুন্দর কি সুন্দর! সেই দিব্য রূপ দেখিতে-দেখিতে রামবেহেরা আপনাকে হারাইয়া ফেলিল,—যাহা দেখিতেছিল তাহাও যেন হারাইয়া ফেলিল। অমনি ব্যাকুলভাবে নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখে,—ত্রিভুবনসুন্দর ত্রিভুবন আলো করিয়া ত্রিভঙ্গভঙ্গে দাঁড়ায়ে আছেন। প্রাণনাথকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া তাহার প্রাণের সাধ মিটিয়া গেল। প্রভুও অমনি দেখিতে-দেখিতে অন্তর্হিত হইয়া পড়িলেন। একবার দেখিয়া রামদাসের দেখিবার সাধ

আরও অধিক বাড়িয়া গেল। সদাই তন্ময়ভাব। সদাই মুখে হাহুতাশ। সদাই অন্তর অমৃতময়। সদাই বাহিরে বিষজ্বালা। এই বিষামৃতের মিলিত অবস্থায় তাহার অবশিষ্ট জীবন যাপিত হইয়া গেল। সে দেহাবসানে দিব্যধামে গমন করিয়া শ্রীহরির পার্ষদ-শরীর লাভ করিল।

নারায়ণ দাস

"সাজগোজটা যে কোথাও যাবার-যাবার দেখ্‌চি ?"

"হাঁ, তাই বটে,—অযোধ্যাপুরে শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্ম দর্শন করিতে যাইব, স্থির করিয়াছি ।"

"অ্যাঁ, এ—কে—বা—রে অ—যো—ধ্যা—পু—রে ?"

"হাঁ, তাই, তোমার কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছি ।"

মালতী এতক্ষণ হাসিহাসি-মুখে পতির সহিত সম্ভাষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু 'তোমার কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছি' এই কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল । অভিমানে দুঃখে ক্ষোভে তাঁহার নয়নপ্রান্তে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল । উত্তেজনার স্বরে তিনি পতিকে বলিয়া উঠিলেন,—"কি, আমার কাছে বিদায় ? আমি কে ? আমার কি নিজের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে ? আমি তো আপনার চরণের পরিচারিকা বই আর কিছুই নয় । আমার কাছে বিদায় ? আপনি যেখানে, কায়ার পশ্চাতে ছায়ার মত দাসীও সেখানে অনুগমন করিবে । আমার নিকট আবার বিদায় কিসের ?"

পতিব্রতা পত্নীর পতিভক্তিময় অমৃতোপম বাক্যে নারায়ণ দাসের বড় আনন্দ হইল । তিনি হাস্য-প্রফুল্ল-মুখে সহধর্ম্মিণীকে বলিলেন, —"বেশ বেশ, সাধ্বি ! তোমার কথায় যারপর নাই প্রীতি

লাভ করিলাম। চল, তুমিও চল, দুইজনে মিলিয়াই অযোধ্যা-পুরীতে গমন করি।”

পতির প্রীতিময় সংলাপনে সতীর অভিমান-দুঃখ দূর হইয়া গেল। আনন্দে হৃদয়-বদন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাঁহার অশ্রুসিক্ত মুখখানি শিশিরসিক্ত প্রভাতপঙ্কজের মত বড়ই মধুর বড়ই সুন্দর দেখাইতে লাগিল।

বঙ্গদেশ। গঙ্গাতীরে কীর্ত্তিচন্দ্র রাজার রাজ্য। করণ নারায়ণ দাস সেই রাজ্যে বসবাস করিতেন। যেমন ধনী, তেমনই গুণী। কিন্তু গুণের গরব ছিল না—ধনের গরম ছিল না। সাদাসিদে লোক। সকলের সঙ্গেই হাসিখুসী মেশামিশি। পর-ধনে লোভ নাই। পর-রমণীতে কু-নজর নাই। মিথ্যা বা বাজে কথা বলা নাই। খোলা প্রাণ, খোলা হাত। নেহাত গোবেচারি; দেখিলে বুঝিবার যো নাই, অত বড় একটা ধনী মানী গুণী লোক। অত বিষয়, সে দিকে আসক্তি নাই। প্রাণ সেই ভগবানের চরণেই পড়িয়া আছে। পত্নী মালতী মূর্ত্তিমতী পতিভক্তি। তাঁহার মত সুন্দরী বুঝি স্বর্গেও সম্ভবে না।

সকল সুখ সকলের ভাগ্যে তো ঘটে না; তাই ইঁহাদেরও একটী অসুখ ছিল,—পুত্র নাই। কন্যা নাই। ইঁহাদের সংসারে অনাসক্তিরও ইহা অন্যতম কারণ। তবে ইঁহাদের দয়ার গুণে বাহিরের পুত্রকন্যার বড় অভাব ছিল না। অনেকেরই ইঁহারা মাতাপিতার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

নারায়ণ দাসের অন্তঃকরণটা বড় বৈরাগ্যপ্রবণ। বয়স বেশী

হইয়াছে, সংসারে রহিয়া পরের উৎপাত ভুগিতে আর তাঁহার ভাল লাগিল না। সদাই যেন কোথায় যাই কোথায় যাই। শেষে মনে মনে স্থির করিলেন,—মোক্ষদাত্রী অযোধ্যাপুরী যাইয়াই অবশিষ্ট জীবন যাপন করি। যেমন সংকল্প অমনই কাজ। তিনি সাজিয়াগুজিয়া পত্নীর নিকট বিদায় লইতে আসিলেন। তাহার পর তাঁহাদের কথাবার্ত্তা তো পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

মালতী যখন যাইতে চাহিলেন, তখন কাজেকাজেই নারায়ণ-দাসকে একটু বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে হইল। তিনি তীর্থবাসের উপযোগী আসবাবপত্র বসনভূষণ বাসনকোসন থলিয়ায় পুরিয়া চারিটী বলদে বোঝাই করিয়া লইলেন। অনেক সাধের পাতা সংসার পাতানো-ছেলেমেয়েদের হাতে তুলিয়া দিয়া, কতিপয় সম্পত্তি দেবসেবার্থ সমর্পণ করিয়া, সে এক মহা শোক-কোলা-হলের মধ্যে বাটীর বাহির হইলেন। দাসদাসী কাহাকেও সঙ্গে আসিতে দিলেন না। কেবল মালতী ছায়ার মত তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।

চারিটি বলদ আগে আগে চলিয়াছে। আর তাঁহারা দুইটী প্রাণী অবিরাম রাম-নাম করিতে করিতে বলদের পাছুপাছু চলিতেছেন। যেখানে পান্থশালা পান, সেইখানেই বিশ্রাম করেন, বলদদের খাইতে দিয়া আপনারাও স্নানাহার সারিয়া লইয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে অন্যান্য পথিকদের সহিত আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিয়া দেন। এইরূপে কিছুদিন পরে তাঁহারা পবিত্র চিত্রকূট-পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেইখানে গিয়া অবধি তাঁহাদের অন্তঃকরণ যেন কি এক অমৃতরসে আপ্লুত হইয়া গেল। তাঁহারা যেন রঘুরাজ রামচন্দ্রের লোক-পাবনী লীলা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। কেবলই ভাবেন—, হায়, এই সেই চিত্রকূট! অরণ্যে যাইবার পথে—গুহক মিতার নিকট বিদায় লইয়া লক্ষ্মণসহায় সীতাপতি এইখানেই প্রথমে আশ্রম নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অবস্থান করিয়াছিলেন। হায়, এইস্থানই মুনি-ঋষির আশ্রমে পরিপূর্ণ ছিল। মুনিবেশধারী প্রভুরাও আমাদের মুনি-ঋষির মত এইস্থানেই পরমানন্দে বিচরণ করিতেন। হায়, সতীশিরোমণি জনকনন্দিনীও এখানে মুনিপত্নীগণের সোহাগ-আদরে কতই না প্রীতিপ্রফুল্ল হইতেন। হায়, ভ্রাতৃভক্ত ভরত এইখানেই সেই দুঃসহ পিতার মৃত্যুবার্ত্তা লইয়া শ্রীরামচন্দ্রের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। হায়, এইখানেই সেই সোদর-সৌহার্দ্দ্যের পিতৃভক্তির ও সত্যনিষ্ঠার পূত প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল। হায়, চিত্রকূট! তুমি আমাদের হৃদয়ের নাথ অযোধ্যা-নাথের কতই না লীলাকথা হৃদয়ে গাঁথিয়া, কতই না প্রাকৃতিক নির্য্যাতন সহ্য করিয়া, সেই লীলার স্মারক স্তম্ভরূপে দাঁড়ায়ে আছ। হে বন্ধুবর! তুমি সেই লীলাময়ের লীলার মালা গলায় পরিয়া অনন্ত কাল দাঁড়ায়ে থাক, আর আমাদের মত পাপী তাপী তোমাকে দেখিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইয়া যাউক।

নারায়ণ দাস পত্নীর সহিত কিছুদিন সেই চিত্রকূটেই থাকিলেন। সাধুমহান্তের আশ্রমে-আশ্রমে বেড়াইয়া বেড়ান, তাঁহাদের ভ্রান্তি-নাশক শান্তিমাখা সদুপদেশ শ্রবণ করেন, আর আনন্দে আনন্দে

আত্মহারা হইয়া পড়েন। তাই যাই যাই করিয়া সেখান হইতে আর তাঁহাদের যাওয়া হয় না। তাঁহারা সেখানে দানপুণ্য অনেক করিলেন, সাধুসেবা, বৈষ্ণবসেবা সংকীর্ত্তনমহোৎসব করিলেন, তারপর কিছুদিন-পরে অযোধ্যা-অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসের কথা যতই তাঁহাদের মনে পড়ে, ততই তাঁহারা বিষম ব্যথায় কাতর হইয়া পড়েন।—হায়, অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি প্রভু আমাদের বনেবনে বিচরণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, আর তাঁহার ছার ভৃত্য আমরা উত্তম পথে চলিয়া যাইব, তাহা তো কিছুতেই হইতে পারে না, এই ভাবে তাঁহারা চিত্রকূট হইতে আর রাজপথে গমন না করিয়া বনপথে যাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। বনও যেমন তেমন নয়। দিবাভাগে সূর্য্যরশ্মির সেখানে প্রবেশ নিষেধ। চারিদিকেই বড় বড় গাছ। গাছের উপরিভাগ লতায় পাতায় ঢাকা, তলদেশ তৃণগুল্মে আচ্ছন্ন! পেচকের ঘুৎকার, পার্ব্বত্য প্রস্রবণের ঝঙ্কার এবং হিংস্র শ্বাপদের চীৎকার—সকলে মিলিয়া সে এক অদ্ভুত একতানবাদনের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহার উপর ঝিঁঝিপোকার বিরাম-বিহীন সুরের বাহার তো আছেই। সেই সম্মিলিত স্বর শুনিলে প্রাণ ভয়ে শিহরিয়া উঠে। কিন্তু নারায়ণদাসের তাহাতে কিছুই আসিয়া গেল না। তিনি অকুতোভয়ে সেই অরণ্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সঙ্গে সেই চারিটী বলদ আর মালতী ছাড়া অন্য কেহই নাই। বাহিরে আর কেহ না থাকিলেও পতিপত্নীর অন্তরে আর একজন সঙ্গী ছিলেন;

তিনিই তাঁহাদের বল-ভরসা—যাহা বল সকলই। নারায়ণ দাস উচ্চকণ্ঠে তাঁহারই নামলীলা গান করিতেছেন। সেখানে লোকালয় নাই, লোকলজ্জাও নাই, তাই মালতীও পতীর সহিত গলা মিলাইয়া সেই গানের দোহারকি করিতেছেন। গাহিতে-গাহিতে অন্তর্য্যামীর কমনীয় মুর্ত্তি যেন তাঁহাদের নয়নসমক্ষে ভাসিয়া উঠিতেছে; আর তাঁহারা তাঁহারই লীলা-রসে আত্মহারা হইয়া অবিশ্রান্ত চলিতেছেন। সেই অন্তর্নিহিত বস্তুরই কি এক স্বভাব, তাঁহাকে হৃদয়ে রাখিতে পারিলে ভীষণ বলিবার, মন্দ বলিবার বুঝি আর কিছুই থাকে না; তাঁহার সৌন্দর্য্যরাশি যেন ভিতর ফুটিয়া বাহির হইয়া, বাহিরের সকলটাই সৌন্দর্য্যসুধার ভাণ্ডার করিয়া দেয়। তাই আজ এই ভীষণ বনে করণদম্পতী নয়নতর্পণ রমণীয় দৃশ্যই দেখিতে লাগিলেন।

পতি-পত্নী পথ চলিতেছেন বটে, কিন্তু কোন্ পথে যে যাইতে-ছেন,—ঠিক অযোধ্যার পথ, কি আর কোন পথ, তাহার কিছুই ঠিক নাই। আহার নাই, নিদ্রা নাই; তাহার অনুসন্ধানও নাই। কেবল বলদের অনুরোধে মাঝে-মাঝে এক আধটু বিশ্রাম করেন, তাহাদের খাওয়ান-দাওয়ান, আবার পথ চলিতে আরম্ভ করেন। এইরূপ যাইতে-যাইতে তাঁহারা একদিন প্রাতঃকালে এক শবরপল্লীতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। এদিকে-ওদিকে শবরগণকে বিচরণ করিতে দেখিয়া নারায়ণ দাস মনে মনে ভাবিলেন,—ভাল, অযোধ্যার পথটা কাহাকেও একবার সুধাইয়াই লই না কেন? তিনিও জিজ্ঞাসা করিবেন-করিবেন করিতেছেন, এমন

সময় জনদশেক ত্নষ্ট শবর তাঁহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। হিংসাজীবী পাষণ্ডগণ দূর হইতেই ইঁহাদিগকে দেখিয়া মৎলব আঁটিয়াছে,—"এরা একজন মেয়ে একজন পুরুষ বৈ তো নয়, সঙ্গে মালপত্রও অনেক দেখা যাচ্ছে, বোধ হয় কোন মহাজন-টহাজন হ'বে, তা এদের অগম্য বনে নিয়ে গিয়ে একেবারে কর্ম্ম ফরসা ক'রে দেওয়া যাক্; তারপর টাকাকড়ি জিনিষপত্র যাহা থাকে, বখরা ক'রে নেওয়া যাবে এখন।" নারায়ণদাস না বলিতে-বলিতে তাহারাই আগে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"হাঁহে বিদেশি! বলি এ দুর্গম বনে যাচ্ছ কোথা?" দুর্ব্বৃত্তগণ এমনই ভাবখানা দেখাইল, যেন কত সরল—কত সহানুভূতিতে আকৃষ্ট হইয়াই আসিয়াছে। ভক্ত নারায়ণদাসের মনে তো আর দ্বিধা নাই, তিনি তাহাদের আদরের ভাবে গলিয়া গেলেন। ভাবিলেন,—আহা, ইহারা বড়ই সরল। নাগরিক চাতুরী তো এই দুস্তর অরণ্য অতিক্রম করিয়া আসিতে পারে না, তাই ইহাদের হৃদয়ে এত সহৃদয়ের ভাব,—এত অমায়িক ব্যবহার। দেখ না কেন, আমি জিজ্ঞাসা করিতে-না-করিতে ইহারাই আসিয়া অগ্রে আমাকে গন্তব্য পথের কথা জিজ্ঞাসা করিল। এইরূপ ভাবিয়া তিনি তাহাদিগকে বলিলেন,—বাপু হে, তোমাদের সরল ও অমায়িক ভাব দেখিয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আমরা কোথায় যাইতেছি, বলি শুন,—

"শ্রীরামচন্দ্র রঘুবংশী। যেহু অযোধ্যাপুরবাসী॥
সকল-সংসার-কারেণী। সকল-জীব-চিন্তামণি॥

মহামহিমা মহামেরু। ভকত-বাঞ্ছাকল্পতরু ॥
তাঙ্ক দর্শনে ইচ্ছা করি। যাউচ্ছুঁ অযোধ্যা-নগরী ॥"

আমরা সেই রঘুকুলতিলক অযোধ্যানায়ক শ্রীরামচন্দ্রকে,—সেই সকল সংসারের কারণ, সকল জীবের চিন্তা-রতন,—সেই মহামহিম মহা মহীয়ান্,—সেই ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিবার বাসনায় অযোধ্যানগরীর উদ্দেশে গমন করিতেছি।

নারায়ণদাসের মুখের কথা শেষ হইতে-না-হইতে দুষ্টগণ মিষ্ট কথার মোহন আবরণে আত্মভাব গোপন রাখিয়া শিষ্টের মত বলিয়া উঠিল,—অঁ্যা, অবধান! তুমি ক'রেছ কি? এই ঘোর অগম্য বনে একা একা যাবে কি ক'রে? তা আমাদের সঙ্গে দেখা হ'য়ে ভালই হ'য়েছে। আমরাও সেই অযোধ্যাপতিকে দর্শন ক'রতে অযোধ্যাপুরেই যাচ্ছি, চল,—তোমাদের আর ভয় নাই,—আমাদের সঙ্গেই চল। আমরা তোমাদের 'রখুআল' (রক্ষক) হ'য়ে সঙ্গেসঙ্গেই যাচ্ছি।"

শবরবৃন্দের বাক্য শুনিয়া তাঁহারা একবার পরস্পর চক্ষু-ঠারাঠারি করিলেন। তাহাদের কথাটা যেন তাঁহাদের তত ভাল লাগিল না। বিশেষতঃ তাঁহারা যাঁহার অভয়পদে আত্মসমর্পণ করিয়া বাটীর বাহির হইয়াছেন, তিনি ছাড়া—সেই বীরেন্দ্র-কেশরী রামচন্দ্র ছাড়া অন্য কাহাকে রক্ষকরূপে অঙ্গীকার করিতে তাঁহারা বড়ই নারাজ। তাই তাঁহারা তাহাদিগকে নির্ভীকভাবে বলিলেন,—

"বোইলে—প্রভু রঘুনাথ। অনাথ লোকঙ্কর নাথ॥
যে কাণ্ড-কোদণ্ড-ধারণ। সে আন্ত সঙ্গ বোলিজান॥
সে যেনে নেবে—তেনে যিবুঁ। আন্ত আয়ত্ত নাহিঁ বাবু॥"

বাপু হে! সেই অনাথনাথ প্রভু রঘুনাথ,—সেই ধনুর্ব্বাণধারী অযোধ্যাবিহারীই আমাদের একমাত্র সহচারী বলিয়া জান। তিনি আমাদিগকে যে দিকে লইয়া যাইবেন, আমরা সেই দিকেই গমন করিব; ইহাতে আমাদের হাত কিছুই নাই।

যে যেমন, তাহার সহিত ঠিক তেমনটি না হইতে পারিলে তো আর তাহার মন ভুলানো যায় না, তাই দুষ্টগণ তাঁহাদের সুরেই সুর মিলাইয়া বলিয়া উঠিল,—"আহা অবধান! যা ব'ল্লে, ঠিকই কথা। এ সংসারে সঙ্গী আবার কে কার? সেই সকল জীবের প্রাণমণি রঘুবংশ-শিরোমণি রামচন্দ্রই সকলের একমাত্র সঙ্গী। তিনি তোমাদেরও সঙ্গী, আমাদেরও সঙ্গী। তা উত্তম কথা, তিনিই সকলের সঙ্গী থাকুন, আমরা একজোট হ'য়ে আনন্দ ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে তাঁহার ধামে চ'লে যাই।"

কপটীদের ছলনাময় বাক্যে পতি-পত্নী ভুলিয়া গেলেন। তাঁহারা তাহাদের সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধ পাতাইয়া এক-পরিবারের মত আনন্দ করিতে-করিতে পথ চলিতে লাগিলেন। ক্রমেক্রমে তাঁহারা এক অগম্য বনে গিয়া পড়িলেন। দুষ্টেরা দেখিল,—আর যায় কোথা, ঠিক ঠিকানায় আসা গিয়াছে; এইবার নিজমূর্ত্তি ধরা যাক্। তাহাদের সে আনন্দ-উল্লাস দ্যাখে কে? কেহ বলে,—ওহে, বা'র কর খাঁড়াখানা, টক্ ক'রে বেটার মাথাটা কেটে ফেলা যা'ক্।

কেহ বলে,—উপ্‌ড়ে ফেল বেটার জীবটা। কেহ বলে,—দাও শালার চোখ দুটো উপ্‌ড়ে। কেহ বলে,—নাও, হাতে-পায়ে বেঁধে মিন্‌সেটাকে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দাও—বুকে পাথর চাপিয়ে দাও, দু'চার দিনেই অক্কা পেয়ে যাবে; তারপর ও'র টাকাকড়ি যা আছে আর ঐ মেয়েমানুষটা নিয়ে স'রে পড় আর কি, অনেক দিন মজা লুটা যাবে এখন।

দুর্জ্জনগণ এইরূপ পরামর্শ করিয়া নারায়ণদাসের হাতে-পায়ে বাঁধিয়া ফেলিল এবং বেদম মারিতে-মারিতে দুর্গম বনে লইয়া গিয়া ফেলিয়া দিল। তাহাতেও হইল না; তাহারা তাঁহার বুকের উপর বডবড় পাথর চাপাইয়া বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলিতে লাগিল,—নাও, এইবার এইখানে প'ড়ে-প'ড়ে পরম সুখে তীর্থ কর আর কি?

প্রহারে-প্রহারে নারায়ণ দাসের শরীর জর্জ্জরীভূত। নড়িবার-চড়িবার ক্ষমতা নাই। বাক্‌শক্তি বিলুপ্ত। হৃদয়ের স্পন্দনও তেমন অনুভূত হয় না। তিনি কেবল অন্তরে-অন্তরে সেই অন্তরবিহারীর করুণা প্রার্থনা করিতেছেন। কেবলই মনেমনে বলিতেছেন,—

"বোলে—জগত-চিন্তামণি। নমঃ কোদণ্ড-কাণ্ড-পানি॥
নমস্তে নীলঘন-মূর্ত্তি। নমঃ জানকীদেবী পতি॥
নমস্তে ত্রৈলোক্য-ঈশ্বর। সংসার তোর খেলঘর॥
চর অচর আদি করি। সকল ঘটে আচ্ছ পূরি॥
তুম্ভ উদরে এ সংসার। তু অচ্ছু অন্তর-বাহার॥

তোর বাহারে অন্যজনে। অছি কে মো জীব রক্ষণে ॥
তু নাথ যাহা তাহা কর। অন্য শরণ নাহিঁ মোর ॥"

ওহে ত্রৈলোক্য-চিন্তামণি—ধনুর্ব্বাণপাণি! তোমায় নমস্কার। ওহে নীল-নীরদ-মূর্ত্তি—জানকীপতি! তোমায় নমস্কার নমস্কার। ওহে ত্রিলোকনাথ! এ সংসার তো তোমার ক্রীড়াকুট্টিম;—চর অচর সকলের অন্তরেই তুমি বিচরণ করিয়া থাক,—সকল ঘটেই তুমি পূর্ণরূপে বিরাজমান। এই সংসার তোমার উদরমধ্যে অবস্থিত,—তুমিও ইহার অন্তরে বাহিরে। হে অচিন্ত্যবৈভব ভগবন! সেই তুমি ছাড়া আর কে-ই বা আমার জীবন রক্ষণে সমর্থ হইবে? নাথ! তোমার যাহা ইচ্ছা কর;—রাখিতে হয় রাখ, মারিতে হয় মার, আমার কিন্তু তুমি ভিন্ন অন্য শরণ নাই, জানিও।

নারায়ণ দাসকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া দুষ্টগণ মনে করিল,—আপদ চুকিয়াছে—লোকটা মরিয়া গিয়াছে। এইবার তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া তাঁহার পত্নীকে আসিয়া আক্রমণ করিল। আহা, পতির দুর্গতি দেখিয়া মালতী আশ্রয়তরুর অঙ্কচ্যুতা লতিকার মত ভূমিতে লুন্ঠিতা হইতেছিলেন। দুর্ব্বৃত্তগণ এই অবস্থায় তাঁহাকে যাইয়া চারিদিক হইতে আক্রমণ করিল। সুন্দরীর সুষমার নেশায় সকলেই বিভোর,—সকলেই জ্ঞানহারা। ইন্দ্রিয়-কিঙ্করগণ সেই অপ্রাকৃত রূপ যতই দেখিতেছে, ততই যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছে। তাঁহার চৈতন্য-সম্পাদনের আর অপেক্ষা সহিল না; সেই অবস্থাতেই তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল। নারকীগণের মুখে আর কোন কথাই নাই,

কেবলই বলে,—চল গো রসবতি! আমাদের সঙ্গে চল;—তোমার ভয় কি—ভাবনাই বা কি? তোমার এক পতি গিয়াছে; দশ পতি মিলেছে;—উঠ গো সুন্দরী! উঠ।

তাদের সে আদর-কদর গ্যাখে কে?—সে যেন ভাদরের বাদরের মত মালতীর উপর ঝর-ঝর বরষণ হইতে লাগিল। কিন্তু সে কথা শোনে কে?—মালতী তো আর ইহরাজ্যে নাই! তিনি যে মনেমনে সেই মনোনায়কের চরণপ্রান্তে চলিয়া গিয়াছেন।

একে ভক্ত নারায়ণ দাসের বিপদ, তাহার উপর সতীর বিপদে বিপদভঞ্জন বিচলিত হইয়া উঠিলেন। আধার চঞ্চল হইলে আধেয়ও চঞ্চল হয়। ভগবানের চাঞ্চল্যে তাঁহার চরণার্পিত মালতীর চিত্তও চঞ্চল হইয়া পড়িল। অমনি তিনি সে রাজ্য হইতে আবার এ রাজ্যে আসিয়া পড়িলেন। তাঁহার সংজ্ঞা হইল। কদাচারীদের আচরণ দর্শনে ঘৃণায়-লজ্জায় তিনি মরমে মরিয়া গেলেন। ভয়ে ও রোষে শরীর থরথর কাঁপিয়া উঠিল। নয়নে দরদর অশ্রু নির্গত হইতে থাকিল। কামুকগণের কুৎসিত প্রস্তাব যেন বজ্রের মত তাঁহার কর্ণে বিষম বাজিতে লাগিল। তাই তিনি দুইটি হস্তে দুইটি কর্ণ চাপিয়া ধরিলেন এবং আর যেন তাহাদের মুখ দর্শন করিতে না হয়—এই ভয়ে নয়ন মুদিয়া সেই মুদির-বরণ জানকী-রমণকে কাতরকণ্ঠে ডাকিতে লাগিলেন।—

"বোইলা—আহে মহাবাহু। শরণপঞ্জর বোলাউ॥
পুরাণপথে অচ্ছি শুনি। আতঙ্ককালে রঘুমণি॥
রখিবে বোলি ধনু শর। ধরিণ অচ্ছ বেনি কর॥"

ওহে ও মহাবাহু! তুমি না আপনাকে শরণাগতের প্রতিপালক বলিয়া পরিচয় দাও? হায়, পুরাণপথে শুনিতে পাই;—রঘুমণি তুমি না-কি বিপৎকালে রক্ষা করিবে বলিয়া যুগল করে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া আছ? কই,—কই সে তুমি? শরণাগতের শরণদাতা কই সে তুমি?

এইরূপ কাতর উক্তি করিতে করিতে সুন্দরী সুদূরাগত অশ্ব-পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। অমনি তিনি পাগলিনীর মত আলু-থালু ভাবে উঠিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি চালন করিতে লাগিলেন। দেখিতে-দেখিতে দেখিলেন,—দূরে বহুদূরে কে একজন শ্বেতবর্ণ অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া বিদ্যুদ্বেগে আসিতেছেন। নয়নের পলক না পালটিতে-পালটিতে ঝলকে-ঝলকে বিজলীর দীপ্তি ছড়াইতে-ছড়াইতে সেই অশ্বারোহী দস্যুনিপীড়িতা মালতীর অগ্রভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিতে যেন ক্ষত্রিয়,—বেশ বড়ই বিচিত্র;—

"সুবর্ণমুকুট মউলি। দ্বিতী সূর্য্যের প্রায় ঝলি॥
শ্রবণে মকরকুণ্ডল। লুলই বেনি গণ্ডস্থল॥
কণ্ঠে কৌস্তুভমণি-হার। সুরূপে জনমনোহর॥
হৃদরে পদক বিরাজে। রত্নকঙ্কন বেনি ভুজে॥
চম্পক-কঢ়ই অঙ্গুলি। কি শোভা মুদ্রিকা-আবলি॥
ঝিণ বসন কটিমাঝে। সুরত্নমেখলা বিরাজে॥
নীল-জীমূত-কলেবর। রাজীবলোচন সুন্দর॥
রঙ্গ অধরে মন্দ হাস। গলি কি পড়ছি পীযূষ॥
কটিরে যমদাঢ় বান্ধি। শরত্রাসকু কন্ধে চ্ছন্দি॥

ঢালখিঁ পড়িচ্ছি পিঠিরে। চঢ়িন শ্বেতঅশ্বপরে॥”

তাঁহার মস্তকে সুবর্ণ-মুকুট—ঠিক যেন আকাশছাড়া আর একটী সূর্য্য দীপ্তি বিস্তার করিতেছে। কর্ণযুগলে মকরকুণ্ডল,—গণ্ডস্থলে ঢুলঢুল ঢুলিতেছে। কণ্ঠে কৌস্তুভ-সংলগ্ন-মণির মালা। হৃদয়ে পদক। উভয় হস্তে রত্নকঙ্কন। চম্পককলির মত অঙ্গুলি। তাহার উপর সারিসারি আঙ্গুটী; শোভাই বা কত? কটিতে সূক্ষ্ম বসন, তাহার উপর রত্ন-জড়িত চন্দ্রহার। শ্যামল জলধরের ন্যায় কলেবর। কমল-কমনীয় শোভন লোচন। রঙ্গিম অধরে মন্দ হাস্য,—সে যেন সুধার ধারা গলিয়া-গলিয়া পড়িতেছে। কটিদেশে ‘যমদাঢ়’ নামক অস্ত্র আবদ্ধ। স্কন্ধে তূণ। পৃষ্ঠভাগে ঢাল। কড়ি ও কোমলে সে মূর্ত্তিখানি বড়ই মনোহর। মনোহর বটে, কিন্তু সকলের পক্ষে সমান নয়। সেই বজ্রাদপি কঠোর মূর্ত্তি দেখিয়া দস্যুগণের মন মহা-ভয়ে অভিভূত হইল। কাহাকেও কিছু বলিতে হইল না, তাহারা আপনাআপনি গহন বনে পলায়ন করিল। কে যে কাহার ঘাড়ে পড়ে, কিছুই ঠিক নাই। কেহ বা কিছু দূর গড়াইয়া-গড়াইয়াই চলিল। পড়িয়া গিয়া কাহারও হাঁটু ছিঁড়িয়া গেল; কাহারও কপাল ফাটিয়া গেল; কাহারও দন্তপাটি উপড়াইয়া পড়িল; কাঁটাখোঁচা ডাল-পালা ফুটিয়া কাহারও নাক, কাহারও চোক, কাহারও গলা, কাহারও কাণ ছিঁড়িয়া-ফুঁড়িয়া গেল। “ঐ এ’ল-রে—ধ’ল্লেরে” বলিতে-বলিতে যে যেদিকে পাইল সেইদিকেই প্রাণ লইয়া দৌড় দিতে লাগিল। কিন্তু সেই অশ্বারোহীর কুসুম-

সুকুমার রূপ দর্শনে মালতীর মন আমোদে মাতিয়া উঠিল। তিনি অনিমিষ-নয়নে সেই রূপমাধুরী প্রাণ ভরিয়া পান করিতে লাগিলেন।

ক্ষত্রিয়চূড়ামণি এইবার অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। হাসিতে-হাসিতে মালতীর কাছে আসিয়া বাৎসল্যরসের সুধাসিক্ত স্বরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হাঁগা বাছা, তোমাদের বাড়ী কোথায় গা? একলা মেয়ে মানুষ, সঙ্গে কেহ নাই, এই দুর্গম বনে যাবেই বা কোথায়? আর হাঁগা, ওই যে কয়টা লোক তোমার কাছে থেকে পালিয়ে গেল, তারাই বা কে?"

তাঁহার স্নেহ-সম্ভাষণ শ্রবণে মালতীর মনে হইতে লাগিল, আহা হা হা! এই নরকের বিষম বিষজ্বালার মধ্যে এই স্বর্গের প্রাণ-তর্পণ অমৃতবর্ষণ কে আনিয়া দিল রে? এ নিশ্চয় রঘুবীর! তোমারই করুণার লীলা।

ভাবের প্রবল আবেগে মালতী কিছুক্ষণ কিছুই বলিতে পারিলেন না। তিনি কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার অন্তরের কৃতজ্ঞতা নয়নদ্বার দিয়া অজস্রধারে বাহির হইয়া পড়িল। তিনি অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া সেই করুণাময় ক্ষত্রিয়বীরের নিকটে আদ্যোপান্ত আত্ম-কথা বিনীত ভাবে বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

পতির প্রতি পাপিষ্ঠগণের নির্য্যাতনের কথা কীর্ত্তন করিতে-করিতে সতীর লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি মণিহারা ফণিনীর মতন ধৈর্য্যহারা দিশেহারা হইয়া পড়িলেন। কি বলেন,

কি করেন, কিছুই ঠিক নাই। অবশেষে তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে-করিতে উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—ওগো, তুমি আমার কে—তা জানি না। আমাদের দুরবস্থা দেখিয়া দুরিত-হারী রঘুবীরই বোধ হয় তোমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। ওগো, শুন গো শুন,—ওই পলাতক পাষণ্ডগণ আমার পতি-দেবতাকে প্রহার করিতে-করিতে কোথায় লইয়া গিয়া কি যে করিল, কিছুই জানি না। ওগো, শুন গো শুন,—ওরা আবার ফিরে এ'সে প্রকাশ্য বেশ্যার মত আমার কাছে জঘন্য প্রস্তাব করিতেছিল। এমন সময় রঘুনাথের কৃপায় তুমি আসিয়া পড়িলে, আর তোমাকে—তোমাকে দেখিয়া ওরা পলাইয়া গেল। ওগো, শুন গো শুন,—আমার পতি বোধ হয় আর জীবিত নাই। তাই আমার প্রাণের মাঝে প্রলয়ের আগুন দাউদাউ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। দাও,—দাও চিতা জ্বালাইয়া দাও। যদি দয়া করিয়া আসিয়াছ—দাও,—দাও চিতা জ্বালাইয়া দাও। সেই জ্বলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দান করিয়া অন্তরের জ্বালা জুড়াইয়া লই;—বিষে বিষের ক্ষয় হইয়া যাউক। দাও,—দাও চিতা জ্বালাইয়া দাও—জ্বালাইয়া দাও।

সতীর পতিভক্তিমাখা উক্তি শুনিয়া সীতাপতি নিরতিশয় প্রীতি-লাভ করিলেন। তাঁহার করুণায়-গলা প্রাণ আরও যেন বিগলিত হইয়া গেল। করুণার ঝরণার মত ঝরঝর করুণারসে মালতীর মন-প্রাণ সরস ও সুস্নিগ্ধ করিতে-করিতে তিনি বলিতে লাগিলেন,—"পতিব্রতে, চিন্তা নাই, চিন্তা নাই। তোমার পতি জীবিত আছেন। তোমার কথা শুনিয়া আমার মনে হইতেছে,—আসিবার পথে

দেখিয়া আসিয়াছি, কে এক জন জঙ্গলের মাঝে পড়িয়া-পড়িয়া কাতরকণ্ঠে বলিতেছে—হা মালতি, আর বুঝি অযোধ্যায় যাওয়া হইল না। নিশ্চয় তিনিই তোমার পতি হইবেন। চল, চল সতি, অধিক দূর নয়, একটু অগ্রসর হইলে তুমিও তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইবে। চল,—তাঁহার সহিত তোমায় মিলিত করিয়া দিই।”

পতি-বিহনে পতিব্রতা মালতীর শরীর তখন যেন এলাইয়া পড়িয়াছে। তাঁর যেন আর একটী পা-ও চলিবার ক্ষমতা নাই। ভগবান্ তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন,—মাতা, তুমি আমার হস্ত ধারণ কর,—আমার সঙ্গে-সঙ্গে চলিয়া আইস,—ভয় নাই। তোমার মত পতিপরায়ণা সতী রমণীর কখনও পতির সহিত চিরবিচ্ছেদ হইতে পারে না। আইস,—আমার এই হস্ত ধারণ করিয়া আস্তে-আস্তে চলিয়া আইস। এই বলিয়া ভবভয়হারী তাঁহার অভয় হস্ত বিস্তার করিয়া দিলেন মাতৃসম্বোধন শুনিয়া মালতীর আর অবিশ্বাসের কোন কারণ রহিল না। তিনি সেই দীনবান্ধবের দয়ার হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে-সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ-মধ্যেই তাঁহারা নারায়ণদাসের নিকটে যাইয়া পৌঁছিলেন। গিয়া দেখিলেন, তাঁহার হস্ত-পদ দুশ্ছেদ্য রজ্জুতে আবদ্ধ। বক্ষের উপর গুরুভার প্রস্তর। মুখে বাক্য নাই। শরীর নিশ্চেষ্ট ও অবশ। পতির এই দুঃখদ দশা দর্শনে মালতী যেন ধরণীতে ঢলিয়া পড়েন-পড়েন হইয়া পড়িলেন। ভগবান্ তাঁহার অভয়-নাদের দুন্দভি-বাদ্যে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে-করিতে নারায়ণদাসের বক্ষ

হইতে প্রস্তরগুলি নামাইয়া ফেলিলেন এবং শাণিত অস্ত্রে বন্ধন ছেদন করিয়া দিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া একবার ঝাঁকুনি দিলেন। তাহাতেই তাঁহার শরীরে যেন তড়িতের তরতর প্রবাহ প্রবাহিত হইল। ঘুমন্ত মন-প্রাণ-শরীর সকলই জাগিয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন। চাহিয়া দেখেন,—সম্মুখে সেই দিব্য ধনু-র্ধারি-মূর্ত্তি, আর তাঁহার পার্শ্বে পত্নী মালতী।

ব্যাপারখানা কেমন যেন তাঁহার স্বপ্নের মত বোধ হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ তিনি যেন কেমন একতর হইয়া সেই শ্রীমূর্ত্তির দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর তাঁহার পূর্ব্বের অবস্থা সকলই স্মরণপথে আসিয়া গেল। অহো, সেই ভীষণ বিপদে বিপদভঞ্জন জানকীরঞ্জন ছাড়া আর কে-ই বা নিস্তার করিতে সমর্থ? ইনি-ই নিশ্চয় সেই ধনুর্ব্বাণপাণি রঘুবংশ-শিরোমণি, এই ভাবে গদগদ হইয়া তিনি তাঁহার চরণতলে পড়িয়া লুটাপুটি খাইতে লাগিলেন। তাহার পর কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—ঠাকুর হে!—

"তুম্ভে মোহর প্রাণেশ্বর। তুম্ভে মো জীবের ঠাকুর॥
তুম্ভে মো বাঞ্ছাকল্পতরু। তুম্ভে সকলজীব গুরু॥
তুম্ভে মো মুকুন্দ মুরারি। তুম্ভে মো আদিকন্দ হরি॥"

তুমিই আমার প্রাণেশ্বর। তুমিই আমার জীবনের ঠাকুর। তুমিই আমার বাঞ্ছাকল্পতরু। তুমিই সকল জীবগণের গুরু। তুমিই আমার মুকুন্দ মুরারী। তুমিই আমার আদিমূল হরি। তা প্রভু, যদি দয়া করিয়া দেখাই দিলে—বন্ধন মোচন করিলে,

তবে আর একটু ভাল করিয়া দেখা দাও! তোমার স্বরূপ সাক্ষাৎকার করাইয়া ভবের বন্ধন বিমুক্ত করিয়া দাও।

ভক্তের কথা শুনিয়া ভক্তবৎসলের রক্তিম অধরে মন্দ-মধুর হাস্য ফুটিয়া উঠিল। হাসির ভাবটা,—নাঃ ভক্তের কাছে আর আমার আত্মগোপন করিবার যো নাই। সুবর্ণ—বালা-বাজু হার-কুণ্ডল যে কোন রূপ ধরুক না কেন, বেণিয়ার কাছে তাহার আর ফাঁকি দেওয়া চলে না। ভক্তের কাছেও আমার অবস্থা সেইরূপ। মালতী ও নারায়ণদাস আমার অকপট ভক্ত। তাহারা আমাকে দেখিবার জন্যই আমার নাম লইয়া বাটীর বাহির হইয়াছে। তাহাদের আমি আপন স্বরূপ দেখাইব না কেন? এই ভাবিয়া তিনি তাঁহাদের সমক্ষে আপনার রঘুনাথ-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সেই কন্দর্পবিজয়ী দিব্য রূপ দর্শনে পতি-পত্নীর নয়ন-মন ভুলিয়া গেল। তাঁহারা বারবার দণ্ডবৎ প্রণাম করেন, আর গদগদ-কণ্ঠে কত কি স্তবস্তুতি করেন। কেবলই বলেন,—হায় প্রভু! তোমার প্রভুপণার বলিহারি যাই বলিহারি যাই। এই ছার মানব আমাদের জন্য তুমি অযোধ্যাপুরী শূন্য করিয়া এখানে আসিয়াছ! হায় প্রভু, তোমার মত দয়ার ঠাকুর ছাড়িয়া কেন যে লোকে অন্য দেবতা আরাধনা করিতে যায়, তাহাতো কিছু বুঝিতেই পারি না। অহো, তাহাদের মুর্খতা কি অসাধারণ!

ভক্তের বিশুদ্ধ ভাব দর্শনে, ভগবান্ বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। বলিলেন,—"ওগো, তোমাদের বিমল প্রেমে আমি তোমাদের কাছে আত্মবিক্রীত হইয়া গিয়াছি। তোমরা আমার কাছে অভি-

মত বর প্রার্থনা করিতে পার,—আমি আপনাকে পর্য্যন্ত তোমা-দিগকে দান করিতে প্রস্তুত।”

পতি-পত্নী অতি বিনীতভাবে বলিলেন,—“নাথ, আমরা যখন তোমাকে পাইয়াছি, তখন সকলই পাইয়াছি। আর আমাদের অন্য বরে প্রয়োজন নাই। কেবল ইহাই প্রার্থনা,—তুমি অনুক্ষণ আমাদের অন্তরের পথে বিচরণ কর,—আমরা যেন নয়ন মুদিলেই তোমার ওই দিব্য রূপ দর্শন করিতে পারি।”

ভগবান্ হাসিতে-হাসিতে বলিলেন,—“ওগো, তাই হবে গো তাই হবে। তোমরা এখন অযোধ্যাপুরে গমন কর। সেইখানে গিয়া আমার সেবায় কালযাপন করিতে থাক। দেহাবসানে দিব্য-দেহে আমার সহিত যাইয়া মিলিত হইবে।” এই বলিয়া অন্তর্য্যামী অন্তর্হিত হইলেন। নারায়ণ দাস এবং মালতীও শ্রীপ্রভুর উদ্দেশে অসংখ্য প্রণাম করিয়া, তাঁহার মহিমা গাহিতে-গাহিতে বলদ লইয়া অযোধ্যা-অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। প্রভুর কৃপায় কিছুদিনের মধ্যে নিরাপদে তথায় যাইয়া পঁহুছিলেন এবং সামান্য একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতেই সাধু-বৈষ্ণব-সেবা ও হরিভজন করিতে-করিতে শান্তিময় পুণ্য জীবন অতিবাহিত করিলেন। অন্তে শ্রীরামচন্দ্রের পদপ্রান্তে স্থান প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়া গেলেন। এ সংসারে তাঁহাদের আসা যাওয়ার অবসান হইয়া গেল।

বালিগ্রাম দাস

ভাবের প্রভাব ভাবনায় আনা যায় না। সে স্বভাবের উপরও কলম চালায়। তুমি উচ্চ জাতি, উচ্চ প্রকৃতিই তোমার স্বভাব-সিদ্ধ হওয়া উচিত; কিন্তু ভাবের গুণে তুমিও নীচ হইয়া যাইতে পার;—আপনাকে একটা 'হাম বড়' ভাবিতে-ভাবিতে তুমিও নীচের নীচ হইয়া যাইতে পার। আবার ঐ নীচজাতি, নীচতাই যাহার মজ্জাগত প্রকৃতি, ভাবের গুণে সে-ও উচ্চ হইয়া উঠিতে পারে,—আপনাকে 'দীনহীন সামান্য' ভাবিতে-ভাবিতে সে-ও উচ্চের উচ্চ হইয়া পড়িতে পারে। তুমি যতই কেন উচ্চ জাতি হও, আপনাকে বড় ভাবিতে গেলেই ভাব তোমায় ঘাড়ে ধরিয়া ছোট করিয়া দিবে, আর যতই নীচজাতি হও না কেন, আপনাকে তৃণাদপি নীচের নীচ চিন্তা করিতে পার তো ভাব তোমায় বড়র বড় মহাবড় করিয়া দিবে। ইহাই ভাবের বিচিত্র বৈভব।

ভাব এ স্বভাব পাইল কোথা হইতে,—তাহা কি আর বলিতে হইবে? ভগবান্ ভাবনিধি; ভাব তাঁহার শক্তিতেই শক্তি-সম্পন্ন। অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার উদর-মধ্যে অবস্থিত, সেই বিশ্বম্ভর ভগবান্‌কে যিনি মস্তক-ভূষণ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি জাতি-বিদ্যায় কুলে-শীলে ধনে-মানে যতই কেন বড় হউন, তাঁহার আর মস্তক উন্নত করিবার যো নাই। গিরিধারীর অসাধারণ গুরুতায়

তাঁহার মস্তক আপনাআপনি অবনত হইয়া পড়ে,—তিনি আপনাকে ধরণীর ধূলিকণার অপেক্ষাও নগণ্য মনে করিয়া বিশ্ববাসী সকলেরই চরণতলে অবলুণ্ঠিত হইতে থাকেন। আর যেখানে ভাবনিধি ভগবান্ নাই, এ ভাবও সেখানে নাই। বর্ণবহির্ভূত মূর্খ নির্ধন ও নির্গুণ হইলেও সে আপনাকে কি একটা মস্ত প্রকাণ্ড বলিয়া মনে করে। করিবারই কথা; তাহার মাথায় তো আর বিশ্বম্ভরের গুরুভার নাই? সে ভিতর-ফাঁকা—খালি খানিক ধোঁয়া-পোরা ফানুসের মত শূন্যেশূন্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। আবার সেই নীচ মূর্খ দুর্জ্জাতিই যদি কোন ভাগ্যবলে আপনার ভিতর ভগবান্‌কে আনিতে পারে, তাহা হইলে তাহার প্রকৃতির অন্যরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। সে-ও তখন ভিতরেভিতরে কি-একটা ভারি-ভাব অনুভব করিয়া ফলভারবিনম্র বৃক্ষের মত অবনত হইয়া পড়ে।

এই দেখ না কেন, দাসিয়া বাউরী, সে তো খন্দাল জাতি—একরূপ শবরজাতি বলিলেই হয়, ব্রহ্মাণ্ডপতিকে অন্তরে ধরিয়া সে কি কাণ্ডকারখানাটাই না দেখাইল? তাহার সেই দেব-দুর্লভ ভাবের কথা ভাবিলেও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কেবলই মনে হয়,—বলিহারি ভাবনিধি ভগবান্, আর বলিহারি তাঁহার ভাবের প্রভাব!

বালিগ্রাম শ্রীপুরুষোত্তমধাম হইতে দুই ক্রোশ ব্যবধান। দাসিয়া বাউরির নিবাস সেই গ্রামে। সে বড় দরিদ্র। পুত্র নাই, কন্যা নাই। মাত্র এক পত্নী। দুইজনে কাপড় বুনিয়া কোন রকমে দিন গুজরাণ করে। সাধারণতঃ বাউরীদের যেরূপ আচার-ব্যবহার

হইয়া থাকে, দাসিয়ারও আচার-ব্যবহার প্রায় সেই প্রকার। কিন্তু তাহার ভগবানের নাম-গান শ্রবণ করিবার একটা আন্তরিক আগ্রহ ছিল। গ্রামের মধ্যে কাহারও ঘরে কোন ব্রত-উৎসব-উপলক্ষে যদি কখনও নামসঙ্কীর্ত্তনাদি হইত, সে তথায় গিয়া দূরে রহিয়া তাহা শ্রবণ করিত। সে গানের ভাব-অর্থ কিছু বুঝিত না, কিন্তু কি-জানি কেন সে তাহাতে কি এক সুখ পাইত, সেই সুখের লোভেই সে হরিলীলা-গান শুনিতে যাইত।

এইরূপে কিছুদিন যায়, শ্রুতিমূলে হরি-গীতি প্রবেশ করিতে-করিতে তাহার অন্তরের অপবিত্রতা দূর হইয়া গেল,—দিব্য-জ্ঞানের নির্ম্মল আলোকে অন্তঃকরণ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে গুরুদেবের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিল। গলায় তুলসীর মালা পরিল। দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ধারণ করিয়া হরি-পূজা করিতে থাকিল এবং আনন্দ-মনে সজ্জনের সনে হরিগুণ গাহিয়া-শুনিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্রমে তাহার নির্ম্মল মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হইল। তাহার মনে হইতে লাগিল,—পাপ পুণ্য এই উভয়ই বন্ধন—উভয়ই কিছুই নয়। সুখ-দুঃখ কেবল নামে ভেদ, বাস্তবিক এ দুই-ই সমান। তাই তাহাতে সমভাব অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর। সে সর্ব্বদাই কি এক সুখের নেশায় নিমগ্ন হইয়া থাকে। আহার-আদির আর বড় চেষ্টাচরিত্র নাই। যখন যাহা জুটিল, তখন তাহাই খাইল। যে চিন্তার চিতানলে জীবিত মানব ধিকিধিকি পুড়িয়া ছারখার হইয়া থাকে, সে চিন্তা যেন তাহার অন্তরের প্রান্তসীমাতেও নাই। তাহার কেবল একমাত্র চিন্তা,—হায় বিধাতা! তুমি আমায় নীচ

জাতিতে জন্ম দিলে, আমি সেই সুদুর্লভা হরিভক্তি বুঝি পাইব না,—শ্রীহরির দেব-বন্দিত পাদপদ্ম বুঝি পাইব না! হায় হায়! বৃথাই আমার ভবে আসা হইল।

বালিগ্রাম এবং পুরুষোত্তমধাম একরূপ পাশাপাশি। দুই ক্রোশ ব্যবধান আর কতটুকু? সেই পুরুষোত্তমধামে প্রতিবর্ষে মহাসমারোহে শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা হইয়া থাকে। কত দূর-দূরান্তরের লোক আসে, কিন্তু দাসিয়া বাউরী একবারও তাহা দেখিতে যায় নাই। শ্রীক্ষেত্র-অভিমুখে রথযাত্রা-দর্শন উপলক্ষে দলেদলে যাত্রীর দল যাইতে দেখিয়া এবার তাহার মনে কেমন সাধ হইল,—ভাল, আমিও একবার দারুহরিকে দর্শন করিয়া আসি না কেন? হায় হায়! আমার কি আর সে সৌভাগ্য ঘটিবে? আমি কি এ চর্ম্ম-নয়নে চক্রধারী শ্রীহরিকে দেখিতে পাইব? চিত্তে এইরূপ বিচার করিয়া সে যাত্রিগণের সহিত নীলাচলধামে গমন করিল। যাইয়া দেখে, শ্রীজগন্নাথ নন্দীঘোষ-রথে আরোহণ করিয়া গুণ্ডিচা-অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। সকলের মুখেই জয়জয় হরিহরি ধ্বনি। হাজার হাজার লোক নাচিতেছে, হাজার হাজার লোক গাহিতেছে, হাজার হাজার লোক বাজনা বাজাইতেছে, হাজার হাজার লোক রথের রজ্জু ধরিয়া টান দিতেছে। সেই উল্লাসময় দৃশ্য দেখিয়া দাসিয়ার মন আনন্দ-রসে রসিয়া গেল। সেই রস টস্ টস্ করিয়া নয়ন-দ্বার দিয়া ঝরিয়া-ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সে এক-একবার মস্তকের উপর যুগল হস্ত বিন্যস্ত করিয়া প্রভুর অমিয়-মাখা

শ্রীমুখখানি দর্শন করে, আর 'জয়জয় জগন্নাথ' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠে। শ্রীপ্রভুর বিদ্রুম-বিনিন্দিত রক্তিম অধর এবং কৃষ্ণতারক-শোভিত শোভন নয়ন দেখিয়া সে ভাব-বিভোর হইয়া পড়িল। সে দেখিল,—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীহরি যেন মৃদু-মধুর হাস্য করিতে-করিতে তাহার প্রতি করুণ-নয়নে চাহিতে-ছেন। সে আর থাকিতে পারিল না। অমনি দু'বাহু তুলিয়া গদগদ-কণ্ঠে প্রভুর উদ্দেশে বলিতে লাগিল,—পতিতপাবন হে! যদি দয়া করিয়া দেখিতেছ, দেখ—আমার মত পতিত আর নাই। যদি তোমায় পতিতপাবন-নামই ধারণ করিতে হয় প্রভু, তবে অগ্রে এ পতিতকে উদ্ধার করিয়া পরে ঐ নাম ধারণ করিও। ছাখ, ছাখ প্রভু, আমার মত মহানারকী, মহাপাতকী আর দেখিতে পাইবে না। দয়াময়! আমিই তোমার দয়া প্রকাশের প্রকৃত পাত্র। আমার প্রতি আর অবহেলা করিলে চলিবে না। অধমকে তোমায় উদ্ধার করিতেই হইবে। দাও—দাও প্রভু! আমার পাপ-তাপ দূর করিয়া দাও। দাও—দাও প্রভু! আমার হৃদয়ে জ্ঞানের দীপ জ্বালিয়া দাও। তাহার আলোকে আমার অন্তর-বাহির আলোকিত হইয়া উঠুক। আর সেই আলোকে তোমার ঐ ত্রিভুবন আলো-করা কমনীয় মূর্তি অনুক্ষণ দর্শন করি। এই বলিয়া সে বারংবার সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করে, আবার উঠিয়া মস্তকে যুগল হস্ত রাখিয়া বিনয়-বচনে কত কি বলে, আর তৃষিত-নয়নে সেই অপ্রাকৃত রূপসুধা পান করে। এইরূপ কিছুক্ষণ করিবার পর সে যেন প্রাণেপ্রাণে প্রাণনায়কের আশ্বাসের ভাষা

শুনিতে পাইল। আর প্রভুর নিকট 'মেলানি' (বিদায়) লইয়া একলা একলা চলিয়া আসিল।

দাসিয়া বাটী আসিয়া প্রবেশ করিবামাত্রই তাহার প্রেয়সী হাসিয়া-হাসিয়া বলিল,—এই যে, রথযাত্রা দেখিয়া আসিয়াছ যে? বেশ করিয়াছ। তা এখন এক কার্য্য কর, অনেকটা বেলা হইয়া গিয়াছে, হাত-পা ধুইয়া আহার করিতে ব'স। দাসিয়ার তখন ভাবের নেশা ছুটে নাই। সে আর কোন কথা না কহিয়া হাত-পা ধুইয়া খাইতে বসিল। সেদিন তাহার পত্নী করিয়াছে কি,—নূতন হাঁড়ীতে করিয়া ভাত রাঁধিয়াছে। ভাতে-ফেনে একটী হাঁড়ী টাইটুম্বুর। হাঁড়ীর কানায়কানায় ফেন। ফেনের উপর সর পড়িয়া গিয়াছে। ঠিক মধ্যস্থলে কতকটা শাক দিয়া, সে সেই হাঁড়ীটী পতির সম্মুখে আনিয়া ধরিয়া দিল। চারিদিকে হাঁড়ীর টক্‌টকে রাঙ্গা ধার, তাহার পর কতকটা সাদা ফেনের সর, আর তার মধ্যভাগে কাল শাক ঠিক গোল হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দাসিয়া ভাবের ঘোরে এই শাকান্ন দেখিয়া যেন আর কি দেখিয়া ফেলিল। সে দেখিল,—অহো, এ যে সেই শ্বেতপদ্ম ডোলা,—এ যে সেই বিশ্বমোহনের শ্বেত-পদ্মনয়ন! অহো, এই সেই নয়নের রক্ত-প্রান্ত। এই সেই নয়নের শুভ্র অবকাশ। এই সেই নয়নের কৃষ্ণবর্ণ তারকা। হায়, এই সেই প্রভুর প্রফুল্ল-পঙ্কজ-নয়ন! মরিমরি নয়নের কি শোভা রে! এইরূপ চিন্তা করিতে-করিতে ভাবের আবেগে দাসিয়ার শরীর থরথর কম্পিত হইতে লাগিল। বদনে আর

বচন বাহির হয় না। নয়নের বাঁধ ভাঙ্গিয়া প্রেমের জল বাহির হইয়া পড়িল। অঙ্গেঅঙ্গে রোমাবলী উত্থিত হইল। এই ভাবেই কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। তাহার পর সে বাতুলের মত আসন হইতে উঠিয়া পড়িল। কাহাকে যে কি বলে, কিছুরই ঠিক নাই। কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, কখনও বা হাততালি দিয়া ঢলিয়া-ঢলিয়া নানা রঙ্গে নাচিতে থাকে। দাসিয়ার অবস্থা দেখিয়া তাহার পত্নীর বড় ভয় হইল। সে ভাবিল,—এ নিশ্চয় কেহ আড়ি করিয়া তাহার পতিকে 'গুণগান' কিছু করিয়াছে। তাই সে মহা হাঁকডাক করিয়া রাজ্যের লোক জড় করিল। সকলকেই বলে,—ওগো, তোমারা দ্যাখ গো, আমার স্বামী সবে এই শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছিল, কোন্ অভাগা বা অভাগী আমার মাথা খাইয়া কি ক'ল্লে গো কি ক'ল্লে। ঐ দ্যাখ গো ঐ দ্যাখ, পাগলের মত আবোলতাবোল কত কি ব'ক্‌ছে—নাচছে, গাইছে, কত কি ক'রছে। আমি এখন কি করি?—তোমরা ব'লে দাও গো ব'লে দাও।

এই কথা শুনিয়া কয়েকজন লোক রমণীকে আশ্বস্ত করিয়া দাসিয়ার দেহ ধরিয়া ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলিতে লাগিল,—ও দাস, দাস। ভাত-টাত না খেয়ে এত নাচুনি-কুঁদুনি হ'চ্ছে কিসের জন্য? কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির পর দাসিয়া যেন কোন্ রাজ্য হইতে এ রাজ্যে আসিয়া পড়িল। চমকভাঙ্গা হইয়া উত্তর দিল,—অ্যাঁ। তখনও তাহার উপর অবিশ্রান্ত প্রশ্ন চলিতে-ছিল। সে দীন হীন কাঙ্গালের মত কৃতাঞ্জলিপুটে সকলের

কাছে কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল,—ওগো, তোমরা কি বল গো. কি বল,—খাবার কথা কি বল গো কি বল? রথারূঢ় জগন্নাথের ঐ পদ্ম-নয়ন তোমরা দেখিতে পাইতেছ না কি? আহা আহা,—ঐ যে তাহার রক্তপ্রান্ত,—ঐ যে তাহার শুভ্র অবকাশ, ঐ যে তাহার কৃষ্ণবর্ণ কণীনিকা! আহা আহা, কি সুন্দর কি সুন্দর! এইরূপ বলিতে-বলিতে সে আবার ভাবের আবেশে অবশ হইয়া পড়িল। আবার সেই উন্মত্তের মত নাচিতে-গাহিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

দাসিয়ার নিবাসে যে সকল লোক আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ভাল মন্দ সকল রকমই ছিল। বিশেষতঃ সেদিন রথ-যাত্রা, তাই অনেক সাধু-সজ্জন বালিগ্রাম দিয়া যাতায়াত করিতে-ছিলেন। এই লোকসংঘট্টের মধ্যে সেইরূপ মহাত্মাও কেহ-কেহ ছিলেন। তাঁহারা দাসিয়ার এই ভাব দেখিয়া বিমোহিত হইয়া গেলেন। বলিলেন,—ওহে বাউরি, তোমার বিমল ভাবের বালাই লইয়া মরিয়া যাই! এ ভাব তুমি পাইলে কোথা হইতে? নিশ্চয়ই তুমি শ্রীহরির মন হরিয়া এই ভাব-রত্ন আহরণ করিয়া আনিয়াছ। ধন্য, ধন্য তুমি! আজ তোমাকে দেখিয়া আমা-দের বড় আনন্দ হইল। আজ হইতে তোমার নাম হইল—"বালিগ্রামদাস।" এ বালিগ্রাম তোমাকে বক্ষে ধরিয়া কৃতার্থ হইয়া গেল। আর মাতা দাসপত্নি! তুমি পতির নিমিত্ত চিন্তা করিও না। বহু ভাগ্যে তুমি এমন পতি পাইয়াছ। উপ-স্থিত তুমি এক কার্য্য কর,—এই হাঁড়ি হইতে শাকটুকু তুলিয়া

একটা কিছুতে রাখ এবং অপর একটী হাঁড়ীতে পেজপানি (ফেন) প্রভৃতি ঢালিয়া দাও। তাহা হইলেই তোমার স্বামী এখনই আহার করিবে। জগন্নাথের জলজ-নয়ন যাহার মনে-মনে জাগিয়া আছে, সে কি কখনও ঐ ভাবের ঐ অন্ন গ্রহণ করিতে পারে? আহা মাগো! ঐ দেখিতেছ না কি,—

"হাণ্ডী সুরঙ্গ পেজ ধলা। তা মধ্যে শাগ দিশে কলা॥
সাক্ষাতে পদ্মডোলা সেহি। গোলি কিরূপ খাইবই॥"

ঐ যে লাল হাঁড়ীর কানা, তার পর ঐ সাদা ফেন, তার মধ্যে ঐ যে কালো শাক দেখা যাইতেছে, ও যে সাক্ষাৎ শ্রীহরির পদ্মনয়ন-সদৃশ; ও কি গুলিয়া খাইতে পারা যায় মা? এত বড় কঠিন রোগ মা! কঠিন রোগ। এই রোগের প্রাবল্যেই শ্রীমতী রাধিকা তমালতরু আলিঙ্গন করিয়া বিভোর হইয়া থাকিতেন,—বাঁশে বাঁশে ঘষাঘষীর ধ্বনি শুনিয়া অচেতন হইয়া পড়িতেন। এ সেই জাতের রোগ মা! সেই জাতের রোগ! এই বলিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। দাসপত্নীও তাঁহাদের আদেশ অনুসারে শাক ও ফেন পৃথক্ পাত্রে বাড়িয়া দিলেন। তারপর পতিকে মিনতি করিয়া আহার করিতে বলায় তিনিও বিনা আপত্তিতে ভোজন করিয়া ফেলিলেন। ঐ দিন হইতে দাসিয়ার ভাবই আর এক প্রকার হইয়া গেল। দিন নাই—রাত্রি নাই, কেবলই ভাবনা,—সেই ঘণ্টা-নিনাদ-মুখরিত নন্দীঘোষ রথ, রথোপরি সেই জগন্নাথ, তাঁহার সেই সুধার সদন রসের বদন, আর সেই সন্তাপনাশন সরোজ-নয়ন। সে বাহিরে যে কোন কর্ম্মই করুক

না কেন, মন সেই মনোনায়কের চরণতলে রাখিয়া দিয়াছে। অনুক্ষণ মনে করে,—সে যেন সেই দীনবন্ধুর অভয়-পাদপদ্মতলে মস্তকটী রাখিয়া নির্ভয়ে শুইয়া আছে। এই ঘুমের ঘোরেই যেন সতত বিভোর। নয়ন যেন সর্ব্বদাই ঢুলু ঢুলু।

একদিন রাত্রিকালে বালিগ্রামদাস শয়ন করিয়া আছে। চিত্ত চিন্তামণির চরণকমলে সমর্পিত। প্রাণটা কেমন আনচান করিয়া উঠিল,—হায় সেই শঙ্খচক্রধারী দারুহরির কৃপা অধিকার করিতে কখনও পারিব কি?—তাঁহার দর্শনলাভ ভাগ্যে কখনও ঘটিবে কি? উৎকণ্ঠায় তাহার যেন কেমন একটা ছটফটানি ধরিল। সে যেন আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না, দর্শনলাভের ক্ষণিক বিলম্বও যেন অসহ্য—অসহ্য। জাতি নয়, কুল নয়, সৎপ্রতিষ্ঠা সদাচারও নয়, কেবল প্রাণভরা ব্যাকুলতাকেই যিনি আপনাকে পাইবার একমাত্র মূল্য অবধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, সেই প্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অমনি তিনি মোহন-বেশে ভক্তের পাশে চিরবিক্রীতের মত আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মঞ্জু মঞ্জীর-সিঞ্জিতে বালিগ্রামদাসের আবেশ ভাঙ্গিয়া গেল। সে চকিত-নয়নে চাহিয়া দেখে,—তাহার সাধনের ধন, কমলারমণ হাস্য-বদনে দাঁড়ায়ে আছেন। অনেক দিনের পিপাসা; নেত্ররন্ধ্রে সে রূপসুধা পীইয়া পীইয়া সাধ আর মেটে না। অনেক্ষণ দর্শনের পর সে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রভুকে বলিতে লাগিল,—দয়াময়! রথে তোমায় যে দিব্য মূর্ত্তিতে দেখিয়াছিলাম, আজ আমি সাক্ষাতেও তোমায় সেই মূর্ত্তিতেই

দর্শন করিতেছি। না, তুমি যথার্থই কাঙ্গালের ঠাকুর বটে। সুর-অসুর গন্ধর্ব্ব-কিন্নর যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্র প্রভৃতিও যাঁহার দর্শন পান না, সেই ব্রহ্মাণ্ডের ঠাকুর তুমি কি না জ্ঞানহীন ভক্তিহীন হীনজাতি আমার গৃহে আগমন করিলে? আমি তোমায় কি দিয়া সৎকার করিব প্রভু? দাসের কথা শুনিয়া পীতবাস সহাস্য-সম্ভাষণে বলিলেন,—

"স্বর্গাদি অপবর্গ যেতে। কেবে ন রসে মোর চিত্তে॥
ভকতিভাবে যে ভজই। মো মন তা ঠারে রিঝই॥
তেনু তো ভাব মোর মূল। হে ভক্ত! মাগি ঘেন বর॥"

প্রিয়তম! স্বর্গ বল, অপবর্গ বল, অন্য কাম্য যাহা কিছু বল, এ সকলের জন্য যাহারা আমার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করে, তাহারা কিছুতেই আমার অন্তরকে প্রীতি-বিগলিত করিতে পারে না। কিন্তু অকপট ভক্তিভাবে যে আমার ভজনা করে, আমার মন তাহার জন্য ঝুরিয়া মরে। তাই তোমার বিশুদ্ধ ভাবই আমার মূল,—সেই ভাবের আকর্ষণেই আমি এখানে আসিয়া পড়িয়াছি। ভক্ত হে, তুমি আমার নিকট অভিমত বর মাগিয়া লইতে পার।

চিন্তা[illegible]ণি যাহার হস্তগত, সে আর সামান্য সামগ্রী কি-ই বা প্রার্থনা করিবে? তাই বালিগ্রামদাস আনন্দভরে প্রভুর নিকট আত্মনিবেদন করিয়া বলিল,—

"পদ্ম-চরণ তুম্ভ ভাবি। কোটিএবার লুচ্চি যিবি॥
বরে মো প্রয়োজন নাহি। এতেক দেব ভাবগ্রাহি॥

তো ভক্তমানঙ্ক চরণে। মো মন থাউ অনুক্ষণে ॥
যেবে মুঁ মনরে ভাবিবি ! তুম্ভ দর্শন পাউথিবি ॥
এ বর মোতে আজ্ঞা হেউ। অধিক লোড়া নাহি আউ ॥"

আই আই, আমি তোমার চরণকমল চিন্তা করিতে-করিতে কোটিকোটিবার তোমার বালাই লইয়া মরিয়া যাই। তোমার কাছে আমার অপর বরে আর প্রয়োজন নাই। তবে যদি নিতান্তই কিছু দিতে চাও—তবে ভাবগ্রাহি হে, ইহাই দিও,—যেন তোমার ভক্তগণের চরণে আমার মন অনুক্ষণ বিচরণ করে আর আমি যখন মনে মনে তোমার ভাবনা করিব, তখন যেন তোমায় দেখিতে পাই। ইহার অধিক কামনা করিবার আমার কিছুই নাই।

ভক্তের প্রীতি-মাখা প্রার্থনা-বাক্যে ভগবান্ পরম প্রীতি-লাভ করিলেন। প্রসন্ন-বদনে বলিলেন,—ওহে বালিগ্রামদাস ! তোমার জীবন ধন্য। এরূপ কামনাশূন্য পুণ্য-মন বড় দেখা যায় না। তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। তুমি যখন নীলাচলে গমন করিবে, আমি আমার দেউলের নীলচক্রের উপর অব-স্থান করিব। তুমি আমায় যে রূপে দেখিতে ইচ্ছা করিবে, আমি সেই রূপেই তোমাকে দেখা দিব। আর তুমি আমায় যে কোন দ্রব্য আহার করিতে দিবে, তাহা আমি অবশ্যই ভোজন করিব। এই বলিয়া হাসিতে-হাসিতে শ্রীহরি অন্তর্দ্ধান করিলেন।

দীনতাই ভক্তের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ভক্ত স্বভাবতঃ আপনাকে

নীচের নীচ—অতি নীচ মনে করিয়া থাকে। দাসিয়া বাউরী একে আপনাকে অতি নীচ জাতি বলিয়াই জানিত, তাহার পর ভগবানের ভক্তি-সম্পত্তি অধিকার করিয়া সে যে আপনাকে কত নীচের নীচ মনে করিত, তাহা বলা যায় না। তাই সে ভগবান্‌কে—প্রাণের ঠাকুরকে কিছু খাওয়াইব খাওয়াইব মনে করিলেও মুখ ফুটিয়া সে কথা তাঁহার নিকট বলিতে পারে নাই। কেবল নয়নে দেখিবার বাসনাই জানাইয়াছিল মাত্র। অত্যধিক দীনতাই তাহার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। সে না বলিলেও কিন্তু অন্তর্যামী ভগবান্ তাহার অন্তরের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি আপনাআপনিই বলিয়া উঠিলেন যে,—তুমি আমাকে যাহা কিছু খাইতে দিবে, আমি তাহা অবশ্যই ভোজন করিব।

ভগবানের কথা শুনিয়া বালিগ্রামদাস কেবলই ভাবে,—অহো, করুণাময়ের কি অপার করুণা! আনন্দে-আনন্দেই তাহার রজনীর অবসান হইয়া গেল। প্রাতঃকালে উঠিয়া কেবলই চিন্তা—প্রভুকে কি খাওয়াই—কি খাওয়াই। সে একখানি কাপড় বুনিয়াছিল। সেখানি বিক্রয় করিতে এক বিপ্র-গৃহে গমন করিল। ব্রাহ্মণ বস্ত্রখানি লইয়া মূল্য আনিতে বাটীর মধ্যে গিয়াছেন; বালিগ্রামদাস তাঁহার দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছে। সে দেখিল—সুন্দর একটী নারিকেল গাছ। বেশী উচ্চ হয় নাই। তাহাতে সুন্দর একটী নারিকেল ফলিয়াছে। ফলটী দেখিয়াই তাহার প্রাণনাথের কথা মনে পড়িয়া গেল। ভাবিল,—

আহা, এই নারিকেলটী যদি পাই তো তাঁহাকে আদর করিয়া আহার করাই। এমন সময় ব্রাহ্মণ বস্ত্রের মূল্য লইয়া বাহিরে আসিলেন। বালিগ্রামদাস তাঁহাকে মহা আগ্রহের সহিত বলিল,—ঠাকুর! আপনার ঐ নারিকেল ফলটী অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে দান করুন। বরং উহার যাহা মূল্য হয় বস্ত্রের মূল্য হইতে তাহা কাটিয়া লউন। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—তা-ও কি হয়? আমার এই প্রথম গাছের প্রথম ফল; একি যাকে-তাকে দেওয়া চলে? তিনি বলিলেন বটে, কিন্তু নারিকেলটী দিলে কাপড়ের দাম যে কিছু কম দিতে হইবে, এ কথাটা ও মনেমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। বালিগ্রামদাসেরও আগ্রহ-প্রকাশের সীমা নাই দেখিয়া ব্রাহ্মণ আবার বলিলেন,—ভাল, নারিকেলটী না হয় তোমাকেই দিলাম, কিন্তু তুমি ইহার মূল্য কত দিতে পার বল দেখি? বালিগ্রামদাস বলিল,—ঠাকুর, মূল্য তো আপনারই নিকটে রহিয়াছে, উহার মধ্য হইতে যত ইচ্ছা লইতে পারেন। ব্রাহ্মণ দেখিলেন,—সুযোগ মন্দ নয়। তিনি অমনি বলিয়া উঠিলেন,—তা বাপু, ফলটী তো আমার দিবারই ইচ্ছা নাই; তবে তুমি নিতান্ত জিদ করিতেছ, কি করি, তুমি এক কাজ কর, তুমি কাপড়খানির মূল্য ছাড়িয়া দাও, বিনিময়ে ফলটী লইয়া চলিয়া যাও। বালিগ্রামদাস বলিল,—আচ্ছা হউক,—তাহাই হউক, আপনার কাপড়ের মূল্য দিয়া কাজ নাই, নারিকেলটী আমাকে আনিয়া দিন। ব্রাহ্মণ তাহাই করিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি নারিকেলটী পাড়িয়া আনিয়া দাসিয়াকে দিতে গেলেন। সে

বলিল,—ঠাকুর! কৃপা করিয়া একটু অপেক্ষা করুন। আমি স্নান করিয়া আসিয়া ফলটি লইয়া যাইতেছি। ব্রাহ্মণের বাটীতেই পুষ্করিণী। দাসিয়া তাহাতেই স্নান করিয়া শুদ্ধভাবে সেই ফলটী গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেল। তাহার তখন আনন্দ দ্যাখে কে? মনের মত ফল মিলিয়াছে, এইবার যাই, ইহা প্রভুকে খাওয়াইয়া আসি, এই ভাবিয়া সে দেউলের দিকে দ্রুতগতি চলিল। সে একবারও ভাবিল না—করিলাম কি? বস্ত্রখণ্ডের মূল্য না লইয়া দুইটী প্রাণীর জীবিকাকে বিপন্ন করিলাম?

প্রকৃত কথা বলিতে কি,—দাসিয়া প্রতিদিন যে বস্ত্র বয়ন করে, তাহা বিক্রয় করিয়া যাহা পায়—তাহা হইতেই সে আবার সূতা ক্রয় করে, এবং লাভের পয়সায় খাওয়া-দাওয়া সকল ব্যয়ই নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ভালবাসা যথার্থই অন্ধ; তাই জগন্নাথের ভালবাসায় দাসিয়া দেখিতে পাইল না যে, সে বস্ত্রের মূল্য না লইয়া কাজটা করিয়া ফেলিল কি? সে উল্লাসে-উল্লাসে দেউলের দিকে চলিয়াছে। পথে যাইতে-যাইতে দেখিল,—তাহারই পল্লীবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ শ্রীপ্রভুর সেবার জন্য পইড় (ডাব), শ্রীফল, (বেল), পনস (কাঁটাল), আম্ব (আম্র), কদলী, ইক্ষু, ছেনাগুটিয়া (ছানার মুড়কি), দুধ, দহি, ঘৃত, নবাত প্রভৃতি লইয়া যাইতেছেন। সে ব্রাহ্মণকে মিনতি করিয়া বলিল,—ঠাকুর, আমার একটী নিবেদন শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হউক। আপনি যদি আমার এই নারিকেলটী লইয়া শ্রীপ্রভুকে নিবেদন করিয়া দেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—তার আর কি? এই তো—!

আমি আমার সকল সামগ্রী নিবেদন করিতেই যাইতেছি, সেই সঙ্গে তোমার ফলটীও নিবেদন করিয়া দিব,—দাও। বালিগ্রাম-দাস বলিল,—ও-রকম একসঙ্গে নিবেদন করিলে চলিবে না। আপনি আপনার নৈবেদ্য অগ্রে নিবেদন করিয়া দিবেন, তাহার পর অধীনের ফলটীর কথা স্মরণ করিবেন। আপনি গরুড়স্তম্ভের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া নারিকেলটী হস্তে লইয়া প্রভুকে বলিবেন,—ওহে পীতবাস! বালিগ্রামদাস তোমাকে এই ফলটী খাইতে দিয়াছে—গ্রহণ কর। আপনি এই বলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন। অপর মন্ত্র-টন্ত্র কিছুই বলিবেন না। ইহাতে যদি তিনি শ্রীহস্ত সম্প্রসারিত করিয়া আপনার হস্ত হইতে নারিকেলটী লইয়া যান, তবেই তাঁহাকে প্রদান করিবেন, নচেৎ আমার ফল আমাকেই আনিয়া দিবেন। দেখিবেন ঠাকুর, যেন এ কাঙ্গালের কথা ভুলিয়া না যান।

দাসিয়ার সম্ভাষা শুনিয়া ব্রাহ্মণ তো হাসিয়াই অস্থির। তিনি "আচ্ছা দাও দাও" বলিয়া ফলটী লইয়া চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ-ঠাকুর পাড়ার লোক, নিষ্ঠা-কাষ্ঠা আছে, লেখাপড়া জানেন, তাই তাঁহার হস্তে নারিকেলটী দিতে দাসিয়ার অবিশ্বাস হয় নাই। সে নিশ্চিন্তমনে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। ওদিকে ব্রাহ্মণও শ্রীদেউলে যাইয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি তাঁহার আনীত দ্রব্যগুলি জগবন্ধুকে নিবেদন করিয়া দিলেন। মহাপ্রসাদ ভোজন পূর্ব্বক কিছুক্ষণ পরমানন্দে বিশ্রাম করিলেন। তাহার পর উঠিয়া বাটী আসিবেন, এমন সময় দাসিয়া-বাউরীর নারিকেলের কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। তিনি ভাবিলেন,—ভাল, ক্ষেপাটার কথা

একবার বুঝিয়াই দেখা যাক না কেন ? এই ভাবিয়া তিনি সেই নারিকেলফলটী হস্তে লইয়া গরুড়স্তম্ভের পশ্চাতে যাইয়া দাঁড়াইলেন এবং শ্রীপ্রভুকে সেই ফলটী দেখাইয়া বলিলেন,—প্রভু হে ! বালিগ্রামদাস এই ফলটী আপনাকে আহার করিতে দিয়াছে। আপনি যদি শ্রীহস্ত বিস্তার করিয়া ইহা গ্রহণ করেন, তবেই আমি আপনাকে দিতে পারিব, নতুবা আমাকে ইহা ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। ব্রাহ্মণ এই বলিয়া নয়ন মুদিয়া প্রভুকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। প্রভুও অমনি শ্রীহস্ত বাড়াইয়া ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে নারিকেলটী গ্রহণ পূর্ব্বক আনন্দমনে ভোজন করিলেন। এই বিস্ময়াবহ ব্যাপার দর্শনে ব্রাহ্মণ ভাব-বিভোর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নয়ন অশ্রু-প্রবাহে পূরিয়া গেল। মনে-মনে বলিলেন,—অহো ! ধন্য ভক্তের অচল অটল বিশ্বাস ! আহা ! ভক্ত, তুমি ধন্য ! তোমার জনকজননী ধন্যধন্য ! তোমার আবির্ভাবে আমাদের বালিগ্রামও যারপরনাই ধন্য ! পুরুষোত্তম জগন্নাথ তোমার প্রতি প্রকৃতই প্রসন্ন। আজ আমিও তোমার ফল আনিবার সৌভাগ্যে ধন্য ও সফলকাম হইলাম।

ব্রাহ্মণের মুখে এই আচম্বিত কথা শুনিয়া দেউলের মধ্যে একটা মহা সোরগোল পড়িয়া গেল। সকলেই বলে,—কি বিচিত্র কি বিচিত্র ! ব্রাহ্মণ বালিগ্রামদাসের আবাসে গিয়া শ্রীপ্রভুর শ্রীহস্ত বাড়াইয়া নারিকেলটী লইয়া খাইবার কথা বলিলেন,—তাহাকে শতশত ধন্যবাদও দিলেন। শুনিয়া তাহার বড় আনন্দ হইল। ব্রহ্মাণ্ডের নাথ যে নীচজনের নিবেদিত দ্রব্যও আদর

করিয়া অঙ্গীকার করেন, এ বিষয়ে আর তাহার সংশয় রহিল না। এইবার তাহার প্রভুকে যেন অধিক পরিমাণে আপন আপন মনে হইতে লাগিল। প্রভুর কাছে অগ্রসর হইতে চিত্ত যেন, আর সঙ্কুচিত হয় না। একদিন সে মনে ভাবিল,—যাই, একবার নীলাচলে যাই ; তিনি যে নীলচক্রে রহিয়া প্রার্থনার অনুরূপ রূপে দেখা দিবেন বলিয়াছেন, তাহার সত্যতা একবার অনুভব করিয়া আসি। কিন্তু তাঁহার নিকট রিক্তহস্তে যাওয়াটা তো ঠিক নয়, সঙ্গে খাবার-দাবার লইয়া যাই কি ? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে একজন মালী তাহার দ্বারে আম্র বিক্রয় করিতে আসিল। আম্রগুলি দেখিতে অতি সুন্দর—আগাগোড়া পীতবর্ণ, কোথাও একরত্তি অন্য দাগ নাই ; যেন মোম দিয়া গড়া। আকৃতিও বড়বড়। গন্ধে সেই স্থানটা যেন মাতাইয়া তুলিয়াছে। দেখিয়া বালিগ্রাম-দাসের বড় হর্ষ হইল। ভাবিল,—হ্যাঁ, ইহাই দেবতাকে দিবার উপযুক্ত দ্রব্য বটে ! সে তাহার ক্ষমতার অতীত অর্থ দিয়া দশ-পুঞ্জা (দশ-গণ্ডা) আম্র ক্রয় করিল। তাহাতেই দুইটি চাঙ্গারি ভরিয়া গেল। সে স্নানাদি সারিয়া শুদ্ধভাবে কাঁধে ভার করিয়া সেই চাঙ্গারি-ভরা আম্রগুলি লইয়া পুরী-অভিমুখে যাইতে লাগিল। সে যাই দেউলের নিকটে গিয়াছে, অমনি পণ্ডার দল তাহাকে ছাঁকিয়া ধরিলেন। আম্র দেখিয়া সকলেরই লোভ। কেহ বলেন,—ওহে দাস ! এ আম্র আমার হস্তে দাও, আমি লইয়া গিয়া প্রভুকে খাওয়াইয়া আসিতেছি। তাঁহার কথায় বাধা দিয়া আর একজন চক্ষু কপালে তুলিয়া বিকট চীৎকার করিয়া বলিয়া

উঠিলেন,—ওহে! তুমি কে হে?—আম লইয়া যাইবার তুমি কে হে? প্রভুর সেবার যত কিছু দ্রব্য ভিতরে লইয়া যাইবার আমারই তো একমাত্র অধিকার, দেখি তুমি কেমন করিয়া লইয়া যাও? ওহে দাস! তুমি এই দিকে এস, ও আম্র আমাকে দাও, আমিই ভিতরে লইয়া যাইব। অপর একজন আসিয়া তাঁহার উপর মাত্রা চড়াইয়া মহা লম্ফঝম্ফ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—কী-ই,—কই, কাহার্ সাধ্য আছে আমার সম্মুখ হইতে এই আম্র লইয়া যায়, যাউক দেখি? ওহে দাস! তুমি ও আম্র আমারই হাতে দাও, আমি প্রভুকে খাওয়াইয়া আসিতেছি। এইরূপ তার উপর তার উপর মাত্রা চড়িতে লাগিল,—চেঁচামেচির চোটে ব্রহ্মকটাহ ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইয়া পড়িল,—আর টানাটানিতে ছেঁড়াছেঁড়িতে পড়িয়া বালিগ্রামদাস বেচারি মারা যাইতে বসিল। সে তাঁহাদিগকে বিনীতভাবে যতই বলে,—ঠাকুর গো! এ আম্র আপনাদিগকে লইয়া যাইতে হবে না গো হবে না, তাঁহারা তাহাকে লইয়া ততই টানাটানি করেন। তাহার সে কথা তখন শুনেই বা কে? অনেকক্ষণ পরে তাঁহারা যখন দেখিলেন,—লোকটা কাহারও হস্তে আম্রগুলি দিল না, তখন তাঁহারা গোল থামাইয়া একজোট হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হাঁ হে দাস! তুমি আম্র লইয়া আসিয়াছ প্রভুর নিমিত্ত, অথচ সেবক আমরা—আমাদের হাতে দিতেছ না; বলি, তোমার মতলবটা কি? বালিগ্রামদাস ঈষৎ হাসিতে হাসিতে তাঁহাদিগকে সেই সাবেক কথাই বলিল,—ঠাকুর গো! এ আম্র তো আমি

আপনাদের কাহারও হস্তে দিব না। এই কথা বলাও যা, আর অমনি পাণ্ডার পাল চটিয়া লাল! মহা হাত মুখ নাড়িয়া বলিলেন,—কী-ই,—বেটা ছোটলোক বাউরী,—তুই এই আম্র নিয়ে ক'র্‌বি কি? তুই দেউলের ভিতরে যাইতে পার্‌বি,—না, প্রভুর কাছে গিয়ে তাঁরে খাওয়াতেই পার্‌বি? ও-ওঃ—বেটা বাউরী, প্রভুকে খাওয়াতে আম্র এনেছে, আবার আমাদের হাতে দেবে না? দিবি না কি রে বেটা!—প্রভুকে খাওয়াতে হয় তো এই আমাদেরই পা—য়ে ধো—রে দি—তে হ—বে যে—।

বালিগ্রামদাসের সেই হাসি-হাসিই মুখ। সে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগের নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে-করিতে খানিকটা পিছাইয়া আসিল এবং স্কন্ধ হইতে ভারটি নামাইয়া নীলচক্রের দিকে নয়ন চালন করিল। চাহিয়া দেখে কি?—অহো, তাঁহার প্রাণের বন্ধু সেখানে শুভ বিজয় করিয়াছেন। দেখিয়াও তাহার বিশ্বাস হয় না যে, ছার বাউরীর জন্য জগতের নাথ আবার এতটা ক্লেশ অঙ্গীকার করিয়াছেন। সে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল—ওগো! তাই বটে গো তাই বটে! ওই যে সেই দয়ার সাগর প্রভু বটে গো প্রভু বটে! সে যতই দেখে, ততই যেন প্রভুর মাধুর্য্য উছলিয়া উছলিয়া পড়িতে লাগিল। সে সেই রূপ-মদিরা নয়ন-চসকে পান করে আর ঢলিয়া-ঢলিয়া বলে,—হে প্রভু! আমি তোমার পরিমুণ্ডা যাই পরিমুণ্ডা যাই,—তোমার পায়ে মাথা রাখিয়া লুটোপুটি খাই লুটোপুটি খাই! সে মাতালের মত সেই মধ্যপথেই ঢলিয়া পড়িয়া প্রভুকে বারংবার প্রণাম

করিল ; চলিতে-চলিতে আবার উঠিয়া পড়িল এবং সেই চেঙ্গারি হইতে জোড়া-জোড়া আম্র লইয়া প্রভুকে দেখাইয়া বলে,—খাও খাও, আর মহাবাহু সেগুলি অন্যের অলক্ষ্যে লইয়া ভক্ষণ করেন। এইরূপে সে সেই দশ গণ্ডা আম্রই প্রভুকে খাওয়াইয়া ফেলিল। পণ্ডা ও অন্যান্য লোকজন সকলে তাহার ভাবখানা দেখিয়া প্রথম মনে করিয়াছিলেন যে, লোকটা পাগল, তারপর আম্রযুগ্মগুলি অদৃশ্য হইয়া যাইতে দেখিয়া ভাবিলেন,—এ লোকটা নিশ্চয়ই কোন মায়াবী হইবে। তাঁহারা তো আর প্রভুর শ্রীহস্ত বিস্তার করিয়া আম্রগুলি লইয়া আহার করার ব্যাপারখানা দেখেন নাই ; তাই তাঁহাদের এইরূপ ধারণা হইবারই কথা! তা হউক, তাঁহাদের এ ধারণাও বড় মিথ্যা নয়। প্রকৃত পক্ষে ভক্তের মত মহা পাগল মহা মায়াবী আর কে আছে? যাহার মায়ায় সেই মায়াধীশকেও মোহিত হইতে হয়!

সে যাহা হউক, শ্রীপ্রভু ভক্তপ্রদত্ত আম্রগুলি উপযোগ করিয়া নীলচক্র হইতে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। ভক্তেরও ভাবের জমাটি ভাঙ্গিয়া গেল। সে যেন তখন অনেকটা সহজ মানুষ। তখন সকলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন,—ওহে দাস! তুমি কি উড়নবিদ্যা জান টান,—না অপর কেহ ঐ বিদ্যার বলে তোমার আম্রগুলি উড়াইয়া লইয়া গেল? বলি, ব্যাপারখানা কি,—বল দেখি? উত্তরে বালিগ্রাম বলিল,—সে আম্র আমিও উড়াই নাই ; অপর কেহও উড়াইয়া লয় নাই ; উড়াইয়া লইয়াছেন স্বয়ং ভগবান্ জগন্নাথ ;—

তিনিই সেগুলি আমার হস্ত হইতে লইয়া-লইয়া ভোজন করিয়াছেন। আপনাদের বিশ্বাস না হয় তো দেউলে গিয়া দেখিতে পারেন। তাহার কথা শুনিয়া তো সকলেই অবাক্! কেহ বলেন,—বেটা বাতুল, কেহ বলেন,—না হে না, চল একবার দেউলে গিয়া দেখিয়াই আসা যাক্ না কেন? কতিপয় সেবক ত্বরাত্বরি শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। গিয়া দেখেন,—অদ্ভুত ব্যাপার! শ্রীপ্রভুর রত্নবেদীর পার্শ্বে সেই দশ-গণ্ডা আম্রের খোসা ও আঁটি পড়িয়া আছে! তাঁহারা ভাবনিধির ভাবের বলিহারি দিতে-দিতে বালিগ্রামদাসের নিকট ফিরিয়া আসিলেন এবং গৌরব-সহকারে তাহার গলায় প্রভুর প্রসাদী ধণ্ডামালা (বড় মালা) পরাইয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন,—ওহে দাস তোমার জীবনই ধন্য, তুমি ভাবমূল্যে ভগবান্‌কে কিনিয়া লইয়াছ। মিছাই আমরা প্রভুর 'সেবক' বলাই, তুমিই প্রভুর প্রকৃত সেবক। আমরা কোন গুণেই তোমার ত্রিসীমা মাড়াইতে পারি না। অহো! তোমার মত ভক্ত দর্শনে আজ আমরা কৃতার্থ হইলাম, শাস্ত্রের কথা সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিলাম, আর প্রভুর স্বভাবেরও প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইলাম। আজ আমরা উত্তমরূপেই বুঝিলাম,—

"যে যেড়ে নীচ জাতি হেউ। সে একা ভক্তিভাবে থাউ॥
তাহার পত্র ফল পুষ্প। পাইলে শ্রীহরি সন্তোষ॥
যে নর উচ্চ জাতি হেউ। শ্রীহরি-ভকতি ন থাউ॥
সে যেতে স্বাদু দ্রব্য দেলে। প্রভু ন চ্ছুয়ন্তি তা ভলে॥"

যত নীচ জাতিই হউক না কেন, সে যদি ভক্তিভাবে বিভাবিত

হয়, তবে তাহার প্রদত্ত পত্র-পুষ্প ফল-টল যৎসামান্য যাহা-কিছু পাইলেই শ্রীহরি প্রীতিপ্রফুল্ল হইয়া উঠেন,—আনন্দে-আনন্দেই তাহা অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। আর, হউক উচ্চ জাতি, সে ব্যক্তি যদি ভক্তিবিহীন হয়, তবে সে যতই না কেন স্বাদু উপাদেয় দ্রব্য ভগবান্‌কে নিবেদন করুক, তিনি তাহা অঙ্গুলির অগ্রেও স্পর্শ করেন না। ওহে দাস! আমরা প্রভুর সেবক বিপ্র, আশীর্ব্বাদ করি,—তোমার এই বিশুদ্ধ ভাব বজায় থাকুক, দেহাবসানে তুমি পরম পদ লাভ কর।

বালিগ্রামদাস—"আমি ছার অস্পৃশ্য বাউরী, আমার প্রতি আপনাদের এতই কৃপা" প্রভৃতি আর্ত্তির কথা কহিতে-কহিতে তাঁহাদের চরণতলে লুটাইয়া পড়িল এবং চরণের ধূলি লইয়া মস্তকের ভূষণ করিল। ব্রাহ্মণগণ আনন্দমনে চলিয়া গেলেন। অন্যান্য লোকজনও প্রভুর বিচিত্র মহিমা এবং ভক্তের ভাবের প্রভাব ভাবিতে-ভাবিতে যথাকার্য্যে গমন করিলেন। বালিগ্রাম-দাসের তখন কি-জানি-কেন বড় কান্না পাইতে লাগিল; সে প্রভুর গুণ বিনাইয়া-বিনাইয়া এক চোট খুব কাঁদিয়া লইল; তাহার পর নীলচক্রের পানে চাহিয়া চক্রপাণির উদ্দেশে মানস-সম্ভাষণ করিতে লাগিল। বলিল,—প্রভু হে, আমার আর তো এখানে আসা হবে না ঠাকুর! আমি মহা পতিত মহা মন্দ খন্দাল-জাতি। কিন্তু তুমি যেরূপ ঢাক পিটিয়া আমাকে জাহির করিয়া দিলে, তাহাতে লোকে দেখিলে বলিবে কি?—ভক্ত—ভক্ত—ভারি ভক্ত। লোকের মুখ ত তখন বন্ধ করিতে পারিব না? তাহাদের

কথা শুনিতেই হইবে। শুনিতে-শুনিতে যদি অভিমান আসিয়া যায়,—তবেই ত আমার ইহলোক পরলোক অন্ধকারময় হইয়া গেল প্রভু! তার আর কাজ কি? আমি যেখানে-সেখানে থাকি না কেন, আশীর্ব্বাদ কর—যেন সেখানে সেখানেই তোমার দর্শন পাই। আর আজ বিদায়ের পূর্ব্বে আর একটি বাসনা জানাইব, এ বাসনা বহুদিনের বাসনা,—তোমার দশ অবতারের দশবিধ মূর্ত্তি একবার আমায় দেখাইতে হইবে। কৃপা করিয়া তাহা একবার দেখাইয়া দাও, আর আমি তোমার মহিমার গান গাহিতে-গাহিতে বিদায় লই।

ভক্তের বাসনা ভগবানের না রাখিলে চলে না। তিনি কি করেন, সেই নীলচক্র হইতেই তাহাকে মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতার-মূর্ত্তি দর্শন করাইলেন এবং ভাবে-ভাবে দেখা দিবেন—ইঙ্গিতে অঙ্গীকার করিয়া হাস্যমুখে বিদায় দিলেন। বালিগ্রামদাসও প্রণতি-মিনতি করিয়া প্রভুকে অন্তরের কথা জানাইয়া বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। যতদূর দৃষ্টি চলে—ফিরিয়া-ফিরিয়া নীলচক্রের দিকে চাহিয়া দেখে,—তখনও জগন্নাথ সেখানে মাধুর্য্যের ভাণ্ডার উঘাড়িয়া দাঁড়ায়ে আছেন। দেখিতে-দেখিতে নীলচক্র অদৃশ্য হইয়া গেল। বালিগ্রামদাস এইবার বাহিরের শ্রীমন্দির ছাড়িয়া মনোমন্দিরে চিন্তামণিকে চিন্তা করিতে-করিতে আপন গ্রামে আগমন করিল।

যে প্রতিষ্ঠার ভয়ে সে শ্রীক্ষেত্র হইতে পলাইয়া আসিল, সেই প্রতিষ্ঠা কিন্তু তাহাকে ছাড়ে না। সে বালিগ্রামে আসিবার

বহুপূর্ব্বেই তাহার ভক্তিকীর্ত্তি সেখানে আসিয়া পঁহুছিয়া গিয়াছে। তাহাকে দেখিলে সকলেই ধন্য ধন্য করে,—তাহার ভাগ্যের শতমুখে প্রশংসা করে। এ সব শুনিতে তাহার ভাল লাগেনা,—বরং ঘৃণা হয়—ভয় হয়। তাই তাহাকে বাটীর বাহির হওয়া ছাড়িতে হইল। সতী রমণীর অন্তঃপুরই ব্যবস্থা। সে প্রাণে-প্রাণে প্রাণপতির উপাসনা করিবে বলিয়াই বোধ হয় ভগবান্ তাহার এই অবরোধের বিধান করিলেন। সে আর কাপড় বোনে না, কিছুই করে না ; কেবল হরি বলিয়া হাসে কাঁদে নাচে গায়, আর আমোদভরে এলাইয়া যায়। তাহার আহারের ভার বিশ্বপতিই আপন হস্তে লইলেন। বিশ্বপতির প্রেরণায়—পাঁচজনের করুণায় পতি-পত্নীর কিছুরই অভাব নাই। আনন্দে-আনন্দেই তাহাদের গোণা দিন কাটিয়া গেল। দেহাবসানে দিব্যদেহে তাহারা দেবদেবের পাদপদ্ম লাভ করিল।

ফুল ফুটিয়া—সুবাস ছড়াইয়া—মধু লুটাইয়া ঝরিয়া পড়ে ; আর তাহার সুবাসের লেশ মিলে না। এ রাজ্যের ফুলের এইরূপ দশাই বটে। কিন্তু ভগবানের খাস-বাগানের এই পবিত্র পুষ্পটি বিমল যশের সুবাস ছড়াইয়া,—মধুমথনের নামের মধু প্রেমের মধু লুটাইয়া দিয়া, অন্তর্হিত হইলেও তাহার স্বর্গীয় সুষমা আজিও অন্তরে অন্তরে বিরাজিত,—তাহার স্বর্গীয় সৌরভে আজিও চারিদিক আমোদিত।

মঙ্গল-আদি বিচারি ইহ, বস্তু ন ঔর অনূপ।
হরিজনকে যশ গাবতে,—হরিজন মঙ্গলরূপ॥
সন্তন মিলি নির্ণয় কিয়ো, মথি পুরাণ ইতিহাস।
ভজবেকো দোঈ সুঘর—কৈ হরি কৈ হরিদাস॥
অগ্রদেব আজ্ঞা দঈ,—ভক্তনকো যশ গাব।
ভবসাগরকে তরণকো, নাহিঁন আন উপাব॥

বিচার করিয়া চিতে, মঙ্গলাদি বিধিমতে,
অনুপম বস্তু স্থির হৈল।
হৈতে ভক্ত গুণ-গান, মঙ্গল নাহিক আন,
হরিজন সাক্ষাত মঙ্গল॥
যত সাধুসন্ত-জন, মিলি কৈল নিরূপণ,
মথিয়া পুরাণ ইতিহাস।
ভজিবার ভাল ঠাঁই, দুই বই তিন নাই,
হয় হরি নয় হরিদাস॥
অগ্রদেব অনুমতি, কৈল নাভাজীর প্রতি,
ভক্ত-যশ গাহিবার তরে।
ইহা বই নাই নাই, অপর উপায় ভাই,
তরিবারে ভব-পারাবারে॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি ॥

ভক্তের জয়

তৃতীয় উল্লাস

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী কর্ত্তৃক
বিরচিত।

(তৃতীয় সংস্করণ)

শ্রীগৌরপূর্ণিমা—চৈতন্যাব্দ ৪৫২।

প্রকাশক—
১।১, চাল্‌তা বাগান সেকেণ্ড লেনস্থ
শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী হইতে
শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ১।০ এক টাকা চার আনা মাত্র

সিংহ প্রিন্টিং ওরার্কস্ ৩০, বাহুড় বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীশচীন্দ্ররঞ্জন দাস বি-এ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গপত্র।

মহামহিম মহিমচন্দ্র,

সন ১৩১১ সালের কথা, একদিন অধিকরাত্রে আমি আপনাদের ৺পুরীধামের প্রাসাদে গমন করি। আপনি তখন যে-ভাবে ভূমি-লুণ্ঠিত-মস্তকে আমাকে অভিবাদন করিয়াছিলেন, সে ভাব একালের একজন সামান্য ধনীর সন্তানের মধ্যেও সহজে দেখা যায় না। অথচ আপনি অমিতধনের অধিপতি কাশীমবাজারাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের বিবিধ বিদ্যার আগার জ্যেষ্ঠ কুমার! সেই আপনাকে প্রথম দেখা। আহা, কি সে আপনার হাস্যপ্রফুল্ল সৌমমূর্ত্তি, কি সে সুন্দর ভক্তিভাবের সমুজ্জ্বল দীপ্তি! দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া গেলাম। রাজার সখিত্ব রাজার সহিত হওয়াই স্বাভাবিক। তাই শ্রীব্রজমণ্ডলে অবস্থান-কালে আপনি হরিদাসবর্য্য গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের সহিত সখিত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহারই ক্রোড়ে দেহ রক্ষা করিয়াছেন,—এখানকার সকল সম্বন্ধ ছাড়িয়া চিন্ময়ধামে চলিয়া গিয়াছেন। আপন প্রজ্বলিত চিতার উপর দিব্য জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া অনেক সাধনশীল গোবর্দ্ধন-বাসীকে ইঙ্গিতে এ কথা জানাইয়াও গিয়াছেন। কিন্তু বলিতে কি, আপনার এখানকার সেই মাধুর্য্যমণ্ডিত-মূর্ত্তি এবং ভক্তোচিত বিনীত ভাব আজিও আমরা ভুলিতে পারি নাই, স্মৃতিতেও সুখ পাইয়া থাকি। আপনার মহনীয়চরিত্র পিতৃদেব আপনার এই পবিত্র স্মৃতিটুকু জাগাইয়া রাখিবার জন্য আপনার পবিত্র চিতাভূমির উপরে—কত পথশ্রান্ত পথিকের বিশ্রামস্থান "স্মৃতিমন্দির" নির্ম্মাণ করিয়া আপনার নামে উৎসর্গ করিয়া-ছেন। কাঙাল আমি আর কি করিব' সেই স্মৃতিটুকু জাগাইয়া রাখিবার জন্যই আমার ভক্তের জয়ের তৃতীয় উল্লাস প্রচ্ছন্নভক্ত আপনার পবিত্র নামে উৎসর্গ করিলাম। ইতি—

আপনার গুণমুগ্ধ—

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

শ্রীশ্রীগৌরহরির্জয়তি।

ভক্তের জয়

—— :০: ——

পূর্ব্ব-ভাষ।

বিবিধ বিঘ্ন-বাধা এবং স্বজন-বন্ধু-বিয়োগের বিষম ব্যথার ভিতর দিয়া ভক্তের জয়ের তৃতীয় উল্লাস প্রকাশিত হইলেন। এ প্রকাশকার্য্যের অবকাশ রোগশোকের হা-হুতাশ এবং তপ্তশ্বাসেই পরিপূর্ণ। যাঁহাকে সহায় পাইয়া আমরা পরমোৎসাহে বৈষ্ণবসাহিত্যের প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম, সেই অকপট সাহিত্যসেবী এবং অকপট শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা পূজ্য-পাদ বলাই দাদা আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া চিরতরে চলিয়া গিয়াছেন। একটা সন্দেহ হইলে আর জিজ্ঞাসা করিবার কেহ নাই,—কার্য্যে অবসাদ আসিলে উদ্দীপ্ত ভাষায় উৎসাহ দিবারও আর কেহ নাই। এ দুঃখের কথা কাহাকে বলিব?

তারপর, কএকটি পুত্র-কন্যা ইতিপূর্ব্বে ভগবৎপাদপদ্মে স্থান লাভ করিয়াছিল, অবশিষ্ট ছিল একটী কন্যা। সেটীও সেদিন (২৭শে কার্ত্তিক) শ্রীপাদপদ্মের উদ্দেশে চলিয়া গিয়াছে। শ্রীভগবানের নামে এমন প্রাণভরা অনুরাগ তো কখনও দেখি নাই। যখন মুখে বুলি ফুটে নাই, তখন হইতেই মা-আমার নিতাই-গৌর, রাধা-গোবিন্দ, কিংবা ভগবানের অন্য কোন নাম শুনিলেই আনন্দে মাতিয়া উঠিত এবং হাততালি দিয়া অব্যক্ত ধ্বনি করিতেকরিতে অস্থির হইয়া পড়িত। শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন শুনিলে তো আর রক্ষা থাকিত না;—আহারনিদ্রা ভুলিয়া যাইত। মা-আমার দুই বৎসর হইতে-না-হইতেই চলিয়া

গিয়াছে। এক বৎসর এক মাস বয়ঃক্রমের পরই দুরন্ত শিশুযকৃদ্ রোগে আক্রান্ত হয়। শরীর দিনদিন ক্ষীণ হইয়া পড়ে। কিন্তু বলিব কি, যতদিন করতাল বাজাইবার শক্তি ছিল, ততদিন আমার সহিত সে করতাল বাজাইয়া কীর্ত্তন করিয়াছে, তারপর যখন করতাল ধরিতে পারে নাই, তখন হাতে তালি দিয়া কীর্ত্তনে উল্লাস প্রকাশ করিয়াছে, যখন উঠিবার শক্তি ছিল না—এমন কি দেহত্যাগের অতি অল্পদিন অবশিষ্ট, তখনও সে কোলে শুইয়া শুইয়া অঙ্গ দুলাইয়াও শ্রীনামকীর্ত্তনে অন্তরের আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছে। দেহত্যাগও অদ্ভুত,—যোগী মহাপুরুষের মত। দেহত্যাগের দুইঘণ্টা পূর্ব্বেও মা-আমার দেবোদ্দেশে প্রণাম করিয়াছে এবং চাহিয়া-চাহিয়াই ইহলোকের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছে। মা-আমার এতদিন রোগ ভোগ করিল, একটীদিনও রোগের যাতনা কাহাকেও জানাইলনা,—নীরবে সকলই সহ্য করিল। পূর্ব্বের পুত্রকন্যাগুলির বিরহে হৃদয়ে সামান্য বেদনাই অনুভব করিয়াছি, কিন্তু এবারকার বেদনা ভাষায় বর্ণনা করা চলে না। এ তো সন্তানবিয়োগের দুঃখ নয়, এ দুঃখ যে ভক্ত-সঙ্গ বিয়োগের দুঃখ! শ্রীরামানন্দরায় ঠিকই বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনু দুঃখ নাহি আর।"

আহা, মাতা আমার সাধন-ভজনের কত সহায়তাই করিত। তাহার সঙ্কীর্ত্তনপ্রীতির অনুরোধে আমারও যে বেগারের দায়ে গঙ্গাস্নান হইত।

তারপর, নিত্য নূতননূতন রোগেও আমাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। আর যে অধিকদিন আমি বৈষ্ণবজগতের সেবা করিতে সক্ষম হইব, সে পক্ষে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। অধিকাংশ সময় শয্যার আশ্রয়েই থাকিতে হইতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কি যে ইচ্ছা বলা যায় না। বোধ হয় নরাধম আমার দ্বারা সেবাকার্য্য যথাযথ হইতেছে না বলিয়াই তিনি প্রকারান্তরে এ কার্য্য হইতে আমাকে নিরস্ত করিতেছেন?

পতিতপাবন বৈষ্ণবগণ! করুণা করিয়া অধমের সেবাঅপরাধ মার্জ্জনা করুন—মার্জ্জনা করুন।

সে যাহা হউক, এখন তৃতীয় উল্লাসের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তৃতীয় উল্লাসে চতুর্দ্দশটী ভক্তচরিত্র স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। সকলেরই আকর সেই উৎকলভাষায় "দার্ঢ্যভক্তিরসামৃত"। চতুর্দ্দশটী চরিত্রের ত্রয়োদশটী বঙ্গবাসি-হিন্দুমাত্রেরই পরম প্রিয়—হিন্দু-সমাজের মুখপত্র বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। নন্দ-মহান্তী-চরিত্রের অর্দ্ধাংশমাত্র "অবসর" নামক প্রখ্যাত মাসিকে প্রকাশ পাইয়াছিল। মাধবাচার্য্য-চরিত্রে বর্ণিত শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা বাঙ্গালা ভাষায় কোন লীলাগ্রন্থে দেখা যায় না। সুতরাং বলিতে হয়, শ্রীগৌরাঙ্গের এই লীলাটী বাঙ্গালা-ভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত।

এবারকার এই মহাদুঃখের সংবাদের ভিতরও একটু আনন্দের সংবাদ আছে। সেটুকু জানাইয়াই বক্তব্যের উপসংহার করিব। আমি ভক্তের জয়ের প্রথম উল্লাসের পূর্ব্বভাবে বলিয়াছিলাম,—"ভক্তচরিত্র-প্রকাশের ভাষা আমার আয়ত্ত না থাকিলেও আশা আছে, ভবিষ্যতে কোন উপযুক্ত কবি পুষ্পিত ভাষায় ইহার সৌন্দর্য্য-সুষমা ফুটাইয়া তুলিবেন এবং কবিত্বগন্ধে দেশবাসীকে পরমানন্দিত করিবেন।" বড়ই আনন্দের কথা, ইহারই মধ্যে অনেক মনীষী লেখক এই কথার সার্থকতা সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার—আমাদের পরম সুহৃদ সুকবি শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম উল্লাসে "বন্ধু মহান্তীর" চরিত্র অবলম্বনে "দীনবন্ধু" নামক অপূর্ব্ব যাত্রার পালা রচনা করিয়াছেন। শক্তিশালী সুলেখক শ্রীযুক্ত রামরাম চন্দ্র মহোদয় দ্বিতীয় উল্লাসের "রামবেহারার" চরিত্রটী "মুচীরাম দাস" নামক মনোমদ পদ্যগ্রন্থে পরিণত করিয়াছেন, আর মেদিনীপুরবাসীর বিচক্ষণ সম্পাদক

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ নাগ মহোদয় "ভক্তের ভগবান্"নাম দিয়া "রঘু অরক্ষিত" প্রভৃতি চরিত্রগুলি সরল পদ্যে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিতেছেন। বলা বাহুল্য, ইহাঁরা সকলেই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। এইরূপ সদ্ভাবপূর্ণ সদ্‌গ্রন্থের যতই প্রচার বাড়িবে, বুঝিতে হইবে ধর্ম্মবলে বাঙ্গালী ততই বলিষ্ঠ হইতেছে। কলিকাতা হাইকোর্ট এবং হাবড়া জজকোর্টের বিখ্যাত উকীল—হাবড়া-পঞ্চাননতলানিবাসী শ্রীমান্ পরেশ চন্দ্র দত্ত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মণ্ডলীর অনেকেরই পরিচিত—অনেকেরই প্রীতির পাত্র। শুভাশীর্ভাজন শ্রীমান্ এই সংস্করণের মুদ্রণকার্য্যে অযাচিতভাবে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে শ্রীমানের রতি-মতি অচলা হউক। শিক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায়ের এই প্রকার সৎপ্রবৃত্তিও অল্প আশা ও আনন্দের কথা নয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় এই প্রকার সৎপ্রবৃত্তির উত্তরোত্তর অভিবৃদ্ধি হউক,—ভক্তিগ্রন্থে ভক্তিগ্রন্থে সকল দেশ ছাইয়া ফেলুক,—দর্প-অহঙ্কারের দুর্গম দুর্গ ভেদ করিয়া ভক্ত ও ভক্তির জয়পতাকা পতপতরবে দিকেদিকে উড়িতে আরম্ভ করুক,—শান্তিপ্রীতির শীতল সমীরণে বিশ্ববাসীর ত্রিতাপজ্বালা জুড়াইয়া যাউক। ইতি—

শ্রীঅক্ষয়তৃতীয়া
শ্রীগৌরাঙ্গ ৪২৮
মহেন্দ্র নাথ গোস্বামী লেন
সিমুলিয়া, কলিকাতা।

ভক্ত-চরণরেণু-প্রার্থী
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

ভক্তের জয়

তৃতীয় উল্লাস

সূচীপত্র।

ভক্ত ভক্তি ভগবন্ত গুরু
চতুর নাম বপু এক।
ইনকে পদ বন্দন করৈ
নাশৈ বিঘন অনেক॥

ভক্ত ভক্তি গুরুদেব আর ভগবান্
চারি নাম ভেদ কিন্তু শরীর সমান॥
ইহাঁদের শ্রীচরণ করিলে বন্দন।
জগতের যত বিঘ্ন হয় নিবারণ॥

ভক্তের জয়

সালবেগ।

"মা!"

"কেন বাবা!"

"আমি আর বাঁচিব না।"

"ষাট! ষাট! অমন কথা বলিতে আছে?"

"না মা, সত্যই আমি আর বাঁচিব না। বাঁচিবারও বাসনা নাই। সারা দিন সারা রাত যে যাতনা ভোগ করিতেছি, তাহার অপেক্ষা মরণের যাতনা বোধ হয় অনেক অল্প।"

"ছি বাবা, মরিতে হয়—শত্রুরা মরুক। যাহারা চক্ষের মাথা খাইয়া তোমার কোমল অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিয়াছে, তাহারা মরুক। তাহাদের পরমায়ু লইয়া তুমি শতেক বৎসর বাঁচিয়া থাক।"

"না মা, আমার আর বাঁচিবার আশা নাই। সহজে মৃত্যু না হইলে, যে কোন উপায়ে আমাকে মরিতেই হইবে। মা, তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া বিদায় দাও। এ অকৃতী সন্তানের কথা চিরতরে ভুলিয়া যাও।"

* * *

উড়িষ্যার অন্তর্গত কটক-সহরের লালবাগ-নামক স্থানে লালবেগ-নামক এক দুর্দ্দান্ত মোগল বাস করিত। তখন গজপতিবংশীয় নৃপতিগণ উড়িষ্যাদেশে আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন। লালবেগ তাঁহাদের সহিত শত্রুতা করিয়া অনেক সৈন্য-সামন্ত সংগ্রহ করে এবং রণবাদ্য বাজাইয়া নানা স্থানে যুদ্ধবিগ্রহ লুটপাট আরম্ভ করিয়া দেয়। তাহার উপদ্রবে সমস্ত উড়িষ্যাদেশ 'থরহরিকম্প' হইয়া উঠিয়াছিল। লাল-বেগের অনেকগুলি পুত্র। একটীর নাম—সালবেগ। সে শিশুকাল হইতে যুদ্ধবিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করে এবং যৌবনে তাহাতে বেশ পারদর্শী হইয়া উঠে। সেই অহঙ্কারে তাহার আর পৃথিবীতে পা পড়িত না। বীর্য্যের গরবে সে যেন আপনাআপনি ফাটিয়া পড়িত। একবার সে তাহার পিতার সহিত এক যুদ্ধে গমন করে। বিপক্ষদলের সহিত বহুক্ষণ অদ্ভুত সমর করিয়া সে অবশেষে উপর্য্যুপরি সাতটি খড়্গের আঘাতে ধরাশায়ী হইয়া পড়ে। তাহার অনুচরগণ তখনই তাহাকে সংগ্রামস্থল হইতে সরাইয়া ফেলে। বহুদিন হইয়া গেল, সেই অস্ত্রের ক্ষত আর কিছুতেই সারে না। অকর্ম্মণ্য পুত্রের পিতাও বড় খোঁজখবর রাখেন না। কেবল তাহার গর্ভধারিণী আহার-নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া আছেন; আর প্রাণঢালা স্নেহযত্নে সেবা-শুশ্রূষা করিতেছেন। আজ সালবেগের যন্ত্রণার মাত্রা বেজায় বাড়িয়া গিয়াছে। তাই সে জননীর নিকট ঐরূপ আত্মঘাতের প্রস্তাব করিতেছিল।

পুত্রের শেষ কথা শুনিয়া জননী একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন;—বাছনি রে, তোর যাতনার কথা শুনিয়া আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। তুই চলিয়া গেলে আমি আর কাহার মুখ চাহিয়া জীবন ধারণ করিব? যদি আমার জীবনের বিনিময়ে তোর জীবন রক্ষা হয়, তাহাও করিতে প্রস্তুত। তাহা তো বাপ! হইবার নয়। আমার

কর্ম্মফল তো আমায় ভোগ করিতে হইবে। তবে বাছা, নিরুপায়ের এক-মাত্র যাহা উপায়, তাহা তোমায় বলিয়া দিতে পারি, কিন্তু তুমি তাহা করিতে পারিবে কি ?

প্রসূতির উক্তি শুনিয়া সালবেগ সসম্ভ্রমে বলিয়া উঠিল,—কেন পারিব না মা, কেন পারিব না ? বল, তুমি যাহা বলিবার বল, আমি অবশ্যই তাহা প্রতিপালন করিব। জননী বলিলেন,—না বাছা, তুমি কিছুতেই পারিবে না। আশৈশব শিক্ষা-দীক্ষার বিপরীত আচরণ করিতে তোমার প্রবৃত্তি হইবে কেন ? মাতার কথায় পুত্রের সন্দেহ যেন বাড়িয়া গেল। সে কৌতূহলভরে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কথা তো ভাল বুঝিতে পারিতেছি না মা ? আমার শিক্ষা-দীক্ষার প্রতিকূল কথাই বা তোমাকে আমায় বলিতে হইবে কেন ? উত্তরে মাতা বলিলেন,—বৎস রে, আমি যে তোমার শিক্ষা-দীক্ষার সম্পূর্ণ প্রতিকূল, তাহা তো তুমি জান না। আমি যে হিন্দু—ব্রাহ্মণকন্যা।

সালবেগ মহা বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল,—সে কি কথা মা ! তুমি যদি হিন্দু, তবে আমার জননী হইলে কি প্রকারে ? মাতা বলিলেন,—বাছা, যখন জিজ্ঞাসা করিতেছ, তখন লজ্জা-শরম ছাড়িয়া সকল কথাই তোমাকে বলি। দাণ্ডমুকুন্দপুর-গ্রামের নাম বোধ হয় শুনিয়াছ। ভারি সমৃদ্ধ গ্রাম। ঐ গ্রামে আমার শ্বশুরালয়। পতি অল্প বয়সেই পরলোক গিয়াছিলেন। শ্বশুর-শাশুড়ীও ছিলেন না। তোমার পিতার উপদ্রবে তখন অনেকেই ঘর বাড়ী ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল। গ্রাম একরূপ জনশূন্য। একদিন আমি নদীতে স্নান করিতে গিয়াছি, এমন সময়তোমার পিতা কোথা হইতে যুদ্ধ করিয়া সৈন্য-সঙ্গে সেই পথে প্রত্যাগমন করিতে-ছিলেন। আমার তখন পূর্ণ যৌবন। রূপেরও প্রশংসা ছিল। আমাকে দেখিয়া তোমার পিতার মন ভুলিয়া গেল। তিনি একাকিনী অসহায়া আমাকে

বলপূর্ব্বক অশ্বের উপর আরোহণ করাইয়া আপন আলয়ে আনয়ন করিলেন। আমি অবলা স্ত্রীজাতি, আমাকে বশীভূত করিতে তাঁহাকে বড় বেগ পাইতে হইল না। অল্প দিবসেই বসনে-ভূষণে ও আদর আপ্যায়নে তিনি আমার মন ভুলাইয়া ফেলিলেন,—আমার ইহকাল পরকাল খাইয়া আমাকে তাঁহার কাম-সহচারিণী করিয়া ফেলিলেন। তাহারি ফলে বাপ আমার! তোমাকে পুত্ররূপে পাইয়াছি। কিন্তু হতভাগিনীর কপালে তাহাও বুঝি সহিল না।

এইরূপ বলিতে বলিতে হৃদয়ের আবেগে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। সালবেগ সকল কথাই বুঝিল। সে অমনি জননীকে সহানুভূতির স্বরে বলিয়া উঠিল,—মা! তুমিই আমায় গর্ভে ধারণ করিয়াছ। আমার দেহ তোমারই দেহ। ইহার রক্ষার জন্য তুমি যাহা আদেশ করিবে, তাহাই আমার শিরোধার্য্য। বল মা! বল, সেই নিরুপায়ের উপায়ের কথা আমাকে বলিয়া দাও। মাতা বলিলেন,—হাঁ বাবা, বলিব বই কি? কিন্তু তোমার পিতার ব্যবহারের কথাটাও একবার তোমায় জানাইয়া দিই। তিনি এখন তোমাকে ভুলিয়া কেমন পুত্র-দারা লইয়া নিশ্চিন্তে অবস্থান করিতেছেন,—দেখিতেছ ত? তুমি যে তাঁহারই জন্য যুদ্ধ করিতে গিয়া আপনাকে জীবন-মরণের সন্দেহস্থলে ফেলিয়াছ, তাহা তিনি একবারও ভুলিয়া মনে করেন না—একবার একটা লোক পাঠাইয়াও তোমার সমাচার রাখেন না কেন, তাহার কারণ কিছু বুঝিতে পারিতেছ কি? কারণ আর কিছুই নয়, কারণ—আমার যৌবনের অপগম হইয়াছে, আর তোমার দেহ কর্ম্মাক্ষম হইয়া পড়িয়াছে। তুমি ও আমি—দুই জনের কেহই এখন তাঁহার স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল নহি। তাই এই অনাদর—অবজ্ঞা এখন বাছা ভগবান্ যদি তোমাকে রক্ষা করেন, তবেই আমার এই পাপ প্রাণ ধারণ করিয়াও সুখ। বাছা রে, দাসীপুত্র বলিয়া তোমার জন্মদাতা তোমার কথা স্মরণ

করেন না, কিন্তু আমি যে তোমাকে না দেখিলে এক মুহূর্ত্তও জীবন ধারণ করিতে পারি না।

"তু অটু মো জীবন-ধন। তো বিনা মোর সর্ব্ব শূন্য ॥
তুহি মো অন্ধর লউড়ি। তু সিনা মো ধন কউড়ী ॥
তুহি মো কণ্ঠরত্নমালা। তুহি মো নয়নপিতুলা ॥"

বাপ আমার, তুমিই আমার জীবন ধন। তুমি বিনা আমার সকলই শূন্য। তুমি আমার অন্ধের যষ্টি। তুমিই আমার ধনকৌড়ি। তুমিই আমার কণ্ঠের রত্নমালা। তুমিই আমার নয়নের তারা। তোমাকে ছাড়িয়া কি আমি এক মুহূর্ত্ত জীবন ধারণ করিতে পারিব? কখনই না, কখনই না। তা বাছা! তুমি আমার কাছে সত্য কর, আমি যাহা বলিব তাহা তুমি অবশ্য করিবে, তবে আমি তোমায় সেই উপায়ের কথা বলিয়া দিব। না হয় তোমার সহিত আমিও এ পাপদেহ বিনষ্ট করিব।

সালবেগ অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিল,—মা! মা! আমি তোমার কাছে লক্ষবার সত্য করিতেছি, তোমার কথা আমি প্রতিপালন করিবই করিব। আর ইহাও সত্য করিতেছি,—আমি আরোগ্য লাভ করিয়াই তোমার চোখের জল মুছাইয়া দিব। তুমি আর কেঁদোনা মা! কেঁদোনা, আমাকে সেই উপায়ের কথা সত্বর বলিয়া দাও। সন্তানের কথা শুনিয়া মাতার তাপিত প্রাণ কতক শীতল হইল। তিনি অশ্রু মুছিয়া বলিলেন,—

"শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভজ। সে যে অশেষ-দেবরাজ ॥
অশেষ ঔষধির ঘর। ভজিলে নিশ্চে হেবু পার ॥"

বাবা, তুমি অকপট বিশ্বাসের সহিত শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা কর। যেখানে যত দেবতাই থাকুন, তিনি সকলেরই রাজা। তাঁহার আদেশই সকলে অবনত-মস্তকে বহন করিয়া থাকে। তিনি সকল

প্রকার মহৌষধির মূল। তাঁহাকে ভজনা করিলে নিশ্চয় তুমি সকল রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিবে; ইহাই নিরুপায়ের একমাত্র উপায়।

পুত্র বলিল,—হাঁ মা, তাহাই করিব—তাঁহাকেই ভজিব, কিন্তু আমিতো তাঁহার পরিচয় কিছুই জানি না। তিনি কোথায় থাকেন, তাঁহার স্বরূপ কি, কোন্ দেশের তিনি রাজা, তাঁহার পিতা-মাতারই বা নাম কি আর কেমন করিয়াই বা তাঁহাকে ভজিতে হয়, এ সকল তো আমি কিছুই জানি না। তুমি তাঁহার বিশেষ কথা বলিয়া দিলেই আমি বিশ্বাসের সহিত তাঁহাকে ভজিতে পারি।

লালবেগের বাটীতে আসিয়া অবধি সালবেগের জননী একটী দিনও কাহারও মুখে কৃষ্ণকথা শুনেন নাই, কাহারও কাছে বলিবারও অবকাশ পান নাই। আজ পুত্রের কাছে সেই কৃষ্ণকথা বলিবার সুযোগ পাইয়া তাঁহার মনে আনন্দ আর ধরে না। তিনি হর্ষোৎফুল্লমুখে মৃদুমৃদু হাস্য করিতেকরিতে বলিলেন,—বাবা! একেএকে সকলই বলিতেছি শ্রবণ কর। তাঁহার পিতার নাম নন্দ মহারাজ, জননীর নাম যশোদা দেবী, আর তাঁহার প্রিয়ার নাম শ্রীমতী রাধিকা। প্রিয়া ও তিনি কিশোর কিশোরী। শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন বৃন্দাবনের রাজা। সেখানে তাঁহার প্রজাও অনেক। তাঁহার রূপ অতি অপরূপ। দেখিলে মদনেরও মন মোহিত হয়। আহা! কি বা সে সুন্দর শ্যামল কান্তি। নবীন জলধর বল, দলিত অঞ্জন বল, নীলকান্ত মণি বল, সে কান্তির সহিত কাহারও তুলনা হয় না আহা! মস্তকে কিবা কুঞ্চিত কেশকলাপ। তাহাতে কিবা কুসুমের বেশ। তাহার উপর কিবা ময়ূরপুচ্ছের মোহন চূড়া। কিবা ললাটে গোরোচনা-তিলক। শ্রবণে মকর-কুণ্ডল। বিকশিত পদ্ম-সদৃশ সুদৃশ্য নয়ন। কাম-কার্ম্মুকের মত কমনীয় ভ্রূলতা। নাসিকার অগ্রভাগে সুরম্য গজ-মুক্তা। কুন্দকলিকার অপেক্ষা মনোহর হীরককান্তি দন্তপংক্তি। রাতুল

অধরে সুধাশ্রাবী মৃদুমধুর হাস্য। আহা! শ্রীমুখের সে শোভা দর্শনে চন্দ্রকেও লজ্জায় আত্মগোপন করিতে হয়। কিবা সে চারু চিবুক! শঙ্খসদৃশ ত্রিরেখাঙ্কিত গ্রীবা। গলদেশে বনমালা। বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন। সুবলিত বাহুযুগল, তাহাতে নানা রত্নালঙ্কার। অঙ্গুলিসকলে অঙ্গুরীয়ক। পরিধানে পীতবসন। চরণে নূপুর। পদতলে ধ্বজবজ্রাদি চিহ্ন। কিবা ত্রিভঙ্গভঙ্গিম ঠাম। মন-মাতানো মুরলির কলতান। এ শ্রীমূর্ত্তির সকল কথা কথায় বলা যায় না। শেষনাগ সহস্রবদনেও বলিয়াবলিয়া আজিও তাহার শেষ করিতে পারেন নাই, আমরা কোন্ ছার।

এ ভুবন ভুলানো রূপ নয়ন মুদিয়া ধ্যান কর বাবা! ব্রহ্মাদি দেবগণ, দেবর্ষি-মহর্ষিগণ সাধু ও সজ্জনগণ সর্ব্বদা এই রূপেরই চিন্তা করিয়া থাকেন। অখিল ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী কমলা দেবী ঐ চরণকমল পাইবার নিমিত্ত সততই লালায়িত। ভক্তের বাঞ্ছিত ঐ চরণ চিন্তা করো বাবা! আমার ভক্তিতৎপর পিতা আমায় শৈশবে ঐ পরম মঙ্গল দিব্য-রূপের উপদেশ দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন,—মা! তুমি কর্ম্মফলে যতই কেন সন্তাপ পাও না, একবার চক্ষু বুজিয়া ঐ শ্যামল সুন্দর মুরলীধারী মূর্ত্তি চিন্তা করিও, সকল সন্তাপ দূর হইয়া যাইবে। বলিব কি বাবা! আমি যে এই রাক্ষসপুরীতেও সুস্থির হইয়া আছি, তাহা কেবল ঐ রূপ-ভাবনার প্রভাবে। বাবা! বাবা! তুমিও ঐ ভাবনার ধনকে ভাবনা কর, দেহের মনের সকল যন্ত্রণারই অবসান হইয়া যাইবে।

বলিতে বলিতে ভাবের প্রাবল্যে জননীর মুখমণ্ডলে এক অপূর্ব্ব লাবণ্য ফুটিয়া উঠিতেছিল। সালবেগ তাহা দেখিয়া আত্মহারা হইয়া গেল,—তাহার অন্তরের ময়লা কতকটা যেন কাটিয়া গেল। সে আবার মাতাকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল,—মা গো! তোমার বৃন্দাবনচন্দ্রের রূপের পরিচয় তো পাইলাম, এখন তাঁহাকে পাই কোথা? মা বলিলেন, কেন বাবা!—

"এমন্ত স্বরূপ অটই। যহিঁ চিন্তিব তহিঁ থাই॥"

তাঁহার স্বরূপ বড়ই বিচিত্র ;—যেখানে চিন্তা করিবে, সেইখানেই তিনি বিরাজমান। তুমি ভয়ভ্রান্তি ছাড়িয়া তাঁহাকে চিন্তা কর বাবা! চিন্তা কর।

পুত্র আবার বলিল—আচ্ছা মা! কতদিনে আমি তাঁহার সাক্ষাৎকার পাইব? কতদিনে আমি এই দারুণ যন্ত্রণা হইতে নিস্কৃতি লাভ করিব? মাতা কহিলেন,—বৎস রে! কৃষ্ণভজনের মূল কথা হইল—বিশ্বাস। তুমি সংশয়কে কাছে আসিতে না দিয়া, সুদৃঢ় বিশ্বাসের সহিত তাঁহাকে ভাবিতে আরম্ভ কর, দ্বাদশ দিবসেই তুমি তাঁহার কৃপা অধিকার করিতে পারিবে। কিন্তু দেখো বাবা! আবার তোমায় সাবধান করিয়া দিই,—ঐরূপ কৃষ্ণরূপ চিন্তায় যথার্থ যন্ত্রণা-নিবারণ হইবে কি না,—কেবল রূপ ভাবিতেভাবিতে রূপীর দেখা পাইবে কি না,—এ প্রকার সন্দেহে যেন তোমার হৃদয় আন্দোলিত না হয়। তাহা হইলে দ্বাদশ দিন কি, দ্বাদশ পরার্দ্ধেও তাঁহার দেখা মিলিবে না।

সালবেগ বলিল,—ভাল মা! আমি তোমার কথাই মানিয়া লইলাম। এই আমি আঁখি দুইটির দ্বারে কবাট বন্ধ করিয়া দিলাম, ইহার ভিতরে ঐ রূপ ছাড়া আর কাহাকে উঁকি মারিতেও দিব না। তুমিও মা, আমার হইয়া তাঁহাকে একটু জানাও, যেন তিনি দেখা দিতে দেরী না করেন—হাসিমুখে বাঁশী বাজাইয়া অবিশ্বাসী আমার গলায় প্রেমের ফাঁসি পরাইয়া দেন। তাঁহার আকর্ষণেই যেন আমি তাঁহার হইয়া তাঁহাকে ভজিতে পারি। চক্ষু তো মা! বুজিয়াছিই, তাঁহার দেখা না পাইলে, এই বুজানোই শেষ বুজানো জানিবে। কেবল একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া লই,—ঐ রূপ চিন্তা করিবার কিছু মন্ত্রতন্ত্র আছে কি?

হর্ষগদ্গদ-রুদ্ধকণ্ঠে জননী বলিলেন,—মন্ত্র আর কি আছে বাবা!—তাঁহার নামই মহামন্ত্র। তুমি সেই কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র ধরিয়া তাঁহাকে

ডাকিতে ও ভাবিতে থাক, তাঁহার নাম বড় বলবান্, নামই তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া আনিবেন।

'আচ্ছা মা! তাই করি মা! তাই করি"—বলিয়া সালবেগ উচ্চকণ্ঠে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহিয়া উঠিল। কৃষ্ণনামের অপার মহিমা,—ঐ নাম একবার বলিলে বারবার বলিবার বাসনা হয়,—রসনা যেন নামকে পাইয়া নাচনা জুড়িয়া দেয়,—বলিয়া বলিয়া তাহার সাধ যেন আর মিটে না। তার কেবলই মনে হয়,—একা জিহ্বা আমি—আমি এ অমিয়মাখা নাম কতই বা কীর্ত্তন করিব? আমার সঙ্গে হাজার হাজার জিহ্বা আসিয়া যদি যোগ দেয়, তবেই প্রাণ ভরিয়া প্রাণারাম এই নাম অবিরাম ঘোষণা করিতে পারি। সালবেগের জিহ্বাও একবার কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া বিরত হইল না, সে কিছুক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে লাগিল। নামমন্ত্রের মহীয়সী শক্তিতে সালবেগের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল। তাহার তখন চারিদিকেই নামের বেড়া,—সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারেদ্বারেই তখন নাম মূর্ত্তিমান্।

এইবার তাহার অন্তরের মাঝে সেই মদনমোহন বংশীবদনের রূপের রশ্মি ফুটিয়া উঠিল। আর তাহার আপনাকে সামলানো ভার। ভাবের বিকারগুলি একেএকে তাহাকে লইয়া খেলা জুড়িয়া দিল। সে তখন আর তাহার নয়,—ভাবের; এরাজ্যের নয়,—ভাবরাজ্যের। সে সেই ভাবগ্রাহীর হৃদয়গ্রাহী মূর্ত্তি যতই দেখে, ততই যেন ফুলিয়াফুলিয়া উঠে। শ্রীমূর্ত্তির যেখানকার যেটি—যে ভূষণটি, অলকা-তিলকাটি, বাঁশীটি চূড়াটি পর্য্যন্ত—এমন কি হাসিমাখা চাহনিটি—ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীটি পর্য্যন্ত মনোনয়নে দেখিতেদেখিতে সম্পূর্ণরূপে এখানকার সম্পর্ক ছাড়া হইয়া পড়িল। শ্রীকৃষ্ণস্মরণের অপ্রতিহত প্রভাবে তাহার মানসেই শ্রীকৃষ্ণসেবা আরম্ভ হইয়া গেল। এইবার আর শ্রীকৃষ্ণ একা নন, ব্রজ গোপ গোপী প্রভৃতি লীলার সহায় সকলকে লইয়া তিনি তাহার অন্তরে নানা লীলার স্ফূর্ত্তি

করাইয়া দিলেন। সে যতই দেখে, মানসকুসুমে ততই তাঁহার পূজা করিতে থাকে। তাহার পর তাহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে বিচিত্র বন্দনা আপনাআপনি বাহির হইয়া পড়িল। সে মনেমনে বলিতে লাগিল,—

"জয় তু বৃন্দাবনচন্দ্র।	জয় মুকুন্দ আদিকন্দ॥
জয় যমলার্জ্জুন-ভঞ্জা।	তৃণা-শকটা-গর্ব্ব গঞ্জা॥
জয় তু ষণ্ডা-বিনাশন।	গোকুল-শিরী-বরধন॥
জয় তু বক-অণ্ট-চিরা।	অঘা-প্রলম্বা-প্রাণহরা॥
বচ্ছাপালক দৈত্যকুল-।	দহনে তু প্রভু অনল॥
দুষ্ট নিবারি সন্থ পালু।	তু নাথ পরম দয়ালু॥
কালিন্দী-কল্লোল-বিহারি।	কালী-মউলী-চিত্রকারি
কদম্ব তরুমূলবাসি।	রঙ্গে মুরলীনাদ ঘোষি
শিরে মণ্ডিত গুঞ্জামালি।	মউলি-খঞ্জা যামুডালি॥
শ্রবণে রঙ্গ ফুলকাপ।	শোভই যেহ্নে ইন্দ্রচাপ
অঙ্গে শোভিত গোরুধূলি।	নাটুআকুলর মউলি॥
আবর নারী-চিত্ত-চোর।	ব্রজকামিনী-বস্ত্রহর॥

ওহে বৃন্দাবনচন্দ্র! তোমার জয়। সংসারতরুর মূলকন্দ মুকুন্দ হে, তোমার জয়। ওহে যমলার্জ্জুনভঞ্জনকারি তৃণাবর্ত্ত ও শকটাসুরের গর্ব্ব-গঞ্জনকারি শ্রীহরি! তোমার জয়। ওহে বৃষরূপী অরিষ্ট-অসুরের প্রাণ-নাশন—শ্রীগোকুলের শ্রীবর্দ্ধন! তোমার জয়। ওহে বক-অসুরের কণ্ঠ-বিদারক!—অঘ ও প্রলম্বাসুরের প্রাণনাশক! তোমার জয়। ওহে, তুমি বৃন্দাবনের বনেবনে বৎসচারণ করিয়া থাক, অনলের মত দৈত্য-কুলকে দগ্ধ করিয়া থাক, তোমার জয়। ওহে নাথ! তুমি দুর্জ্জনের দমন এবং সজ্জনের পালন করিয়া থাক, পরমদয়াল তোমার জয়। ওহে, তুমি কালিন্দীর জলকল্লোলে কেলি করিয়া থাক, কালীয়নাগের শিরো-

ভাগ চরণচিহ্নে চিত্রিত করিয়াছ, তোমার জয়। ওহে, তুমি কদম্বমূলে নিবাস কর,—নানারঙ্গে মুরলী নিনাদ কর, তোমার জয়। ওহে, তোমার মস্তকে গুঞ্জার মালা শোভমান, চূড়ার চারিধারে জামগাছের ডাঁল বিদ্যমান তোমার জয়। ওহে, তোমার কর্ণমূলে কত বর্ণের ফুলের থোপা,—ঠিক যেন রামধনুকটি আঁকা, তোমার জয়। ওহে, তোমার সারা গায়ে গোরুর ধূলি,—তুমি নটকুলের মাথার মৌলী, তোমার জয়। ওহে, তুমি রমণীর মন হরণ কর—ব্রজবালার বসন হর' তোমার জয়।

সালবেগ ভাবের আবেগে এইরূপ কতকি স্তবস্তুতি করে, আপনাকে ভগবানের দাস ভাবিয়া, তাঁহাকেই একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু মনে করিয়া, তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করে। তাহার শরীর পুলকেপুলকে ছাইয়া যায়, নেত্রদ্বারে অনর্গল প্রেমের জল গড়াইয়া পড়ে, সে যেন তখন আর এক মানুষ। আবার কখনওকখনও সে চমকভাঙ্গা হইয়া ইহরাজ্যে আসিয়া পড়ে, তখন তাহার দেহ-আদির অনুসন্ধান আসে। তখন মনে হয়, কই শরীরের ক্ষত ত সারিল না, তবে আবার কিসের ভজন? ঐ সময় সে তাহার মাতাকে বলে,—কই মা! এই তো তোমার শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিলাম, আমার রোগের যন্ত্রণা তো গেল না? বরং যেন কিছু বাড়িয়াই যাইতেছে বোধ হয়। মা আবার তাহাকে বুঝান,—

"অনেক কষ্ট তুল করি। দয়া করন্তি নরহরি ॥
তো মনে সংশয় ন কর। বিশ্বাসে ভজ বংশীধর ॥"

বাপ আমার! সেই নরহরির লীলা বড়ই বিচিত্র। তিনি অনেক কষ্ট একত্র করিয়া তবে দয়া করিয়া থাকেন। কষ্টের মাত্রা বাড়াইয়া দিয়া তিনি দেখেন যে, এত কষ্টেও সে আমায় ভুলিল কিনা। যে ভোলে, সে ঠকিয়া যায়। না ভুলিলেই মঙ্গল। তুমি বাপ মনের মধ্যে কোন

প্রকার সন্দেহ করিওনা, বিশ্বাসের সহিত সেই বংশীধরকে ভজনা কর।

মা তো বলেন—সংশয় করিও না, সংশয় করিও না, কিন্তু সংশয় ছাড়া কি সহজ 'ব্যাপার? বিশেষত দেখিতেদেখিতে আজ একাদশ দিবস অতীত হইয়া গেল, আজিও দেহের ক্ষত মিলাইল না, যন্ত্রণারও অবসান হইল না, এ অবস্থায় সালবেগ আর মনকে কত চোখ ঠারিয়া রাখিবে বল? তাই মহাদুঃখের সহিতই সে তাহার মাতাকে বলিল,—মাগো! আমার মরণই বোধ হয় তোমার হরির অভিপ্রেত, কই তাঁহার তো দয়া হইল না, তিনি তো আমায় রোগমুক্ত যাতনামুক্ত করিয়া দিলেন না?

মার সেই একই কথা,—সংশয় ছাড়—সংশয় ছাড়; বিশ্বাসের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ভজনা কর। রাত্রিকালে সালবেগ শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। আজ সে একরূপ স্থিরই করিয়াছে, আজিকার রজনীর মধ্যে যদি শ্রীকৃষ্ণ কৃপা না করেন, আমায় নীরোগ করিয়া না দেন, তবে কল্য প্রাতঃকালেই আমি আত্মঘাতী হইব। আমার মৃত্যুতে মাতারও মৃত্যু হইবে। সুতরাং কল্য প্রভাতেই হয় তো আমরা উভয়েই ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিব।

মাতাও তাহার পার্শ্বে শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার চিন্তা কিন্তু অন্যরূপ, তাঁহার চিন্তায় সন্দেহের নামগন্ধ নাই; তাঁহার চিন্তা—চিন্তামণিময়। তিনি নিশ্চয়ই জানেন,—আজ দয়াময়ের দয়া হইবেই হইবে। বাস্তবিক হইলও তা-ই। যামিনীর দ্বিতীয় যাম অতীত হইয়া গেল। মাতা-পুত্র গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। এমন সময় শ্রীহরি বৃন্দাবন পরিহরি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সালবেগ যেন স্বপ্ন দেখিল,—তাহার মাথার শিয়রে বালমুকুন্দবেশে তিনি আসিয়া বসিয়াছেন এবং হাসিহাসি সম্ভাষণে বলিতেছেন,—ওরে ও সালবেগ আর তোর চিন্তা নাই, তুই উটে বোস, এই বিভূতিগুলি আমার হাত হইতে নে আর তোর ক্ষতের

উপর লাগাইয়া দে, সব ঘা সেরে যাবে, সুখেস্বচ্ছন্দে কাল কাটিবে। কিন্তু দেখিস্, আমার নাম যেন কখনও রসনা-ছাড়া করিস্ না।

সালবেগ অমনি উঠিয়া বসিল, তাঁহার হস্ত হইতে বিভূতি লইল, সকল অঙ্গে মাখাইয়া দিল, কতক মস্তকের উপর ধারণ করিল, তারপর সেই মধুসূদনের মধুময় মূর্ত্তি অবাক হইয়া একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেই মূর্ত্তি একটু ফিক্ করিয়া হাসিয়া সরিয়া পড়িল। সালবেগও কেমন আপনহারা হইয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল। রাত্রি প্রভাত হইবা মাত্র তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। প্রাণে যেন আনন্দের তরঙ্গ উঠিতেছে। চাহিয়া দেখে, পার্শ্বে মাতা তখনও নিদ্রিতা। দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না,—সকল ক্ষতই অন্তর্হিত হইয়াছে, কেবল তাহার চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট আছে! শরীরে আর ক্লেশ নাই—গ্লানি নাই। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া মাতাকে ডাকিতে লাগিল,—মা! দেখদেখ—তোমার করুণাময় কৃষ্ণ আমায় করুণা করিয়াছেন; শীঘ্র উঠ মা! চাহিয়া দেখ।

মাতা তো কৃষ্ণচিন্তা করিতে করিতে কৃষ্ণময়ী হইয়া শুইয়া ছিলেন। পুত্রের আনন্দ-আহ্বান শুনিবাত্র তিনি সকল কথাই বুঝিতে পারিলেন। সত্বর গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পুত্রের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিলনা। পুত্র রোগমুক্ত হইয়াছে বলিয়া যত আনন্দ না হউক, তাহাকে যে তিনি কৃষ্ণবিশ্বাসী করিতে পারিয়াছেন, এই আনন্দেই তাঁহার অধিক আনন্দ।

মাতাকে জাগিতে দেখিয়া সালবেগ হর্ষভরে বলিল,—মা! মা! এই দেখ, আমার দেহে আর ক্ষত নাই—যাতনাও নাই; আমার অন্তর-বাহির দিব্য আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছে। মা বলিলেন,—বাপধন! শ্রীকৃষ্ণের মহিমাই এই প্রকার; তাঁহার মতন আর্ত্তের আর্ত্তিনাশন আর নাই।

এইবার তুমি প্রাণ ভরিয়া তাঁহার ভজনা কর আর কি। সালবেগ বলিল, —হাঁ মা! সত্যই তাঁহার মত যাতনানাশন ঠাকুর আর নাই। মা গো! তোমার কৃপায় তোমার শিক্ষায় আমার জীবন ধন্য হইয়া গেল। তা মা! তুমি আমায় হাসিমুখেবিদায় দাও, আমি আর এখানে থাকিব না, সন্ন্যাসীর বেশে দেশেদেশে ভ্রমিয়া বেড়াইব, আর এই দয়ার সাগর ঠাকুরের কথা প্রচার করিয়া জন্ম সার্থক করিব।

সালবেগের মাতা তো সামান্য মাতা নন, তাঁহার সাধনরাজ্যের অবস্থা তখন অনেক উন্নত; মনও তাঁহার বশীভূত। তিনি পুত্রের প্রার্থনায় আপত্তি প্রকাশ করিলেন না। হাসিমুখেই তাহাকে বিদায় দিলেন। কেবল একটি কথা বলিয়া দিলেন,—যাও বৎস! তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক। সাবধান, আমাকে ভুলিও, সকলকে ভুলিও, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে যেন ভুলিও না; তাঁহার নাম জিহ্বায় জাগাইয়া রাখিও, কিছুরই অভাব থাকিবে না।

সালবেগ ভক্তিভরে জননীর চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিল,—তাঁহার পদধূলি লইয়া মস্তকে প্রদান করিল এবং মুক্তকণ্ঠে কহিল,—

"এমন্ত প্রভু থাউঁ থাউঁ। যে অন্যে আশ্রে করে আউ॥
ধিক বোলিবা তা জীবন। এ দেহে কিস প্রয়োজন?"

মাগো! এমন প্রভু থাকিতে থাকিতে যে অন্য কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহার জীবনে ধিক্। জন্মিয়া যে শ্রীকৃষ্ণচরণ আশ্রয় না করিল, তাহার এ নশ্বর দেহের প্রয়োজন কিসের? মা, তোমার হরিকে তুমি ভজনা কর, আমি ভজিয়া তাঁহাকে ভজাইতে চলিলাম।

এই বলিয়া সালবেগ বাটীর বাহির হইল। একটিবারও ফিরিয়া চাহিল না। সে বরাবর নীলাচলে চলিয়া গেল। সেখানে কিছুদিন দীন-

বন্ধুকে দর্শন করিয়া, দক্ষিণ অভিমুখে গমন করিল। অনেকদিন আর তাহার সমাচার কেহ পায়নাই। তাহার মাতাকেও আর কেহ লালবেগের ভবনে দেখিতে পায় নাই। মাতাপুত্রেরও পরস্পর মিলন হয় নাই। তবে কিছুদিন পরে উভয়ের মিলন হইয়াছিল। ইহলোকে নয়; পরলোকে—সে এক মধুময় মিলনের রাজত্বে। এ মিলনের আর বিচ্ছেদ ঘটে নাই। *

---

* ৺পুরীধামে বলগণ্ডিস্থানে সরকারি ডাক্তারখানার ঠিক বিপরীত দিকে—বড় দাণ্ডের উপর এক বটবৃক্ষতলে সালবেগের সমাধিস্তম্ভ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

রামদাস

——:০:——

ভাবনা এক বই দুই নয়। তাহার গতির দিক কিন্তু দুইটা,—বিষয় ও ভগবান্। দিক দুইটা আবার এ ওর বিপরীত,—একটা পূর্ব্ব তো আর একটা পশ্চিমগোছের। কাজেকাজে ভাবনার গতি একদিকে যাইতে আর একটা দিক্ তফাৎ হইয়া পড়ে। ভাবনা যখন বিষয়ের দিকে যায়, ভগবান্ তখন দূর হইয়া পড়েন, আর যখন ভগবানের দিকে ধাবিত হয়, তখন বিষয়ও তাহার নিকট হইতে সরিয়া সরিয়া যায়। ভগবানের দিকে ভাবনার চালনা কিন্তু যার তার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। যার হয়, তার মত ভাগ্যবান্—অসাধ্য সাধনে ক্ষমতাবান্ আর নাই। কেননা বিষয় হইল রূপ-রসাদি; তাহারা হইল জড়। জড়ের আর কতটুকু শক্তি? তাই বিষয়ের দিকে যাইতেযাইতে ভাবনাও জড় হইয়া পড়ে,—শক্তিহীন হইয়া পড়ে। কিন্তু ভগবান্ হইলেন অনন্ত-শক্তিমান্, তাই তাঁহার দিকে যাইতে যাইতে সে-ও ঐশীশক্তিতে সম্পন্ন হইয়া উঠে,—চেতনায় উদবুদ্ধ হইয়া উঠে।

রামদাস বড় ভাগ্যবান্। কেননা তাহার ভাবনা ভগবান্ ছাড়া কিছু জানিত না। স্ত্রী ছিল, একটি পুত্র ছিল, মঠবাড়ী ছিল, বিষয়-বৈভব ছিল, কিন্তু সে সকলের কথা ভাবনাপথেই আনিত না; ভগবানকে ভাবিয়াই দিনযামিনী যাপন করিয়া দিত। পত্নী ও পুত্রটিও তাহার ভাবনাপথে কণ্টক জন্মাইত না। তাই বলিতেছিলাম, রামদাস বড় ভাগ্যবান।

তাহার ভাগ্যের কথা আরও বলি। দক্ষিণদেশে লছমণপুর তো

একটা ছোটখাট স্থান নয়. অত বড় সহর, কত বড়বড় লোকের তথায় বাস, কিন্তু অতিথি-অভ্যাগত সাধু-মহান্ত যদি দেখিতে হয় তো ঐ গৃহী বৈষ্ণব রামদাসেরই দুয়ারে। তাঁদের আসা-যাওয়ার আর বিরাম নাই, রামদাসেরও মনের মত আহার দিয়া সেবা-শুশ্রূষারও কিছুই ক্রটি নাই। এ সকল বহু ভাগ্যের কথা ছাড়া কি বলিব?

তার পর, যাহারা অষ্টপ্রহর বিষয় বিষয় করে, তাহারা একমাত্র আপনাকেই চিনে, আপনার ইন্দ্রিয়সুখকেই সুখ বলিয়া বুঝে, অপর কাহারও যে ব্যথায় ব্যথিত হইতে হয়, তাহাদের দুঃখও যে তাহারই সমশ্রেণীর বলিয়া বুঝিতে হয়, কিংবা তাহা দূর করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে হয়, এ সকল কথা তাহাদের কল্পনাতেই আসে না। কিন্তু যাহারা কেবল ভগবান্ ভগবান্ করেন, তাঁহাদের আত্মসুখ বলিয়া একটা স্বতন্ত্র কথাই নাই, সকলের সুখই তাঁহাদের নিজের সুখ, তাই বিষয়ীর মত তাঁহারা আপনাকে খাওয়াইয়া-পরাইয়া প্রীতি অনুভব করিতে পারেন না। পাচজনকে লইয়াই তাঁহাদের কারকারবার, পাঁচজনের সুখেই তাঁহারা সুখী,—আবার পাঁচজনের দুঃখেই তাঁহারা দুঃখী। এ পাঁচজনের ভিতর আবার পশুপক্ষীটী পর্য্যন্তও বাদ যায় না; ভগবদ্-ভাবুকের তাহারাও আত্মীয়। এ ভাবটা তাঁহাদের ভাব্য ভগবানেরও আছে কিনা, তাই তাঁহার ভাবনার গুণে তাঁহাদেরও এটা অশাইয়া যায়। এ ভাব লাভ করাও অল্প সৌভাগ্যের কথা নয়। ভক্ত রামদাসের এ সৌভাগ্যও ছিল। সে সকল-জীবকেই সমান দৃষ্টিতে দেখিত, তাহাদের সুখে দুঃখে আপনাকে সুখী বা দুঃখী মনে করিত এবং স্বতঃপরত তাহাদের দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করিত। তাহাকে ভাগ্যবান্ বলিব না তো বলিব কি?

এ সকলের উপর তাহার পড়াশুনা ছিল, কিন্তু ভগবৎপ্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু পড়িত না। গাওনা-বাজনা জানা ছিল, কিন্তু ভগবানের নাম-

SOCIETY 17.12.77
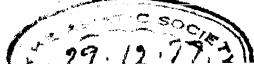
সংকীর্ত্তন ছাড়া তাহার প্রয়োগ করিত না। বিষয়কর্ম্মে অভিজ্ঞতা ছিল, কিন্তু সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহের অতিরিক্ত তাহাতে ব্যাপৃত থাকিত না। দেহ ধর্ম্মে আহার-নিদ্রাদিও ছিল, কিন্তু শাস্ত্রবিধি অতিক্রম করিয়া কখনও তাহার অনুষ্ঠান করিত না।

যত দিন যাইতে লাগিল, রামদাসের যশে দেশবিদেশ ছাইয়া ফেলিল। ফলে অতিথি অভ্যাগতের আগমনের মাত্রাও বাড়িয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে আয়ের অনুপাতে ব্যয়ের মাত্রাও বর্দ্ধিত হইয়া গেল। তখন মূলধনে হাত পড়িল। কলসের জল গড়াইতে গড়াইতে ফুরাইয়া যায়; রামদাসেরও সঞ্চিত ধন সমস্তই ফুরাইয়া গেল। অথচ দাতা-ভক্তের আলাদা ধাত,— অতিথি আসিলে না বলা যায় না, দুঃখী-কাঙ্গালকে যৎকিঞ্চিৎ না দিয়া বিদায় করা চলে না। কাজেই সমস্যা বিষম হইয়া দাড়াইল। রামদাসের কিন্তু সে দিকে খেয়াল নাই। যোগেযাগে দিনটা কাটিয়া যাইলেই হইল। এইবার একেবারেই অচল। স্ত্রী ও পুত্র চঞ্চল হইয়া পড়িল। আর অতিথিসেবা হইবে না ভাবিয়া ব্যথিতপ্রাণে তাহারা রামদাসকে প্রকৃত অবস্থা জানাইল। রামদাস তখনও অচল। বরং দৃঢ়তার সহিত স্ত্রী-পুত্রকে বলিল,—

"চিন্তিত কিপাঁ তুম্ভ মন। যাহার প্রভু লছমণ ॥
দেবা 'দিআইবা ঠাকুর। কেবল সেহি সিনা মূল ॥
তা বিনা আজ্ঞারে এ জীব। কিস করিবা শক্তি হেব ॥
সাধুঙ্ক সেবাকু মো চ্ছার। কোটিয়ে কীটরু অন্তর ॥
কেবল সাহা দেবরায়। এথু মোহর নাহিঁ ভয় ॥"

আরে! তোমরা ভাব কেন?—তোমাদের প্রভু লছমণ থাকিতে তোমরা ভাব কেন? দেবার দেওয়াইবার মালিক তো তিনিই? তাঁহার

হুকুম না হইলে জীবেরই বা কিছু করিবার শক্তি হইবে কি প্রকারে? কীটের অপেক্ষা কোটিগুণ নিকৃষ্ট ক্ষুদ্র আমি, সাধুসজ্জনের সেবা গ্রহণ করা কি আমার সামর্থ্যে কুলাইতে পারে? কেবল দেবাদিদেব সহায় আছেন বলিয়াই এ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে; আমারও প্রাণে ভয়ের উদ্রেক হয় না। তা তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, তিনি যতদিন আমাদের দ্বারা এ কার্য্য সম্পাদন করাইবেন, ততদিনই আমরা আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মত করিয়া যাইতে পারিব। তার পর তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহা তো আছেই। চিন্তায় তাহার প্রতিকার হইবার নয়।

আনন্দের মূর্ত্তি রামদাস পত্নী-পুত্রকে এইরূপে আশ্বস্ত করিয়া, এক ধনবান্ মহাজনের গৃহে গমন করিল। দেবতার সাহসে যে কাহাকেও ভয় করে না, তাহার আর ঋণেরই বা ভয় কিসের? সে হাতচিঠা (handnote) লিখিয়া দিয়া অনেক টাকা ধার করিয়া ফেলিল। তবে তাহার মধ্য হইতে একটী পয়সাও অঙ্গুলীর অগ্রে স্পর্শ করিল না। বন্দোবস্ত করিয়া আসিল, —সাধুসেবার যখন যাহা আবশ্যক, তাহা ঐ টাকার মধ্য হইতে দিতে হইবে।

রামদাসের একে সুনাম ছিল। তার উপর তাহার এই অপূর্ব্ব ব্যবহার দেখিয়া মহাজনও বিস্ময়াপন্ন হইল। খৎ লিখিয়া টাকা ধার লইয়া, সে টাকা মহাজনের কাছেই রাখিয়া আসে, এমন লোক তো দেখাই যায় না! মহাজন আনন্দমনে রামদাসের সাধুসেবার দৈনিক ব্যয় যোগাইতে লাগিল। দেখিতেদেখিতে হাতচিঠার টাকা ফুরাইয়া গেল। বরং তাহার উপর এক হাজার মোহর চাপান হইয়া পড়িল। রামদাসের তো অত শত হিসাব নাই সে আবশ্যক হইলেই মহাজনের ঘরে লোক পাঠায়। মহাজন কিন্তু এইবার হাত গুটাইয়া বসিল। রামদাসেরও মাথার টনক নড়িল। সে তাড়াতাড়ি মহাজনের ভবনে গমন করিল। ফলে দুইটা কটু কথাই শুনিতে হইল।

মহাজন বলিল,—হিসাবটা দেখিতেছ কি? এই ত্থাখ, হাতচিঠার উপর হাজার মোহর যে কাবার হইয়া গিয়াছে? অগ্রে এগুলি পরিশোধ কর, তার পর যখন যাহা চাহিবে, পাইতে পারিবে।

রামদাস দেখিল—বিষম বেগতিক। টাকা তো নাই, পরিশোধ হয় কি প্রকারে? বরং আরও টাকার দরকার। অতিথি-অভ্যাগতের গতা-গতির তো আর বিরতি নাই? তাই তাহাকে আম্‌তা আম্‌তা করিতে-করিতে অপর এক মহাজনের অন্বেষণে যাইতে হইল। জুটিয়াও গেল। আবার হাতচিঠা লিখিয়া টাকা ধার করা হইল। বন্দোবস্ত সেই পূর্ব্বেরই মত,—সাধুসেবার যে দিন যাহা দরকার যোগাইতে হইবে। হইলও তা-ই। এবারও কিছুদিন বেশ স্বচ্ছন্দে সাধু-সজ্জনাদির সেবা চলিয়া গেল। হাতচিঠার টাকা তো আর টাকা প্রসব করে না,—ভগবানের মত অব্যয়ও নয়, কাজেই ব্যয়ে ব্যয়ে তাহার ক্ষয় হইয়া গেল। মহাজনও অমনি বাঁকিয়া বসিল; আর পয়সাটি দেবারও নামটি নাই। রামদাস মনেমনে প্রমাদ গণিল। কি করে, আবার নূতন মহাজনের কাছে নূতন হাতচিঠায় টাকা লইতে আরম্ভ করিল। ক্রমে তাহার ঋণের কথা নগরময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। আর কাহারও কাছে হাত পাতা চলে না। যাহার কাছে যায়, সে-ই বলে,—ওহে পাঁচ হাজার মোহর ধার করিয়াও তোমার ঋণের সাধ মিটে নাই; আবার তুমি ধার করিতে আসিয়াছ? বলি, বিষয় তো ওই, পরিশোধ করিবে কোথা হইতে? ফলে রামদাসের তখন কাহারও কাছে সামান্য চাউল চাহিতে যাওয়াও কঠিন হইয়া পড়িল। সদাই চিন্তা। অবশ্য অপর চিন্তা নয়, কেবলই চিন্তা—এ অবস্থায় যদি সাধুমহান্ত বা অতিথি-ফকীর আসিয়া পড়েন তো সেবা নির্ব্বাহ হইবে কি প্রকারে? এমনই সময়—দুই পাঁচ জন বা দুই পাঁচ শত নয়, একেবারে পাঁচ হাজার জটাধারী সন্ন্যাসিমূর্ত্তি তাহার মঠদ্বারে আসিয়া

উপস্থিত। এইবার রামদাসের স্থির থাকা কঠিন হইয়া পড়িল। ভয়হীন হৃদয়ে ভয়ের উদয় হইল। কি করে? মনেমনে সেই ভয়হারীকেই ভাবিতে লাগিল,—

"ভো প্রভু! তুম্ভে যাহা কর। সকল আয়ত্ত তোহর॥"

প্রভু হে! তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, সকলই তোমার আয়ত্ত। আমি আর কি বলিব?

স্থিরভাবে ভাবিবারও তখন অবকাশ নাই। সত্বর সেবার নিমিত্ত সাধুগণ তখন হাঁক-ডাক জুড়িয়া দিয়াছেন। স্বর ক্রমশ উদারা-গ্রাম ছাড়াইয়া—মুদারাকেও অতিক্রম করিয়া তারায় চড়িয়া গিয়াছে, আর রক্ষা নাই, শাপাশাপীই বা আরম্ভ হয়। রামদাস কি করে? তাঁহাদিগের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে জানাইল,—ঠাকুর! আপনারা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, লছমণদেব আপনাদের উপযুক্ত সেবা করিবেনই করিবেন। যাহা কিছু হয় তাঁহারই কৃপায়। আমি সামান্য ব্যক্তি, আপনাদের সেবা লইবার ক্ষমতা আমার কোথায়?

রামদাস এই বলিয়া তাঁহাদের কাছে বিদায় লইয়া বাটীর মধ্যে আসিল। স্ত্রী ও পুত্রকে যথাকথা জানাইল। শেষ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—হায় হায়, হাত পাতিলে তো এক মানও তণ্ডুল পাওয়া যাইবে না, এখন ইহাঁদের সেবা নির্ব্বাহ হয় কি প্রকারে? স্ত্রীও তো সামান্য নয়, সে হাসিহাসি-মুখে বলিল,—তার আর কি, বাড়ীতে এত বাসনকোসন রহিয়াছে আমার অঙ্গের অলঙ্কার রহিয়াছে, অতিথিসেবার ভাবনা কিসের? এইগুলি বেচিয়াই হউক, আর বাঁধা দিয়াই হউক, আজিকার সেবাটা তো চলিয়া যাউক, তাহার পর যাহা হইবার হইবে। এই বলিয়া সে একএকখানি করিয়া সকল গহনাগুলিই গা হইতে খুলিয়া স্বামীর সম্মুখে ধরিয়া দিল। তা ছাড়া তো আর অন্য উপায় নাই, কাজেই

রামদাসকে পত্নীর প্রস্তাবেই সম্মত হইতে হইল। তবে স্ত্রীর অঙ্গের অলঙ্কার বিক্রয়টা কোন হৃদয়ালু পতিই পারিয়া উঠে না ; বিশেষত সেই স্ত্রী যদি আবার স্বধর্ম্মের সহায় হয়। রামদাস অনিচ্ছা-সত্ত্বেও সেই গহনা-গুলি লইয়া ধনীর ভবনে গমন করিল। যাইয়া বেচিবার নয় বাঁধা রখিবারই প্রস্তাব করিল। কেননা বেচিবার কথা বলিতে তাহার কেমন বাধোবাধো ঠেকিতে লাগিল। এদিকে বোঝারির দল ভারেভারে বাসন কোসন লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল।

ধনী সেই উত্তমর্ণ,—সর্ব্ব প্রথমে সে-ই টাকা ধার দিয়াছে। সে তো বন্ধক রাখার প্রস্তাব শুনিয়া তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। রাঙারাঙা চোক দুটা কপালে তুলিয়া সিংহগর্জ্জনে তর্জ্জন জুড়িয়া দিল। হাত-মুখ নাড়িয়া বলিল,—কী-ই, আমার সঙ্গে চালাকী ? তোর তো যথাসর্ব্বস্ব আমার কাছে বাঁধা, আবার সেই আমারই জিনিস আমার কাছে বন্ধক দিতে এসেছিস ? তোর কি একটু লজ্জাও নাই—ভয়ও নাই, ধারের টাকা পরিশোধ না কোরে তুই এগুলাই বা এতদিন বাড়ীতে রাখিয়াছিলি কি নিমিত্ত ? তোর বুকের পাঠাখানা তো কম নয় ? রোস্ তোর মহত্ত্ব টহত্ত্ব এইবার পঞ্চত্ব পাইয়ে দিচ্চি। তোর মাগ ছেলে বেচে টাকা আদায় কোরে তবে তোকে ছেড়ে দেবো। দেখি তোর কোন্ বাপে তোকে রক্ষা করে ?

এই মহা হৈহৈ-ব্যাপারে আরও পাঁচজন মহাজন সেই স্থানে আসিয়া গেল। তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ আবার পাওনাদার। তাহারাও সেই গলাবাজির সহিত গলা মিলাইয়া গালি পাড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। রামদাস আর কি করিবে, নীরবে অবনতবদনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। পূরা এক পালা গালাগালির পর তাহাদের একটু থামিতে দেখিয়া সে তাহাদিগকে বিনয়-বচনে বলিতে লাগিল,—

"তুম্ভে সমস্তে সাধু শুন। মোতে লাগিচ্ছি তুম্ভ ঋণ ॥
উপরহস্তে অচ্ছ দেই। তলহস্তরে অচ্ছি নেই ॥
সে ব্রহ্মবিষর সমান। খাই কে পাঁর করু ঋণ ॥..
বিষ খাইলে জনে মরে। ব্রহ্মস্ব বংশ নাশ করে ॥
ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি সুরাসুরে। যক্ষ গন্ধর্ব্ব যে কিন্নরে ॥
ঋণ-ভুজঙ্গ দংশে যারে। গুণিআ নাহিঁ আউ তারে ॥
বিষ ত ঝাড়িলে ঝড়ই। নোহিলে দেহ-সঙ্গে রহি ॥
সে যাই জীবর সহিতে। বিষর বড়পণ এতে ॥
ব্রহ্মস্ব কালে দেহ নাশি। গমই জীবসঙ্গে মিশি ॥
বৃক্ষর চ্ছায়া প্রায়ে হোই। জীবর সঙ্গে লাগি থাই ॥
ঋণ সুঝিলে চ্ছাড়ি দেই। নোহিলে জন্মে জন্মে থাই ॥
এণু এ পুত্র দারা ধন। বোলন্তি ঋণানুবন্ধন ॥"

মহাজনগণ! আপনারা আমার একটা নিবেদন শুনুন। আমি আপনাদের কাছে ঋণী। আপনারা উপর-হস্তে আমাকে দিয়াছেন, আমি তল-হস্তে তাহা লইয়াছি। ঋণ তো সামান্য বস্তু নয়,—সে যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্ব-বিষ? সে বিষ খাইয়া কে হজম করিতে পারিবে? সামান্য বিষ ও ব্রহ্মস্ব-বিষে অনেক তফাৎ। সামান্য বিষ যে খায় সেই মরে, কিন্তু ব্রহ্মস্ব-বিষ সবংশে বিনাশ করে। ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি দেবতাই হউক, আর যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর কিংবা অসুরই হউক, ঋণভুজঙ্গ দংশন করিলে তাঁহার আর নিষ্কৃতি নাই। রোজায় ঝাড়িলে এ বিষের ক্ষয় আছে, না ঝাড়িলে না হয় সে দেহের সঙ্গেই থাকিয়া যায়। কিন্তু ঋণবিষ ঝাড়িয়া উড়াইয়া দিবার রোঝা নাই; তাহার সম্বন্ধও কেবল দেহের সঙ্গে নয়, সে জীবের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যায়। তাই এ বিষের চেয়ে ঋণ-বিষই বড়। ব্রহ্মস্ব-বিষ কালে দেহ নাশ করিয়া জীবের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া গমন করে,—বৃক্ষের ছায়ার মত তাহার সহিত সংলগ্ন হইয়া থাকে। ঋণ পরিশোধ করিলেই

সে ছাড়িয়া দেয়, নয়তো জন্মে জন্মে থাকিয়া যায়। তাহার জ্বালায় জন্মে-জন্মে জ্বলিয়া পুড়িয়া খাঁক হইতে হয়। এই যে এখানকার ধন তনয় পত্নী প্রভৃতি,—যাহাদের জন্য নানা নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়, ইহারা সেই ঋণেরই প্রতিমূর্ত্তি; তাই ইহাদিগকে "ঋণানুবন্ধন" বলিয়া থাকে। সেই ব্রহ্মস্ববিষের বা তাহার নামান্তর ঋণের কথা নিরন্তর আমার অন্তরে জাগরূক রহিয়াছে। শ্রীলছমণদেবের কৃপায় অমি অতি সত্বরেই—হয় তো দুইচারিদিনের ভিতরেই আপনাদের ঋণ পরিশোধ করিব। আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, এই সকল সামগ্রী আপনারাই রাখিয়া দিউন, আর অনুগ্রহ পূর্ব্বক আজিকার সাধুসেবার উপযুক্ত অর্থ ভিক্ষা স্বরূপ আমাকে অর্পণ করুন; ইহার অতিরিক্ত অপর প্রার্থনা আমার নাই। হায়, না জানি আমার বিলম্ব দেখিয়া সাধুগণ কত কি মনে করিতেছেন,—কতইবা অভিসম্পাৎ প্রদান করিতেছেন?

রামদাস এই বলিয়া ব্যাকুলভাবে তাঁহাদের উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার সরলতামাখা সত্য কথা শুনিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইল,—মহাজনেরও মন ভুলিয়া গেল। বলিল,—আচ্ছা, আজিকার মত অতিথি-পরিচর্য্যার অর্থ লইয়া যাও, আর ঐ গহনগাটিও লইয়া যাও, কিন্তু মুখে যাহা বলিলে কাজে যেন তাহা হয়—দুই-চারিদিনের মধ্যেই যেন ঋণটা পরিশোধ করা হয়। "আজ্ঞে লছমণদেবের কৃপায় পরিশোধ করিব বই কি"—বলিয়া সে-ও অর্থ সামগ্রী লইয়া সহাস্য মুখে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। দেখিয়া স্ত্রীপুত্রাদি সকলেই সুখী। তখনই-সেই অতিথিসেবারূপ মানবযজ্ঞের মহা আয়োজন হইতে লাগিল! আনন্দে-আনন্দে সেদিনকার সেবাকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া গেল। অতিথিরা আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় লইলেন। আরও দুই তিন দিন আনন্দে অতিবাহিত হইল। রামদাসেরও সেই ঋণপরিশোধের কড়ারের কথা মনে পড়িয়া গেল। কেবলই ভাবে,—

তাই তো, দুই চারি দিবসের ভিতর ঋণ পরিশোধ করিব বলিয়া আসিয়াছি, কই আজিও তো লছমণদেবের দয়া হইল না। শুনিয়াছিলাম,—যে যেভাবে তাঁহাকে ভজনা করে, তিনি তাহাকে সেই ভাবেই ভজনা করিয়া থাকেন। তিনি ভাবগ্রাহী, আমার ভাব তো তাঁহার জানাই আছে। আমি যে সকল ছাড়িয়া তাঁহাকেই সার করিয়াছি, তাহা কি আর তিনি জানেন না? এই সাধুসেবাই বল, আর দীনদুঃখীকে অন্নবস্ত্র বিতরণই বল, যাহার জন্য আমার ঋণের জ্বালা, ইহা তো আমার নামের জন্য নয়,—আত্মসুখের জন্যও নয়? ইহাও তো তাঁহারই প্রীতির নিমিত্ত? কেমন করিয়া বলি, সর্ব্বসাক্ষী লছমণদেবের ইহা অবিদিত? তবে তাঁহার দয়ায় বঞ্চিত হইতেছি কেন? আর সাধুসজ্জনের আশীর্ব্বাদ, তাহাও কি বিফল হইবার? হায় হায়, এমন সময় আবার যদি অতিথির আগমন হয়, তবে তাঁহাদের সেবার কি হইবে, নিরাশ হইয়া তাঁহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে দেখিলে আমি কি আর স্থির থাকিতে পারিব? নাঃ, আমি আর চিন্তা করিতে পারি না, ভাবিতেও কষ্ট হয়,—আমার মরণই মঙ্গল।

হায় রে ঋণ, ঋণের জ্বালায় ভক্তের চিত্তও বিচলিত হইয়া পড়িল। রামদাস মৃত্যুই স্থির করিয়া গোপনে সর্পবিষ সংগ্রহ করিল। মনে করিয়াছিল, এ কথা কাহাকেও জানাইবে না; কিন্তু সুখদুঃখের সমভাগিনী সহধর্ম্মিণীকে না জানাইয়া থাকিতে পারিল না। পতির কথা শুনিয়া পতিব্রতা শিহরিয়া উঠিল। অভিমানে দুঃখে কাতর হইয়া পড়িল। কথা বলিতে গেল, পারিল না। বাষ্পপূরিত-নেত্রে পতির প্রতি কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। সে নয়নই যেন নীরব-ভাষায় তাহার প্রাণের বেদনা প্রকাশ করিয়া দিল। কিছুক্ষণ এই ভাবেই কাটিয়া গেল। তার পর তাহার মুখ হইতে তিরস্কারমাখা নৈরাশ্যের ভাষা ফুটিয়া উঠিল। বলিল,—

"তুম্ভে তো মোর সঙ্গফল। বৃক্ষকু যেসনে বকল ॥
ফলর মঞ্জিপ্রায়ে হোই। দইব লগাই অচ্ছই ॥
পতি-বিহীনা যেউঁ নারী। সংসারে থান্তি দেহ ধরি ॥
কে কহু তাঙ্ক দুঃখমান। জীঅন্তে মরণ-সমান ॥
মোতে ছাড়িবা মনে কর। এ কেউ ধরম তুম্ভর ॥
তুম্ভে পরাণ দেব যেবে। মুহিঁ ভুঞ্জিবি বিষ তেবে ॥"

তুমি যে আমায় ছাড়িয়া যাইতে চাও, এ তোমার কিরূপ ধর্ম্ম বল দেখি? বলি, তোমায় আমায় কি কখনও ছড়াছাড়ি হইতে পারে? বৃক্ষের যেমন বল্কল, তুমি আমার তেমনই সঙ্গী। ফলের সহিত বীজের মত তোমাতে আমাতে মিলিত হইয়া আছি। এ মিলন—দৈবেরই ঘটন। তুমি কি না ইহাতে বিচ্ছেদ ঘটাইতে চাও? বল্কল অভাবে বৃক্ষের ক্লেশ তুমি জান না? যে রমণী পতিহীনা হইয়া এ সংসারে দেহ ধরিয়া থাকে, তাহার দুঃখের কথা কি কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে? তাহার জীবন মরণেরই মত। তুমি পতি হইয়া পত্নীকে এই বিচ্ছেদের আগুনে আহুতি দিয়া পালাইতে চাও? কই, কেমন একাএকা পালাইতে পারো পালাও দেখি? তুমিও বিষ ভক্ষণে প্রাণত্যাগ করিবে, আর আমিও অমনি সঙ্গেসঙ্গে বিষ ভক্ষণ করিব।

শুনিয়া তো রামদাসের মুখের আর বাক্যই বাহির হয় না অনেক ভাবিয়াচিন্তিয়া শেষ ঢোঁক গিলিয়া বলিল,—তা বটে, যা ব'লছ তা বটে —বটে, কিন্তু কি জান, তুমি শুদ্ধ আমার সঙ্গী হইলে, পুত্রটী যে অনাথ হইবে? ওর কথাটাও তো তোমার ভেবে দেখা উচিত?

অবলা আর এখন বড় অবলা নয়, তাহার কণ্ঠস্বরে প্রাবল্যেরই পরিচয়; ইহা অবশ্য আন্তর-বলেরই বহির্বিকাশ। রমণী উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—কী-ই, পুত্র অনাথ হইবে,—এ-ই? লছমণদেব যাহাদের নাথ,

তাহাদের আবার নাথহীনতার আশঙ্কা? ছিছি, কি তুমি দেবতার আরাধনা করিলে? হৃদয়ের এতই দৌর্ব্বল্য? আমি তো জানি, লছমণদেব যখন আমাদের প্রভু, তখন আমাদের আর ভয় করিবার কেহই নাই,—চিন্তা করিবারও কিছুই নাই। তবে, তুমি স্বামী, আমি তোমার অনুগামিনী; তুমি বিষ ভক্ষণ করো, আমিও বিষ ভক্ষণ করিব; কিন্তু জানিও—তোমার মত ঋণ বা লোকলজ্জা কিংবা অতিথিসেবায় অক্ষমতা প্রভৃতির ভীতি-নিমিত্ত নয়। ভালো বিষ খাইবার বাসনা হইয়া থাকে খাওয়া যাইবে, তার আর কি, তোমার ভোগ্যে আমার অর্দ্ধেক ভাগ তো কেহ ঘুচাইবে না? এখন চল, সংসারের কাজকর্ম্ম সারা যাউক, তারপর লছমণদেব যেমন প্রবৃত্তি দেন।

সতীর দেবভক্তির শক্তিমাখা উক্তি শুনিয়া রামদাসের মনে নববলের সঞ্চার হইল। রাত্রিকালে তিনজনেই আহারাদি সমাপন করিয়া ভগবানের নাম লইয়া আনন্দ-মনে শয্যায় শয়ন করিল। কিন্তু রামদাস বিষপাত্রটি মাথার শিয়রে লুকাইয়া রাখিতে ছাড়িল না। মনের ভাব—আজ যামিনীযোগে যদি প্রভু দয়া করেন উত্তম, নচেৎ এ প্রাণ আর রাখিব না। পত্নীর কিন্তু এ কথা অবিদিত রহিল না। তাহার মনের ভাব—স্বামী যদি সত্যই গরল ভক্ষণ করে, তবে আমাকেও ভক্ষণ করিতে হইবে।

শুইয়া অবধি পতিপত্নীর আর অন্য চিন্তাই নাই,—কেবল হা লছমণ যো লছমণ। উভয়েই মনেমনে লছমণদেবের কত স্তবস্তুতি পাঠ করিল,—কত দীনতা জানাইল; নয়ন-জলে শয্যা ভিজাইয়া ফেলিল। এদিকে মাত্রা পূরা হইয়াছে দেখিয়া লছমণদেবেরও আসন টলিল। তিনি মোহনিদ্রাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন.—দেখ, তুমি সত্বর আমার ভক্ত রামদাসের আবাসে গমন কর,—তাহাদের সকলকেই তোমার শক্তিতে

আচ্ছন্ন করিয়া ফেল। মোহনিদ্রা—"আপনার যাহা আদেশ" বলিয়া চলিয়া গেল এবং তাহাদিগকে ঘুমঘোরে অচেতন করিয়া ফেলিল। এ ঘুম তো যেমন-তেমুন নয়, একরূপ মরণ বলিলেও হয়। এই ঘুমের ঘোরে রামদাসের মরণের কথা স্মরণের পথ ছাড়িয়া দিল। তখন, কোথায় বা বিষ, আর খায়-ই বা কে ?

এদিকে চিন্তামণি করিলেন কি ? ভক্তের তরে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। যাঁর কোন চিন্তাই নাই,—চিন্তা করিবার কোন কারণই নাই, ভক্তের চিন্তায় তিনি চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। এইটুকুই তাঁহার বিচিত্রতা,—এইটুকুতেই তাঁহার ঈশ্বরত্বের বিকাশ। পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয়। যেমন তিনি নির্গুণ হইয়াও সগুণ, ইচ্ছাময় হইয়াও বিকার-বিহীন, সর্ব্বব্যাপী হইয়াও ভক্তের অঙ্কবিহারী, অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও পরিচ্ছিন্ন, একরূপ হইয়াও বহুরূপ, সর্ব্বভূতে সম হইয়াও ভক্তবৎসল, আত্মারাম হইয়াও ভক্তের প্রেমের ভিখারী, স্বাধীন হইয়াও ভক্তের অধীন। এইরকম আরও কতই আছে। তাই আজ তিনি চিন্তাহীন হইলেও ভক্তের চিন্তায় মহা চিন্তিত।

তিনি কেবল চিন্তা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিলেন না, আপনিই রামদাস হইয়া পড়িলেন। ইহা আর তাঁহার পক্ষে কঠিনই বা কি ? যে সর্ব্বদা যাহাকে চিন্তা করে, তাহাকে তাহার রূপ ধরিতে বড় বেগ পাইতে হয় না। তৈলপায়িকা তো কুমীরেপোকার রূপ ভাবিতে ভাবিতেই কুমীরেপোকা হইয়া যায় ? অনুক্ষণ ভগবানের রূপ ভাবিতেভাবিতে ভক্তেরও যেমন ভগবানের সারূপ্যলাভ অসম্ভব নয়, ভগবানেরও তেমনি ভক্তের রূপ পরিগ্রহ করা কিছুই অসম্ভব নয়। কেননা তিনিও যে একমাত্র ভক্তকেই সর্ব্বদা ভাবিয়া থাকেন।

সে যাহা হউক, ভগবানের ভক্তপ্রীতিরই বলিহারী, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ ভগবান হইয়াও ধরিলেন কি না সামান্য মানবের বেশ! আর সেই গভীর রাত্রে চলিলেন কোথায়—না কুসীদজীবী ধনবানের ভবনে ভবনে। তিনি রামদাস হইয়া আগে আগে যাইতে লাগিলেন। সম্মুখে দুইজন মশাল ধরিয়া পথ দেখাইয়া যাইতে লাগিল। আর পশ্চাতে কয়েকজন ভৃত্য মোহরের তোড়া বহিয়া লইয়া চলিল। রামদাস যে যে মহাজনের নিকট টাকা ধার করিয়াছে, তিনি তাহাদের প্রত্যেকের বাড়ী-বাড়ী গিয়া তাহার নাম ধরিয়া ডাকেন—মহাশয় গো, আমি রামদাস আসিয়াছি, আসুন শীঘ্র করিয়া আসুন, আপনাদের টাকা লইয়া যাউন।
অধিক রাত্রি; সকলেই নিদ্রায় অভিভূত। অনেক ডাকাডাকির পর সকলেই উঠিয়া আসে, আর ব্যাপার দেখিয়া অবাক হয়। সকলেই বলে,—কি আশ্চর্য্য, এত রাত্রে টাকা দিতে আসা কেন, কাল সকালে দিলেই তো চলিত? রামদাসরূপী ভগবান বলেন,—সে কি কথা, আজ আপনাদের মিয়াদ ফুরাইয়াছে, এখনই টাকাটা পাওয়া গেল, আর ঘরে ফেলিয়া রাখিতে আছে কি? তাই এত রাত্রিতেই পরিশোধ করিতে আসিয়াছি। দেনার টাকা পরিশোধ করিতে পারিলেই শান্তি। এই নিন, সুদে-আসলে সকল টাকা চুকাইয়া নিন, আর হাতচিঠাখানি ফেরৎ দিন। ভবিষ্যতে আমার প্রতি কৃপা রাখিবেন, যেন দরকার হইলে আবার ধার পাই।

এই ভাবে ভগবান সকল মহাজনের সকল ঋণ সুদে-আসলে পরিশোধ করিলেন এবং হাতচিঠাগুলি লইয়া তাড়াতাড়ি রামদাসের বাড়ীতে আসিলেন। তাহার শিয়রে গিয়া দাঁড়াইয়া দেখেন, তিনজনেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, অদূরে বিষপাত্রটি লুক্কায়িত ভাবে রক্ষিত রহিয়াছে। তিনি আর বিলম্ব করিলেন না, বিষপাত্রটি লইয়া বিষটুকু দূরে ছুঁড়িয়া

ফেলিয়া দিলেন এবং সেই পাত্রের উপর হাতচিঠাগুলি রাখিয়া দিয়া সরিয়া পড়িলেন।

এদিকে ভগবদাদেশে মোহনিদ্রা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিল। রজনীও পোহাইয়া আসিল। সহসা প্রাভাতিক পক্ষিকূজন কর্ণকুহরে প্রবেশ করায় রামদাস চমকিয়া উঠিল,—তাই তো, রাতি যে পোহাইয়া গেল। ভগবানেরও তো দয়া হইল না!—বিষও ভক্ষণ করা হইল না। হায় হায়, কি সর্ব্বনাশ কি সর্ব্বনাশ! ভগবানের নাম লইয়া রামদাস নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিল,—তখনও অন্ধকার একেবারে বিদূরিত হয় নাই। তবে আর কি, এইবেলা বিষটুকু খাইয়া ফেলি না কেন? এই ভাবিয়া সে বিষপাত্রটি আনিবার জন্য চুপিচুপি হাত বাড়াইল। পাত্রের উপর হাত দিয়া দেখে,—তাহাতে কিছুমাত্র বিষ নাই। তাহার পরিবর্ত্তে পত্রের মত কয়েক খণ্ড কাগজ না কি রহিয়াছে।

এ আবার কি ব্যাপার, ভাবিয়া রামদাস আস্তেআস্তে আলো জ্বালিয়া ফেলিল। দেখিল,—সত্যই পাত্রে বিষ নাই, আর তাহার উপর কয়েকখানি কাগজই রহিয়াছে। বিস্ময়ে পাঠ করিয়া দেখিল,—কি আশ্চর্য্য, এ যে তাহারই ঋণের হাতচিঠা,—যে মহাজনের কাছে যত ঋণ, সকল ঋণেরই হাতচিঠা! কি আশ্চর্য্য, এ যে দেখিয়াও বিশ্বাস হয় না! বোধ হয়, ঐ হাতচিঠার কথা ভাবিয়াভাবিয়া আমার কোন রোগই জন্মিয়া গেল, তাই ঐরূপ খেয়ালই দেখিতেছি। তাই-ই যদি হয়, তবে বিষই বা গেল কোথায়? ভাল, একবার পত্নীকেই বা ডাকি না কেন, সে-ও একবার দেখুক না কেন,—সত্য কি মিথ্যা? এই ভাবিয়া রামদাস তাহার স্ত্রীকে ডাকিয়া সকল ব্যাপার দেখাইল। তখন আর সন্দেহ করিবার কিছুই থাকিল না, বাস্তবিকই সেগুলি হাতচিঠা।

সূর্য্য উঠিলেন। রাত্রির অন্ধকার অন্তর্দ্ধান করিল। কিন্তু পতি-

পত্নীর অন্তেরের অন্ধকার ঘনীভূত হইল। যেন সারা রাজ্যের সকল আঁধার তাহাদের হৃদয় জুড়িয়া বসিল। উভয়ে কেবলই ভাবে,—একি ইন্দ্রজাল,—না, আর কিছু? যদি ইন্দ্রজালই হয়, সে ঐন্দ্রজালিকই বা কে? এ তো সহজ ব্যাপার নয়,—বিষের বদলে একেবারে অমৃত? যদি সত্য হয়, অমৃত নয় ত কি? ঐ হাতচিঠাগুলির জন্যই তো আমরা মরিতে বসিয়াছিলাম,—ঐ পাত্রের উপর বিষ আনিয়া রাখিয়া ছিলাম? হাতচিঠাগুলি যদি যথার্থই হয়, তবে উহাই আমাদের মরণ রহিত করিয়া দিবে? তবে উহাদের 'অমৃত' বলিব নাতো বলিব কি? কিন্তু এ বিষকে অমৃত করা তো যে-সে মায়াবীর কার্য্য নয়? হায় লছমণদেব! এ কি তোমারই খেলা? তোমারই ইচ্ছায় তো বিষও অমৃতে এবং অমৃতও গরলে পরিণত হইতে পারে দয়াময়? তবে,—একি তোমারই কৃপাবিলাস?

তাহারা অবাক হইয়া এইরূপ কত কি ভাবিতেছে। বেলা তখন এক প্রহর হইয়া গিয়াছে। এমন সময় কতিপয় অতিথি আসিয়া তাহাদের সাধের সমাধি ভাঙ্গিয়া দিল। অতিথির আহ্বান শুনিয়া রামদাস বড়ই হতাশ হইয়া পড়িল। তাই তো ঘরে যে কিছুই নাই, এখন এদের ভোজন করাই কি প্রকারে? আহা, শুনিতেছি—ইঁহারা আবার কল্য হইতে উপবাসী রহিয়াছেন। তাই তো লছমণদেব! কি হইবে?

রামদাস অতিথিগণকে অভিবাদনপূর্ব্বক বসিবার আসন দিয়া এই রূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময় কয়েকজন মহাজন সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেরই হাসিহাসি মুখ। সকলেই মিষ্ট কথায় রামদাসকে তুষ্ট করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। একে হাতচিঠাগুলি মাথার শিয়রে আসিয়া গিয়াছে, তার উপর আবার মহাজনেরা রূঢ়

কথার স্থলে গুড়মাখা কথা কহিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, ব্যাপার-খানা কি ? রামদাস তো ভাবিয়াই অস্থির। কারণ, সে তো সেই সুদখোর মহাজনদের খাতকের বাড়ী আসিয়া হাসি-কথার বাজে খরচ করিতে কখনও দেখে নাই। তার উপর সে জানেওনা যে, কড়ায় গণ্ডায় সুদের সুদ তস্য সুদ মিলাইয়া কর্‌করে মোহরগুলি তাহারা ঘরে তুলিয়া লইয়াছে। তাহাকে কিন্তু অধিক্ষণ ভাবিতে হইল না, মহাজনদের পরের কথা শুনিয়া তাহার সে ভাবনা দূর হইয়া গেল, আর নূতন ভাবনা কিছু করিতে হইল না; বরং সারা জীবন যে ভাবনা করিয়া আনিয়াছে তাহাই বজায় রহিল। কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া মহাজন-দিগকে আপনাদের সাবেক ভাবনা বদলাইয়া নবীন ভাবনা লইয়া ঘরে ফিরিতে হইল। মহাজনগণ যখন হাসিতে হাসিতে মোলায়েম ভাষায় রামদাসকে বলিল,—হাঁ হে, তোমার কি আর রাত্র পোহাইতে তর সহিল না, রাতদুপুরে গিয়া ধার শুধিবার দরকারটা ছিল কি ? রামদাস তখন কেমন আনমনা হইয়া বলিল,—কই না, আমি আবার কখন আপনাদের ধার শুধিতে গেলাম ? মহাজনগণ বলিল,—বেশ, বেশ, সে কি কথা ; তুমি গেলে, আগে আগে মশাল,—পিছনে মুটে—মাথায় মোহরের থলি, আর তুমি সুদ-সমেত সমস্ত পাওনা চুকাইয়া হাতচিঠা ফিরাইয়া আনিলে, আর এখন ব'লছ ;—আমি আবার কখন ধার শুধিতে গেলাম ?

এই কথা শুনিয়া রামদাস আর স্থির থাকিতে পারিল না। যে সমস্যায় পড়িয়া সে এতক্ষণ আকাশপাতাল কত কি ভাবিতেছিল, এইবার তাহার মীমাংসা হইয়া গেল। অবশ্য, তাহাকে কোন নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইল না ;—সে নিঃসংশয় জানিল—বিষের পাত্রে হাত-চিঠা রাখিয়া যাওয়াটা সেই দয়াময় লছমণদেবেরই কাণ্ড। এইবার

তাহার ধৈর্য্যের বাঁধ একেবারেই ভাঙ্গিয়া গেল। সে পাগলের মত ধাইয়া গিয়া মহাজনদিগকে জাপটাইয়া ধরিল। মুখে অন্য কথা নাই, কেবল কথা—অ্যাঁ, তোমরা তাঁকে দেখেছ—দেখেছ? হায় আমি হতভাগা সারা জীবন ভাবিয়া-ভাবিয়া স্বপনেও যে একদিন তাঁহার দেখা পাইলাম না? ওগো, তোমরা আমায় পায়ের ধূলা দাও,—পায়ের ধূলা দাও; তোমাদের আশীর্ব্বাদে যদি কখনও তাঁহার দেখা পাই।

রামদাসের দীনতা এবং আর্ত্তিতে তাহাদের কুলিশ-কঠোর হৃদয় দ্রব হইয়া গেল। সকলেই বলে,—আরে, করো কি —করো কি? পা ছেড়ে দাও—পা ছেড়ে দাও। তুমি আমাদের পায়ের ধূলা লইবে কি, আমাদেরই তুমি পায়ের ধূলা দাও। অনেক দুর্ব্বাক্য তোমাকে বলিয়াছি, ভুলিয়া গিয়া চরণে আশ্রয় দাও। অহো, তোমার অপার মহিমা, তুমি আমাদের খাতক হইয়াছিলে বলিয়াই আমরা চর্ম্মচক্ষে সেই বাক্যমনের অগোচর ভগবান্‌কে দর্শন করিতে পাইয়াছি। ওগো, তুমি আমাদের অপরাধ ক্ষমা কোরে মনে রেখো, আর সাধুসেবার যখন যাহা দরকার, আদেশ করিয়া পাঠাইও, তখনই তাহা পঁহুছাইয়া দিব।

সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! প্রেমের বাদল লাগিয়া গিয়াছে! নয়নে-নয়নে প্রেমের জল! অন্তরে-অন্তরে প্রেমের ঠাকুর! এ দৃশ্য ভাবিতেও আনন্দ, বলিতেও আনন্দ! সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!

মহাজনগণ সেদিনকার সাধুসেবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া রামদাসের নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। রামদাসও সাধুসেবার আয়োজন করিতে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। যাইয়াই সর্ব্বপ্রথমে পত্নী ও পুত্রকে লছমণদেবের কৃপার কথা জানাইল। শুনিয়া তাহাদের আর আনন্দ ধরে না। মুখে মুখে প্রভুর মহিমার কথা ফুটিয়া উঠিল। সকলেই বলে,—হায় হায়, এমন দয়াল প্রভুকেও কেহ চিনিল না গো চিনিল না!

তাঁহাকে ভুলিয়াই যে বারবার আনাগোনা আর এত যাতনা, তাহাও তো কেহ জানিল না গো জানিল না!

রামদাস স্ত্রী পুত্র সমভিব্যহারে পরের উপকার আর অতিথি-সৎকার প্রভৃতি পুণ্য অনুষ্ঠানে নিরত রহিয়া এবং কায়মনে ভগবচ্চরণ চিন্তা করিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিল। দেহাবসানে দিব্য গতি লাভ করিয়া সকলেই ধন্য ও কৃতার্থ হইয়া গেল।

ঠাকুর! তুমি বেশ। তুমি তোমাকেও দেখাইলে, তোমার ভক্তকেও দেখাইলে। তোমাকে দেখাইলে কি? যে যাহা চায়, তাহাকে তুমি তাহাই দিয়া থাক। মহাজনেরা টাকাই চায়, তাই তাহাদিগকে সাক্ষাৎ দেখা দিয়াও তুমি টাকাই দিয়া আসিলে, তোমার নিজের কিছুই দিলে না। তোমাকে আরও দেখাইলে কি? তুমি তোমার ভক্তের তফাতে তফাতে থাকিয়াও তোমার যাহা সর্ব্বস্ব—সমস্তই তাহাকে প্রদান করিয়া থাক; সামান্য ধন-জন দিয়া ভুলাও না আর তোমার ভক্তকে দেখাইলে কি? তোমার ভক্ত তোমার চেয়েও বড়; তোমার সম্পত্তিতে তাহারাই প্রকৃত মালিক। মহাজনগণ সাক্ষাৎ তোমাকে পাইয়া নশ্বর ধনের অধিক কিছুই পাইল না। কিন্তু তোমার ভক্ত রামদাস তাহাদিগকে তোমার গুপ্ত ভাণ্ডারের গুপ্ত ধন প্রেমধনে ধনী করিয়া দিল। হায় ঠাকুর, তুমি ধনী হইয়াও কৃপণ, আর তোমার ভক্ত কাঙ্গাল হইয়াও পরম দয়াল। ঠাকুর! তুমিও বেশ, তোমার ভক্তও বেশ।

রঘুদাস।

—:০:—

পিপিলীগ্রাম ৺পুরুষোত্তম ধাম হইতে দশ ক্রোশ দূরে। সাধারণত গ্রামটী পিপিলীচটী বলিয়াই প্রসিদ্ধ। ভক্ত রঘুদাস উক্ত গ্রামে বাস করিত। বৃদ্ধা জননী ও তরুণী ঘরণী ছাড়া তাহার আর সংসারে কেহ ছিল না। সে জাতিতে ধীবর, উপাধি—বেহেরা, জাতীয় বৃত্তি দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। প্রাতঃকালে উঠিয়াই জাল লইয়া সে বাটীর বাহির হইত, তারপর মাছ ধরিয়া—বিক্রয় করিয়া সেই পয়সায় বাজার-হাট সারিয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিত।

এইরূপে কিছুদিন যায়, তাহার মনে কেমন একটু বৈরাগ্যের উদয় হইল। সে গুরুদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিল। গলায় তুলসীর মালা পরিল। প্রতিদিন প্রাতে স্নান করিয়া সে দ্বাদশ অঙ্গে তিলক করে, গুরুমন্ত্র জপ করে, ভাগবত পাঠ করে, আর সজ্জনের সঙ্গ করে। ক্রমে তাহার দিব্য দৃষ্টি খুলিয়া গেল। সে দেখিল,—তাহার উপাস্য ভগবান্ সকল জীবেরই অন্তরে অন্তরে। জীবহিংসা করিতে আর তার প্রাণ চায় না। জীবের দয়ায় তাহার অন্তর গলিয়া গেল। অনুতাপের তীব্র-তাপে সে যেন কেমন-এক অননুভূত যাতনা অনুভব করিতে লাগিল। সে কেবলই বিষাদভরে বুক-মুখ চাপড়ায় আর বলে,—হায় বিধাতা! তুমি আমায় ধীবরকুলে কেন জন্ম দিলে? জীবহত্যাই আমার জীবিকা;—হায় হায়, না জানি কোন্ অনন্ত নরকে যাইয়া আমায় নিপতিত হইতে হইবে? হায় হায়, দয়ার ঠাকুর তুমি, এ হিংসাকলুষিত-হৃদয়ে কি কখনও তোমার অধিষ্ঠান হইতে পারে?

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রঘুর মন মালিন্যহীন হইতে লাগিল। জাতীয় পেশা বা জীবিকা হইলেও মৎস্যধরা তাহার পক্ষে বিষম ক্লেশকর হইয়া পড়িল। সে একদিন যায় তো দুইদিন যায় না, এইরূপ করিতে করিতে সে ক্রমে মাছ ধরিতে যাওয়াই বন্ধ করিয়া দিল। জীবের দুঃখের কথা ভাবিতে গিয়া সে নিজের দুঃখের কথা—সংসার অচল হইবার কথা বিস্মৃত হইয়া গেল।

দরিদ্রের সংসার, সঞ্চয় তো প্রায় থাকে না। তাই রঘু মাছ ধরিতে যাওয়া বন্ধ করায় সকলেরই পেট চলা ভার হইয়া পড়িল। দুই বেলা খোরাক আর জুটে না, ক্রমে এক বেলাও জুটিয়া উঠিল না; শেষ উপবাসই সার হইল। রক্তমাংসের শরীর লইয়া তাহাই বা কয়দিন পারা যায়? তাহার উপর মাতা ও বনিতার তিরস্কার। রঘু কি করে, দয়ার অন্তরে পাষাণ-প্রলেপ দিয়া আবার তাহাকে জাল লইয়া মৎস্য ধরিতে যাইতে হইল। প্রাণে ভারি কষ্ট। কেবলই ভাবে,—হায় ভগবান্! এ অধম ধীবরের কি অপর জীবিকার পথ তুমি দেখাইয়া দিতে পার না? আমি নিজের জন্য চিন্তা করি না, কিন্তু বৃদ্ধ মাতা ও পতিব্রতা পত্নীর কথা চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারি কই? শত অকার্য্য করিয়াও তাঁহাদের ভরণ করিবার কথা তো শাস্ত্রমুখে তোমারই উপদেশ?

এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে রঘুধীবর ধীর-পদবিক্ষেপে এক সরোবরতীরে আগমন করিল এবং একান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ঘুরণী জালখানি হরি হরি বলিয়া মাথার উপর ঘুরাইয়া 'ছপাং' করিয়া জলে ফেলিয়া দিল। এইরূপ বারকতক ফেলিতে ফেলিতে এক প্রকাণ্ড রোহিত মৎস্য তাহার জালে পড়িয়া গেল। সে জালখানি টানিয়া ডেঙ্গায় তুলিল, আর মৎস্যটি জালের মধ্যে ধড়ফড় করিতে লাগিল। দেখিয়া তাহার আর দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। সে হাত দিয়া মাথা চাপড়ায় আর বলে,—হায় হায়, এ

যে সাক্ষাৎ সেই মীন অবতার, ইনিই তো সেই শঙ্খাসুরকে নিধন করিয়াছিলেন ? হায় হায়, ইহাকে বধ করিয়া আমি দেহ ধারণ করিব কি প্রকারে ? না বধিলেই বা উপায় কি ? বৃদ্ধা জননী পতিব্রতা রমণী দুইজনেই যে মারা পড়িবেন ?

এই ভাবিয়া রঘুদাস মৎস্যটিকে জালের ভিতর হইতে বাহির করিল। তাহার দু'নয়নে জলধারা। সে কর্ত্তব্যের অনুরোধে প্রাণকে বজ্রাদপি কঠোর করিয়া মৎস্যটিকে মারিবার উদ্দেশ্যে শুষ্ক ভূমিতে লইয়া গিয়া ফেলিল এবং সেই মৎস্যকে লক্ষ্য করিয়া বিনয়-বচনে বলিল,—ওহে মীনরূপধারি ! তুমি আমার দুইটা দুঃখের কথা শুন। আমি জাতিতে ধীবর, তোমাদের বধ করাই আমার স্বভাব, এ স্বভাব তো আর অন্যথা হইবার নয় ? কাজেই আমায় তোমাকে বধ করিতে হইতেছে। তুমি যদি সেই হরিই হও তাহা হইলেও আমার হস্তে তোমার নিস্তার নাই ; কেন না, আমার এ স্বভাব তো তোমারই গড়া ? আর তোমাদের বধ করিয়া একমুষ্টি অন্ন পাইবার ব্যবস্থাও তো তোমারই করা ?

এই বলিয়া রঘু সজোরে সেই মৎস্যটির টুঁটি টিপিয়া ধরিল। মৎস্যটিও অমনি বদন বিস্তার করিয়া বলিয়া উঠিল,—রক্ষা কর নারায়ণ ! রক্ষা কর। রঘু স্বকর্ণে তাহা শুনিল। এক অপ্রাকৃত আনন্দে তাহার অন্তর ভরিয়া গেল। অভুক্তা মাতা ও বনিতার চিন্তা সে স্থান হইতে সরিয়া পড়িল। সে কালবিলম্ব না করিয়া সেই মৎস্যটিকে বক্ষে লইয়া অগম্য বনে যাইয়া প্রবেশ করিল। বনের মধ্যে পর্ব্বত। তাহাতে শত শত প্রস্রবণ। ক্ষুদ্র বৃহৎ কত কুণ্ডে তাহার জল জমিয়া রহিয়াছে। রঘু সেই মৎস্যের উপযুক্ত একটি কুণ্ডে তাহাকে ছাড়িয়া দিল। জল পাইয়া মৎস্যের যত আনন্দ না হউক, রঘু কিন্তু অমিত আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িল। সে সেই কুণ্ডের তটে নিশ্চল আসনে উপবেশন করিল এবং আকুলি-

বিকুলি করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিল,—ওহে তুমি কে হে, এই মীনের ভিতর হইতে আমাকে নারায়ণ নাম শুনাইলে, তুমি কে হে? ওহে, তুমি যে হও সে হও, তুমি দয়া ক'রে একবার আমায় দেখা দাও। শব্দরূপে দেখা দিলে চলিবে না; সাক্ষাৎ শ্রীমূর্ত্তিতে দেখা দিতে হইবে। তোমার সুধাবিনিন্দিত সুমিষ্ট স্বরই যেন আমায় বলিয়া দিতেছে,—তুমি বড় সুন্দর গো বড় সুন্দর। তুমি তোমার সেই অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার সৌম্য মূর্ত্তিতে একবার আমায় দেখা দাও; বেশী বলিব না, একটিবার আমায় দেখা দাও। যদি না দাও তো নিশ্চয় জানিও, আমি তোমার উপর পাতক চাপাইয়া আত্মহত্যা করিব। এই বলিয়া রঘু স্থিরচিত্তে সেই নারায়ণ নাম জপ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তিন দিন হইয়া গেল, নামের নেশায় সে তাহা জানিতেই পারিল না। নারায়ণ তাহা জানিলেন। এদিককার জানাজানি বন্ধ না হইয়া গেলে তো আর তিনি অন্তরে থাকিয়াও অন্তরের সাড়া পান না? তাই রঘুর এদিক্কার ঘরকরণা ক্ষুধা-পিপাসা দিবা-রজনী প্রভৃতির জ্ঞান বিলুপ্ত হইবামাত্রই ভগবান্ তাহার প্রাণের কথা জানিতে পারিলেন। অমনি তিনি এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণপূর্ব্বক তাহার সম্মুখে আসিয়া ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিলেন,—ওহে ও তপস্বি! তুমি এই একান্ত বনে বসিয়া কিসের তপস্যা করিতেছ? তোমার নাম গোত্র জাতি কি? বাড়ীই বা কোথায়?

ছদ্ম-বৃদ্ধের আহ্বান শুনিয়া রঘু বেহারা তাড়াতাড়ি চাহিয়া ফেলিল। আপনার অবস্থা তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিল, শেষে বলিল,—ঠাকুর, প্রণাম হই, আপনি এখন আসিতে পারেন, আমার ভজনের বিলম্ব হইয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—তোমার কথা তো বড় বিপরীত দেখিতেছি হে? মাছ কি কখনও কথা কয়?—না, তাহা বিশ্বাসই করিতে পারা যায়? আর যদি সত্যই হয়, তাহা কোন দেবতারই খেলা বলিয়া

জানিও। তা সে দেবতাই বা তোমায় দেখা দিবেন কেন ? তুমি তোমার এই বৃথা প্রয়াস পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন কর। শুধু শুধু কষ্ট পাইবার প্রয়োজন কি ?

রঘু বেহেরা বলিল,—ঠাকুর ! তুমি বেশ বলিতেছ ত ? সে দেবতা তেমনই কি না ? আমি যেন আর তাঁর দয়ার কথা কিছু শুনি নাই ? ঐ নীলাচলে দেখেন নাই কি, তাঁহার দেউলের অগ্রভাগে পতপতরবে পতাকা উড়িতেছে ? সে পতাকা তো প্রতিনিয়ত পতিত-তারণের প্রতিজ্ঞাবাণীই প্রচার করিতেছে ? মহাপতিত আমাদের তা-ই তো ভরসা, আর সেই ভরসাতেই তো এই অসম সাহসে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আর যদি তিনি দেখা না-ই দেন, তবে তাঁহার নাম লইয়া এ প্রাণ এইখানে বিসর্জ্জন দিব। আপনার চরণে কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম করি, আশীর্ব্বাদ করিয়া আপনি এখান হইতে শুভ করুন, আমি প্রাণ ভরিয়া তাঁহার নাম গান করিতে থাকি।

ভক্তের ভাবে এইবার ভগবান্ বিভোর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় ছলছল হইয়া আসিল। আপনাকে গোপন রাখাও কঠিন হইয়া পড়িল। তিনি মনেমনে বিচার করিলেন,—ইহার যেরূপ দৃঢ়তা দেখিতেছি আমি দেখা না দিলে নিশ্চয়ই এ আপনাকে আপনি বিনষ্ট করিবে। তিনি জলদগম্ভীর-স্বরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—বৎস রঘু রে ! ধন্য তোর একনিষ্ঠা, এই দ্যাখ, তাহারই টানে বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া আমি এই অগম্য বনে আগমন করিয়াছি। বৎস রে ! আরও শোন্ বলি, ঐ মীনের মধ্য হইতে নারায়ণ-নাম আমিই তোরে শুনাইয়াছি। বৎস রঘুদাস ! বিশ্বাস হয় কি ?

অ্যাঁ তুমি—তুমি ? তবে কই তোমার মস্তকে মণিমুকুট কই ? কই তোমার কর্ণে দলমল মকরকুণ্ডল কই ? কই তোমার শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী

ভুজ চারিটী কই? তোমার কণ্ঠশোভী কৌস্তুভ মণি কই? কই তোমার বৈজয়ন্তী মালা কই? কই তোমার পীত বসন কই? আর কই তোমার ভক্তের বাঞ্ছিত ধ্বজ-বজ্রাদি চিহ্নিত রাজীবচরণ কই? ঠাকুর! আমি যে অশিক্ষিত, পাপনিরত ধীবর। তোমার ভক্ত নই যে, যে-সে স্বরূপে ভিতর হইতে তোমায় আমি টানিয়া বাহির করিব। অন্ধ আমি, আমার ভক্তির নয়ন ফুটাইয়া দিয়া, আবরণের বাহিরে আসিয়া আমাকে সাক্ষাৎ দর্শন না দিলে, আমি কোথায় তোমায় হাতড়াইয়া বেড়াইব বল? মৎস্যের আবরণে সাড়া দিয়া তুমি আমায় গৃহ ছাড়া দেশছাড়া—আহার নিদ্রা সকল ছাড়া করিয়াছ, আবার এই ব্রাহ্মণ-শরীরের আবরণটুকু বজায় রাখিতে গিয়া আমাকে শেষ প্রাণটুকু পর্য্যন্ত ছাড়া করিতে চাও? না না করুণাময়, যদি করুণার প্রেরণায় জাতি কুল শৌচ সদাচার প্রভৃতির অপেক্ষা না রাখিয়া আপন বলিয়াই অঙ্গীকার করিয়াছ, তবে, আরও কিঞ্চিৎ করুণা করিয়া তোমার সেই ভুবনমোহন নারায়ণ-মূর্ত্তিতে একবার আমায় দেখা দাও। এই বলিয়া সে তাঁহার চরণতলে লুটাপুটী খাইতে লাগিল।

ভক্তের আর্ত্তি শুনিয়া ভগবান্ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তখনই তাহাকে প্রার্থিত দিব্য মূর্ত্তিতে দর্শন দান করিয়া বর প্রার্থনার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রঘুদাস আর বর প্রার্থনা করিবে কি সাক্ষাৎ দর্শন পাইয়া আনন্দেই তাহার অন্তর-বাহির ভরিয়া গিয়াছে। সে কম্পিত-কণ্ঠে কেবলই বলে,—অহো ভাগ্য, অহো ভাগ্য! ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি দেবগণ ধ্যানযোগে যাঁহার দর্শন পান না, ছার ধীবরের জন্য সেই তুমি কি না বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া বিজনবনে আগমন করিয়াছ? ধন্য ধন্য প্রভু! তোমার অবাধ করুণায়। বর আর তোমার কাছে কি-ই বা প্রার্থনা করিব? আশীর্ব্বাদ কর,—যেন চিরদিনই তোমার চরণতলে অবলুণ্ঠিত হইতে পারি।

ভগবান্ তবু তাহাকে ছাড়েন না। বর প্রার্থনার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রঘুদাস কি করে, তাঁহার সহিত অধিক হঠ করা ভাল নয় ভাবিয়া শেষ প্রার্থনা করিল,—প্রভু হে, যদি বরই দিবার এত বাসনা হইয়াছে, তবে কৃপা করিয়া এই বর প্রদান কর,—আমি তো জাতিতে ধীবর, মৎস্যমারণ তো আমার জাতীয় স্বভাব, এ স্বভাব যেন ছাড়িয়া যায় এবং যে অন্নের জন্য এই প্রাণিহিংসায় প্রবৃত্তি, সে অন্ন যেন অনায়াসেই উপস্থিত হয়। আর অন্তিমকালে জিহ্বা যেন তোমার পরম মঙ্গল নাম উচ্চারণ করিতে পারে এবং অন্তরে চিন্তা করিলেই যেন চিন্তামণি তোমার দেখা পাইতে পারি। ভগবান্ তাহার মস্তকে সন্তাপ-নাশন শ্রীহস্ত সমর্পণ করিয়া বলিলেন,—তাই হবে রে, তাই হবে। ধীবর পরম আনন্দে হরি হরি ধ্বনি করিয়া উঠিল। শ্রীহরিও অমনি হাসিতে-হাসিতে অন্তর্হিত হইয়া পড়িলেন।

প্রভুকে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া রঘুদাসের দুঃখের আর সীমা নাই। সে আছাড়িপিছাড়ি করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল। তাহার সেই আর্ত্তিমিশ্রিত ক্রন্দন শ্রবণ করিলে বজ্রও বিগলিত হইয়া যায়। অনেকক্ষণ ক্রন্দনের পর সে আপনাকে আপনি কতকটা প্রকৃতিস্থ করিয়া হরিহরি বলিতেবলিতে ধীরেধীরে বনের বাহির হইল। ভাবের ভরে পা যেন আর চলে না। সে যেন তখন আর এক মানুষ। স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহ যেন সুবর্ণ হইয়া গিয়াছে! সে করতালি দিয়া হরিনাম গান করিতেকরিতে আপন আবাসে যাইয়া প্রবেশ করিল। তাহার গর্ভধারিণী ও সহধর্ম্মিণী তখন ধরায় পড়িয়া তাহার জন্য কাঁদিয়াকাঁদিয়া গগনমণ্ডল ফাটাইয়া ফেলিতেছে। তাহাদের বিশ্বাস—রঘুদাস আর জীবিত নাই।

রঘুও বাটীতে প্রবেশ করিল, তাহার পশ্চাৎপশ্চাৎ গ্রামবাসী কতকগুলি হুজুগবাজ নিষ্কর্ম্মা লোকও তথায় যাইয়া উপস্থিত হইল।

তাহাদের সমালোচনার হাত হইতে তো কাহারও অব্যাহতি পাইবার যো নাই;—রঘুই বা পাইবে কেন? তাহারা জিহ্বাগুলি বেশ সানাইয়া লইয়া একজোঁট হইয়া বলিতে লাগিল,—আরে দেখেচ-দেখেচ, বেটা জেলের পোলার আক্কেলটা দেখেচ? বেটার খেটে খাবার ক্ষমতা নাই, তাই দিনকতক কোথায় লুকিয়ে থেকে আজ আবার ভেক বোদ্‌লে পাগল সেজে এসে হাজির হোয়েছে। মতলবখানা,—ওকে দেখে ওর মা-মাগিটা আর মাগ ছুড়িটা ভয় পা'ক, আর তারা যেমন-তেমন কোরে ওর খোরাক্ যোগাক্, আর ও মজা কোরে বোসে বোসে খ্যাটন চালাক্। মরণ আর কি, অত বড় গতরখানা তবু খাটবার ভয়ে এত প্রতারণা!

যাহার যাহাতে সুখ। নিষ্কর্ম্মা নিন্দুকের দল দুইটা দুর্ব্বাক্য বলিয়া কথার কণ্ডূতির নিবৃত্তি করিয়া আনন্দমনে চলিয়া গেল। মনের ভাব,—বেটা যেমন ঠক, তেমনি চোট্‌পাট্ বলিয়া আসিয়াছি। আর সেই নয়নমণিহারা রমণী দুইটী করিল কি? তাহারা হারানিধিকে ঘরে পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়া পড়িল। তাহারা তাহাকে আদরভরে স্নানাহার করাইয়া পরা প্রীতি অনুভব করিল। রঘুদাসও আহারান্তে একান্তে বসিয়া প্রাণকান্তের নাম গ্রহণ করিতে লাগিল। তাহাকে যে যে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করুক, হরি নারায়ণ মধুসূদন প্রভৃতি ভগবানের নাম ছাড়া আর তাহার মুখে অন্য কোন কথাই নাই। সে প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্নান করে এবং বৈষ্ণব-চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া ভগবানের নাম লইয়া পথেপথে বিচরণ করিতে থাকে। কাহারও কাছে মুখ ফুটিয়া কিছুই চাহে না। কিন্তু অন্তর্য্যামীর আন্তর-আদেশে এ ও সে তাহার দৈনিক আহার্য্য ডাকিয়া তাহার করে অর্পণ করে। সে-ও তাহা লইয়া মাতার হস্তে আনিয়া দেয়। দেখিয়া জননীর মনে আনন্দও হয় বিস্ময়ও

হয়। বধুর সহিত তিনি তাহা পাক করেন এবং পুত্রকে আহার করাইয়া বধূতে তাঁহাতে ভোজন করেন। এইরূপে দিন একরূপ স্বচ্ছন্দেই যাইতে লাগিল।

একদিন রঘুদাস একটী গ্রাম্য মণ্ডপে বসিয়া আছে। একপাল ছেলে তাহার পাছে লাগিয়াছে। চারিদিক্ হইতে তাহারা তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। কেহ তাহাকে গালাগালি দেয়, কেহ ঢিল ছুড়িয়া মারে, কেহ ধূলায় মাথামাথি করিয়া ফেলে। আবার কেহ বা তাহার মালা ছিঁড়িয়া দেয়, কেহ বা টিকি ধরিয়া টানে, কেহ বা কাপড় কাড়িয়া লয়। এত উপদ্রবেও কিন্তু তাহার ক্ষোভ নাই। নামগানেরও বিরাম নাই। উপদ্রবের মাত্রা ক্রমশ বাড়িতে দেখিয়া রঘুদাস বাড়ী যাইতে মনস্থ করিল। সে উঠিয়া কিছুদূর গিয়াছে, এমন সময় একটা দুষ্ট বালক লোহার কাঁটা-আঁটা লাঠি দিয়া নির্দ্দয়ভাবে তাহার নিতম্বে আঘাত করিতে লাগিল। আহা, তাহার রুধিরধারায় ধরাতল অভিষিক্ত হইতে থাকিল। অতিরিক্ত রক্তপাতে ভক্তের শরীর শক্তিহীন হইয়া পড়িল। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না,—তাহার মুখ হইতে করুণার কথা বাহির হইয়া পড়িল। সে কাকুতি-মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল,—কেন বাবা! আমি তোমার কি অপরাধ করিয়াছি; আমায় এ অকারণ এত দণ্ড কেন? হতভাগ্য বালক তবুও তাহাকে প্রহার করিতে বিরত হইল না। একবার রঘুর অন্তরে কেমন একটু সন্তাপের অনুভূতি হইল। অন্তর্য্যামীরও তাহা গোচর হইয়া গেল। সে দুই চারি পা যাইতে-না-যাইতে সেই বালক চেতনাহীন হইয়া ধরণীতে ঢলিয়া পড়িল। অমনি "কি হইল কি হইল" বলিয়া বালক সকল সেখানে দৌড়িয়া আসিল। আসিয়া দেখে, তাহার শরীরে প্রাণ নাই। তাহারা তখনই তাহার পিতামাতার নিকট ধাইয়া গিয়া সকল কথা

বিজ্ঞাপিত করিল। তাঁহারা অমনি ক্রন্দনের উচ্চ রোলে দিগদিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেকরিতে ত্বরাত্বরি পুত্রের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।'' তাঁহারা তাহাকে অতি সন্তর্পণে উঠাইয়া বসাইলেন। নাসিকা চাপিয়া কর্ণে ফুৎকার প্রদান করিলেন। হস্তপদের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন,—হায় হায়, কি সর্ব্বনাশ,—বাছা আর ইহলোকে নাই! তাঁহারা তো বালকের ব্যবহার সকলই শুনিয়াছিলেন, তাই মনে করিলেন,—ইহা নিরপরাধ রঘুদাসের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণেরই প্রতিফল। রঘুদাস বোধ হয় সামান্য কেহ হইবে না। এখন তাহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলে হয় তো বালক জীবন পাইলেও পাইতে পারে। যাই, আমরা তাহাকে প্রসন্ন করিতেই চেষ্টা করি। যাহার রোষে এ বালক প্রাণ হারাইয়াছে, তাহার প্রসন্নতায় ইহার প্রাণ পাওয়া অসম্ভব নয়। এই ভাবিয়া তাঁহারা মৃত পুত্রটিকে ধরাধরি করিয়া লইয়া গিয়া রঘুদাসের পায়ের উপর ফেলিয়া দিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে অনেক স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কথা,—ওগো, আমাদের এই একটী বই আর তুইটী নাই, আর সন্তান লাভের বয়সও নাই, এই আমাদের মুখ চাহিয়া ইহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া তুমি ইহাকে বা আমাদিগকে জীবিত করিয়া দাও। না দাও তো নিশ্চয় জানিও, আমরা তোমার উপর হত্যা চাপাইয়া আত্মহত্যা করিব। বলি হাঁগা, তুমি তো সাধু, তোমার আর শত্রুই বা কি, মিত্রই বা কি? তোমার তো সকলই সমান? তবে তুমি এই বোধহীন বালকের প্রতি এত কঠোর দণ্ডের বিধান করিলে কেন?

এই বলিয়া তাঁহারা রঘুদাসের পদতলে পতিত হইলেন। বিনয়ের খনি রঘুও অমনি—‘করেন কি করেন কি,—অধম ধীবর আমি, ছিছি আমার পায়ের তলায় আপনারা—করেন কি করেন কি?'' এইরূপ বলিতে-বলিতে শশব্যস্তে তাঁহাদিগকে করে ধরিয়া উঠাইল এবং বিনয়-বচনে

বলিতে লাগিল,—দেখুন, ইহাতে আমার অপরাধ কিছুই নাই। ঐ বালকগণ সর্ব্বদাই আমাকে উদ্বেগ দেয়, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারেন, আমি তজ্জন্য উহাদিগকে কিছুই বলি না। তবে আমরা নাকি সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীহরিরই একান্ত আশ্রিত, তাই তিনিই যদি অন্তরের উদ্বেগ বুঝিয়া কিছু করিয়া থাকেন। ভাল, একবার সেই প্রভুর কাছেই ইহার কথা জানাই; দয়াময় তিনি দয়া করিয়া ইহার প্রাণভিক্ষা দিলেও দিতে পারেন।

এই বলিয়া রঘুদাস নয়ন নিমীলন করিল এবং প্রাণ ভরিয়া প্রভুকে ডাকিতে ডাকিতে বালকের প্রাণ ভিক্ষা করিতে লাগিল। এইরূপ কিছু-ক্ষণ করিবার পর সে যেন অন্তর্যামীর ইঙ্গিত পাইল। সকলকে ডাকিয়া বলিল,—দেখ, তোমরা সকলে মিলিয়া হরি-ধ্বনি দিয়া এই বালককে "উঠ উঠ" বলিয়া ডাক দেখি, প্রভুর নামের মহিমায় এখনই এ বালক প্রাণ পাইয়া উঠিয়া বসিবে।

এই কথা বলাও যা, অমনই সকলে উচ্চকণ্ঠে হরি হরি ধ্বনি করিয়া তাহাকে "উঠ উঠ" বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিল, আর সে-ও অমনি ঘুমভাঙ্গার মত উঠিয়া বসিয়া মাতাপিতা এবং সকলেরই আনন্দ বৰ্দ্ধন করিল। সকলেই অমনি উল্লাসভরে হরি হরি বলিয়া উঠিল। বালকও তাহাদের সহিত হরি হরি বলিয়া রঘুদাসের পদে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। রঘুদাস তাহার দাড়ি ধরিয়া চুমা খাইয়া তাহার পিতা-মাতার সহিত তাহাকে যাইতে বলিল। ভক্ত ও ভগবন্নামের প্রভাব দেখিয়া সকলে মহা বিস্মিত হইল এবং রঘুদাসের মহিমা কীৰ্ত্তন করিতে করিতে নিজ নিজ নিবাসে চলিয়া গেল। রঘুদাসও প্রভুর নাম গুণ গাহিতে গাহিতে গৃহাভিমুখে গমন করিল।

এই কথা মুখে মুখে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। ক্রমে রঘুদাসের

যশে ভুবন ভরিয়া গেল। নিত্য নানা দেশ হইতে শত শত লোক তাহাকে দেখিতে আসে, ধন-রত্ন বসন-ভূষণ দিয়া সম্মানিত করে, আর তাহার সদানন্দ সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দ-মনে গৃহে প্রত্যাগমন করে। রঘুদাসও সেই সকল ধনরত্নাদি দীনদুঃখীকে অকাতরে বিতরণ করে, আর অতিথি-অভ্যাগতের সেবায় ব্যয় করে। তাহার আর কোন বিষয়ের কোন অভাবই নাই।

ভগবদ্ভজনপ্রভাবে তাহার এতই শক্তি বাড়িয়া গেল, সে তখন যাহাকে যাহা বলে, তাহাই সিদ্ধ হইতে লাগিল। ক্রমশ রঘুদাস একজন বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া সে-দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। এইবার তাহার আর বাহিরে থাকা দায়। সর্ব্বদাই লোকসমাগমে ভজন আর হয়ই না। প্রতিষ্ঠাই যে ভজনপথের পরম শত্রু! যে তাহাতে মজে, সে ভজনমার্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। আর যে না মজে, সে ভজনের ধন ভগবান্‌কে লাভ করে। রঘু বড় ভাগ্যবান্, তাই সে শৌকরীবিষ্ঠার মত সেই প্রতিষ্ঠাকে ত্যাগ করিয়া একান্ত স্থান আশ্রয় করিল। আর বড় কেহ তাহার দেখা পায় না। সে সেই নিভৃত স্থানে বসিয়া অন্তরে অন্তরে প্রাণারাধ্য দেবতার সময়োচিত সেবা করে আর নীরবে নয়ন-নীর বিসর্জ্জন করিতে থাকে।

এইরূপে কিছুদিন যায়। একদিন হইল কি? তাহার কেমন মনে হইতে লাগিল;—নীলাচলনাথ জগন্নাথ যেন তাহার কাছে কিছু খাইতে চাহিতেছেন। তাহার আর আনন্দ ধরে না। সে সেই নিভৃত স্থানে অবস্থোচিত সামান্য আহার্য্য লইয়া তাঁহার উদ্দেশে নিবেদন করিতে বসিল। ভগবান্ তো ভক্তেরই অধীন। ভক্ত অন্তরে অন্তরে তাঁহাকে ডাকিবামাত্র তিনি তথায় আগমন করিলেন। দেখিয়া দাসের বড় আনন্দ হইল। সে প্রভুকে পরমাদরে দিব্যাসনে বসাইল এবং সেই খাদ্যগুলি তাঁহার শ্রীমুখে

তুলিয়া তুলিয়া দিতে লাগিল, আর তিনিও তাহা হাসিতে হাসিতে আহার করিতে লাগিলেন।

এদিকে হইয়াছে কি? ঠিক ঐ সময় পুরীর মহারাজ শ্রীপ্রভুর সেবার নিমিত্ত নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য সেবক-হস্তে ভোগমণ্ডপে প্রেরণ করিয়াছেন। ভোগমণ্ডপ হইতে প্রভুর মূল-মন্দির অনেকটা দূরে। তাই তথায় দর্পণে প্রভুর প্রতিবিম্ব ধরিয়া ভোগ নিবেদিত হইয়া থাকে। পূজাপণ্ডা ভোগ নিবেদন করিতে বসিলেন। কিন্তু দর্পণে আর প্রতিবিম্ব পড়ে না। বারংবার ধ্যান করেন, কতমত প্রার্থনা করেন, অবুও দর্পণে প্রভুর প্রতিবিম্ব পরিলক্ষিত হইল না। শেষে তিনি হতাশ হইয়া নৃপতিকে তাহা জানাইলেন। বলিলেন,—মহারাজ! এ নৈবেদ্যে নিশ্চয়ই কোন দোষ হইয়াছে, নচেৎ প্রভু ইহা অঙ্গীকার করিলেন না কেন? এ সকল সামগ্রী এখনই মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করিতে করিবে। শুনিয়া মহারাজ যার-পর-নাই দুঃখিত হইলেন এবং গরুড়স্তম্ভের পশ্চাতে কুশাসন বিছাইয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। কেবলই মনে মনে বলেন,—হায় প্রভু! এতই কি অপরাধ করিয়াছি, আমার উপহৃত কিছুই কি তোমায় উপযোগ করিতে নাই? আমার কৃত অপরাধ কি সকল সামগ্রীই অপবিত্র করিয়া দিয়াছে? দয়া করিয়া বলিয়া দাও,—কি প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিলে এই অপরাধ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি। নচেৎ এ প্রাণ আর রাখিব না।

সর্ব্বান্তর্য্যামী তাহা জানিলেন। তিনি স্বপ্নমার্গে মহারাজকে দেখা দিয়া বলিলেন,—রাজন্, তুমি দুঃখ কর কেন? আমি কি আর নীলাচলে আছি যে, দর্পণে আমার দেখা পাইবে, না, আমি তোমার উপহারই আহার করিব? আমি যে এখন পিপিলীগ্রামের রঘুবেহেরার গৃহে ভোজনকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছি। সে জাতিতে ধীবর হইলে কি হয়, সে যে আমায় বড় ভাল বাসে,—প্রাণের অপেক্ষা সকলের অপেক্ষা ভাল বাসে। সে না

ছাড়িয়া দিলে তো আমার আর আসিবার যো নাই,—তোমার সামগ্রী খাইবারও উপায় নাই। হয় তো তুমি বলিবে,—তোমার এ রাজভোগের অপেক্ষা দরিদ্র ধীবরের সামান্য উপহারের কি এতই আকর্ষণ? হাঁ, তা-ই,—সত্যই তা-ই।—

"মূল মো ভগতর ভাব। এ দ্রব্য মোর কিস হেব॥
ভগত রেণুমাত্র দেলে। তাহা মুঁ মনে মেরু-তূলে॥
ভাব ন থাই যে ভোজন। সে মেরু-তূলে দেবা ধন॥
সে মোতে অটই কিঞ্চিত। শ্রদ্ধা ন থাই যার চিত্ত॥"

মহারাজ! আমি উপহৃত সামগ্রীর ভাল মন্দ কিছুই বিচার করি না. দেখি কেবল নিবেদকের ভাব। তোমার ঐ ভাবশূন্য সামগ্রীতে আমার কি হইবে বল? ভক্তের ভাবই হইতেছে আমার প্রধান আকর্ষণ। ভক্ত যদি রেণুপরিমিত সামগ্রী আমাকে অর্পণ করে, আমি তাহা সুমেরুর সমান মনে করিয়া থাকি। আর যাহার অন্তরে শ্রদ্ধা নাই, সে যদি সুমেরুতুল্য সুবর্ণে মোড়া রাশিরাশি ভোজ্য আমাকে নিবেদন করে, আমি তাহার সেই ভাব-বিহীন ভোজ্যকে একটা যা তা কিছু বলিয়া মনে করি। সে আর আমায় কি আকর্ষণ করিবে বল? তবে তুমি যদি তোমার খাবারগুলি আমাকে খাওয়াইতেই চাও তবে এক কার্য্য কর। এখনই সেই পিপিলী-গ্রামে গমন কর, আমার ভক্ত রঘুদাসকে মাতা ও বনিতার সহিত এখানে আনয়ন কর; তাহাকে আমার এই ক্ষেত্রবরে বাস করাও; তাহা হইলেই আমি আনন্দমনে তোমার উপহার আহার করিব।

এই বলিয়া ভগবান্ অন্তর্দ্ধান করিলেন। নৃপতিও তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক পিপিলীগ্রামে গমন করিলেন। তিনি আপনিই রঘুদাসের দ্বারে গিয়া ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিলেন। সে কথা তখন শুনে কে? রঘুদাস যে তখন সেবকবৎসলের সেবানন্দেই বিভোর হইয়া

হইয়া আছে। সেবানন্দ তো সামান্য আনন্দ নয়। সে যে আত্মানন্দেরও অনেক উপর। সেই আনন্দে নিমগ্ন হইয়া রঘুদাস আপনাকে পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার কাণে তখন বাহিরের কোন কথা প্রবেশ করিতে পারে কি ?

অনেক ডাকাডাকিতেও সাড়াশব্দ না পাইয়া নরনাথ তাহার মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গিয়া দেখেন,—আহা হাহা, সে পুলকিত-কলেবরে প্রফুল্ল-বদনে বসিয়া আছে। হস্তে খাদ্য, যেন কাহার মুখে তুলিয়া দিতেছে। কিন্তু সে মুখখানি যেন এখানে থাকিয়াও এখানে নাই। সে মুখখানি যেন কি-জানি কি আবরণে ঢাকা, সেই আবরণটুকু অতিক্রম করিতে না পারিলে যেন তাহা আর দেখিবার যো নাই। এখানকার সকল দেখা যে ছাড়িয়া দিতে পারিয়াছে, সে-ই যেন এখানে থাকিয়াও তাহাকে দেখিতে পায়! তাই রঘুদাস সেই বদনখানি দেখিতে পাইলেও রাজা তাহা দেখিতে পাইলেন না।

এদিকে নৃপতিকে আগমন করিতে দেখিয়া শ্রীপতিও রঘুদাসের সোহাগের সেবা ছাড়িয়া সরিয়া পড়িলেন। রঘুদাসও অমনি—"কই প্রভু! কোথায় গেলে" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পৃথিবীতে পড়িয়া গেল, আর তাহার নয়ন দিয়া পিচকারীর মত অশ্রুবারি ছুটিতে আরম্ভ করিল। মহারাজ তাহা দেখিয়া মনে মনে বলিলেন,—হাঁ, এমন না হইলে কি আর প্রভু আমার নীলাচল ছাড়িয়া—রাজভোগ উপেক্ষা করিয়া এতদূরে ধীবরের গৃহে আগমন করেন? তিনি অমনি আথালি পাথালি করিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া ধরিলেন। বলিলেন,—আহা আহা, আমার জীবন জুড়াইয়া গেল গো জুড়াইয়া গেল। ধন্য রঘুদাস! ধন্য তুমি, ধন্য তোমার জীবন! আহা, তুমি এ হরি-বশ-করার মন্ত্র পাইলে কোথা হইতে? তুমি যে সেই বিশ্বপতিকে একেবারে বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছ

দেখিতেছি। তা, আমি আর তোমায় ছাড়িতেছি না। চল, আমার সঙ্গে সপরিবারে নীলাচলে চল, তোমার অনুগত হইয়া যদি তাঁহার কৃপা অধিকার করিতে পারি।

ভগবান্‌কে হারাইয়া রঘুদাস তখন এরাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। নরনাথের এখনকার সকল কথাই তাহার কর্ণপথে প্রবেশ করিল। নীলাচল-নায়কের বিরহতাপে তাহার প্রাণ তখন উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাই সে নৃপতির প্রস্তাবে অসম্মত হইল না। এদিকে মহারাজের পরিচারক-বর্গ সুসজ্জিত হস্তী এবং নরযানাদি লইয়া রঘুদাসের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। মহারাজ তাহাকে বেশভূষায় বিভূষিত করিয়া হস্তীর উপর আরোহণ করাইলেন এবং নিজেই তাহার মাহুত হইয়া বসিলেন। রঘুদাসের জননী ও পত্নী নরযানে যাইতে লাগিল। সে এক মহা হর্ষ-কোলাহলের মধ্যে নৃপতি সকলকে লইয়া নীলাচলে আসিয়া প্রবেশ করি-লেন। তাহাদের দেউলে লইয়া গিয়া শ্রীপ্রভুকে দর্শন করাইলেন। এইবার ভোগমণ্ডপে দর্পণে প্রভুর প্রতিবিম্ব পড়িল। পূজাপণ্ডা প্রীতমনে প্রভুকে সেই সমস্ত নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া দিলেন। চারিদিক হইতে অমনি ভক্তবৎসল প্রভুর ও তাঁহার ভক্তের জয়জয় রব উত্থিত হইল। মহারাজ শ্রীপ্রভুর শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ-পার্শ্বে তাহাদের থাকিবার একটী সুন্দর বাটী—সর্ব্ববিধ উপকরণে সুসজ্জিত করিয়া দান করিলেন এবং প্রতিদিন প্রভুর প্রসাদ পাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তাহারাও পরমানন্দে প্রভুর ভজন ও সজ্জন সেবন করিয়া জীবন যাপন করিতে লাগিল। ভগবদ্ভক্তের আনন্দ উভয় লোকেই সমান। তাই তাহারা উপযুক্তকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া পরলোকেও পরমানন্দ অধিকার করিয়া বসিল।

গোপাল

গোপাল নামেও যা কাজেও তা,—গো-পালনই তাহার কার্য্য। গোঁয়ারের একশেষ। শৌচ-সদাচার নাই, আহারের বিচার নাই, ধর্ম্মকথা ভুলিয়াও শ্রবণ করা নাই। সারাদিনই গোষ্ঠে থাকে,—গোরুর সঙ্গে ঘুরে ফিরে। বাড়ী প্রায় আসে না। স্ত্রী-পুত্রাদিই তথায় গিয়া অন্ন যোগাইয়া আসে। এক কথায় বলিতে গেলে, সে পশুর সঙ্গে পশুরই মত বিচরণ করে।

কমলাবতীপুর উত্তরখণ্ডের একটী প্রসিদ্ধ স্থান। সেখানে সর্ব্বদাই বিবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতেছে, শাস্ত্রব্যাখ্যা হইতেছে; সেই দেশে বাড়ী হইলেও গোপাল সেই সব স্থানে যায় না, সংসারেরও কাজকর্ম্ম দেখে না। গুণের মধ্যে—তাহার একটা ধারণা আছে যে, শ্রীহরির নাম পরম মঙ্গল-স্বরূপ। তাই সে এক-আধবার হরিনাম উচ্চারণ করিয়া থাকে। তা-ও সকল সময় নয়, জ্ঞানতও নয়। হয় তো হাই তুলিবার সময়, নয় তো অবসন্ন-দেহে বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিবার সময় অন্যমনস্কভাবেই তাহার হরি-বলা হইয়া থাকে।

দেখিতেদেখিতে তাহার বয়স পঞ্চাশ পার হইয়া গেল। সমবয়স্কেরা সকলেই তাহাকে উপহাস করে, টিট্‌কারি দেয়, উপদেশও প্রদান করে,—হাঁ হে, তোমার জীবনের তো অর্দ্ধেক কাবার হইয়া গেল, আজিও তুমি গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলে না, হরি ভজনও করিলে না; দুনিয়ায় আসিয়া তরিবার কি ঠাওরাইয়াছ বল দেখি? জাননা কি, ভবপারের কর্ণধার হইতেছেন একমাত্র গুরু। তিনি তোমার কর্ণে ধরিয়া মন্ত্রবর্ণ

না বলিলে তুমি তরিবে কি প্রকারে ? ভগবানের শ্রীমুখের বাণী কি শুন নাই ?. তিনি বলেন,—এই মানবদেহ সকল দেহের শ্রেষ্ঠ দেহ। দেহ তো নয়, এ যেন একখানি সুগঠিত তরণী। এই তরণীখানির সাহায্যেই তোমায় ভবপারে যাইতে হইবে। আজ তুমি বহুভাগ্যে ইহাকে পাইয়াছ। তাই ইহা সুদুর্ল্লভ হইয়াও তোমার কাছে সুলভ হইয়াছে। দাঁত থাকিতে তো কেহ দাঁতের মর্য্যাদা বুঝে না, তাই তুমি এই দেহের দুর্ল্লভতা বা উপাদেয়তা বুঝিতে পারিতেছ না। কিন্তু তোমায় এই দেহ থাকিতে-থাকিতে উহার সাহায্যে ভবপারে চলিয়া যাইতে হইবে। এ দেহ একবার হাতছাড়া হইলে,—মরণের হাতে চলিয়া গেলে, আর যে তুমি ইহাকে পাইবে সে পক্ষে বিশেষ সন্দেহ। তাই তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে, যত সত্বর সম্ভব এই দেহের সাহায্যে ভবপারে চলিয়া যাওয়া। নৌকা নাকি নিজে নিজে পারে যাইতে পারে না, তাই তাহার একজন কাণ্ডারী চাই। এ দেহতরীর কাণ্ডারী হইতেছেন গুরু। যে কাণ্ডারী ছাড়িয়া নৌকাকে পরপারে লইয়া যাইতে চায়, তাহার আর বিপদের অবধি থাকে না। প্রায় তাহাকে তরী ও পণ্যের সহিত প্রাণ হারাইতে হয়। তাই এই কর্ণধারের প্রয়োজন। তুমি গুরুকে কর্ণধার কর, তাঁহার কাছে ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহারই নির্দ্দেশমত তরীখানি চালাইতে দাও, আর তোমার চিন্তা নাই, ঝড়ঝাপ্‌টারও ভয় নাই, আমি অমনি অনুকূল বাতাস হইয়া তরীর সকল বাধা সকল বিঘ্ন কাটাইয়া দিয়া তাহাকে পরপারে পঁহুছাইয়া দিই। ক্লেশ তো তোমার দূরের কথা, তুমি জানিতেও পারিবে না যে, তুমি কেমন করিয়া পারে আসিলে। তুমি তখন দুরন্ত দুঃখের দ্বিতীয় মূর্ত্তি ভব-বারিধি পার হইয়া নিত্যানন্দের নিত্য-নিবাস আমার আবাসে গিয়া আমার সহিত মিলিত হইবে,—দুঃখের সম্বন্ধ তোমার চিরতরে ঘুচিয়া যাইবে। মনুষ্য-শরীর পাইয়া তুমি যদি এ কার্য্য না কর, তবে তোমার

নাম হইবে—আত্মঘাতী। তোমাকে সেই নিবিড়-তমসাচ্ছন্ন অসুরলোকে যাইয়া অবস্থান করিতে হইবে।

ভাই গোপাল! এই তো হইল ভগবানের কথা, মানুষ হইয়া এ কথা কি কাহারও উপেক্ষা করা উচিত? তুমি আর বিলম্ব করিও না, যত সত্বর সম্ভব গুরুপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ কর।

গোপাল তাহাদের কথা শুনে, আর হাসে, হাসিতে হাসিতে বলে,—না ভাই, আমায় আর ও সব কিছু করা হবে না; গুরুর কাছে কাণ ফুঁকাইলেই তো তোমাদের মত টিপ্ টিপ্ করিয়া তাঁহার পায়ে মাথা কুটিতে হইবে? ও কাজ আমার দ্বারা কিছুতেই হইবে না। কাহারও কাছে মাথা নোয়ানো আমার ধাতে সহিবে না।

গোপালও মন্ত্র লইবে না, বন্ধুবান্ধবেরাও বলিতে ছাড়িবে না। তাহারা তাহাকে দেখিলেই বলে,—

"শ্রীগুরুমন্ত্র বিনা জান। তো পিণ্ড হেলা অকারণ॥
নরকে পড়িবু তু যাই। তারিবা পথ আউ নাহিঁ॥

ওহে, শ্রীগুরুদত্ত মন্ত্রবিনা তোমার দেহ বৃথা হইয়া গেল। নরকপাত তোমার নিশ্চিত। আর তোমার তরিবার অপর পথও নাই

এইরূপেই কিছুদিন যায়। গোপাল তাহাদের কথা শুনে আর ভাবে। একদিন তাহার কেমন মন হইল, সে তাহাদিগকে বলিল—আচ্ছা, তোমরা বলিতেছ, আমি মন্ত্র গ্রহণ করিব। কিন্তু মন্ত্র-গ্রহণের পর আর আমার গুরুর সহিত দেখা-সাক্ষাৎ হইলে চলিবে না। আমি তো বলিয়াই রাখিয়াছি, আমি অত দণ্ডবৎ করিতে কিছুতেই পারিব না।

বন্ধুরা বলিল,—তা বেশ, তুমি দীক্ষা গ্রহণ করিলেই আমরা খুসী। তা, তুমি এমন ফরমাজী গুরু পাইবে কোথায়? গোপাল বলিল,—তার আর কি, এই পথে কত লোক তো যাওয়া-আসা করিতেছে, তাহাদের

মধ্যে যাহাকে দেখিলে ভক্তি হয়, এমন কোন ভাল বৈষ্ণব যদি দেখিতে পাই, তাহাকেই গুরু করিব। এক পাত্র দুগ্ধ দক্ষিণা দিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিব। তিনি সেই দুগ্ধটুকু পান করিয়া চলিয়া যাইবেন। আমার সহিত আর দেখা-শুনা হইবে না। মাথা নীচু করার দায় হইতে আমি বাঁচিয়া যাইব। মন্ত্রও লওয়া হইবে।

উত্তরে বন্ধুরা বলিল,—ভাল, তুমি না হয় দীক্ষাই গ্রহণ করিলে, কিন্তু মাঝেমাঝে গুরুর দেখা না পাইলে শিক্ষা পাইবে কি প্রকারে? সে বলিল,—আমি শিক্ষাটিক্ষা অত শত জানি না। গুরুকে বলিব,—আপনি আমাকে একটা কথা যাহা হউক কিছু বলিয়া দিয়া যান, আমি নিয়মপূর্ব্বক তাহাই অনুষ্ঠান করিব। বেশী বাড়াবাড়ি আমার দ্বারা হইবার নয়। গুরুর সেই একটা আদেশ পালন করাতে যদি কিছু হইবার হয় হইবে। নচেৎ আমি অপারগ। বন্ধুরা তাহার কথা শুনিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল। সে-ও গোষ্ঠে গিয়া গোচারণে নিযুক্ত হইল।

বলিতে কি, এইবার সত্যসত্যই তাহার গুরুমন্ত্র-গ্রহণের জন্য একটা ব্যাকুলতা জন্মিল। কে যেন তাহার প্রাণেপ্রাণে সদাই বলিতে লাগিল,—এ সংসারে আসিয়া কোন্ কাজেই না গুরুর আবশ্যক? কাহারও উপদেশ না পাইলে কি তুমি গোপালনই করিতে পারিতে? তবে যেরূপ কার্য্য তাহার গুরুও সেইরূপ হওয়া চাই। তুমি আর দেরি করিও না, শীঘ্র গুরুমন্ত্র গ্রহণ কর—গুরুমন্ত্র গ্রহণ কর।

এতদিন সে একমাত্র গোচারণ ছাড়া আর কিছুই করিত না, কিন্তু এইবার তাহার আর একটা কাজ বাড়িয়া গেল। সে যখন-তখন রাজ-পথে যাইয়া থাকে, আর পিপাসিত-নয়নে চাহিয়া চাহিয়া দেখে, কোন সদ্‌বৈষ্ণব আসিতেছেন কিনা। কখনও বা পথিকসকলকে আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করে, হাঁ, গা, এই পথে আসিতেআসিতে কোন ভাল বৈষ্ণব

দেখিয়াছ কি? কখনও বা অধীর হইয়া বৃক্ষের উপর আরোহণ করিয়া চারিদিক্ নিরীক্ষণ করে,—কোথাও কোন বৈষ্ণব দেখিতে পাওয়া যায় কি না?

মন যখন তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে, তখন আর গুরু জুটিতে দেরী হইল না। লোক-লোচনের অন্তরালে রহিয়া সকলের অন্তরের যিনি কলকাটি নাড়িতেছেন, তিনি এক মহানুভব বৈষ্ণবের অন্তরের কল কেমন একটু নাড়িয়া-চাড়িয়া দিলেন। তিনিও অমনি যেদিকে সেই গোপাল ব্যাকুল-প্রাণে সদ্‌গুরুর প্রতীক্ষা করিতেছিল, সেই দিকেই চরণ চালন করিলেন।

গোপালের এখন সততই ছম্‌ছমে ভাব, ঐ কে যেন আসিতেছেন—আমার ভবপারের কাণ্ডারী সদ্‌গুরু বুঝি শুভাগমন করিতেছেন। একদিন সে গোষ্ঠে গো-দোহন করিতেছে, আর ব্যাকুলপ্রাণে সদ্‌গুরুলাভের কথা ভাবিতেছে, এমন সময় সেই শান্ত সৌম্য বিনয়বিনম্র বৈষ্ণব সেইদিকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়াই কি-যেন-কি এক আকর্ষণে দুগ্ধ দোহন দূর করিয়া দিল এবং তাড়াতাড়ি তাঁহার উদ্দেশে ধাবিত হইল। হস্তে রহিল কেবল একভাণ্ড দুগ্ধ এবং তাহার চিরসহচর লগুড়। সে দৌড়ায় আর ডাক পাড়ে—"আরে ও ঠাকুর! দাঁড়াও—দাঁড়াও"।

গোপালের গলার আওয়াজ তো যেমন তেমন নয়, বজ্রও বোধ হয় গলাবাজিতে তাহার কাছে হার মানিয়া যায়। সেই আওয়াজ শুনিয়া সেই বৈষ্ণব অমনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। চক্ষের নিমেষ না পড়িতে-পড়িতে গোপালও আসিয়া তাঁহার পদতলে দণ্ডবৎ পতিত হইল। সরল ভাবেই বলিল,—গোঁসাই হে, তুমি আমায় পার করিয়া দাও। নাও এই দুগ্ধটুকু পান কর, আর আমার কর্ণে কৃষ্ণমন্ত্র দিয়া চলিয়া যাও। এই চরণ চাপিয়া ধরিলাম, দীক্ষা না দিলে কিছুতেই ছাড়িয়া দিব না।

বৈষ্ণব তো ব্যাপার দেখিয়া অবাক্। কি বলেন, কি করেন, কিছুরই ঠিক নাই। কিন্তু তাহার ভাব দেখিয়া তিনি করুণা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। আহা, তাহার নয়ন দিয়া নির্গত অশ্রুই যে তাহার অন্তরের কথা তাঁহাকে মুখের কথার চেয়ে বেশীবেশী জানাইয়া দিল।

বৈষ্ণব বলিলেন,—বৎস! উঠ, পা ছাড়িয়া দাও। চল,—তোমার ভবনে চল, নিভৃত পবিত্র স্থানে বসিয়া তোমাকে মন্ত্র দান করিব। দেখিতেছি, তোমার স্নানাদি কার্য্য কিছুই হয় নাই; তাহাও তো করিয়া লইতে হইবে?

গোপাল বলিল,—ঠাকুর! আমি গোঠে থাকি গরু চরাই—এই মাত্র জানি; বাড়ী-টারীর বড় ধার ধারি না, স্নান-শৌচেরও তত খবর রাখি না। তুমি এইখানে এই ক্ষণেই আমাকে দীক্ষা দাও, নচেৎ আমি আত্মহত্যা করিব। না দাও তো তোমারও ভাল হইবে না, এই লগুড় দেখিতেছ ত, ইহার আঘাতেই তোমায় সাবাড় করিয়া দিব।

এই সাংঘাতিক ভক্তির কথা শুনিয়া বৈষ্ণব তো শিহরিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন,—এ তো গোঁয়ার গোয়ালা, কি করিতে কি করিয়া ফেলিবে কিছুই বলা যায় না, তা এইখানেই ইহাকে দীক্ষিত করিয়া চলিয়া যাই। প্রকাশ্যে সহাস্যমুখে বলিলেন,—দেখ বৎস, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে, এইখানেই তোমায় দীক্ষিত করিব, কিন্তু তোমাকে আমার কাছে একটী সত্য করিতে হইবে যে? সে বলিল,—আজ্ঞা করুন। বৈষ্ণব বলিলেন,—তোমাকে দীক্ষা দিলেই তো আমি তোমার গুরু হইব; তখন আমি তোমায় যাহা যাহা করিতে বলিব, তাহা তো তোমায় করিতে হইবে? গোপাল বলিল,—নিশ্চয়ই করিতে হইবে আর করিবও; কিন্তু বেশী বাড়াবাড়ি করিলে চলিবে না; একটা যাহ হয় কিছু করিতে বলিবেন; তাহাই কায়মনোবাক্যে করিয়া যাইব। পাষাণের রেখার মত তাহার

আর নড়চড় হইবে না। এই তো সত্য করিলাম ঠাকুর, এইবার দয়া করুন দীক্ষা দিন।

গোপনন্দনের অকপট-কথায় বৈষ্ণব বড় আনন্দিত হইলেন। গোবিন্দ স্মরণ করিয়া সেইখানেই তৃণের উপর উপবেশন করিলেন। মানসেই আসনশুদ্ধি প্রভৃতি সারিয়া ফেলিলেন। স্নেহার্দ্রস্বরে তাহাকে বলিলেন,—এস বৎস! এস, তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া দিই। এই বলিয়া বৈষ্ণববর তাঁহার কমণ্ডলু হইতে তীর্থবারি লইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে সিঞ্চন করিলেন। দ্বাদশ অঙ্গে দ্বাদশ তিলক করিয়া দিলেন, মুখে ভগবানের নির্ম্মাল্য অর্পণ করিয়া কর্ণে কৃষ্ণমন্ত্র প্রদান করিলেন। বলিলেন,—বৎস! তুমি কৃতার্থ হইলে, আর তোমার চিন্তা নাই, কেবল একটী কার্য্য করিও,—যাহা কিছু আহার করিবে, তাহা অগ্রে গোবিন্দকে নিবেদন করিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং আহার করিবে। আর আমার তোমাকে বলিবার কিছুই নাই, এখন তুমি যথেচ্ছ গমন করিতে পার।

গোপাল তাঁহার চরণে ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিল,—তাহাই হইবে গোঁসাই! তাহাই হইবে। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যে গোবিন্দকে নিবেদন করিয়া খাইতে বলিলেন, তিনি থাকেন কোথায়, আর দেখিতেই বা কি প্রকার? বৈষ্ণব বলিলেন,—

"সকল ঘটে বাস তাঁর। পূরিচ্ছি সংসার-যাকর॥
যহিঁ খোজিলে তহিঁ অচ্ছি। অপূর্ব্ব রূপ সে শ্রীবচ্ছি॥
নীল-জীমূত কলেবর। রাজীব-লোচন সুন্দর॥
পূর্ণচন্দ্রমা-প্রায়ে মুখ। দেখিলে চ্ছাড়ি যিব দুঃখ॥
বিম্ব-বিদ্রুম-রঙ্গাধর। পীতবসন বেণুধর॥
ক্ষেমকিঙ্কিণী কটিমাঝে। চরণে নূপুর বিরাজে॥"

বৎস রে! তিনি সকল ঘটেই বাস করেন। সকল সংসার তাঁহাতেই পরিপূর্ণ। তুমি তাঁহাকে যেখানে খুঁজিবে সেইখানেই দেখিতে পাইবে।

আহা, সেই শ্রীবৎসলাঞ্ছন শ্রীহরির রূপ অতি অপরূপ। নীল জলধরের ন্যায় তাঁহার শ্রীঅঙ্গের বর্ণ। প্রফুল্ল পঙ্কজের মত সুন্দর আয়ত লোচন-যুগল। পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রমার ন্যায় সুধাঢলঢল বদনখানি। দেখিলে সকল দুঃখ দূর হইয়া যায়। বিম্ব (তেলাকুচা) ও বিদ্রুমের মত সুরঙ্গ অধর, তাহাতে মুরলী বিন্যস্ত। পরিধানে পীতবাস। কটিমাঝে স্বর্ণ-কিঙ্কিণী, আর চরণে নূপুর বিরাজিত। তুমি এইরূপ চিন্তা করিয়া যেথানে ইচ্ছা তাঁহাকে খাদ্যসামগ্রী নিবেদন করিয়া দিবে, তাহার পর স্বয়ং আহার করিবে; ইহাই আমার আজ্ঞা। যাও বৎস! তোমার মন্ত্রসিদ্ধি হউক। এই বলিয়া তিনি দুগ্ধভাণ্ড লইয়া গমন করিলেন। গোপালও তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া আনন্দমনে গোষ্ঠে গমন করিল।

গোপালের পত্নীপুত্রাদি এ সকল ব্যাপার কিছুই জানে না। সেদিন তাহার পত্নীই তাহার জন্য অন্নব্যঞ্জন লইয়া আসিল এবং সম্মুখে রাখিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। গোপাল যেন আজ কিছু বেশীবেশী অন্যমনস্ক, সে কেবল সেই গোবিন্দের কথাই ভাবিতেছিল। ভাবিতেছিল,—গুরু যে বলিয়া গেলেন,—শ্রীহরি সর্ব্বঘটে সর্ব্বদাই বিরাজমান, সকল স্থানে তিনি সকল সময়েই সমভাবে অবস্থান করেন, তবে কেন আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই না? ভাল, ওই গুরু যেমন বলিয়া গেলেন, সেই রূপই একবার ভাবিয়া দেখি না কেন, যদি সেইরূপ ভাবিতে ভাবিতেই তাঁহাকে দেখিতে পাই? এমন সময় তাহার পত্নী আহারের পাত্র সম্মুখে রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেল। গোপালেরও গুরুর আদেশ মনে পড়িয়া গেল। সে সেই অন্নপাত্র লইয়া এক নিভৃত-স্থানে গমন করিল। জল দিয়া স্থানটি সংস্কার করিয়া অন্নপাত্রটি তথায় রাখিয়া দিল। পাত্রের উপর তুলসীপত্র দিয়া নয়ন মুদিয়া গোবিন্দকে নিবেদন করিতে বসিল। কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিল,—গোবিন্দ হে! এই নাও এই অন্নব্যঞ্জন

ভোজন কর, তুমি খাইয়া-দাইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, গুরু আমায় তাহাই খাইতে আদেশ করিয়াছেন। এস প্রভু! আহার কর। তুমি না খাইলে আমি উপবাসী থাকিব—ভারি ক্ষুধা পাইয়াছে, তথাপি উপবাসী থাকিব। এস ঠাকুর, আর বিলম্ব করিও'না; এই অন্নব্যঞ্জন অঙ্গীকার কর।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল, তবুও গোবিন্দ আসিলেন না, অন্নাদিও খাইলেন না। গোপালের ভারি রাগ হইল, দুঃখও হইল। সে সেই অন্নব্যঞ্জন ঝোড়-জঙ্গলে ফেলিয়া দিয়া গোষ্ঠে প্রত্যাগমন করিল। রাত্রে আর বারিবিন্দুও স্পর্শ করিল না; উপবাসেই রহিল। পরদিন তাহার পত্নী অন্ন-ব্যঞ্জনাদি দিয়া গেল। সেদিনও সে ঐরূপ নিভৃত-স্থানে বসিয়া গোবিন্দকে খাওয়াইবার জন্য ডাকাডাকি করিল, সেদিনও সে গোবিন্দকে আসিতে বা ভাত খাইতে না দেখিয়া দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল এবা অন্নাদি দূরে নিক্ষেপ করিয়া গোষ্ঠে ফিরিয়া আসিল। সেদিনও সে উপবাসে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিল। এইরূপে অষ্টাদশ দিবস কাটিয়া গেল। গোবিন্দ আর আসেন না,—অন্নও আহার করেন না। উপবাসে উপবাসে তাহার দেহ দিনদিন ক্ষীণ হইয়া পড়িল। পেটের মাংস পৃষ্ঠে গিয়া ঠেকিল। চোখে ভাল দেখিতে পায় না। দাঁড়াইলে মাথা ঘুরিয়া পড়ে। পত্নী তাহাকে দেহ-দৌর্ব্বল্যের কারণ জিজ্ঞাসা করে, উত্তর কিছুই দেয় না। সে-ও খানিক থাকিয়া চলিয়া যায়, গোপালও গোবিন্দকে অন্ন নিবেদন করিতে গমন করে, আর নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসে। সদাই ভাবে,—মরণ তো একদিন হইবেই, তবে আর গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন করি কেন? গুরু আজ্ঞা সত্য হইলে, এখানে না পাই, গোলকে গিয়াও তো গোবিন্দের দেখা পাইব?

সেদিন সপ্তবিংশতিতম দিবস। তাহার আর চলিবার-ফিরিবার শক্তি নাই। মুখের কথা জড়াইয়া আসিয়াছে, চক্ষে ঘোলা পড়িয়াছে। বুঝি

বা সেই দিনই তাহাকে ইহলোক হইতে বিদায় লইতে হয়। তাহার পত্নী যথাকালে অন্ন-ব্যঞ্জন লইয়া আসিল। পতির অবস্থা দেখিয়া অতিমাত্র চিন্তিত হইয়া পড়িল। জিজ্ঞাসা করিয়া তো উত্তর পায় না, কাছে থাকিতে চাহিলেও তো থাকিতে পায় না, তাই চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া সে চলিয়া গেল। গোপালও গুটিগুটি সেই গুপ্তস্থানে গিয়া গোবিন্দকে অন্ন নিবেদন করিতে বসিল। 'বসিল' বলা বোধ হয় ভুল হইল। কেননা, সেদিন সে আর বসিতেই পারিতেছিল না। সে সেই অন্নব্যঞ্জনের পার্শ্বে সটাং শুইয়া পড়িয়া প্রাণে প্রাণে গোবিন্দকে ডাকিতে লাগিল। ভিতরে যে জলটুকু অবশিষ্ট ছিল, আজ বুঝি তাহার সমস্তটুকুই নয়ন দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। মনে প্রাণে তাহার যতটা বল ছিল, আজ বুঝি তাহা সমস্তটাই তাহার প্রার্থনার সহিত সম্মিলিত হইল। কারণ, সে বুঝিল,—আজিকার প্রার্থনাই তাহার শেষ প্রার্থনা,—তাহার দেহ ইন্দ্রিয় মন-প্রাণ আর তাহার গোবিন্দ-আহ্বানের সহায়তা করিল না। আজ সে একেবারে আপনার হাল ছাড়িয়া দিয়া গোবিন্দ-চরণে সকলই ঢালিয়া দিল। আর কি গোবিন্দ থাকিতে পারেন? তিনি সেই অশিক্ষিত গোয়ালার নিষ্ঠার টানে আকৃষ্ট হইয়া সেখানে আসিয়া দেখা দিলেন। সেই গুরুবর্ণিত রূপ, নবজলধর-বর্ণ, পীত বসন, অধরে মুরলী। আহা আহা, কি সুন্দর কি সুন্দর! দেখিয়া গোপালের মন-প্রাণ আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া পড়িল। তাহার দেহ ইন্দ্রিয় সকলই যেন সজাগ হইয়া উঠিল,—সে কি-এক বলে বলিষ্ঠ হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি নয়ন উন্মিলন করিল। দেখে,—ভিতরে যাঁহাকে দেখিতেছিল, বাহিরেও তিনিই। সে আর থাকিতে পারিল না; অশ্রুর প্রবাহ ছুটাইয়া ছুটিয়া গিয়া তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িল। সে যে তখন কি করিবে কি বলিবে কিছুই ঠিক করিতে পারে না। করুণাময় তাহাকে কোলে করিয়া তুলিলেন। পদ্মহস্তে নয়নজল

মুছাইয়া দিলেন। সুধার রাশি ছড়াইয়া হাসিহাসি-মুখে বলিলেন,—গোপাল রে, তুই আর কাঁদিস্ না ; এই দ্যাখ্ আমি তোর প্রেমেমাখা অন্ন আহার করিলাম। এই অন্নই আমি চাই, এই অন্নই আমি খাই। এই অন্ন তুই নিত্য দিবি, নিত্যই আমি আহার করিব। এখন যা বৎস! গৃহে যা, পত্নী পুত্রাদিকে আনন্দিত কর। আর তোর ভাবনা নাই। ইহজীবন আমার ভজনে যাপন করিয়া পরলোকে আমার সহিত গোলোকে গিয়া মিলিত হইবি।

এই বলিয়া শ্রীহরি হাসিতেহাসিতে অন্তর্হিত হইলেন। গোপাল কত কথা তাঁহাকে বলিব বলিয়া মনে করিল ; কিন্তু জিহ্বার জড়তায় তাহা পারিয়া উঠিল না। সে এতক্ষণ তাঁহার মাধুর্য্য-বারিধি মূর্ত্তির দিকে তাকাইয়াছিল, এখনও সেই তাঁহার শেষ হাসিটুকু যেখানে মিশাইয়া গেল, সেই দিকেই অবাক্ হইয়া তাকাইয়া রহিল। সে যেন তখন কোন যাদুমন্ত্রে অভিভূত। স্বপ্ন কি বাস্তব—কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। কতক্ষণ পরে সে জানে না—তাহার সুখের নেশা কাটিয়া গেল। সে কিছুক্ষণ আকুলি বিকুলি করিয়া কাঁদিয়া গড়াগড়ি দিল। তার পর উঠিয়া সেই সাক্ষাৎ গোবিন্দভুক্ত মহাপ্রসাদ ভোজন করিল। তাহার কি আস্বাদ গো,—সে যেন সুধা দিয়া কি তার চেয়ে আরও সুমিষ্ট সামগ্রী দিয়া মাখা গো! গোপাল খায় আরও গুরুর বলিহারি দেয়,—গোবিন্দের বলিহারি দেয়। কেবলই বলে,—জয় গুরু! জয় গোবিন্দ!

তাহার আহার শেষ হইল। শুধু সাতাইশ-দিবসের নয়, কত জন্ম-জন্মান্তরের ক্ষুধা-পিপাসার শান্তি হইয়া গেল। গুরুর কৃপায় আর গুরুর বাক্যে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় সে ইহলোকেই গোবিন্দকে পাইল,—ইহলোক ছাড়িয়া গোলকে গিয়াও গোবিন্দকে লাভ করিল।

পরমেষ্ঠি সিপুটি

সকল জমিতে সকল ফসল ফলে না। বীজেরা বুঝি আপনার উপযুক্ত জমি আপনারাই ভাল বুঝে? মনের মতন জমি পাইলেই বুঝি তাহারা আপনা-আপনি অঙ্কুরিত হইয়া উঠে,—আপনা-আপনি পত্রে প্রবালে ফুলে-ফলে শোভন লোভন হইয়া উঠে? তাহা না হইলে অমন যে কমল, সে অত উচ্চ ভূমি—পাহাড়-পর্ব্বত ছাড়িয়া নিম্নভূমির জলমধ্যস্থিত পঙ্কের আশ্রয় লইবে কেন? সত্য করিয়া বল দেখি ভাই! ভূমিনিম্নে জলের উপর ঐ যে প্রফুল্ল শতদলগুলি মন্দপবনে আন্দোলিত হইয়া—সোহাগভরে এ ওর গায়ে ঢলিয়া পড়িয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের ছড়াছড়ি করিতেছে, উচ্চ স্থানে হইলে ঐ শোভা কি আরও শতগুণে বর্দ্ধিত হইত না,—শতগুণ অধিক জনে কি উহা উপভোগ করিতে পারিত না? হইলে কি হয়, পঙ্কজ যে পঙ্ককেই প্রীতিনেত্রে দেখিয়া থাকে। পঙ্ক যত কেন নিম্নভূমিতে অবস্থান করুক, যত কেন জলের ভিতরে থাকুক, কমল তাহা দেখে না, তাহার ফুটন্ত সুষমা কেহ দেখিল, কি না-দেখিল, সে তাহার অনুসন্ধানও রাখে না, তাহার কেবল যেমন তেমন করিয়া একটু পঙ্ক পাইলেই হইল; তাহা হইলেই সে কৃতার্থ।

হরিভক্তি-কল্পলতিকাও বোধ হয় এই কমলজাতীয়ই হইবেন। কেননা, জাতি-কুল বিদ্যা-বৈভব প্রভৃতির গর্ব্বে পর্ব্বতের অপেক্ষাও যাহারা আপনাকে অধিক উচ্চ ও মহান্ বলিয়া অভিমান করিয়া বসিয়া আছে, তিনি তাহাদের দিক্‌ও স্পর্শ করেন না। কেবল খুঁজিয়া দেখেন,—কোথায় কে কাঙ্গাল আছে,—জাতি-আদির অভিমানশূন্য দীনের দীন আছে। এই

নিম্নভূমি পাইলেই তিনি আনন্দিত হন। এই নিম্নভূমি পাইলেই নিতি অঙ্কুরিত এবং ফুলে ফলে সুশোভিত হন। তা সকলে তাঁহার শোভা দেখুক, আর না-ই দেখুক।

দিল্লী-সহরে সহস্রসহস্র সমৃদ্ধ ব্যক্তি, সহস্রসহস্র আমীর-ওমরাহ, সহস্রসহস্র জ্ঞানী গুণী, কিন্তু ভক্তিদেবীর দেখা কোথাও পাওয়া গেল না, পাওয়া গেল কিনা, দরিদ্র দর্জ্জি পরমেষ্ঠি সিপুটির পরিবারে।

পরমেষ্ঠি সিপুটির একটু পরিচয় দিই। বেচারি সিপুটিগিরি—দর্জ্জিগিরি কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বর্ণজ্ঞানহীন মূর্খ। দেখিতেও যারপরনাই কদর্য্য। অন্ধকারের মত বর্ণ। তার উপর আবার পৃষ্ঠের উপর প্রকাণ্ড কুঁজ। কিন্তু হইলে কি হয়, ভক্তিদেবীর প্রভাবে সে যেন বর্ণচোরা আম' ;—উপরে কালো, কিন্তু ভিতরে মধুরসে ভরপূর। তাহার গুণের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। বলিতে গিয়া কেবলই কবি কালিদাসের বর্ণনা মনে হয়,—"দূরীকৃতা খলু গুণৈরুদ্যানলতা বন-লতাভিঃ"। নীচ মূর্খ দর্জ্জি হইলেও সে আপন গুণে অনেক উচ্চশিক্ষিত সদ্বংজাত ব্যক্তিকেও পরাভব করিয়াছিল সে নীচজাতি হইলেও জিতেন্দ্রিয়, দরিদ্র হইলেও দাতা, শ্রমজীবী হইলেও সদানন্দ ছিল। সে মিথ্যা কথা জানিত না, বলিত না ; জানিত বা বলিত কেবল—জগৎ মিথ্যা। সে জীবহিংসা জানিত না, করিত না ; জানিত বা করিত কেবল —অহং-মমের হিংসা। সে এই বিশ্বসংসারের সর্ব্বত্রই ভগবানের দিব্য বিভূতি দেখিতে পাইত। কেবলই মনে করিত,—ভগবান্ বাসুদেবই সকলের প্রভু ; সর্ব্বান্তর্য্যামিরূপে তিনি সকলের মধ্যেই বিরাজমান ; তাঁহার ইঙ্গিতেই চরাচর চালিত হইতেছে ; তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিবার কাহারও সমর্থ্য নাই ; করিতে যাইলেও কল্যাণ নাই। এইরূপ ভাবিতেভাবিতে সে সময়েসময়ে বিভোর হইয়া পড়ে। হয় তো সে

তখন সেলাইয়ের কার্য্য করিতেছে, তাহার হাতের কাপড়,হাতের ছুঁচ-সূতা হাতেই থাকিয়া যায় ; সে যেন তখন এখানে থাকিয়াও এখানে থাকে না। সে যেন তখন একটী ছবির দর্জ্জী। তখন তাহাকে কেমনটী দেখিতে হয় জান ? এই যেন খুব জল-ঝড় হইয়া গিয়াছে, প্রকৃতি স্থির-ভাব ধারণ করিয়াছে, আর যেন জলে-মাখা ফুটন্ত কদম্বফুলটী নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে। তাহার চক্ষের জলে চব্‌চবে পুলকপোরা কলেবরখানি এই রকমই দেখায় বটে।

পরমেষ্ঠির একটী পত্নী, দুইটি কন্যা এবং তিনটী পুত্র। পত্নী বিমলা সুরূপা, গুণেও পতির অনুরূপা। পুত্র-কন্যাগণ পিতামাতার গুণাবলীরই অনুসরণ করিত। সুতরাং সংসারে অশান্তির নামগন্ধ ছিল না। এরূপ সংসারে অন্যের পক্ষে মজিয়া যাইবারই কথা। কিন্তু পরমেষ্ঠির সংসারে আসক্তি একটুও ছিল না। ভগবান্, তাঁহার ভক্ত এবং তাঁহার নামই তাহার একমাত্র আসক্তির সামগ্রী ছিল। বিশেষত ভগবানের নামগানে তাহার আসক্তির মাত্রাটা যেন কিছু বেশীবেশী ছিল বলিয়াই বোধ হয়। সে যখনই অবকাশ পাইত, তখনই ভগবানের নাম গাহিতে আরম্ভ করিয়া দিত। গাহিতেগাহিতে তাহার গলার স্বর গদগদ হইয়া আসিত। স্তম্ভ, স্বেদ, অশ্রু, পুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবে সকল শরীর ভরিয়া যাইত। আহা, তাহার সেই ভাবে-ভরা মূর্ত্তিখানি দেখিলে আর কুঁজো কালা দর্জ্জি বলিয়া মনে হইত না। বরং তাহার সৌভাগ্য শতবার বাঞ্ছা করিতে প্রবৃত্তি হইত।

এদিকে তো গেল এই, আবার তাহার সেলাই-বিদ্যার বাহাদুরী এম্‌নি যে, তাহার হাতের সেলাইকরা জামা, পায়জামা, আংরাখা কিংবা আর কিছু দেখিলে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। এমন বেমালুম সেলাই, এমন ফুলদার সূচীকর্ম্ম করিবার কারিকর বুঝি দিল্লীসহরে আর দুই জন

নাই। তাই সহরের বড়বড় আমীর-ওমরাহ, অধিক কি স্বয়ং বাদশাহ পর্য্যন্ত সকলেই তাহাকে সকল প্রকার সেলাইয়ের কার্য্য করিতে দিতেন এবং যথেষ্ট পুরস্কৃতও করিতেন।

একবার হইয়াছে কি, দিল্লীশ্বর যে যে স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবেশন করেন, তাহার উপরে দুই পার্শ্বে দুইটা 'মুচুলি' (চক্রাকৃতি পাশবালিশ) ছিল। তিনি তাহার উপর দুইটা পা রাখিয়া উপবেশন করিতেন। ঐ মুচুলি দুইটা তাঁহার বেশ পছন্দসই ছিল না। তাই তিনি দুইটা উত্তম মুচুলি প্রস্তুত করাইবার নিমিত্ত ফরমাস দিয়া সাঁচ্চা জরির উৎকৃষ্ট থান তৈয়ারী করাইলেন। সেই থানের উপর আবার সোণার চুম্‌কি আর হীরা-মাণিক-মোতি বসান। দেখিলে দুই দণ্ড চাহিয়া দেখিতে হয়, আর মনেমনে কারিগরের বাহবা দিতে হয়।

পরমেষ্ঠি সিপুটি একে সূচীবিদ্যায় সুনিপুণ, তাহার উপর আবার বিশ্বাসী, সুতরাং দিল্লীশ্বর তাহাকেই ডাকাইলেন। সে সেলাম করিয়া তাঁহার অগ্রে আসিয়া দাঁড়াইল। বাদশাহ আদেশ করিলেন,—দেখ দর্জ্জি! তুমি এই বহুমূল্য বস্ত্রখণ্ড লইয়া যাও, ইহাতে দুইটি মুচুলি সেলাই করিয়া দিবে। দেখো যেন সেলাইয়ের দাগ না দেখা যায়, আর ফুলের কাজের খাসা বাহার হয়। যাও, মনের মত প্রস্তুত করিয়া এখনই আনিতে পারো তো প্রচুর পুরস্কার পাইবে।

"জাঁহাপনার যাহা আদেশ" বলিয়া সেলাম করিতে করিতে পরমেষ্ঠি বিদায় গ্রহণ করিল। বাড়ীতে আসিয়া স্নান-ভোজন সমাপন করিয়া মুচুলি সেলাই করিতে বসিল। দুইটি পা-বালিশ সেলাই করিতে তাহার আর কতক্ষণ লাগিবে বল? অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে মুচুলি দুইটি সেলাই করিয়া আতরমাথা তুলা পূরিয়া ঠিক্‌ঠাক্ করিয়া ফেলিল। খুব দামী আতর, তাহার গন্ধে সেই স্থানটা ভরিয়া গিয়াছে। মুচুলির

উপর মাণিক্-চুম্‌কি ঝক্‌মক্ করিতেছে। তাহার বাহার রাখিবার আর স্থান নাই। পরমেষ্ঠি সেই মুচুলি দুইটা লইয়া দিল্লীশ্বরের কাছে যাইবে কি, তাহা হস্তে লইবা মাত্র এক অপূর্ব্ব ভাবে অভিভূত হইয়া পড়িল।

মুচুলির মনোহর গন্ধ তাহার নাসারন্ধ্রে যতই প্রবেশ করে, মুচুলির চাক্‌চিক্যচ্ছটা যতই তাহার নয়নপথে পতিত হয়, সে ততই ভাবে,—হায়, এই অতুলনীয় মুচুলি কি কখনও সামান্য মানবের উপভোগ্য হইতে পারে? দেবাদিদেব বাসুদেব জগন্নাথই ইহা ভোগ করিবার একমাত্র অধিকারী। এমন জিনিষ তাঁহাকে হাতে তুলিয়া দিতে না পারিলে কি আর হাতেরই সুখ, না মনেরই সুখ? হায় জগবন্ধু, এ তো আমার নিজস্ব নয়, আমি আর তোমায় কি বলিব?

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল। তাহার দেহে আত্মবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া গেল। ইন্দ্রিয় সকল থাকিয়াও নাই, কেহ কিছু দেখে না শুনে না—কিছুই করে না;—মনও তাহাদিগকে কিছুই করিতে ইঙ্গিত করে না। সে যেন তখন এখানে থাকিয়াও এখানে নাই,—এখানকার সুখ-দুঃখের অতীত আর কোথাও চলিয়া গিয়াছে।

সেই অবস্থায় সে দেখিতেছে কি? বহুদিন পূর্ব্বে সে একবার ৺পুরীধামে রথযাত্রা দেখিতে গমন করিয়াছিল। সে সেই সময় শ্রীজগন্নাথ-দেবের "পহণ্ডী-বিজয়"—অর্থাৎ 'চলি চলি পা পা' করিয়া চলিয়া গিয়া রথে চাপা দেখিয়াছিল। সে এখন তাহাই দেখিতেছে। সেই যেন সেবকগণ শ্রীজগন্নাথকে পট্টডোরি দিয়া বাঁধিয়া উল্লাসভরে লইয়া চলিয়াছেন। চারিদিকে জয়জয় হরিহরি ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। দুন্দুভি-নিনাদে দিগ্‌দিগন্ত ভরিয়া গিয়াছে। শতশত শ্বেত চামর চালিত হই-তেছে। সেবকবৃন্দ পরমানন্দে একএকটি পট্টবস্ত্রের মুচুলি পাতিয়া দিতে-ছেন, আর শ্রীজগন্নাথ হেলিয়া দুলিয়া একটি মুচুলি হইতে আর একটি

মুচুলির উপর গমন করিতেছেন। কঠিন আঘাত পাইয়া মুচুলিগুলি ফাটিয়া-ফুটিয়া যাইতেছে, আর তাহার ভিতর হইতে তুলাগুলি বাহির হইয়া উড়িয়া উড়িয়া যাইতেছে।

দৈবগত্যা সেই দিনও রথযাত্রা, আর পরমেষ্ঠি যখন দিল্লীসহরে বসিয়া শ্রীজগবন্ধুর পহণ্ডী-বিজয়লীলা দর্শন করিতেছিল, তখন শ্রীনীলাচলেও শ্রীজগবন্ধুর পহণ্ডী-বিজয়-লীলা হইতেছিল। ভাববিভোর পরমেষ্ঠি সেই লীলায় এতদূর আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহার মনে হইতে লাগিল,— সে যেন ঠিক সেই নীলাচলেই লীলাময় প্রভুর পার্শ্বেই রহিয়াছে।

এমন সময় নীলাচলে হইয়াছে কি? শ্রীজগবন্ধুর একটি পট্ট-মুচুলি বেজায় ফাটিয়া গিয়াছে, ঘটনাচক্রে সেবকগণের অন্য মুচুলি যোগাইতে একটু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। ভাবাবিষ্ট পরমেষ্ঠি তাহা দেখিল। সে আর থাকিতে পারিল না; তাহার হস্তস্থিত দুইটী মুচুলির একটী মুচুলি লইয়া তৎক্ষণাৎ শ্রীজগন্নাথকে অর্পণ করিল; তিনিও একটু মুচুকি হাসিয়া তাহার উপর শুভ বিজয় করিলেন। দেখিয়া পরমেষ্ঠির আর আনন্দ ধরে না। সে অমনি প্রভুর পাদপদ্মে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া জোড়হস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং উন্মত্তের মত দু'বাহু তুলিয়া নৃত্য জুড়িয়া দিল। ভারি ভীড়, ঠেলাঠেলির চোটে সে অনেকটা পিছাইয়া পড়িয়া গেল। সেখান হইতে আর জগন্নাথকে দেখা গেল না, ভীড় ভেদ করিয়া আর সে অগ্রসরও হইতে পারিল না। তাহার উপর চারিদিকেই প্রহরীদিগের বেত্রপ্রহারের চটপট-শব্দ। সে যেন কেমন থতমত খাইয়া গেল। সে আর সেই ভাবরাজ্যে থাকিতে পারিল না। সেখানকার জ্ঞান লোপ পাইয়া আবার তাহার এখানকার জ্ঞান সঞ্চারিত হইল। সে মিটি-মিটি চাহিয়া দেখে,— তাই তো, আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? না না, তা-ও তো নয়; এই যে একটী মুচুলিই হস্তে রহিয়াছে দেখিতেছি! হায়, সর্ব্বান্তর্য্যামি জগন্নাথ!

সত্যই কি তুমি আমার অন্তরের কথা শুনিতে পাইয়াছিলে,—সত্যই কি তুমি একটি মুচুলি অঙ্গীকার করিয়াছ? অহো! আমার কি ভাগ্য কি ভাগ্য?

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে একেবারে এরাজ্যে আসিয়া পড়িল। তাহার সে অদ্বয়-আনন্দের সহিত এইবার ভয়ের মহা ঠোকাঠুকি বাধিয়া গেল। সে একবার ভাবে,—তাই তো বাদশাহের বালিশ, তাঁহাকে না দিয়া জগন্নাথকে দিলাম, এখন বাদশাহ যদি দণ্ড দেন,—তবে? আবার ভাবে,—না, আমার জগন্নাথের কাছে দিল্লীনাথের শক্তি-সামর্থ্য আর কতটুকু?

পরমেষ্ঠি এই ভয় ও অভয়ের সংগ্রামে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। এমন সময় বাদশাহের বরকন্দাজ কএকজন তাহার দ্বারে আসিয়া মহা হাঁক ডাক আরম্ভ করিয়া দিল,—ওহে ও ওস্তাগর! বাদশাহের মুচুলি ছুইটী কি এখনও তৈয়ারি হয় নাই? তাঁহার হুকুম মুচুলি লইয়া এখনই তোমায় আমাদের সহিত যাইতে হইবে।

"হাঁ হইয়াছে—যাইতেছি" বলিয়া পরমেষ্ঠি উঠিপড়ি করিয়া বাটীর বাহিরে আসিল এবং তাহাদের সহিত সেই একটী মুচুলি লইয়াই বাদশাহের দরবারে গমন করিল। দূর হইতে সেলাম করিতে করিতে সে বাদশাহের সম্মুখে যাইয়া মুচুলিটি রাখিয়া কৃতাঞ্জলি-করে দাঁড়াইয়া রহিল। মুচুলির সেলাইটেলাই দেখিয়া দিল্লীশ্বর ভারি প্রসন্ন হইলেন। কিন্তু একটি মুচুলি আনিবার কারণ কিছুই বুঝিলেন না। ভাবিলেন,—দরিদ্র দর্জ্জি বুঝি পারিতোষিকের একটা বিশেষ বন্দোবস্ত না করিয়া আর অপরটী আনিতেছে না; না হয় সেটী এখনও সেলাই করাই হয় নাই। তাই তিনি তাহার ভাব বুঝিবার জন্য হাস্যমুখেই তাহাকে বলিলেন,—ওহে বাপু! মুচুলি যে একটা দেখিতেছি, আর একটী কোথায় গেল? সেলাই করা হয় নাই কি,—সত্য করিয়া বল?

পরমেষ্ঠি তাঁহার পদতলে প্রণত হইয়া বলিল,—জাঁহাপনা! দুইটি মুচুলিই প্রস্তুত করিয়াছিলাম। কিন্তু একটি মুচুলি নীলাচলনাথ জগন্নাথ গ্রহণ করিয়াছেন। অপরটী আপনার সমীপে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছি। মিথ্যা কথা নয়, সত্যই জানিবেন।

শুনিয়া বাদশাহ হাসিয়া উঠিলেন, মনে মনে একটুও বিরক্ত হইলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন,—আরে, বাতুলের মত কি প্রলাপ বকিতেছিস্? কোথায় সেই নীলাচল আর কোথায় এই দিল্লী সহর, এখান থেকে আজ তুই তোর জগন্নাথকে মুচুলি দিলিই বা কি কোরে, আর সে-ই বা লইল কি প্রকারে? আর এমন বুকের পাটাই বা কার্ আছে যে, আমি দিল্লীশ্বর, আমার দিল্লীতে আসিয়া আমার মুচুলি লইয়া যায়? ও সব ন্যাক্‌রা ছেড়ে কি হ'য়েছে সত্য কথা বল্, নচেৎ তোর প্রাণ নিয়া টানাটানি প'ড়্‌বে।

পরমেষ্ঠি কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল,—জাঁহাপনা! অকপটেই বলিতেছি,—নীলাচলনাথ জগন্নাথই একটী মুচুলি লইয়াছেন, অপরটি আপনার জন্য আনিয়াছি। যথাকথাই বলিতেছি, এখন রাখুন বা মারুন, আপনার হাত। আর এখান হইতে তাঁহার মুচুলি লওয়াটা অসম্ভবই বা মনে করিতেছেন কেন? তিনি যে জগন্নাথ—জগতের নাথ; আপনার এ দিল্লী সহর কি জগৎ-ছাড়া? তিনি বিভু;—তিনি নাই এমন স্থান নাই। তাঁহার মত তাঁহার ধামও বিভু; তাঁহার মত তাঁহার ধামও সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজমান। তবে তাঁহার মত তাঁহার ধামেরও সর্ব্বত্র প্রকাশ নাই, এই মাত্র। তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহারও প্রকাশ হয় তাঁহার ধামেরও প্রকাশ হয়। তবে এই দিল্লী হইতে তাঁহার মুচুলি-গ্রহণ-ব্যাপারটা বাতুলের প্রলাপ বলিবেন কি প্রকারে? বিশেষতঃ তিনি সকলের অন্তরে অন্তরে বিচরণ করেন.—সকলের অন্তরের সকল কথা সকল সময়েই জানিতে পারেন। অন্তরের সহিত তাঁহাকে যে যে-কোন কথা বলে, তাহা তিনি শুনিতে পান,

আবার অন্তরের সহিত তাঁহাকে যে যে-কোন সামগ্রী উপভোগ করাইতে চায়, তাহা তিনি উপভোগ করেন। সত্য কথা বলিতে কি, আপনার মুচুলি দেখিয়া আমার মন বড় ব্যাকুল হইয়াছিল,—তাঁহাকে উপভোগ করাইবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল, তাই তিনি দয়া করিয়া তাহা স্বীকার করিয়াছেন। জাঁহাপনা! আমার যে শাস্তি বিধান করিতে হয় করুন, কিন্তু নিশ্চয় জানিবেন—আপনি বড় ভাগ্যবান্, আপনার সাধের সামগ্রী জগন্নাথের সেবায় লাগিয়াছে। কিন্তু আমার প্রাণে ওরূপ ভাব না জাগিলে তাহা কখনই লাগিত না, দণ্ড দিবার সময় এটুকুও বিচার করিয়া দেখিবেন।

এইবার বাদশাহের ক্রোধের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি আরক্ত-নয়নে কর্কশ-স্বরে কহিয়া উঠিলেন,—পাজিটার কথা শোন দেখি, আমি দিল্লীশ্বর, আমার প্রাণে ভাব নাই,আর রাজ্যের ভাব গিয়ে প্রবেশ ক'রেছে কিনা ঐ কদর্য্য দর্জ্জির প্রাণে? কে আছিস্, শীগ্‌গির এই কুঁজোটাকে এখান থেকে নিয়ে যা, আর হাতে পায়ে শিকল বেঁধে বন্দিশালার আঁধার ঘরে ফেলে রাখ্। আমার হুকুম—ওর খোরাক্ বন্ধ, ঘরও তালাবন্ধ থাক্‌বে। দেখি, ওর কোন্ বাবা এসে ওকে রক্ষা করে? যা বেটা যা, তোর জগন্নাথ যে ভারি মুচুলি নিতে এসেছিল, এইবার এসে তোকে খোরাক্ যোগাক্—প্রাণে বাঁচাক্। তার ক্ষমতাটাও একবার দেখে নিই।

বাদশাহের মুখের কথা বাহির হইতে-না-হইতে প্রহরিগণ অমনি চড়টাচাপড়টা ঘুসাটাঘাসাটা বসাইতেবসাইতে তাহাকে কয়েদখানায় লইয়া গেল এবং হাতদুইটা পিছমোড়া করিয়া বাঁধিয়া, পায়েও শিকলীর বাঁধন দিয়া আঁধার-ঘরে ফেলিয়া রাখিল। তারপর কপাটে কুলুপ আঁটিয়া প্রহরায় নিযুক্ত রহিল।

দুষ্ট প্রহরীদের মুষ্টির আঘাতে পরমেষ্ঠির পৃষ্ঠ ফাটিয়া রুধির বাহির

হইয়া পড়িতেছে, শৃঙ্খলের বন্ধনেও শরীর আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সেদিকে তাহার লক্ষ্য নাই, সে একমনে একপ্রাণে সেই মধুসূদনকেই ডাকিতেছে। অন্য কথা নাই,—অন্য চিন্তাও নাই। চিন্তামণির দরবারে নিমিষের মধ্যে এ কথা প্রচারিত হইয়া পড়িল। ভক্তবৎসল অমনি ভক্ত রক্ষায় ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। অমনি তিনি নীলাচল হইতে দিল্লীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

অর্দ্ধরাত্রি অতীত। বন্দিমন্দিরের দ্বারে প্রহরিবৃন্দ জাগ্রত। শ্রীপ্রভু তাহাদিগকে মায়ামোহিত করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার দৃষ্টিমাত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ অর্গলরুদ্ধ দ্বারগুলি আপনাআপনি উন্মুক্ত হইয়া গেল। ভক্ত পরমেষ্ঠি তখনও জানে না যে, তাহার প্রভু তাহার উদ্ধারের নিমিত্ত শুভ বিজয় করিয়াছেন। সে তখনও তন্ময়ভাবে তাহার প্রভুরই নাম মনন করিতেছিল, আর নয়নজলে ভাসিয়া যাইতেছিল। শ্রীপ্রভু তাহার গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভক্তের-বন্ধন দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন। তাঁহার আত্মসংবরণ করা কঠিন হইয়া পড়িল। অনেক কষ্টে আপনাকে আপনি সাম্‌লাইয়া তিনি পীযূষপূর্ণ-স্বরে তাহাকে ডাকিলেন,—বৎস পরমেষ্ঠি!

আহা, আহা, কি মিষ্ট কি মিষ্ট, শিশুর কণ্ঠের প্রথম-নিঃসৃত বা-বা মা-মা বুলিও বোধ হয় পিতামাতার কর্ণে এত মিষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। সেই সুমিষ্ট স্নেহসংবোধন শ্রবণ করিয়া পরমেষ্ঠি চমকিয়া উঠিল। ভাবিল, —এ দানবের পুরীতে অমরার অমিয়ার সঞ্চার কি প্রকারে হইল? তাড়াতাড়ি চাহিয়া দেখে,—নীলকান্তমণির দ্যুতিগঞ্জন বিদ্যুতের দর্প-দলন দিব্য জ্যোতিতে তাহার আঁধার ঘর ভরিয়া গিয়াছে। কে গো কে?—দেখিদেখি করিতেকরিতে সে সেই জ্যোতির ভিতরে জ্যোতির্ম্ময় জগন্নাথ-মূর্ত্তি দেখিতে পাইল। সে চর্ম্মনয়নেই দেখিতে পাইল,—তাহার প্রাণা-

রাধ্য দেবতা যেন প্রসন্নবদনে তাহাকে একহস্তে অভয়মুদ্রায় অভয় দান করিতেছেন, অপর হস্তে ঘর্‌ঘর্‌ করিয়া সুদর্শনচক্র ঘুরাইতেছেন। সুদর্শন নামে 'সুদর্শন' হইলেও আজ ঘোরতর ভীষণদর্শন ;—ভ্রামণের সঙ্গে-সঙ্গে তাহার অঙ্গ হইতে যেন প্রলয়ের অনল ছড়াইয়া পড়িতেছে। প্রভুর এই কোড়ি ও কোমলে কমনীয় মূর্ত্তি দেখিয়া পরমেষ্ঠি পরমানন্দে বিবশ হইয়া পড়িল। সাধ হইল,—ছুটিয়া গিয়া প্রভুর পা-দুইটা একবার জাপ-টাইয়া ধরে, আর খাণিকক্ষণ সাধ মিটাইয়া কাঁদে। কিন্তু সে তাহা পারে কি প্রকারে? তাহার হাতে পায়ে যে শিকলী বাঁধা? তারহীন বৈদ্যুতিক-বার্ত্তার মত তাহার প্রাণের কথা তখনই তাহার প্রভুর প্রাণে পঁহুছাইয়া গেল। তিনি একবার কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিবামাত্র তাহার হস্তপদের শৃঙ্খল স্খলিত হইয়া পড়িল। আনন্দে ও বিস্ময়ে তাহার মন কি-যেন কেমন হইয়া উঠিল। সে কে, কি বৃত্তান্ত, সকলই ভুলিয়া গেল। সকল শরীর যেন জড়, একটুও নড়িবার-চড়িবার যো নাই। শ্রীজগন্নাথ তাহা বুঝিলেন। তাঁহার রঙ্গিম অধরের এধারে ওধারে—কমলনয়নের এ-কোণে ও-কোণে মিষ্টিমিষ্টি হাসির টুক্‌রাগুলি খেলিয়াখেলিয়া বেড়াইতেছিল, এইবার তিনি সেইগুলি একত্রিত করিয়া, না জানি তাতে আরও কত কি মিষ্টতা মিশাইয়া ফোয়ারার মত একেবারে ছাড়িয়া দিলেম। তিনি হাহা করিয়া হাসেন আর বলেন,—

"মো পরা সাহা থাউ থাউ
তোর কাহাকু ভয় আউ॥
এ চক্র থিলে মোর কর।
মোর সেবক বলিআর॥"

পরমেষ্ঠি রে! আয় আয় আমার কাছে আয়। ভয় পেয়েছিস্‌ বাছা, ভয় কিসের? আমি যখন তোর সহায়, তখন আর তোর ভয় কাহাকে?

এই দ্যাখ্ বাছা! আমার হস্তে এই সুদর্শন চক্র থাকিতে আমার সেবকের আর ভয় নাই। যে যতবড় বলবান্ হউক, আমার সেবক সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। আয় বাছা! আমার কাছে আয়।

পরমেষ্ঠি তাঁহার কাছে আসিবে কি, তাঁহার করুণার ধারা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছে। সে সেইখানেই তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া কাঁদিতে লাগিল। স্বভাবসুলভ দীনতাবশে ভাবিতেও লাগিল,—হায়, আমি মহা অধম মহা পাপী, আমি কি উহার সমীপে যাইবার যোগ্য?

সেবকের দীনতায় সেবকবৎসলের আর আনন্দ ধরে না; তিনি আপনি গিয়া তাহার মস্তকে শ্রীপাদপদ্ম অর্পণ করিলেন। শ্রীপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ-সংস্পর্শে পরমেষ্ঠির অনঙ্গের মত মোহন অঙ্গ হইয়া উঠিল,—পৃষ্ঠের কুজটীও অন্তর্হিত হইয়া গেল। আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া সে আপনি এবং ভগবান্ উভয়কেই হারাইয়া ফেলিল।

এদিকে ভগবান্‌ও তাহাকে কৃতার্থ ও বন্ধনমুক্ত করিয়া দিয়া বাদশাহের শয়নমন্দিরে গমন করিলেন। তাঁহাকে স্বপ্নযোগে যথেষ্ট তাড়না-ভর্ৎসনা করিয়া নীলাচলে চলিয়া আসিলেন। বাদশাহ তখনই শয্যা হইতে উঠিয়া পড়িলেন। চারিদিকে চাহিয়া দেখেন,—কই, কেহই তো নাই? ভাবেন,—তবে বুঝি স্বপ্নই হইবে? না, তাই বা বলি কি প্রকারে? সারাটা শরীর টাটাইয়া গিয়াছে,—গা ফুটিয়া প্রহারের দাগ দেখা যাইতেছে। ব্যাপার খুব অদ্ভুত বটে!

প্রভাত হইতে আর ত্বরা সহে না, তিনি তাড়াতাড়ি পাত্র-মিত্রদের ডাকাইলেন, সকলকে স্বপ্নের কথা জানাইলেন। প্রাতঃকাল হইবামাত্র পাত্রমিত্রাদির সহিত তিনি বন্দিশালায় গমন করিলেন। গিয়া দেখিলেন,—প্রহরীরা সব গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত। পরমেষ্ঠির হস্ত-পদের বন্ধন নাই, কুঁজ নাই, কুরূপ নাই। তাহার দেহ দিব্যজ্যোতিতে

ভরিয়া গিয়াছে। বদনমণ্ডলে ঢলঢল লাবণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে প্রসন্ন মনে মনোনায়কের নামগানে বিভোর হইয়া বসিয়া রহিয়াছে।

অবশ্য সংজ্ঞালাভের পর পরমেষ্ঠি তাহার প্রভুকে না দেখিয়া প্রথমত বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছিল, অনেক কান্নাকাটিও করিয়াছিল, তার পর তাহার প্রভুর নামই তাহার প্রাণে তাঁহার অভাব পূরণ করিয়া দিয়াছে। হইবে না-ই বা কেন, নাম ও নামী তো আর ভিন্ন নয়?

পরমেষ্ঠির অবস্থা দেখিয়া দিল্লীপতি অতিমাত্র বিস্মিত এবং ভীত হইলেন। তিনি তাহাকে নানা প্রকারে প্রসন্ন করিলেন। বহু ধনরত্ন উপঢৌকন দিলেন। আপনার খাস-হাতীর উপর উৎকৃষ্ট হাওদা দিয়া তাহাকে তদুপরি বসাইয়া মহাসমারোহে সমগ্র নগর ভ্রমণ করাইয়া বাড়ীতে পৌছাইয়া দিয়া আসিলেন। সমস্ত সহর ভক্তের জয়জয়-নাদে ভরিয়া গেল। ভক্ত পরমেষ্ঠি কিন্তু এই সকল ব্যাপারে লজ্জায় মরমে মরিয়া গেল। প্রতিষ্ঠার ভয়ে সে সত্বর দিল্লীসহর পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে অপর দেশে চলিয়া গেল। ভক্তের উচিত ভজনে-পূজনে ইহজীবন যাপন করিয়া অন্তে ভক্তের উচিত উত্তম গতি লাভ করিল।

মাধবাচার্য্য।

পতি ও পত্নী দুইটিতে যদি মনে প্রাণে একটি হয়, তবেই সংসারে সুখের সম্ভাবনা। কিন্তু এরূপ পরস্পর মনের অনুরূপ হওয়াটা,—প্রাণে-প্রাণে এক হইয়া যাওয়াটা বড় একটা যারতার ভাগ্যে ঘটে না। বহু ভাগ্যের কথা বলিতে হইবে, মাধবাচার্য্য এবং সত্যবতীর মনে প্রাণে এমনই একটা একতা ছিল। তাঁহাদের দুইজনে যেন দুইখানি স্বচ্ছ দর্পণ; উভয়ে উভয়ের প্রতিবিম্ব যেমন পড়িতে হয় পড়িয়াছে; আপনার দিকে দেখিলেই ইনি উহাকে সম্পূর্ণ দেখিতে পান। কাহারও কাছে কাহারও কিছু লুকা ছাপা নাই; দুঁহার অন্তরে-বাহিরে দুঁহার অবাধ অধিকার।

ব্রাহ্মণ মাধব মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। ভগবান্ মাধবের সেবা আর তাঁহার সেবকের সেবা ছাড়া তিনি কিছুই জানিতেন না। দয়ার শরীর; দুয়ারে ভিখারী আসিলে কাহাকেও ফিরাইতে পারিতেন না। সদাচারের সোজা পথ ছাড়িয়া কখনও কদাচারের কুটিল পথে পাদ-চারণ করিতেন না। আর ভক্তবৎপ্রসঙ্গের একটা-না-একটা,—হয় ভক্তিগ্রন্থপাঠ, না হয় নাম-সংকীর্ত্তন, না হয় তো ভক্ত সঙ্গে ভক্তিকথা, যা হয় একটা না লইয়া বৃথা কাল কাটাইতেন না।

সতী সত্যবতীও স্বামীর সকল কর্ম্মেই সহায়; কায়ার পাছে ছায়ার মত তিনি পতির মনের অনুগামিনী। তাঁহার পার্থিব রূপ যদিও সুন্দর যদিও অলোকসামান্য, কিন্তু পতিভক্তির অপার্থিব সৌন্দর্য্যে তাঁহার রূপ যেন অনুক্ষণ নূতন বলিয়া অনুভূত হইত। সে রূপ যেন এ-লোকে থাকিয়াও এ-লোকছাড়া! সুন্দরী—পতি, শ্রীপতি এবং সাধুগণকে সমান দৃষ্টিতে দেখিতেন, আর সমতা-হীন মমতায় এই তিনের সেবা করিতেন। ফলে

দু'জনের ভালবাসায়—দুজনের মনের প্রাণের মেলামেশায় পতিপত্নী দু'জনেই সুখী।

আজ ছয়মাস হইল, ব্রাহ্মণদম্পতীর প্রীতিপাদপে হীরকের বুক্ষে মাণিক্যের মত একটি লোচনলোভন সুন্দর ফল ফলিয়াছে। ইহাকে লইয়া উভয়েই কি এক অভিনব আনন্দে অভিভূত। ব্রাহ্মণ পলেপলে পলকহীন-নয়নে বালকের পানে চাহিয়া দেখেন আর ভাবেন,—আহা আহা, কোন্ অমরধামের মাধুর্য্যসম্ভার খোকার আমার মুখখানিতে মাখান রে! আহা আহা, বাছা বুঝি আমার সেইঅদ্বয়-আনন্দ রাজ্যের অধীশ্বর শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দেরই একটি মকরন্দবিন্দু! তা না হ'লে উহার আগাগোড়া এত মাদকতাময় মাধুর্য্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার হইবে কেন? ব্রাহ্মণ বারংবার খোকাকে বুকে মুখে চাপিয়া-চাপিয়া ধরেন, তাহার ভিতর দিয়া যেন আর কাহার স্পর্শসুখ লাভ করেন, আর তাঁহার শরীর মন সকলই যেন অবশ হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মণীরও নয়নমণি সেই খোকনমণি। তিনি তাহাকে একটিবারও চক্ষের আড় করিতে দেন না। তাহার হাসি-কান্না খেলা-দেয়লা তাঁহার কাছে সকলই যেন সমান সুষমায় মাখামাখি।

একদিন হইয়াছে কি, মাধবাচার্য্য ভগবানের ভোগের জন্য একটি অলাবু কিনিয়া আনিয়াছেন। রাত্রি প্রায় এক প্রহর হইয়া গিয়াছে। সত্যবতী খোকাকে কোলে করিয়া সেই লাউটি বঁটিতে বনাইতেছেন। এমন সময় তাঁহাদের শ্রবণে সুদূরাগত সঙ্কীর্ত্তনধ্বনি আসিয়া প্রবেশ করিল। এ সঙ্কীর্ত্তন আবার অন্য কাহারও নয়; যিনি কলিহতজীবের পাপতাপ প্রশমনের জন্য করুণায় ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং অধিকারী অনধিকারী বিচার না করিয়া সকলের গলায় প্রেম ও নামের মোহন মালা পরাইয়া ধন্য করিয়াছেন, এ সঙ্কীর্ত্তন তাঁহার—সেই সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের।

ঐ দিন শ্রীমহাপ্রভুর ইচ্ছা হইল, অদ্য রজনীযোগে নগরেনগরে শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইব। প্রাণের ভাই নিতাইকে সে কথা জানাইলেন। তিনি তো পাষণ্ড-দলনে অগ্রগণ্য। নামসংকীর্ত্তন হইল আবার পাষণ্ডদলনের প্রধান সাধন। তাই নগরসংকীর্ত্তনের নামে তিনি লাফাইয়া উঠিলেন। তখনই তাহার আয়োজন আরম্ভ হইয়া গেল। হাজারহাজার মশাল প্রস্তুত হইতে লাগিল। ভক্তবৃন্দের মন্দিরে মন্দিরে এই আনন্দ-সংবাদ প্রেরিত হইল। সন্ধ্যা না হইতেহইতে চারিদিক্ হইতে দলেদলে ভাগবতগণ আসিতে লাগিলেন। মশালের আলোকে চারিদিক্ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শ্রীশচীনন্দন মাল্যচন্দনে সকলকে অলঙ্কৃত করিলেন। ভুবন ভরিয়া ভুবনমঙ্গল হরিহরিধ্বনি উত্থিত হইল। তালেতালে খোলকরতাল বাজিয়া উঠিল। শঙ্খ ও শিঙ্গার মঙ্গলনাদে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিল। গদাধরের অধরে আর হাসি ধরে না; তিনি আদরভরে প্রভুর গলায় দোলন-মালা পরাইয়া দিলেন। পরস্পর নয়নেনয়নে না জানি কি কথা কহাকহি হইল। নিতাইর ইঙ্গিতে অমনি প্রেমের গাহনা প্রেমের নাচনা আরম্ভ হইয়া গেল। শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গেঅঙ্গে ভাব তরঙ্গ খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল, তিনি নানা রঙ্গে নাচিতে আরম্ভ করিলেন। সে নৃত্য কেমন? কবির কথাতেই বলি,—

"নাচত গৌরচন্দ্র নটভূপ।

মনমথ-লাখ,- গরবভর-ভঞ্জন,

অখিল-ভুবনজন-রঞ্জন-রূপ॥ ধ্রু॥

অবিরত অতুল, ভাবভরে গরগর,

গরজত অতি অদভুত রুচিকারী।

মঙ্গলময় পদ, ধরত ধরণী'পর,

করত ভঙ্গী ভুজযুগল পসারি॥

হাসত মধুর, অধর মৃদু লাবণি,
শরত-চাঁদ জিনি বদন-বিলাস।
টলমল অরুণ,- কমলদল লোচন,
কৌন কহব কত রস পরকাশ॥
গায়ত মধুর, ভকতগণ নবনব,
কিন্নর-নিকর-দরপ করি চূর।
উথলল প্রেম,- সিন্ধু মহী ভাসল,
নরহরি কুমতি পরশ রহু দূর॥"

এইবার আর রক্ষা নাই; সেই প্রেমার অমিয়হিল্লোলে নদীয়া-নগরী টলমল করিয়া উঠিল। সে সংকীর্ত্তনানন্দের আর অবধি নাই। কবির কথাতেই তাহার পরিচয় দিই।—

"আজু কি আনন্দ সংকীর্ত্তনে!
নাচে গৌর নিত্যানন্দ, পরম আনন্দকন্দ,
প্রিয় পারিষদবৃন্দ সনে॥ ধ্রু॥
নাচে বোলে ভাল ভাল, বাজে খোল করতাল,
সভে মহা বিহ্বল প্রেমায়।
নদীর প্রবাহ-পারা, সভার নয়ানে ধারা,
কেহকেহ পড়ে কার গায়॥
কেহ বা পুলকভরে, হুঙ্কার গর্জ্জন করে,
কাঁপে কেহ থির হৈতে নারে।
কেহ কারু পানে চা'য়া, দুই বাহু পসারিয়া,
কোলে করি ছাড়িতে না পারে॥
কেহ কারু পায়ে ধরে, পদধূলি লয় শিরে,
কেহ ভূমে পড়ি গড়ি যায়।
প্রভু ভৃত্য একরীতি, দেখি নরহরি অতি,
আনন্দে প্রভুর গুণ গায়॥"

সুরধুনীর কূলেকূলে এইভাবে কীর্ত্তন করিতেকরিতে শ্রীমহাপ্রভু চলিয়াছেন। নদীয়ার বালক-বৃদ্ধ যুবক-নারী সকলেই সেই আনন্দে যোগদান করিয়াছেন। দেখিতেদেখিতে সেই আনন্দমণ্ডলী মাধবাচার্য্যের বাটির নিকট আসিয়া উপস্থিত। দূর হইতে ধ্বনি শুনিয়াই তিনি আর আবাসে রহিতে পারিলেন না,—ধ্বনির অনুসরণ করিয়াই উধাও হইয়া ছুটিলেন। প্রেমময়ের প্রেমমাখা নামসংকীর্ত্তন শুনিয়া এবং অঙ্গেঅঙ্গে ভাবের আবির্ভাব দেখিয়া তাঁহার নয়ন-মন ভুলিয়া গেল। যেন কোন্ ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে মোহিত হইয়া তিনিও সংকীর্ত্তনসমণ্ডলীর সহিত নাচিতে-গাহিতে চলিতে লাগিলেন।

এদিকে হইয়াছে কি? মাধবাচার্য্যের ঘরণী শ্রীপ্রভুর সেই অমৃতনিষ্যন্দী নামধ্বনি শুনিয়া আপনহারা হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার হস্ত হইতে তুম্বীফলটী পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহাতে আর তিনি নাই। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার কতকটা যেন সংজ্ঞা হইল। তখনও সেই সুধার নেশা ভরপূর। এদিকে দেবতা ও ভর্ত্তার নিমিত্ত পাক করিতে হইবে, এ সংস্কারটাও অন্তরের মাঝে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। তিনি সেই অবস্থায় অলাবু কুটিতে আপন কুমারকে কুটিকুটি করিয়া হাঁড়ীর মধ্যে পূরিয়া চূল্লীর উপর চাপাইয়া দিলেন। অনলের প্রবল উত্তাপে সেই মাংস টগ্‌বগ করিয়া ফুটিতে লাগিল। তাঁহারও বাহ্য জ্ঞান আবার বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি অন্তরেঅন্তরে সেই সংকীর্ত্তনসুধা পান করিতে লাগিলেন।

সর্ব্বান্তর্য্যামী মহাপ্রভু তাহা জানিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মাধবাচার্য্যের চিত্ত বাটী যাইবার নিমিত্ত চঞ্চল করিয়া দিলেন। আচার্য্যের অমনি ভাবের ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি ব্যাকুলপ্রাণে বাটির পানে ছুটিলেন। তাড়াতাড়ি বাড়ী আসিয়া দেখেন,—বিচিত্র ব্যাপার! ব্রাহ্মণীর সর্ব্বশরীর রুধিরধারায় ব্যাপ্ত, নয়নেও আবার প্রেমাশ্রুর পূতধারা প্রবাহিত। তাঁহার

এই অদ্ভুত ভাব দেখিয়া ব্রাহ্মণ ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। ইতস্তত চাহিয়া দেখেন,—খোকাও নাই। তাই তো কি হইল,—আমার আঁধার-ঘরের মাণিকরতন খোকন কোথায় গেল, ভাবিয়া তিনি অতিশয় অস্থির হইয়া পড়িলেন। পত্নীকে উচ্চস্বরে আহ্বান করিলেন। সাড়াসুড়ি কিছুই পাইলেন না। তিনি মহা ব্যাকুলভাবে পত্নীর পুলকিত-কলেবরে বারবার আঘাত করিতে করিতে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিছুক্ষণ-পরে তাঁহার সংজ্ঞা হইল। তিনি যেন ঘুমের ঘোরে বলিয়া উঠিলেন,—"হরি ও রামরাম।" শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমুখোচ্চারিত—"হরি ও রাম" নাম তখনও তাঁহার অন্তরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, রসনাও সেই নামাবলী লইয়া আনন্দ-নর্ত্তন করিতেছিল, তাই পতির প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে সত্যবতী বলিয়া উঠিলেন,—"হরি ও রামরাম।"

বহু যত্নে পত্নীকে প্রকৃতিস্থ করিয়া আচার্য্য তাঁহাকে খোকার সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তিনি সম্পূর্ণ এরাজ্যে আসিয়াছেন। তাই খোকার কথা শুনিয়া চমকাইয়া উঠিলেন। কোল-পানে তাকাইয়া দেখেন,—খোকা সেখানে নাই। পরিধেয় বস্ত্রখানিও রক্তাক্ত। তাঁহার মস্তক যেন ঘুরিতে লাগিল। তিনি পাগলিনীর মত ছুটিয়া বঁটিখানির কাছে গেলেন। গিয়া দেখেন,—অলাবুটি ভূতলে গড়াগড়ি যাইতেছে, আর সেই স্থানটা সমস্তই রক্তে-রক্ত হইয়া রহিয়াছে। তথা হইতে তিনি রন্ধন-শালায় ছুটিলেন। চুল্লী হইতে হাণ্ডীটি নামাইয়া তাহার আবরণ উন্মোচন করিলেন। তার পর যাহা দেখিলেন, তাহা আর কাহাকেও বলিবার কহিবার কথা নয়। হায় হায়, অলাবুর পরিবর্ত্তে তাঁহার প্রাণোপম পুত্রের মাংসই হাণ্ডীর মধ্যে সিদ্ধ হইতেছে।

এই অবস্থায় অন্য স্ত্রীর কি অবস্থা হইত বলা যায় না, সত্যবতী কিন্তু

শ্রীকৃষ্ণস্মরণ করিয়া সেই হাঁড়ীটি পতির নিকটে লইয়া চলিলেন। অবলার এরূপ মনের বল কাহার বলে, তাহা বোধ হয় বলিতে হইবে না। স্বধর্ম্মে শ্রদ্ধা এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকিলে এইরূপ দৃঢ়তাই হইয়া থাকে। তিনি স্বামীর সম্মুখে রন্ধনপাত্রটি রাখিয়া দিলেন। মাধবাচার্য্যও তাঁহার প্রিয়তম পুত্রের এই মর্ম্মান্তিক পরিণাম দর্শনে দারুণ ব্যথায় "গোবিন্দ গোবিন্দ" বলিয়া উঠিলেন এবং মুখ ফিরাইয়া হস্ত-সঙ্কেতে পত্নীকে বলিলেন,—যাও যাও, আমার সম্মুখ হইতে সত্বর পাত্রটি লইয়া যাও; প্রাতে উহাকে গঙ্গা-জলে নিক্ষেপ করিয়া দিব। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এ সর্ব্বনাশ হইল কি প্রকারে?

পতিব্রতা বলিলেন,—কি প্রকারে কি যে হইল, তাহা বলিতে পারি না। কেবল এইটুকুই বলিতে পারি,—পতিতপাবন নিতাই-গোউর সপরিকরে নগরকীর্ত্তন করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাদের নামগীতি আমার শ্রুতিমূলে প্রবেশ করিবামাত্রই আমি কেমন একতর হইয়া গেলাম। আমি যেন কোন্ স্বপ্নরাজ্যের কি-এক মাদকতাময় সঙ্গীতের তরতর-তরঙ্গে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলাম। সেই তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে 'আমার, বলিবার যাহা কিছু সকলই খোয়াইলাম,—আপনাকেও খোয়াইয়া বসিলাম। তখন আমিও নাই, আমারও নাই। তাই কি করিতে কি করিয়া বসিয়াছি, কি করিয়া বলিব? আমাতে আমি থাকিলে আমার খোকনমণির এ শোচনীয় পরিণাম কি আর দেখিতে হইত?

মাধবাচার্য্য ভার্য্যার কথা শুনিয়া অতিমাত্র আনন্দিত হইলেন। প্রফুল্ল বদনে বলিলেন,—ধন্য, ধন্য সতি! তোমার জীবন ধন্য! তোমার সংবন্ধে তোমার পিতা মাতা প্রভৃতি সকলেই ধন্য! পুত্রের পরমায়ুর অবসান হইয়াছিল, সে চলিয়া গিয়াছে; যাউক, তজ্জন্য দুঃখ নাই। কিন্তু আহা আহা, যাহার হৃদয় কৃষ্ণনামে আপনহারা হইয়া যায়,—অহং

ম উভয় ভুলিয়া নামময় হইয়া যায়, এমন তো কাহাকে কখনও দেখি নাই। আজ তুমিই তাহা দেখাইয়া দিলে,—নামের অপ্রমিত শক্তিতে তুমিই আজ বিশ্বাস জন্মাইয়া দিলে। হায়, না জানি জগদীশ্বরের নামের কিনা আকর্ষণী শক্তি—যে সংসারীর সংসারাকৃষ্ট চিত্তকেও হঠকারিতার সহিত টানিয়া লইয়া যায়। হায়, না জানি জনার্দ্দনের নামে কিনা আনন্দ,—যে সংসারের সকল আনন্দকে মন্দীভূত করিয়া দেয়। সুন্দরি! আজ আমার সামান্য পুত্রের বিনিময়ে অসামান্য লাভ হইয়া গেল। এতদিন মনে করিতাম খোকার চেয়ে বুঝি ভালবাসার সামগ্রী আর নাই। কখনও তো দেখি নাই, তা মনে করিব না-ইবা কেন? কিন্তু আজ মঙ্গলময়—আমরা যাহাকে অমঙ্গল বলি, সেই অমঙ্গলের মাঝে আপন সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্য মূর্ত্তির সাক্ষাৎ করাইয়া দিয়াছেন। পুত্রের মৃত্যুরূপ এই অমঙ্গল না ঘটিলে তো আর মঙ্গলের-মঙ্গল নামব্রহ্মের স্বরূপতত্ত্ব বুঝিতে পারা যাইত না? নাম যে ইতর-মাধুর্য্য-বিস্মারক—মধুরের অপেক্ষাও সুমধুর সামগ্রী, তাহা তো আর প্রাণেপ্রাণে অনুভব করা যাইতে পারিত না? সত্যব্রত! আজ তোমার হৃদয় দিয়াই এই পরম সত্যের আবিষ্কার হইল। তাই তোমাকে পত্নীরূপে পাইয়া আমিও ধন্য হইয়া গেলাম।

এই বলিয়া তিনি পরমাদরে পত্নীর মুখ চুম্বন করিলেন। স্বামীর সোহাগে সুন্দরীর সকল চিন্তার অবসান হইয়া গেল। তিনি ব্রীড়া-বিনম্র বদনে তাঁহাকে বলিলেন,—নাথ! যাহা হইবার তাহা তো হইয়াই গিয়াছে, কিন্তু তবুও কি জানি কেন আমার মনে হয়, খোকা আমার মরিবার নয়। মমতার কথা মনে করিও না,—শোকোন্মত্তার প্রলাপোক্তি মনে করিও না; আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে কে যেন বলিয়া দিতেছে,—খোকা আমার মরিবার নয়। বাছা আমার মরিবেই বা কেন? স্বয়ং ভগবান্ আপনার রসে আপনি রসিয়া ভাগবত-

গণের সনে আনন্দমনে আপন নাম আপনি কীর্ত্তন করিতেছেন, সেই নামে আমার মন মজিয়া গেল, আমি কি করিতে কি করিয়া ফেলিলাম, তাহাতে আমার খোকার কখনও অকল্যাণ হইতে পারে কি? তাহা হইলে যে নামের মহিমাই খর্ব্ব হইয়া যাইবে? চল, আমরা এক কার্য্য করি। এই হাণ্ডীটি লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সমীপে গমন করি। যাইয়া বলি,—দেখ ঠাকুর! এমন নামও গাহিতে হয়? এই দেখ, তোমার নাম আমাদের কি অঘটন ঘটাইয়া দিয়াছে। এ ঘটনার জন্য যদি কাহাকেও দায়ী হইতে হয়, সে কেবল তুমি এবং তোমার প্রচারিত নাম। তা এখন তুমি তোমার নিজের, অথবা তোমার প্রচারিত নামের অবমান করিবে, না, নিজেরও নামের মহিমা জগতে প্রকাশিত করিবে? চল, তাঁহাকে গিয়া বলি তো, তার পর তাঁহার যাহা ইচ্ছা।

পত্নীর প্রস্তাবে পতিরও সম্মতি হইল। উভয়ে সেই হাণ্ডীটি বস্ত্রাবৃত করিয়া সংকীর্ত্তনধ্বনি ধরিয়া প্রভুর উদ্দেশে ধাবিত হইলেন। অগ্রে পতি পথ দেখাইয়া চলিলেন, পশ্চাতে পত্নী সেই হাঁড়ীটি মাথায় লইয়া চলিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তখন সমীপবর্ত্তী এক পল্লীতে ভক্তমণ্ডলী-পরিবৃত হইয়া সংকীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। সত্যবতী ত্বরাত্বরী সেই হাঁড়ীটা লইয়া গিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিলেন এবং কাকুতিমিনতি করিয়া আদ্যোপান্ত আপন অবস্থা অবগত করাইলেন। শুনিয়া ত সকলেই স্তম্ভীভূত! সকলেই বলেন,—

"বোইলে—ধন্য এ সুন্দরী। ধন্য এহার গর্ভধারী॥
ধন্য অটই এহা পতি। ধন্য অটই এহা মতি॥
ধন্য সুফল আন্ত অক্ষি। এমন্ত স্তিরীমুখ দেখি॥"

হায়, ধন্য এই সুন্দরী! ধন্য ইহার গর্ভধারিণী! ধন্য ইহার পতি!

ধন্য ইহার মতি! আর ইহার মুখ দেখিয়া আমাদের নয়নও ধন্য ও সফল হইয়া গেল!

সকলের প্রাণে কেমন যে উল্লাসের ভাব দেখা দিল। তাঁহারা শ্রীমহাপ্রভুকে মহা ধরিয়া বসিলেন,—দয়াময়! এই পুণ্য-রমণীর পুত্রের প্রাণ আপনাকে দান করিতেই হইবে। নতুবা আপনার নামে ও নামগানে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে। আমরা তাহা কিছুতেই সহিতে পারিব না। আপনার প্রেমেমাখা নামকীর্ত্তনে আপনহারা হইয়াই না এ আপন শিশুর প্রাণ নাশ করিয়াছে? এই বলিয়া তাঁহারা মহা উচ্চস্বরে নাম-সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন।

দয়াল নিতাই তো জীবের দুঃখে গলিয়াই আছেন। তিনি বারবার প্রভুর প্রতি ব্যাকুল-প্রাণে সজল-নয়নে চাহিতেছেন,—কতক্ষণে প্রভু কৃপা করেন। প্রভুও আর থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার করুণার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়া নয়ন দিয়া ছুটিতে লাগিল। তিনি তাঁহার মস্তক হইতে নির্ম্মাল্যের তুলসীদল লইয়া সেই ব্যঞ্জনপাত্রের উপর নিক্ষেপ করিলেন এবং সেই পাত্রটী মণ্ডলীর মধ্যে রাখিয়া দিয়া গদগদ-কণ্ঠে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তিনি নাকি বিনয়ের খনি, আপন প্রভাব অভিব্যক্ত করিতে একান্ত অনিচ্ছুক, তাই বারবার শ্রীহরিকে আহ্বান করিয়া ব্রাহ্মণতনয়ের জীবন ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। করিতে করিতে তাঁহার মহা কীর্ত্তনাবেশ আসিয়া গেল। তিনি আপন করে করতাল লইয়া উচ্চ কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। ভক্তবৃন্দও আনন্দভরে তাহাতে যোগদান করিলেন। সে আনন্দ-উল্লাস দ্যাখে কে?

"দণ্ডদণ্ডকে হরিধ্বনি। করন্তে কম্পই মেদিনী॥
কে রঙ্গে করে নানা নৃত্য। কে রঙ্গ করি গাএ গীত॥

কে রঙ্গতালী ভঙ্গী হোই। রঙ্গরে মৃদঙ্গ বজাই॥
কে করে দেই করতালি। কে মুখে দেলে হুলাহুলী॥"

দণ্ডেদণ্ডে হরিহরিধ্বনি উত্থিত হইতেছে,—মেদিনীমণ্ডল যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। কেহ বা নানা রঙ্গে নৃত্য করিতেছে। কেহ বা নানা রঙ্গে গান গাহিতেছে। কেহ বা নানা রঙ্গে নানা ঢঙ্গে মৃদঙ্গ বাজাইতেছে। কেহ বা হাততালি দিতেছে। কেহ বা হুলাহুলিধ্বনি করিতেছে। আর নদীয়ার নরনারী জয়জয়নাদে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিয়া ফেলিতেছে।

এইরূপে দশদণ্ড কাল কোথা দিয়া চলিয়া গেল, কাহারও সংজ্ঞাই নাই। অবশেষে সেই পাত্রের মধ্য হইতে ব্রাহ্মণ-পুত্রের ক্রন্দনধ্বনি সকলের কর্ণরন্ধ্রে যাইয়া প্রবেশ করিল। সকলেই বিস্ময়েবিস্ময়ে কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া হাণ্ডীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন। শ্রীমহাপ্রভুও সেই পাত্রের আবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণতনয়কে বাহির করিয়া আনিলেন এবং ক্রোড়ে বসাইয়া তাহার কর্ণে সঞ্জীবনমন্ত্র প্রদান করিলেন। হাসিতে-হাসিতে বলিলেন,—ত্থাখ, তুমি হরির কৃপায় প্রাণ পাইয়াছ, তাই তোমার নাম হইল—"কৃপাচার্য্য।" যাও বৎস! তুমি তোমার জননীর ক্রোড়ে গমন কর;—নাও মাতা! তোমার পুত্রকে তুমি গ্রহণ কর। এই বলিয়া তিনি তাহাকে তাহার জননীর ক্রোড়ে অর্পণ করিলেন। অমনি চারিদিক্ হইতে ঘনঘন হর্ষভরা হরিধ্বনি হইতে লাগিল। ভগবানের কৃপাবৈভব দর্শনে সকলের নয়নযুগল সার্থক হইয়া গেল। তাহার জননীর আনন্দের তো আর অবধিই নাই।—

"দীনজনরে কোটি বিত্ত। মিলিলে হুঅই যেমন্ত॥
আজন্ম-পঙ্গু মুক্তি হেলে। মূক যে বচন কহিলে॥
আজন্ম-অন্ধ চক্ষু পাই। যেমন্তে কৃতার্থ হুঅই॥

পাপিষ্ঠ বৈকুণ্ঠ-গমনে। যেমন্তে হুএ তার মনে ॥
এমন্ত হেলা সে সুন্দরী। নিজ-বালক পাইকরি ॥"

কাঙ্গাল কোটি বিত্ত পাইলে, আজন্ম-পঙ্গু চলচ্ছক্তি লাভ করিলে, বোবার মুখে কথা ফুটিলে, জন্মান্ধের নয়ন হইলে, মহাপাপী বৈকুণ্ঠ যাইতে পারিলে যে প্রকার আনন্দিত হয়, সুন্দরী সেই হারাণো রতন প্রাণের খোকনকে ক্রোড়ে পাইয়া সেই প্রকার আনন্দ লাভ করিলেন। তিনি তাহাকে বারবার মুখে রাখেন বুকে রাখেন। ঘনঘন মুখ চুম্বন করেন। নয়ন জলে ও স্তন্য দুগ্ধে তাঁহার বদন-বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তিনি যে কি বলিয়া অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন, কিছুই খুঁজিয়া পাইলেন না; তাই সজল-নয়নের নীরব ভাষায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া তিনি প্রভুদের পাদপদ্মে প্রণাম করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৌভাগ্যের প্রশংসা তখন শতমুখে উদ্‌ঘোষিত হইয়া উঠিল। আত্ম প্রশংসায় কেমন তাঁহার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। প্রভুদের নিকট বিদায় লইয়া তিনি গৃহগমনে উদ্যত হইলেন। তাঁহার পতিরও অবস্থা তাঁহারই মত। তাঁহার শরীরে কেমন আনন্দজড়তা আসিয়া গিয়াছে, তিনি যেন তখন আপন মনে আপনি নিমগ্ন, কে যেন তাঁর কথাটা সকলই হরিয়া লইয়াছে। পত্নীকে যাইতে উদ্যত দেখিয়া তিনিও কলের পুতুলের মত প্রভুদের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া তাঁহার সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। পরদিন ব্রাহ্মণ আনন্দমনে অনেক দান-পুণ্য করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের ভজনে জীবনের সীমা অতিক্রম করিয়া তিন জনেই তাঁহারা সচ্চিদানন্দ-সদনে চলিয়া গেলেন।

রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র।

—ঃ০ঃ—

পরীক্ষা পরীক্ষা পরীক্ষা ;—পরীক্ষার আর অন্ত নাই। এ সংসারে আসিয়া প্রবেশ করা হইতে আরম্ভ করিয়া বিদায় লওয়া পর্য্যন্ত পরীক্ষার দায়ে সদাই অস্থির। বিদ্যালয়ে পরীক্ষা, কর্ম্মস্থলে পরীক্ষা, গুরু-শিষ্যে পরীক্ষা, প্রভু-ভৃত্যে পরীক্ষা, স্বামী-স্ত্রীতে পরীক্ষা, পিতা-পুত্রে পরীক্ষা ;—চারিদিকেই পরীক্ষা। পরীক্ষার পরিধা যে কতদূর বিস্তৃত, কল্পনা তাহা নিরূপণ করিতে অসমর্থ।

মানুষের পরীক্ষাটা কেবল যে মানুষেরই হাতে তাহা নয়, অনেক অমানুষেও পরীক্ষকের আসন গ্রহণ করিয়া বসে। বলিতে কি, বাড়ীর পোষা টিয়াপাখীটা—কুকুর বিড়ালটা কি গোরুটা-ঘোড়াটাও বড় অল্প পরীক্ষা না করিয়া প্রীতি প্রকাশ করে না। আসল কথা ; যাহার কাছেই হউক, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারো ত ভালবাসা পাইবে,—অভিলষিত বস্তু করায়ত্ত করিতে পারিবে, না পারো তো তোমার আর কাহারও সহিত পোষাইবে না' সকলেই তোমার প্রতি বিরূপ হইয়া বসিবে।

এ তো গেল এ রাজ্যের কথা। এ পরীক্ষার জন্য বরং তত চিন্তা না-ও হইতে পারে। অন্তত বিধাতার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ আমরা,—আমাদের এ পরীক্ষার নিমিত্ত সতত প্রস্তুত থাকাটাই স্বাভাবিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ যখন পরীক্ষক হইয়া বসেন, তখন স্বল্পশক্তি মানব আর কি করিবে বল? সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া কি সহজ ব্যাপার?

সর্ব্বান্তর্য্যামী বিশ্বস্বামী কি আর বুঝেন না যে, তাঁহার কাছে পরীক্ষা দেওয়াটা আমাদের পক্ষে কত কঠিন ? তবুও না জানি লীলাময়ের কেমনই লীলা,—তিনি মানুষকে একটু মানুষের মত চলিতে দেখিলে,—একটু তাঁহার দিকে চলিতে দেখিলে, একটুআধটু পরীক্ষা না করিয়া থাকিতে পারেন না। বোধ হয়, তিনি এই পরীক্ষার ভঙ্গীতে জগৎকে দেখাইয়া থাকেন যে, তাঁহার রচনা-নৈপুণ্যের চরম উৎকর্ষ মনুষ্যের মধ্যে কত অসীম অনন্ত শক্তি—সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জিতথাকিয়াও তাহাকে অতিক্রম করিবার শক্তি বিরাজ করিতেছে,—কত দৃঢ়তা কত সহিষ্ণুতা, কত ঐকান্তিকতা কত ত্যাগশীলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজি তাহাকে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে।

তা তাঁহার পরীক্ষার যাহাই কেন উদ্দেশ্য থাকুক না, এ পরীক্ষার প্রবল তরঙ্গে পড়িয়া কিন্তু অনেককেই বিষম হাবুডুবু খাইতে হয়। কীর্ত্তিচন্দ্র রাজার পরীক্ষার কথাই আমাদের এ কথার সম্পূর্ণ সমর্থন করিবে।

জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত ভারতবর্ষে ভাগীরথীর পবিত্র তীরে পুণ্যকীর্ত্তি কীর্ত্তিচন্দ্র নৃপতি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজ্য পঞ্চাশৎ যোজন বিস্তৃত। সম্পত্তির ইয়ত্তা নাই। অগণিত সৈন্য-সামন্ত। দাস-দাসী অশ্ব-গজাদি যেমন থাকিতে হয়। কোন বিষয়েরই অভাব নাই। তিনি কিন্তু কমল-দলের জলের মত বিষয়ে থাকিয়াও বিষয়ে নির্লিপ্ত ; হরিভজনেই মজিয়া আছেন। পরনিন্দা পরচর্চ্চা কখনও কাণেও তুলেন না। জীবে দয়া—দীনদুঃখীর প্রতি দয়া তাঁহার শ্বাসপ্রশ্বাসের মত স্বাভাবিক। রাজ্যে পাঁচ ক্রোশ অন্তর সদাব্রত, গ্রামেগ্রামে জলাশয়—দেবালয়। এ সকলের ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত রাজভাণ্ডার সতত উন্মুক্ত। তাহার উপর তাঁহার ঢেঁটরা পিটাইয়া ঘোষণা করা আছে,—'যাহার বাড়ীতেই অতিথি আগমন

করিবেন, তাহাকেই পরমাদরে অতিথির সেবা করিতে হইবে। খরচ যাহা পড়িবে, তাহা রাজসরকার হইতেই মিলিবে। যদি কেহ এই আদেশের অন্যথাচরণ করে, তবে তাহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইবে।" ইহা ছাড়া তিনি আবার মধ্যেমধ্যে প্রজাবৃন্দকে ডাকাইয়া আনিয়া আপন সন্তানের মত সস্নেহ-উপদেশ দিতেন,—

"সাধুঙ্ক পাদে সেবা কর। শ্রীহরি ভজ নিরন্তর॥
বিপ্র-বৈষ্ণবে কর প্রীতি। দৃঢ় ভগতি কর নিতি॥"

ইহাতে তাঁহারও সুখ, প্রজাদেরও সুখ। ধার্ম্মিক ধরণীপতির আদর্শে ও উপদেশে প্রজাসকলের পরস্পর প্রীতি-সৌহার্দ্দ্য ছিল। বিবাদ-বিসংবাদ কাহাকে বলে, তাহারা জানিত না। তাই রাজ্যে শান্তির শীতল সমীরণ সর্ব্বদা প্রবাহিত। তাঁহার বিপুল অট্টালিকার চারিদিকেই শ্রীহরির লীলাচিত্র চিত্রিত। অন্তরের কথা,—যেদিকে চাহিব সেই দিকেই যেন কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছু দেখিতে না হয়;—বিষয় তাঁহাকে ভুলাইয়া দিলেও তাঁহার লীলাচিত্র যেন তাঁহাকে অন্তরে জাগাইয়া দেয়। প্রাসাদের প্রকোষ্ঠে-প্রকোষ্ঠে অলিন্দে-অলিন্দে শুক-সারী প্রভৃতি শিক্ষিত পক্ষী অবিশ্রান্ত রাধাকৃষ্ণ-নাম আবৃত্তি করিতেছে;—দেবগৃহে গৃহপ্রাঙ্গণে অনুক্ষণ হরি-সংকীর্ত্তন চলিতেছে;—কোথাও বা ভাগবতশাস্ত্র ব্যাখ্যা হইতেছে। নৃপতির শ্রবণ সেই রসেই লুব্ধ,—অন্য কথা শুনিতে তাঁহার প্রাণ নিতান্তই নারাজ। রাজভবনের সিংহদ্বারে অতি উচ্চ ধর্ম্মধ্বজা, তাহাতে পতপত-রবে পতাকা উড়িতেছে; সেই যেন হস্তচালন করিয়া অতিথি-অভ্যাগতকে সাদর আহ্বান করিতেছে। নৃপতির অতিথিসেবার এতই প্রীতি যে, তিনি দূত দ্বারা গ্রামের বাহির হইতে অতিথি বরণ করিয়া আনিয়া অভিলষিত ভোজন দানে এবং প্রার্থিত সামগ্রী বিতরণে তাঁহাদিগকে আনন্দিত করেন।

কীর্ত্তিচন্দ্রের এই দাতৃত্ব-কীর্ত্তি দিনদিন দেশেদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমে সকলের মুখেই তাঁহার দানীপণার প্রশংসা প্রচারিত হইতে থাকিল। সে প্রশংসা এতই বাড়িয়া গেল যে, এ রাজ্যে আর তাহার স্থান সঙ্কুলান হইল না। সে এ রাজ্য অতিক্রম করিয়া অতীন্দ্রিয় ভগবদ্রাজ্যে যাইয়া প্রবেশ করিল। ভগবানের আর স্থির থাকা দায়। তিনি অমনি দৃঢ়তা পরীক্ষা করিবার জন্য প্রধাবিত হইলেন। নটবরের তো আর বেশ বদলাইতে বড় বাধে না, যখন যেমন প্রয়োজন, বিনা আয়োজনে তেমন বেশ ধরাটা তাঁহার গোড়াগুড়ি রপ্ত। তবে এবার নাকি অতিথিভক্তির পরীক্ষক হইয়া যাইতে হইতেছে, তাই তিনি ছাই-ভস্মমাখা ছাপাতিলক-আঁকা কপনি-আঁটা—জটাধারী তপস্বীর বেশে কীর্ত্তিচন্দ্রের দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আহা, তাঁহাকে সেই দেখে, সেই বলে,—এমন মন-মজানো রূপ তো কখনও দেখি নাই! অহো ইহাঁর কণ্ঠে কি সুন্দর তুলসীমালা সংলগ্ন! স্কন্ধে কি শুভ্র যজ্ঞোপবীত শোভমান! এ যেন সাক্ষাৎ ব্রহ্মতেজ,—সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব!

ঠাকুর তো এই তেজোদ্দীপ্ত তপস্বীর বেশে অতিথিরূপে কীর্ত্তিচন্দ্রের দ্বারদেশে যাইয়া বেদধ্বনি করিতে থাকুন, রাজাও অমনি পাত্র-মিত্র-সমভিব্যাহারে আসিয়া তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইয়া অনেক স্তব-স্তুতি আরম্ভ করিয়া দিলেন। অতিথির মুখে কৃষ্ণগীতি শুনিয়া নৃপতির আর আনন্দ ধরে না। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁহার পদ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া সেই চরণামৃত পান করিলেন। বিনয়-বচনে বলিলেন,—অহো, আজ আমার পুরী পবিত্র হইল পবিত্র হইল, আপনার চরণরজে আমার দেহ-গেহ পাপমুক্ত হইয়া গেল। প্রভু হে! কৃপা করিয়া বলুন, এ অধম আপনার কোন্ আদেশ প্রতিপালন করিবে?

মায়াতপস্বী মৃদু মধুর হাস্য করিতেকরিতে নরনাথকে বলিলেন,—

বেশ বেশ, আমি তোমার বিনয়-বিনম্র ব্যবহারে যার-পর নাই প্রীতিলাভ করিলাম। কি জান বাপু! আমি আজন্ম সন্ন্যাসী। বনেই থাকি, বনেরই ফলমুল আহার করি; আর দিন নাই রাত্রি নাই তপস্যা করিয়া থাকি। বহুদিন তপশ্চর্য্যার পর সংপ্রতি আমার সংকল্প সংসিদ্ধ হইয়াছে তাই ভাবিলাম,—ভাল, একবার বনের বাহিরটাই কি রকম বেড়াইয়া আসিনা কেন। এ-দেশে সে-দেশে বেড়াইতেবেড়াইতে তোমার দেশে আসিয়া গিয়াছি। তোমার কীর্ত্তিকুসুমের সুবাসে চারিদিক্‌টাই আমোদিত। তাহার আকর্ষণে তোমার নিকটে আসিয়া পড়িয়াছি। কিছু প্রার্থনা করিতেও ইচ্ছা হইতেছে, পূরণ করিতে পারিবে কি? তা তুমি যেরূপ দাতা শুনিতেছি, হয় তো তোমার অসাধ্যও হইবে না।

মায়াভিখারীর মুখের কথা ফুরাইতে-না-ফুরাইতে ভূপতি অমনি মিনতি করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—কি কি, বলুন না বলুন না, এ দাস আপনার আদেশ প্রতিপালন করিতে এখনই প্রস্তুত। কৃপা করিয়া বলুন,—কি চাই? হস্তী-অশ্ব ধন রত্ন বসন-ভূষণ ভুমি-ধান্য যাহা চাহিবেন, তাহাই পাইবেন। অধিক কি, প্রার্থনা করেন তো এ রাজপদ প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হইব না, জানিবেন। অনুগ্রহপূর্ব্বক অনুমতি করুন,—আপনার কোন্ অভিলষিত বস্তু প্রদানের অধিকার পাইয়া এ দাস কৃতার্থ হইতে পারিবে?

পরীক্ষক ঠাকুর এবার যেন একটু গুরুগম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। মুখের হাসি মুখেই মিশাইয়া দিয়া হস্তসঙ্কেতে আস্তেআস্তে তাঁহাকে বলিলেন,—দেখ বাপু, সে অতি গোপনীয় কথা, সকলের সম্মুখে বলা চলে না; একটু নিরালায় পাইলে বলিতে পারি।

রাজা বলিলেন,—তার আর কি? চলুন,—কৃপা করিয়া ঐ মন্ত্রণা-প্রকোষ্ঠে চলুন, যাহা বলিবার ঐখানেই বলিবেন এখন। এই বলিয়া তিনি সভাসদ্‌বৃন্দকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার আদেশ দিয়া সন্ন্যাসীকে

লইয়া উক্ত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। পরীক্ষক মহাশয়ও অমনি একবার এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া লইয়া 'প্রশ্নপত্র'খানি প্রকাশ করিলেন। মহা-গম্ভীরভাবে যতদূর সম্ভব ধীরেধীরে বলিলেন,—দেখ বাপু, আমি সুদীর্ঘ-কাল ধরিয়া তপস্যাই করিতেছিলাম, তাই কাম আর আমাকে আক্রমণ করিবার সুযোগ পায় নাই। তাই তাহার মনেমনে আমার উপর ভারি রাগ ছিল। এখন তপস্যা হইতে তফাৎ হইতে দেখিয়া সে আমাকে একেবারে পাইয়া বসিয়াছে। বলিতে কি, তাহার জ্বালায় আমায় অস্থির করিয়া ফেলিয়াছে। কেবলই কামকেলি করিবার প্রবৃত্তি। করি কি? পরিণীতা পত্নী নাই। পণ্যস্ত্রীতেও উপগত হইতে পারি না। শুনিলাম,—তোমার পত্নী পদ্মিনী রাণী নাকি রূপে গুণে অতুলনা এবং যার-পর-নাই পতিপরায়ণা। তার উপর তোমার অতিথিসেবায় নিষ্ঠা আছে, হয় তো তোমার কাছে আমার প্রার্থনাটা জানাইলে নিষ্ফল হইবে না, তাই তোমার যশ শুনিয়া তোমারই কাছে আসিলাম। প্রার্থনা এখন বুঝিতেই পারি-তেছ,—তোমার কামিনীকে আজিকার রজনীতে আমার কামবিলাসের সহকারিণী হইতে হইবে। এখন বল,—আমার কামনা পূর্ণ হইবে কি না?

রাজার তো আর "না" বলিবার রেয়াজ নাই,—কখনও তো তিনি কোন অতিথিকে "না,—দিতে পারিব না" বলিয়া বিদায় দেন নাই, তাই এই উদ্ধত অতিথিকে আশ্বাসের বাণী বলিবার সময় তাঁহার রসনা দুই একবার প্রকম্পিত হইল বটে, কিন্তু তিনি মুখ ফুটিয়া "না" কথাটি বলিতে পারিলেন না। কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—এ-ই প্রার্থনা? তার আর কি, প্রাণ চাহিলেও আপনাকে তাহা অদেয় হইত না। আসুন, বিশ্রাম করুন, স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া সুখে নিদ্রা যান; নিশার আগমনের সঙ্গে-সঙ্গেই আপনার আশা পূর্ণতা লাভ করিবে। এই বলিয়া নৃপবর তাঁহাকে

বিশ্রামমন্দিরে লইয়া গিয়া সেবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া সভায় প্রত্যাগমন করিলেন। যথাকালে সভা ভঙ্গ হইল। তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মহিষীকে সকল কথা জানাইলেন। পতিব্রতা সে কথায় প্রতিবাদ করিলেন না ; কেবল বলিলেন,—

"যেউঁ দিনরু পিতা মোতে। সমর্পি দেলে তুম্ভ হস্তে॥
সে দিনু হোইচ্ছি তুম্ভর। তু নাথ যাহা ইচ্ছা কর॥"

প্রাণনাথ! যে দিন পিতা আমায় তোমার করে আমাকে সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন, সেই দিন হইতে আমি তোমার হইয়া গিয়াছি। তোমার সামগ্রী লইয়া তুমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে, আমার আর তাহাতে বক্তব্য কি আছে?

সতীর কথায় নৃপতির বড় আনন্দ হইল। তিনি হর্ষভরে তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন এবং তাহার পতি-অনুরাগের শতমুখে প্রশংসা করিতে করিতে বহির্ব্বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন। তিনি অন্য দিনের মত দৈনিক সকল কর্ম্মই সম্পন্ন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু অতিথির আগমনে নূতন চিন্তা আজ তাঁহার অন্তর অধিকার করিয়া বসিয়াছে। কেবলই ভাবেন, তাই তো এ অতিথি কে? নিশ্চয়ই ইনি সামান্য কেহ হইবেন না। ইঁহার অঙ্গের দিব্য জ্যোতি, পবিত্র সৌরভ এবং প্রশান্ত ভাব যেন ঐ কথাই বলিয়া দিতেছে। আর আমি এ দেশের অধিপতি, আমার কাছে আমার পত্নীর রতি-ভিক্ষা কি যে-সে লোকের কাজ? এ সাহস কি সহসা কাহারও হইতে পারে? ভাল, দেখাই যাউক, লীলাময়ের এ আবার কি অপূর্ব্ব লীলাভঙ্গী!

সন্ধ্যা হইল। পুরবী-রাগিণী আলাপ করিয়া নহবৎ বাজিয়া উঠিল। দেবালয়ে কাংস্য-করতাল মৃদঙ্গ-মন্দিরা সহযোগে আরতিকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। সায়ংকৃত্য সমাপন করিয়া ভূপতি অতিথির নিকটে আসিলেন,

ভূপতিত প্রণাম পূর্ব্বক বলিলেন,—প্রভু, শুভ বিজয় করুন, চলুন আপনাকে রাণীর মন্দিরে রাখিয়া আসি। তিনিও "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহার সহিত অন্তঃপুরে যাইয়া প্রবেশ করিলেন। দূর হইতেই দেখিলেন কীর্ত্তিচন্দ্রের কৌমুদী—পদ্মিনী দেবী যেন পাতিব্রত্যের পীযূষরশ্মিতে গৃহ আলোকিত করিয়া বসিয়া আছেন। চারিদিকে তারকা-নিকরের মত সহচরীবৃন্দ—আনন্দমনে বৃন্দাবনচন্দ্রের সায়ংকালোচিত লীলাগানে তন্ময় দেখিয়া বড় সুখ হইল।

অকস্মাৎ একজন অপরিচিত সন্ন্যাসীর সহিত নৃপতিকে আসিতে দেখিয়া সহচরীবর্গ বিস্ময়েবিস্ময়ে সরিয়া পড়িল। রাজমহিষীও সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। মহীপতি মহিষীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—প্রিয়তমে! অদ্য রাত্রে এই অতিথিই তোমার পতি; দেখো যেন সেবায় কোনরূপ ত্রুটি না হয়; আমি চলিলাম। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন, রাণীও অমনি সন্ন্যাসীর চরণতলে পতিত হইয়া বিনয়-বচনে বলিলেন,—দেব! আপনি যে-ই হউন, পতির অনুমতি অনুসারে আজ আপনিই আমার পতি। পতিই সতীর একমাত্র গতি; আমি সর্ব্বতো-ভাবে আপনার চরণে আত্মসমর্পণ করিলাম; এখন আপনার যাহা ইচ্ছা। এই বলিয়া তিনি মায়া-তপস্বীর পদযুগল সুগন্ধি সলিলে প্রক্ষালন করিয়া—কেশপাশে মুছাইয়া দিয়া পরমাদরে পালঙ্কের উপর উপবেশন করাইলেন এবং আদেশের প্রতীক্ষায় মৃদুমৃদু পাদ-সংবাহন করিতে লাগিলেন।

যাহার জন্য মদনমোহনের মদন-বেদন তাহা তো সিদ্ধ হইল,—রাজা-রাণীর ভাবের সোণা খাঁটী কি না, তাহার তো পরীক্ষা হইল, কিন্তু তবুও কি জানি কেন, পরীক্ষক ঠাকুরের মন তাহাতেও উঠিল না। তিনি আরও এক মাত্রা চড়াইয়া দিয়া আবার এক অভিনব পরীক্ষার অবতারণা

করিলেন। যাঁহার নামে-যশে জগৎ মোহিত, স্বয়ং তাঁহাকে আর কাহাকেও মোহিত করিতে বড় বিলম্ব হয় না। তিনি রাণীকে মোহিত করিয়া তাঁহার অঙ্গের সকল অলঙ্কার খুলিয়া লইয়া অন্তর্হিত হইলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল, এক প্রহর বেলাও হইয়া গেল, তবুও রাণীর দেখা নাই। ব্যাপারখানা কি? সন্দেহেসন্দেহে সহচরীবৃন্দ রাণীর মন্দিরদ্বারে আসিয়া দেখা দিল। দ্বার উন্মুক্ত দেখিয়া কেমন তাহাদের সন্দেহ হইল। সত্বর গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখে,—হায় কি সর্ব্বনাশ, একলা রাণী পালঙ্কের উপর পড়িয়া আছেন, তাঁহার দেহে প্রাণ নাই, অঙ্গে অলঙ্কার নাই; আর সেই সন্ন্যাসীও সেখানে নাই!

তাহারা তাড়াতাড়ি নৃপতির অগ্রে আসিয়া কাঁদিতেকাঁদিতে বলিতে লাগিল,—সর্ব্বনাশ হইয়াছে, মহারাজ। সর্ব্বনাশ হইয়াছে। সেই সন্ন্যাসীটা আপনার মহিষীকে মারিয়া অলঙ্কারগুলি লইয়া চম্পট দিয়াছে মহারাজ! চম্পট দিয়াছে।

নরনাথ কথা কয়টা কানে শুনিলেন বটে, কিন্তু প্রাণে তাহার সায় পাইলেন না। তিনি তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন,—তোমরা কেঁদোনা গো কেঁদোনা; তপস্বী কখনও কি মহিষীকে মারিতে পারেন? রাণী মরিয়া থাকেন তো আপন দোষেই মরিয়াছেন। না জানি তিনি সন্ন্যাসীর চরণে কি গুরুতর অপরাধই করিয়াছেন। সেই অপরাধের ফলেই তাঁহার এই অকাল মৃত্যু। যাও,—তোমরা যাও, দেখ, সেই সন্ন্যাসী কোথাও আছেন কিনা? আমিও দেশেদেশে দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহার তত্ত্ব লইতেছি।

সহচররা আর করে কি? তাহারা নয়নের বারি নয়নেই নিরুদ্ধ করিয়া অন্তরেঅন্তরে কাঁদিতেকাঁদিতে অন্তঃপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল নৃপতিও পাত্র-মিত্র দূত-দৌবারিক সকলকে আহ্বান করিয়া বলিয়া

দিলেন,—দেখ, তোমরা যেখানে পাও, সেইখান হইতে সেই সন্ন্যাসীকে সসম্মানে লইয়া আইস, নচেৎ আমার আর জীবনের সম্ভাবনা নাই।

আদেশ পাইবামাত্র সকলেই সন্ন্যাসী অন্বেষণে বহির্গত হইল নরনাথের অন্তরের কথা অন্তর্য্যামী নারায়ণের অবিদিত রহিল না; তিনিও রাজবাটীর নিকটেই পথিমধ্যে বসিয়া রহিলেন। ভারি গম্ভীর ভাব; যেন কিছু জানেনই না। এদিকে কয়েকজন দূত খুঁজিতেখুঁজিতে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। তাহারা অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া তাঁহাকে মহারাজের নিকটে লইয়া গেল। তিনি তপস্বীকে দেখিয়া সিংহাসন হইতে উঠিয়া যষ্টির মত তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইলেন এবং বারংবার ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া কত কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিলেন। প্রধান কথা,—প্রভু হে! আমার মহিষী—স্ত্রীজাতি, সে সেবা করিতে যাইয়া না জানি কি ভীষণ অপরাধই করিয়াছে; তাই বলিয়া কি তোমায় রুষ্ট হইতে হয় যোগেশ্বর? কই আমাকেই বা কোন্ সেই অপরাধের কথা জানালে? আমিই তাহার সমুচিত শাস্তি বিধান করিতাম। ক্ষমা কর প্রভু! ক্ষমা কর।

কপট-তপস্বী এইবার ধরানাথের কাছে যেন ধরা দিবার সুরে অথচ কিছু রাখিয়া-ঢাকিয়া বলিতে লাগিলেন,—দেখ কীর্ত্তিচন্দ্র! আমি তোমার প্রতি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। তাই দুইটা প্রাণের কথা ক'ই,—আপন স্বভাবেরও পরিচয়টা দিই,—

'যে আম্ভ-পাদে সেবা করে। অত্যন্ত হরষমনরে॥
তাহাঙ্কু দেউঁ আম্ভে দুঃখ। সে যেবে হোইব বিমুখ॥
তাহাঙ্কু চ্ছাড়ি আম্ভে যাউঁ। লোড়িলে পাইব সে কাহুঁ॥
যে দুঃখে সুখ পাইঁ হৃদে। লেউটি সেবে আম্ভ পাদে॥
তাহাঙ্কু চ্ছাড়িত না পারু। সে কাহি যিব মো আগরু॥

সে মোতে চ্ছাড়িব বোইলে। মুঁ তাকু ন চ্ছাড়ইঁ ভলে ॥
সে মোতে চ্ছাড়িলে অবশ্য। মুঁ যে ন চ্ছাড়ে তার পাশ ॥
যেতেহেঁ দূরে থিলে রহি! চিন্তিলে পারুশে মিলই ॥
সে মোর জন্মর প্রকৃতি। যাহা লিখিচ্ছি প্রজাপতি ॥
কে তাহা করিবটি আন। এ কথা বুঝ হে রাজন ॥

যে আনন্দমনে আমার চরণসেবা করে, আমি তাহাকে দুঃখ দিয়া থাকি। সে যদি তাহাতেই বিমুখ হইয়া যায়, আমি তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাই; আর সে আমার পাছুপাছু ছুটাছুটি করিলেও আমাকে কিছুতেই পাইয়া উঠে না। আর সে আমার দেওয়া দুঃখকে সুখ মনে করিয়া—ফিরিয়া-ঘুরিয়া আমারই সেবা করে, আমি তাহাকে ছাড়িতে পারি না। সে আর তখন আমার সম্মুখ হইতে কোথাও যাইতে পারে না। সে যদি আমাকে ছাড়িব-ছাড়িব বলে তো আমি তাহাকে কিছুতেই ছাড়ি না। সে যদি কখনও ছাড়িয়াও যায়, আমি তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করি না। যতদূরেই থাকুক না কেন, যে যদি আমাকে একবার মনে করে, আমি অমনি তাহার পার্শ্বে যাইয়া মিলিত হই। ইহাই আমার জন্মগত স্বভাব। বিধাতা আমার ললাটে এইরূপই লিখিয়াছেন। কে আর ইহার অন্যথা করিবে বল? রাজন্! তুমি এখন এই কয়টা কথা আলোচনা করিয়া দেখ, সকলই বুঝিতে পারিবে। বুঝিয়া-সুঝিয়া আমার উপর যাহা করিতে হয়, করিতে পার।

কীর্ত্তিচন্দ্র ছদ্ম-তপস্বীর কথার আভাস যেন কতকটা বুঝিতে পারিলেন। তিনি তাঁহার চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন এবং অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। স্বর্ণ-ঝারির শীতল বারিতে চরণ দুইটি ধুয়াইয়া দিয়া সেই চরণোদক রাণীর আননে অর্পণ করিলেন। নয়নজলে বয়ান ভাসাইয়া সরল বিশ্বাসের আশ্বাসের ভাষায় বলিয়া উঠিলেন,—রাণি রাণি। আজ আমাদের সৌভাগ্যের আর সীমা নাই,—

আমাদের উপর ব্রহ্মযতির কৃপা হইয়াছে। সাধুর পাদবারি পান করিয়া তুমি আজি মুক্তির অধিকারী হইয়া গিয়াছ। আর তোমার শরীরে পাপ নাই। শাস্ত্রে বলে,—সাধুর পাদসলিল কিঞ্চিৎ পান করিয়া মস্তকে ধারণ করিলে গঙ্গাস্নানের সমান পুণ্য হইয়া থাকে। তাহার শক্তি ভাষায় অভিব্যক্ত করা যায় না। এ কথা কি মিথ্যা? কখনই নয়—কখনই নয়। সতি! তুমি এই পরম সত্য শাস্ত্রীয় বাণীর প্রসাদে জীবনলাভ কর। সাধুর পবিত্র পাদজলের মহিমা দেশেদেশে উদ্‌ঘোষিত হইতে থাকুক।

বলিতে-বলিতে পদ্মিনী রাণী পদ্মনয়ন উন্মীলন করিলেন। সহচরীগণের মহা হর্ষকোলাহলের মধ্যে তিনি নিদ্রোত্থিতের মত উঠিয়া বসিলেন। এইবার মহারাজ মহাহর্ষে রাশিরাশি ধনরত্ন আনিয়া তপস্বীর চরণতলে রাশীকৃত করিয়া দিলেন। কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—গোঁসাই হে! নাও,—এই ধনরত্ন সমস্তই তুমি লইয়া যাও; ও দুইখানা সামান্য গহনায় আর তোমার কি হইবে বল? যাইবার সময় প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া যাও,—যেন তোমাদের পাদপদ্মে আমাদের মতিগতি থাকে;—তোমাদের দেওয়া দুঃখকেও আমরা পরম সুখ বলিয়া মনে করিতে পারি।

ভগবান্ তো আর নাই! ভক্তের দৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতায় তিনি বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রচ্ছন্ন বেশ তখন বজায় রাখা কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি আনন্দাশ্রু-পরিপ্লুত নয়নে তাঁহাদের সন্তাপ দূর করিতে-করিতে বলিতে লাগিলেন,—ধন্য রাজা! ধন্য তুমি, তোমার মহিষীও ধন্য-ধন্য। তোমরা সংসারে আদর্শ স্ত্রী-পুরুষ। তোমরাই তোমাদের তুলনার স্থান অধিকার করিয়াছ। তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হউক। ইহলোকে তোমরা সর্ব্ববিধ সুখসম্পত্তি উপভোগ করিয়া কীর্ত্তিত অমর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া অমরধামে চলিয়া যাও।

পরীক্ষক ঠাকুর আর আপনাকে সামলাইতে পারিলেন না তাঁহার

সেই সন্ন্যাসীর ভেক ভেদ করিয়া তাঁহার সেই শ্যামল-সুন্দর দিব্য মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া পড়িল। দেখিয়া রাজারাণীর মানবজীবন সার্থক হইয়া গেল। পরীক্ষক ঠাকুরও এইরূপে তাঁহাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পুরস্কার-স্বরূপ স্বকীয় সাক্ষাৎকার দিয়া অন্তর্হিত হইয়া পড়িলেন। এ দৃশ্য কিন্তু রাজা রাণী ছাড়া অন্য কেহ দেখিতে পাইল না। তাঁহাদের মতন ভাবের নয়ন তো আর সকলের নাই? তাই তাহারা সন্ন্যাসীর আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে মহা বিস্ময় প্রকাশ করিল। আনন্দ-হলহলায় রাজপুরী যেন অমরাপুরী হইয়া পড়িল। রাজা-রাণী আনন্দভরে অপ্রমিত ধনরত্ন বিতরণ করিলেন। ইহলোকের সকল সুখ উপভোগ করিয়া দেহাবসানে দিব্য ধামে উপনীত হইলেন। কীর্ত্তিচন্দ্রের কীর্ত্তিকিরণে চারিদিক্ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল,—পদ্মিনীরাণীর যশের সৌরভে সকল ভুবন ভরিয়া গেল।

অনন্ত শবর

—ঃ০ঃ—

ভগবানের নামের কি মহীয়সী শক্তি, ভাবে বা অ-ভাবে তাঁহার কিছু আসিয়া যায় না। ঠিক যেন অগ্নি; জ্ঞানপূর্ব্বকই হাত দাও, আর অজ্ঞানপূর্ব্বকই হাত দাও, সমান কথা,—হাত তোমার পুড়িবেই। ভগবানের নামও ভাবভরে গ্রহণ কর, আর ভাবহীন হইয়াই গ্রহণ কর, সমান কথা—পাপরাশি ভস্মীভূত হইবেই। তা না হইলে কি আর অনন্তশবরের সদ্গতি লাভ হইত?

অনন্তশবরের নিরূপিত নিবাস ছিল না। শিকারের সুবিধা বুঝিয়া যেখানে-সেখানে স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া গাছ-পাতার ঝোপড়ায় কাল-যাপন করিত। দেহ সুগঠিত এবং বলিষ্ঠ। সাহসের সীমা নাই। ক্রূরতার অন্ত নাই। জীবহিংসা জীবিকা। তাহাতেই তাহার পরম সুখ। পশু মার, পক্ষী মার, উদর ভরিয়া মাংস আহার কর, আর মৃগচর্ম্মাদি বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে আকণ্ঠ-পূরিয়া মদ্য পান কর; ইহা ছাড়া সে বড় একটা কিছু জানিত না। ইহাই তাহার ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ—চতুর্ব্বর্গ।

অনন্ত যখন তাহার সেই আব্লুস্-কাষ্ঠ হইতে কুঁদিয়া বাহির করা চেয়ারাখানির উপর শিকারের বেশ চড়াইত, তখন যেন রৌদ্ররস মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিত। মাথায় ঝুঁটিবাধা চুল। তাহার চারিধারে পাখীর পালক। চক্ষু দুইটা যেন অরুণের টুক্‌রা। পৃষ্ঠে শরপূর্ণ তূণ। হস্তে জ্যাযুক্ত ধনু। উন্নত বক্ষে ও পৃষ্ঠে চর্ম্ম-আচ্ছাদন। চর্ম্মবস্ত্র পরিধান। কটিতে কোষবদ্ধ শাণিত ভূজালি। দেখিলেই ভীতির উদ্রেক করে।

এই বেশ হইল তাহার পশু-শিকারের, কিন্তু পক্ষি-শিকারের বেশ অন্যরূপ। তাহাতে বরং কিছু মোলায়েম ভাব দেখা যাইত। সে পক্ষীগুলিকে বাণবিদ্ধ না করিয়া জীবিত ধরিতেই অধিক ভাল বাসিত। কারণ, জীবন্ত পক্ষীতেই পয়সা অধিক মিলে। তাই তীর-ধনুর পরিবর্ত্তে এক-তাড়া আটাকাটি এবং একটী লতা-পাতায় ঢাকা বাঁশের ঝাঁপ লইয়া পক্ষিশিকারে গমন করিত। পক্ষীরা যাহাতে তাহাকে দেখিতে না পায়, অথচ লতাপাতার আবরণে প্রতারিত হয়, এই ভাবে ঐ ঝাঁপের অন্তরালে থাকিয়া সে সাবধানে আটাকাটি চালাইত। একটা প্রকাণ্ড লম্বা আটাকাটি লইয়া গেলে পাছে পাখীরা ভয় পাইয়া পলাইয়া যায়, তাই সে অনেক খণ্ডে বিভক্ত করিয়া কাটিগুলি তাড়া বাঁধিয়া লইয়া যাইত। প্রথম একটি সরু কাটি—তাহার আগায় আটামাখানো, সেইটী ঝাঁপের মধ্য দিয়া চালাইয়া দিল, তাহাতে নাগাল না পাইলে ঐ কাটির গোড়ায় আর একটি অপেক্ষাকৃত মোটা কাটি জুড়িয়া দিল, তাহাতে নাগাল পাইল ত উত্তম, নচেৎ পরপর আরও মোটামোটা কয়টি কাটি জুড়িয়া জুড়িয়া টক্ করিয়া আটা দিয়া পাখীটীকে আটকাইয়া ফেলিল। তার পর পৃষ্ঠে স্থিত এক খাঁচায় তাহাকে রাখিয়া দিল। আর যদি আটাকাটি দিয়া নিতান্ত নাগাল না পাইল, তবেই গুল্‌তি ছুড়িয়া তাহাদিগকে সংহার করিল। এই জন্য তাহার কোমরের একদিকে একটি বাঁশের চোঙায় কতকটা আটা এবং অপর দিকে একটা থলির মধ্যে কতকগুলি মাটির গুলি থাকিত। একটা ছোট হাত-গুল্‌তিও ঐ থলির পার্শ্বে রক্ষিত হইত।

তাহার হিংসা-কলুষিত কঠোর জীবন এই ভাবেই কাটিয়া যাইতেছে। মানবের চিন্তনীয় একটি কথাও তাহার প্রাণে একটি দিনও জাগে না। এই বিচিত্রতাপূর্ণ বিশ্বের কেহ নিয়ন্তা আছেন কি না?—যদি থাকেন তো তিনি কে বা কেমন?তাঁহার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ আছে কি না?—

দেখা-শুনাই বা হইতে পারে কি না ?—এ ভাবের কোন একটি কথাই তাহার অন্তরে জাগরূক হয় না। সে তো বনে-বনেই থাকে, পশুপক্ষী লইয়াই কারকারবার করে, কিন্তু তাহাদের পরমাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য একটি দিনও তাহার নির্ম্মম নয়নকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই, বিহঙ্গমের সঙ্গীতও তাহার কুলিশসার-নির্ম্মিত চিত্তকে একটি দিনও বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই। হায় তাহার হতভাগ্য !

বহুদিন এই ভাবেই কাটিয়া গেল। তার ভিতর নূতনত্ব কিছুই নাই। একদিন ঘটনাচক্রে সে এক বনমধ্যে পক্ষী শিকার করিতে গিয়াছে। বিজন বন। নিস্তব্ধতার রাজত্ব। শব্দের মধ্যে কেবল ঝিঁঝিঁপোকার একঘেয়ে ডাক, আর মধ্যেমধ্যে দু'একটা পশুপক্ষীর কিংবা বৃক্ষবল্লরীর পত্রপতনের শব্দ। তবু বন নিস্তব্ধ। কেননা, এসকল শব্দ বনভূমির স্বাভাবিক। সে-দিন কিন্তু ঐ স্বাভাবিক শব্দ ভেদ করিয়া বনমধ্যে এক অভিনব শব্দ অকস্মাৎ উত্থিত হইল,—

"রাধা কৃষ্ণ-রাধা কৃষ্ণ-রাধা কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম"

শব্দ শুনিয়া শবর চমকিয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল,—শব্দের মাধুর্য্য যেন সমগ্র বনভূমিকে সুধাসিক্ত করিয়া তাহার কর্ণ দুইটীকে মিষ্টরসে পূর্ণ করিয়া ফেলিল। বারবার ভাবে,—আহা আহা, কি মিষ্ট কি মিষ্ট ! সংসারে কি এমন মিষ্ট সামগ্রী আছে ? কই, শিশু-সন্তানের অধরপ্রান্তে, শবরীর স্নেহসম্ভাষণে, মহুয়ার মদ্যে বা বিবিধ মাংসে তো একটি দিনও এ মিষ্টতার আভাসও পাই নাই ? কোন্ মিষ্টরসে আপনা চুবাইয়া কাহার এ কণ্ঠস্বর কাণের ভিতর দিয়া মরমে গিয়া পশিতেছে গো। আহা আহা, কি মিষ্ট কি মিষ্ট !—

"রাধা কৃষ্ণ-রাধা কৃষ্ণ-রাধা কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম"

অনন্তশবরের বয়স বেশী হইয়াছে, তবু সে ভগবানের ভুবনমঙ্গল

নাম কখনও ভুলিয়াও শুনে নাই,—বলে নাই। কিন্তু আজ তাহার কি জানি কি সুকৃতির পরিণতি, সে আজ মধুসূদনের মধুমাখা নাম শুনিয়া সংসারের মধুরস সমস্তই বিস্মৃতির পথে আনিতে বসিয়াছে! সে সেই শব্দের উদ্ভবস্থান স্থির করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল। তৃষিত নয়নে এদিক্ ওদিক্ দেখিতেদেখিতে দেখিতে-পাইল,—এক শুকপক্ষী এক বৃক্ষের উচ্চ শাখে বসিয়া ঐ নাম আবৃত্তি করিতেছে।

পক্ষীটী কাহার পোষা ছিল, তাহার পায়ের কাটা শিকলটী সে পরিচয় দিয়া দিতেছে, কিন্তু ভগবন্নামের কি বিচিত্র শক্তি, বন্ধনমুক্ত বিহঙ্গমও সে নাম বিস্মৃত হইতে পারে নাই। বরং মুক্তদেহে মুক্তপ্রাণে আরও রসাল করিয়া সেই নাম সে মুক্তকণ্ঠে আবর্ত্তন করিয়া সমস্ত বনস্থলী নামময় করিয়া তুলিয়াছে।

ব্যাধের আর বিলম্ব সহিল না। সে ত্বরিতগতি সেই বৃক্ষতলে গমন করিল এবং আটাকাটি দিয়া পক্ষীটীকে ধরিয়া ফেলিল। ধরিতে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হইল না, কৌশলও বিস্তার করিতে হইল না। কেন না, নামের নেশাতেই হউক, কিংবা অপর কারণেই হউক, পক্ষীটী আপনা হইতে আপনাহারা ছিল।

অনন্ত তাহাকে হস্তে লইয়া বারবার নিরীক্ষণ করে, আর মনেমনে ভাবে,—আহাএ বনের পাখী, এ মানুষের বুলি বলিতে শিখিল কি প্রকারে? সে তো আহার আর নিদ্রা ছাড়া সংসারের কোন সংবাদই রাখে না, তাই সে পাখীর মুখে মানুষের ভাষা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া পড়িল। বিস্ময়ের একটু বিশেষ কারণ, পাখীটা ধরা পড়িয়াও জাতীয় বুলি না বলিয়া সেই "রাধা কৃষ্ণ", বুলি বলিয়া চেঁচাইতে আরম্ভ করিল। "রাধা কৃষ্ণ" বুলি যে ভগবানের নাম, শবর তাহা জানে না। এই মাত্র জানে যে, উহা মানুষের বুলি। এইটুকু বুঝিয়াই তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কিন্তু

বস্তুশক্তি যাইবে কোথায় ? নাম যখন একবার তাহার অন্তর অধিকার করিতে পারিয়াছেন, তখন আর রক্ষা নাই। তখন হইতেই তাহার অন্তরে নামের কার্য্য আরম্ভ হইল ! সে চলেচলে আর মনেমনে বলে,—

"রাধা কৃষ্ণ-রাধা কৃষ্ণ-রাধা কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম"

আর তাহার অপর পক্ষী শিকার করা হইল না। সে সেই শুক-পক্ষীটীকে এবং পূর্ব্বে যাহা কিছু শিকার করা হইয়াছে, সেই গুলিকে লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সে দিন আর তাহার আহারাদি বড় ভাল লাগিল না, মদ্যপানেও অভিলাষ হইল না ; কেবলই মনেমনে ঐ নামের কথা তোলাপাড়া করে। পরদিন প্রাতঃকাল হইতে-না-হইতেই সে পক্ষীর তত্ত্ব বুঝিবার নিমিত্ত গ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিল ; শিকারে যাওয়া হইল না। সে গ্রামবাসীদের যাহাকে দেখে, বিস্ময়েবিস্ময়ে তাহাকেই পক্ষীর কথা জিজ্ঞাসা করে।—বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়ন দুইটী বাহির করিয়া বলে,—দেখ গা, এ পাখীটা মানুষের বুলি বলে গো মানুষের বুলি বলে। খালি বলে,—

"রাধা কৃষ্ণ-রাধা কৃষ্ণ-রাধা কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম"

সকলেই তাহাকে উত্তর দেয়'—পাখীটা কাহারও পোষা পাখী, তাই ও মানুষের বুলি বলিতে শিখিয়াছে। অনন্ত কিন্তু এ কথায় শান্তি পাইল না,—চিন্তারও পার পাইল না। পাইবে কোথা হইতে ? সে তো পাখী ধরিয়াই থাকে বা মারিয়াই থাকে, পাখী পুষিয়া তো আর কখনও পড়াইতে শিখায় নাই ? বরং সে ভাবিয়া স্থির করিল,—এ পাখীটা বড় অলক্ষুণে, আজ তাহার শিকারে যাওয়াই বন্ধ করিয়া দিয়াছে,—মনও কেমন বিগ্ড়াইয়া দিয়াছে। নাঃ, ইহাকে আর কাছে রাখা কিছু নয় ; যে দামে হয় বেচিয়া ফেল।

পড়া পাখী ; খরিদদার জুটিতে একটুও দেরি হইল না। মূল্য বরং

কিঞ্চিৎ অধিকই মিলিল। কিন্তু তাহাতেও অব্যাহতি নাই। সে যাই পাখীটা বেচিয়া ঘরের পথ ধরিল, একলা পাইয়া নাম আসিয়া আবার তাহাকে আক্রমণ করিয়া বসিল। সে ছাড়ান পাইতে চাহিলেও নাম আর তাহাকে ছাড়ে না। সেই "রাধা কৃষ্ণ-রাধা কৃষ্ণ-রাধা কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম" নাম বলাৎকারে তাহার অন্তর অধিকার করিয়া ফেলিল। সে এক-একবার ভাবে,—কি বালাই পাখীটা বুঝি ভূতাবিষ্টই হইবে; তাহার ভূত তাহাকে ছাড়িয়া বুঝি আমাকেই ভর করিয়া বসিল? হায় হায়, কি কুক্ষণেই কাল পাখী মারিতে পা বাড়াইয়াছিলাম।

শবর যতই একথা সেকথা ভাবুক না কেন, কিন্তু ঘুরিয়া-ফিরিয়া সেই "রাধা কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম" নাম আসিয়া পঁহুছাইয়া যায়। এই ভাবেই সে ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। খাওয়া-দাওয়া কিছুই ভাল লাগে না। নামও কি ভাল লাগে না? ঠিক কেমন করিয়া বলিব? তবে, না লাগে তো তাহা প্রাণে জাগে কেন?

অনন্ত শবরের তো এই অবস্থা। এমন সময় শমনদেবের দপ্তরখানায় দেখা গেল, তাহার পরমায়ুর খাতার সকল পাতাগুলিই ফুরাইয়া গিয়াছে। অমনি তাহাকে তথায় লইয়া যাইবার জন্য আদেশ প্রচারিত হইল। দূতগণ দ্রুতপদে তাহাকে লইতে আসিলেন। তাঁহাদের কাছে আর শবরের জারি জুরি খাটিল না। এতো আর পশুপক্ষী নয় যে, শরাঘাতেই ঠিক করিয়া দিবে। এ বড় কঠিন ঠাঁই,—যমদূত; ইঁহাদের কাছে দেহের বলে কিছুই হইবার নয়। অতি বড় বীরও ইহাদের কাছে তৃণতুল্য। নিমেষে দূতগণ শবরকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া মারিতে মারিতে টানিয়া লইয়া চলিলেন। কিছু-দূর যাইতে-না-যাইতে দিব্য বেশ-ভূষায় বিভূষিত কএকজন বিষ্ণুদূত পুষ্পক-বিমান-সহ সেখানে আসিয়া যমদূতগণের কার্য্যে বাধা দিয়া বলিলেন,—কি কর, কি কর, এই নিষ্পাপ শবরের প্রতি তোমাদের এ ক্রূর ব্যবহার

কেন ? তোমরা অচিরে ইহাকে পরিত্যাগ কর, এ ব্যক্তি তোমাদের অধিকৃত নহে ;—আমাদের। আমরা এই পুণ্যাত্মাকে পুষ্পকবিমানে লইয়া যাইব। দাও, সত্বর ইহাকে ছাড়িয়া দাও।

যমদূতগণ বলিলেন,—পুণ্যাত্মা—পুণ্যাত্মা শবর ? কি বলেন আপনারা, কিছুই বুঝিতে পারি না। আপনারা বোধ হয় ভুল করিয়াছেন। ইহার নাম—অনন্ত শবর। দুরন্তপণার ইহার অন্ত নাই। শৌচ নাই, সদাচার নাই, খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই, প্রাণিহিংসা ছাড়া কার্য্যও নাই। এ হইল পুণ্যাত্মা শবর ?

বিষ্ণুকিঙ্করগণ জলদনিনাদে উত্তর প্রদান করিলেন,—হাঁ হে হাঁ তোমরা যাহা বলিতেছ, এ শবর সত্যই তাই ! সত্যই ইহার মত অসদাচারি অসদাহারী আর নাই, সত্যই ইহার মত হিংসা ব্রত-পাপ-নিরত আর নাই, কিন্তু তোমরা হয় তো আমাদের প্রভুর নামের মহিমা জান না, সেই নামই ইহার পাপময় জীব পুণ্যময় মধুময় করিয়া দিয়াছে। শ্রীপ্রভুর নাম প্রভাবের অধিক পরিচয় আর কি প্রদান করিব,—

"ভাবে অ-ভাবে যেউঁ প্রাণী। বদনে রাম-নাম ভণি ॥
যে অবা শুনি থাই কর্ণে। নোহিলে চিন্ত থাই মনে ॥
অশেষ কোটিজন্ম যাএ। সে যেবে পাপ করি থাএ ॥
দণ্ডকে হোএ ভস্মরাশি। সেহি সে বিষ্ণুলোকে বসি।"

যে কোন প্রাণী ভাবে মজিয়াই হউক, আর ভাব-রহিত হইয়াই হউক, শ্রীপ্রভুর নাম বদনে গ্রহণ করিবে, কর্ণে শ্রবণ করিবে, কিম্বা অন্তরে চিন্তা করিবে, সে যদি অনন্ত কোটি জন্ম ধরিয়া পাপাচরণে প্রবৃত্ত থাকে, তাহার অপরিমিত সেই পাপ, নিমেষে ভস্মরাশিতে পরিণত হইয়া যাইবে এবং সে বিষ্ণুলোকে বসবাস করিতে পারিবে। যমদূতগণ ! তোমরা আর বিলম্ব করিও না, এই পুণ্যাত্মার কালপাশ মোচন করিয়া

পলাইয়া যাও, নচেৎ তোমাদের জীবন লইয়া বিপন্ন হইতে হইবে, স্বয়ং মৃত্যু আসিয়াও তোমাদের মৃত্যু নিবারণ করিতে পারিবে না

শুনিয়া যমদূতগণের বড় ভয় হইল। তাঁহারা তাড়াতাড়ি অনন্তকে পাশমুক্ত করিয়া দিয়া তাঁহাদের পদতলে প্রণত হইয়া পড়িলেন। বিষ্ণু-কিঙ্করগণ বলিলেন,—যাও, আর তোমাদের ভয় নাই, তোমাদের অধিপতির সাক্ষাৎ অনুমতি না লইয়া এরূপ অতি-সাহসে আর কখনও অগ্রসর হইও না

যমদূতেরা "আজ্ঞে তাই হবে'—তাই হবে" বলিতে বলিতে বরাবর যমরাজের দরবারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তখনও ভয় ভাঙ্গে নাই। কম্পিত দেহে কম্পিত-কণ্ঠে জন্তুরাজকে জানাইলেন,—মহারাজ! আজ যাহা দেখিলাম, এমনটি কখন দেখা যায় নাই।—বিপরীত ব্যাপার মহারাজ! বিপরীত ব্যাপার! অনন্ত শবর, কোন পুণ্যই করে নাই, জীবনে জীবহত্যা ছাড়া কোন কার্য্যই জানে না, কেবল একটীদিন শুকের মুখে ভগবানের নাম শুনিয়াছিল মাত্র। কাল পূর্ণ হওয়াতে আমরা তাহাকে মহা-পাতকী বলিয়া আপনার আদেশের অপেক্ষা না রাখিয়াই নিজেনিজে আনিতে গেলাম; গলায় বাঁধিয়া কিছুদূর আনিয়াওছিলাম, এমন সময় কোথা হইতে বিষ্ণুদূতগণ আসিয়া তাহাকে আমাদের হাত হইতে ছিনাইয়া লইলেন। তাঁদের কথা,—এমন পুণ্যাত্মা আর নাই! অবাক্ কাণ্ড মহারাজ! অবাক্ কাণ্ড! তাঁদের সঙ্গে তো আর পারিবার যো নাই, তাই আমরা পলাইয়া আসিয়াছি, এখন যাহা করিতে হয় আপনিই করুন।

যমরাজ দূতদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতে লাগিলেন,—দেখ দূতবৃন্দ! তোমরা যে আমার আদেশ না লইয়াই অনন্ত শবরকে আনিতে গিয়াছিলে, এ কার্য্যটা তোমাদের ভাল হয় নাই। আর তোমরা যে বিষ্ণুদূতগণের সহিত বিবাদ না বাধাইয়া পলাইয়া আসিয়াছ, ভালই করিয়াছ—

বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দিয়াছ। অতঃপর তোমরা আমার এই শিক্ষার কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে—

"ভাবে অ-ভাবে যেউঁ প্রাণী। কর্ণরে রামনাম শুনি ॥
কি অবা মুখে ঘোষুথিব। তাহার পাখকু ন যিব ॥
যত্তপি যিব তার পাশ। নিশ্চে মো যমপণ নাশ ॥"

যে কোন প্রাণী ভাবে বা অ-ভাবে শ্রবণে ভগবন্নাম শ্রবণ করিবে, কিংবা মুখে উচ্চারণ করিবে, তোমরা কদাচ তাহার কাছে যাইও না, যাইলেই আমার যমত্ব নিশ্চয় নষ্ট হইয়া যাইবে। অনন্ত শবর জীবদ্রোহী হউক, যাহাই হউক, সে তো কর্ণে আমার প্রভুর নাম শুনিয়াছে, তখন তাহার আর পাপ কোথায়,—তাহার প্রতি আমাদেরই বা অধিকার কোথায়?—যাহারা আমার প্রভুর দোহাই দেয় না,—তাঁহার কোন সংস্রবই রাখে না, তাহারাই তো আমার অধিকারভুক্ত?

দূতগণ! এই প্রসঙ্গে তোমাদিগকে আর কিছু উপদেশ দিয়া সতর্ক করিয়াই দিই। এ কথাও তোমরা সতত স্মৃতিপথে রক্ষা করিবে,—

"যা মুণ্ডে তুলসীমঞ্জরী। তুণ্ডে নির্ম্মাল্য থিব ভরি ॥
গলে তুলসীমাল থিব। হৃদে শ্রীনাম জপু থিব ॥
যে অবা সাধুঙ্ক সঙ্গরে। যে স্নান করে গঙ্গানীরে ॥
যে অবা করে ক্ষেত্রবাস। যে করি থিবে হরি-বশ ॥
যে অবা গুরু-পাদগতে। সেবা করন্তি অবিরতে ॥
যে অবা জীবে দয়া করে। কি অবা পর উপকারে ॥
এমন্ত লোকঙ্কর কতি। গলে মো সরিব সম্পত্তি ॥"

যে ব্যক্তি মস্তকে ভগবন্নিবেদিত তুলসীমঞ্জরী, বদনে ভগবন্নির্ম্মাল্য, কিম্বা কণ্ঠে তুলসীমাল্য ধারণ করিবে, এবং হৃদয়ে হৃদ্‌বিহারি শ্রীহরির নাম জপে নিরত থাকিবে, তোমরা তাহার সমীপে কখনও যাইও না। আরও

বলি,—যে ব্যক্তি সাধুসঙ্গ করে, কিম্বা গঙ্গাজলে স্নান করিয়া থাকে, অথবা পুণ্যক্ষেত্রে নিবাস করে, তোমরা তাহার নিকটেও কদাপি গমন করিও না। শেষকথা,—যে ব্যক্তি ভক্তিপথের পথিক হইয়া শ্রীহরিকে বশীভূত করিতে পারিয়াছে, কিম্বা শ্রীগুরুর শ্রীপাদপদ্মের অবিরত সেবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছে, অথবা জীবে দয়া এবং পর-উপকারে প্রবৃত্ত হইতে পারিয়াছে, তাহাদের ত্রিসীমা কখনও স্পর্শ করিও না। করিলেই সর্ব্বনাশ, আমর সকল সম্পত্তি সমূলে বিনিষ্ট হইবে। যাও, তোমরা সতত সতর্ক থাকিও।

এই বলিয়া যমরাজ দূতগণকে বিদায় দিলেন। এদিকে বিষ্ণুদূতগণ অনন্ত শবরকে বিবিধ দিব্য বিভূষণে বিভূষিত করিয়া, মাল্য পরাইয়া, চন্দন মাথাইয়া, সেই পুষ্পকবিমানে পরমাদরে বসাইলেন এবং মঙ্গলশঙ্খ বাজাইয়া জয়ধ্বনি করিতেকরিতে পরব্যোমের পথ ধরিলেন। দেখিতে-দেখিতে দিব্যরথ বিষ্ণুধামের দ্বারে যাইয়া উপনীত হইল! ধামবাসিগণ হাসি-হাসিমুখে শ্রীপ্রভুর মহিমগাথা গাহিতে-গাহিতে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। দেখিয়া-শুনিয়া অনন্ত শবর আনন্দভরে সেই শুকের গাথা গাহিয়া উঠিল,—

"রাধা কৃষ্ণ-রাধা কৃষ্ণ-রাধা কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম।"

কৃষ্ণদাস।

—— ——:*:—— ——

কৃষ্ণদাস অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণদাস। কায়-মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণসেবা ভিন্ন সংসারের আর কিছুই সে জানিত না—করিতও না। জাতিতে করণ হইলে কি হয়, তাহার আচরণ বর্ণোত্তম ব্রাহ্মণেরও অনুকরণযোগ্য ছিল। তাই পুরুষোত্তমধামে একজন উত্তম পুরুষ বলিয়া তাহার মান্যও যথেষ্ট ছিল।

কৃষ্ণদাসের অপর পরিচয় বেশী কিছু নয় সে একজন সুপণ্ডিত—সুকবি। কবি বলিয়া যা-তা লিখিয়া কবিত্বের অপব্যবহার করিত না। তাহার কবিতার একমাত্র আশ্রয়—শ্রীভগবান্ এবং তাহার লীলা। শ্রীভগবান্ কেমন করিয়া সজ্জন পালন করেন, দুষ্ট-দলন করিয়া থাকেন, সাধ করিয়া ভক্তের অধীন হন, এই সকলই হইল তাহার বর্ণনার উপকরণ।

ভগবানের লীলা একে মিষ্ট, তার উপর কৃষ্ণদাসের কবিত্ব মিষ্ট, সর্ব্বোপরি তাহার কণ্ঠও যার-পর নাই মিষ্ট। এই তিনটী মিষ্টরসের সংযোগ কত মিষ্ট হয় বল দেখি? পুরিবাসী নর-নারী সকলেই এই মিষ্ট রসের আস্বাদ লইবার নিমিত্ত একান্ত ব্যাকুল থাকিত। যে পায় সে আর তাহাকে ছাড়িতে চায় না।

এই কৃষ্ণগীতিই কৃষ্ণদাসের জীবন বল—জীবিকা বল, যাহা কিছু। জীবিকা-নির্ব্বাহের নিমিত্ত তাহার অপর কিছু অবলম্বন করা নাই, অথচ ইহাতেই তাহার স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া যায়। গান শুনিয়া সকলেই

তাহাকে কিছু-না-কিছু পুরস্কার দেয়, সে ও তাহাতেই সন্তুষ্টমনে উদর-ভরণাদি সমাধা করিয়া থাকে। সুধু তাই নয়; তাহার শরীরটা বড় দয়ার। অনেক দীন-হীন কাঙ্গাল-গরীবকেও তাহাকে এই পুরস্কারের নিত্য অংশী করিতে হইত।

এইরূপ আনন্দেই তাহার দিন যায়। ক্রমে তাহার কবিত্বের প্রশংসা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ভাল বাসিবার—আদর করিবার লোকও বাড়িয়া গেল। একমাত্র পরশ্রীকাতর খল ভিন্ন তাহার আর দ্বেষ করিবার কেহই নাই। কৃষ্ণদাসের অতটা আদর অভ্যর্থনা তাহাদের কুটিল প্রাণে সহিত না। তাই বিনাকারণে একটু আধটু নিন্দা করিতেও ছাড়িত না। কৃষ্ণদাস কিন্তু তাহা শুনিয়াও শুনিত না, অরসিক খলের স্বভাবই এইরূপ, ভাবিয়া উপেক্ষা করিত। তাহার কবিত্ব-গীতির প্রশংসার উপর এ প্রশংসাও অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যাইত।

মহারাজ দিব্যসিংহ তখন পুরীপ্রদেশের নরপতি। কৃষ্ণদাসের গীতি-কবিত্বের প্রশংসা ক্রমে তাঁহারও শ্রুতিগোচর হইল। বারংবার শুনিতে-শুনিতে একদিন তাঁহার কৃষ্ণদাসের গীতি-কবিতা শ্রবণ করিবার ইচ্ছা হইল। তিনি দূত দ্বারা কৃষ্ণদাসকে ডাকাইলেন। কৃষ্ণদাস বিনীতভাবে রাজসভায় আসিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিল। নরনাথ স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন,—হাঁ হে কৃষ্ণদাস, শুনিতে পাই, তুমি না কি ভারি ভাল কবিতা রচিতে পার,—মিষ্ট-গলায় গাহিতে পার, কই, আমাকে একদিন শুনাইবে না? কৃষ্ণদাস যেন মাটির সঙ্গে মিশাইয়া গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল—আজ্ঞে মহারাজ, কবিত্ব-টবিত্ব আমার কিছুই নাই। ভগবানের দুইটা লীলাকথা ছন্দে বাঁধিয়া প্রাণের আবেগে গাহিয়া বেড়াই,—এইমাত্র। সে গান কি আপনার এই গুণিগণপূর্ণ মহাসভায় শুনাইবার যোগ্য?

মহারাজ তাহার বিনয়-দর্শনে পরম সন্তোষ লাভ করিলেন আবার

বলিলেন,—না হে না, তোমাকে অত কুণ্ঠিত হইতে হইবে না, তুমি প্রাণ খুলিয়া তোমার রচনা আমাদিগকে শুনাও,—পড়িয়াও শুনাও, গাহিয়াও শুনাও।

কৃষ্ণদাস কি করে? মনেমনে কৃষ্ণ-স্মরণ করিয়া সে তাহার কৃষ্ণ-গীতির দুই একটি আবৃত্তি করিল। আহা, সে আবৃত্তি কতই না মধুর! আবৃত্তির গুণে কবিতার স্তরেস্তরে শব্দালঙ্কারগুলি যেন মণিমাণিক্যের মত ঝল্‌মল্ ঝল্‌মল্ করিতে লাগিল। শুনিয়া সকলেই খুশী। তার পর, সে যখন সেই কবিতার ভাব ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিল, তখন কবিতার অর্থালঙ্কারের দিব্যচ্ছটায় সমগ্র রাজসভা যেন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এবার সকলের আনন্দের মাত্রা আরও অধিক বাড়িয়া উঠিল। তার পর, সে যখন মধুরকণ্ঠে সেই মধুর গীতির গাহনা জুড়িয়াদিল, তখন আর কাহারও আনন্দ রাখিবার স্থান নাই। নয়নদ্বার দিয়া যেন তাহা উপছাইয়া পড়িতে লাগিল।

কৃষ্ণদাসের সঙ্গীত থামিয়া গেল। তখনও যেন রাজসভা জুড়িয়া গানের সুর ঘুরিয়াঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রাণের ভিতর সুর তো ভরপুর। রাজা যার-পর-নাই প্রসন্ন হইলেন। যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া বসন-ভূষণে কৃষ্ণদাসকে পুরস্কৃত করিলেন। কৃষ্ণদাসের উপযুক্ত সম্মান দর্শনে সভাশুদ্ধ সকলেরই আনন্দ। সমস্ত রাজসভাই যেন আনন্দে ডুবান। কিন্তু বিধাতার নিয়মে আনন্দের পর নিরানন্দই স্বাভাবিক। এখানেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইল না। নিরানন্দের পালা আরম্ভ হইল।

বড় লোকের—রাজারাজড়ার খেয়ালই এক স্বতন্ত্র। দিব্যসিংহ মহা-রাজের প্রাণে কেমন এক খেয়াল উঠিল,—আহা আহা, বেড়ে গান গুলি বেঁধেচে! আহা, ভগবানের নামের বদলে আমার নামে যদি ও এই রকম গান রচনা করিয়া গাহিয়া শুনায়, তাহা হইলে কতই না মিষ্ট লাগে,—

কতই না আমার মহিমা প্রচার হয়! রাণীরা তো শুনিলে রাখিবার স্থানই পাইবেন না।

মহারাজের এ প্রাণের খেয়াল কাঙ্গালের খেয়ালের মত প্রাণে উঠিয়া প্রাণেই লয় পাইল না, বাহিরে আসিয়া পড়িল। মহারাজ হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণদাসকে বলিলেন,—দেখ কৃষ্ণদাস, তোমার মত কবি—তোমার মত গায়ক আর এ দেশে নাই। কবিতা শুনাইয়া—গান শুনাইয়া তোমার মত আমাকে এত আকৃষ্ট—এত আনন্দিত করিতে আর কেহ কখনও পারে নাই। আমি বলি কি,—তুমি আমার নামে ঐরূপ কিছু কবিতা বাঁধনা কেন? আমি আরও অধিক সন্তুষ্ট হইব—আরও অধিক পুরস্কার দিব। আর আমি এ-দেশের রাজা, আমার নামের গান এ-দেশের লোক কত আদরপূর্ব্বক শুনিবে বল দেখি? সুতরাং সে দিকেও তোমার লাভ অল্প হইবে না।

রাজা তো আর জানেন না যে, কৃষ্ণদাস তাঁহার চেয়ে আরও অনেক বড় রাজার—সকল রাজার উপরের রাজার সংবাদ রাখে। কৃষ্ণদাস এ রাজার কথা শুনিয়া সেই রাজাকেই স্মরণ করিল,—প্রাণেপ্রাণে প্রাণের কথা জানাইল। তখনই যেন তারহীন টেলিগ্রাফের মারফত সে-রাজার অভয়-বাণী কৃষ্ণদাসের প্রাণে আসিয়া গেল। এখন আর সেই দীন হীন সামান্য কাঙ্গাল কৃষ্ণদাস নয়,—শত সহস্র চক্রবর্ত্তী নৃপতির শক্তি যেন পুঞ্জীভূত হইয়া তাহার দেহে প্রকাশ পাইতেছে। সে অসমসাহসে মহারাজকে বলিয়া উঠিল,—

"বোইলে শুন নৃপনাথ। কেবল দেব জগন্নাথ॥
এ পিণ্ড বিকি অছি তারে। গীত মুঁন বোলে অন্যরে॥

মহারাজ, আমার এ শরীর আমি শ্রীজগন্নাথকে বিক্রয় করিয়া

ফেলিয়াছি। তাই তাঁহার দেহ লইয়া—তাঁহার গান ছাড়া অন্যের গান আমি গাহি না।

শুনিয়া নৃপতির অত্যন্ত দুঃখ হইল। তিনি আবার তাহাকে বলিলেন,—না হে না, ও সকল পাগ্‌লামির কথা ছেড়ে দাও। তুমি আমার নামে গান রচনা করিলে আমি তোমায় অনেক গ্রাম দেশ দান করিব,—রাজ্যের শ্রেষ্ঠ অধিকারে নিযুক্ত করিব,—প্রাণের মত ভাল-বাসিব। কিন্তু গান রচনা না করিলে তোমার আর অব্যাহতি নাই, জীবনের আশা তুমি ছাড়িয়া দাও। জান তো আমি সমস্ত জগতের একমাত্র অধিপতি। আমার আদেশ অমান্য করিলে কে আসিয়া তোমাকে রক্ষা করিবে?

সে-বার কৃষ্ণদাসের সুর একটুকু নরম ছিল, এবার আর তাহা নয়। সে সপ্তমে চড়িয়া সিংহ হুহুঙ্কারে বলিয়া উঠিল,—

"তুম্ভস্কু নাহি মোর ডর। মো প্রভু বলে বলিআর॥
জগতস্সৃষ্টি আন হেলে। গীত মুঁ আনকু ন বোলে॥"

নরনাথ, হইতে পার তুমি জগতের নাথ, কিন্তু তোমাকে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও ভয় নাই। আমার প্রভু তোমা অপেক্ষা সকলের অপেক্ষা সর্ব্ববলে বলীয়ান্। এ বিশ্বসৃষ্টির যদি আমূল পরিবর্ত্তনও হইয়া যায়, তবু আমার কথার পরিবর্ত্তন হইবেনা,—আমার দ্বারা অপরের নামে রচনা বা গাহনা কখনও হইবে না।

এইবার রাজসভার আমূল পটপরিবর্ত্তন হইল। আনন্দের স্থানে নিরা-নন্দের—স্তুতির স্থানে কটূক্তির অভিব্যক্তি হইল। মহারাজ ক্রোধে অধীর হইয়া বজ্র-নির্ঘোষে বলিয়া উঠিলেন,—আরে কে আছিস্, শীঘ্র এই বর্ব্বরটার হস্তপদ বন্ধন করিয়া বন্দিশালায় লইয়া যা। দেখি, উহার কোন্ জগতের নাথ আসিয়া উহাকে রক্ষা করে?

রাজাজ্ঞা প্রচার হইতে-না-হইতে প্রহরিগণ আসিয়া কৃষ্ণদাসের হস্ত-পদ শৃঙ্খলরুদ্ধ করিয়া বন্দিমন্দিরের অভিমুখে গমন করিল। সভাসদ্‌গণ এই আচম্বিত ব্যাপার দেখিয়া সকলেই স্তম্ভীভূত এবং যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন।

বড়র সকলই বড়,—অনুগ্রহও বড়—নিগ্রহও বড়। যে মহারাজ এই মাত্র কৃষ্ণদাসকে অনুগ্রহ করিয়া গ্রাম দেশ দিয়া দিতেছিলেন,—রাজ্যের শ্রেষ্ঠ অধিকারে নিযুক্ত করিতেছিলেন, তিনিই এখন সেই কৃষ্ণদাসকে নিগ্রহ করিবার নিমিত্ত হাতে পায়ে শিকল বাঁধিয়া কয়েদখানায় পাঠাইয়া দিলেন। তাহাতেও হইল না; তিনি সভাভঙ্গ করিয়া অন্তঃপুরে না যাইয়া বরাবর বন্দিশালায় গমন করিলেন। গিয়া করিলেন কি। এক বন্দিগৃহের অভ্যন্তরে এক প্রকাণ্ড খানা কাটাইলেন। তাহার মধ্যে কৃষ্ণদাসকে বসাইয়া খানার উপরে তক্তা ঢাকাইয়া দিলেন। তাহাতেও হইল না, সেই তক্তার উপরে বড়বড় পাথর চাপাইয়া বন্দিঘরের দরজায় চাবি দেওয়াইয়া চলিয়া আসিলেন। আসিবার সময় বারবার প্রহরিবৃন্দকে বলিয়া আসিলেন,—দেখ, খুব হুঁসিয়ার থেকো, যেন কোনরূপে পলাইতে না পারে বা কেহ বাহির করিয়া না লইয়া যাইতে পারে।

কৃষ্ণদাসের এই নিগ্রহ দর্শনে সকলেই মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইল,—যাহারা অতি বড় নিন্দুক তাহারাও পাইল, কিন্তু রাজভয়ে কেহ কোন কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। কেবল প্রাণেপ্রাণে ভগবানের নিকট তাহার কল্যাণ কামনা করিতে লাগিল।

কৃষ্ণদাস তো কৃষ্ণেরই দাস, তখন তাহার পুরস্কারই বা কি তিরস্কারই বা কি,—অনুগ্রহই বা কি নিগ্রহই বা কি? প্রহরিগণ যখন কৃষ্ণদাসকে তাড়নভর্ৎসন করিতেকরিতে বন্দিমন্দিরে লইয়া আসে, তখনও কৃষ্ণদাসের মুখে কৃষ্ণকৃষ্ণ ভিন্ন অপর কথা কেহ শুনে নাই,—তাহার মুর্ত্তিতে নিরা-

নন্দের কোন লক্ষণই কেহ দেখে নাই। এখনও বন্দিগৃহের খাতের ভিতরে অবরুদ্ধ কৃষ্ণদাস সে-ই কৃষ্ণদাস,—এখনও তাহার মুখে সেই কৃষ্ণ-গীতি—এখনও তাহার অন্তরেবাহিরে সে-ই আনন্দের অভিব্যক্তি।

এই ভাবে কৃষ্ণদাসের অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। খানার মধ্যে বায়ুর চলাচল বন্ধ। ক্রমেই কৃষ্ণদাসের শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। সে যেন থাকেথাকে হাঁপাইয়া উঠে। সে বুঝিতে পারিল, এই ভাবে আর কিছুক্ষণ থাকিলে তাহাকে নিশ্চয়ই মরিতে হইবে। মরণের জন্য সে তো সর্ব্বদাই প্রস্তুত, তাহার একটুও দুঃখ নাই—চিন্তা নাই; কিন্তু তাহার দুঃখ ও চিন্তার বিষয় ইহাই হইল যে,—আমি যদি এই ভাবে মারা যাই, তবে সংসারে আর কেহ শ্রীহরির নাম লইবে না। আমার কর্ম্মফলে এই ভাবে আমার জীবনের অবসান হইবার—তাহাই হইল, ইহা তো আর সকলে বুঝিবে না—বলিবে না? তাহারা বুঝিবে বা বলিবে কি? বুঝিবে বা বলিবে—এই তো কৃষ্ণদাস দিন নাই রাত্রি নাই কৃষ্ণকৃষ্ণ করিত, কিন্তু তাহার বিপৎকালে কই কৃষ্ণ আসিয়া তাহাকে তো রক্ষা করিল না? এমন কৃষ্ণ ভজিলেই বা কি, না ভজিলেই বা কি?

কৃষ্ণদাস তাহার এই দুঃখ ও চিন্তার পারে যাইবার জন্য তাহার সেই দুঃখহারী শ্রীহরিকেই একান্তমনে ডাকিতে লাগিল, আর প্রাণের কথা জানাইতে লাগিল। শেষে কাঁদিতেকাঁদিতে বলিয়া উঠিল,—ন্যাথ ঠাকুর! শরীর ধরিলে মরণ তো একদিন, তা সেই মরণের দিনই যদি আজি আমার হইয়া থাকে, তবে তুমি আপনহস্তে সেই মরণের ব্যবস্থা কর, কিন্তু এ ভাবে এই বন্দিগৃহের খানার মধ্যে মরিতে দিও না। তোমার মহিমার অপমান আমি কিছুতেই সহিতে পারিব না।

এই কথা বলিতেবলিতে কৃষ্ণদাসের সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়া গেল। তাহার অন্তরের কথা অন্তর্যামী জানিতে পারিলেন। অর্দ্ধরাত্রি অতীত

হইবার পর শ্রীপ্রভু সেই স্থানে শুভ বিজয় করিলেন। তাঁহার 'করপল্লব' (পত্রপুষ্পরচিত শ্রীহস্তের বেশ-বিশেষ) কৃষ্ণদাসের সকল শরীরে বুলাইয়া দিলেন। শ্রীহস্তের স্পর্শ পাইয়া দাসের সকল বন্ধনই বিমুক্ত হইয়া গেল,—সংজ্ঞাও হইল। সে দেখিল,—শ্রীপ্রভুর শ্রীঅঙ্গের শীতল রশ্মিতে থানার ভিতর ভরিয়া গিয়াছে। তাঁহার এক হস্তে অভয়মুদ্রা অপর হস্তে উত্তম আহার্য্য। মুখে মৃদুমৃদু হাস্য এবং অভয়ের ভাষা। শ্রীপ্রভু কৃষ্ণদাসের পার্শ্বে খাদ্যসামগ্রীগুলি রাখিয়া—খাইবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া হাসিতে-হাসিতে অন্তর্হিত হইলেন।

কৃষ্ণদাস প্রভুর এই করুণালীলা চর্ম্মচক্ষে দেখিলেও যেন স্বপ্নে-দেখার মত দেখিতেছিল,—কেবল দেখিতেই ছিল। সুতরাং তাহার পূর্ব্বের সংজ্ঞা-লাভটাকে এ-রাজ্যের হিসাবে সংজ্ঞালাভ না বলিলেও বলিতে পারো। শ্রীপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর তাহার এ-রাজ্যের হিসাবে প্রকৃত সংজ্ঞা-লাভ হইল। বুঝিবা এ-রাজ্যের সংজ্ঞা থাকিতে শ্রীপ্রভুর কৃপা-বৈভব কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। সে যাহাই হউক, এ-রাজ্যের সংজ্ঞা পাইয়া কৃষ্ণদাসের মনে হইতে লাগিল,—বুঝি এতক্ষণ স্বপ্নই দেখিতেছিলাম। কিন্তু সে যখন দেখিল,—তাহার হস্তপদে শৃঙ্খল নাই. তাহার পর হাতড়াইয়া আরও দেখিল,—পার্শ্বে প্রচুর খাদ্য রহিয়াছে, তখন তাহার আর করুণাময়ের করুণাপ্রকাশ-লীলায় অবিশ্বাস করিবার কিছুই রহিল না। তাহার স্বপ্নকল্পনা বাস্তবে পরিণত হইয়া গেল।

এই দেখাও যা, কৃষ্ণদাস অমনি প্রভুর প্রেমে পাগল হইয়া উঠিল। তাহার সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ দেখা দিল, নয়ন দিয়া প্রেমের জল পড়িতে লাগিল। অন্তরেঅন্তরে কতই যে কৃতজ্ঞতার ভাষা ফুটিয়া উঠিল, তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

শ্রীপ্রভু যে তাঁহার করের বেশ 'করপল্লব' লইয়া কৃষ্ণদাসের সকল

শরীরে বুলাইয়াছিলেন, কৃষ্ণদাস তাহা জানিত না—আর সেই কর-পল্লবটী যে তাহার মাথার উপরেই রক্ষিত হহয়াছিল তাহাও জানিত না। কেবল তাহার মনোমদ গন্ধে আমোদিত হইতেছিল মাত্র। কিন্তু হঠাৎ কৃতাঞ্জলি করযুগল মস্তকের উপর ন্যস্ত করিতে গিয়া সে যখন শ্রীপ্রভুর সেই 'করপল্লব' দেখিতে পাইল, তখন আর তাহার আপনাকে সামলাইয়া রাখা ভার হইয়া পড়িল। সে সেই করপল্লবটী লইয়া বারবার চক্ষে রাখে, মুখে রাখে, বুকে রাখে আর প্রভুর নাম লইয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠে।

এই ভাবেই কৃষ্ণদাসের সেই রাত্রি কাটিতে থাকুক। ওদিকে হইয়াছে কি? যে সময় শ্রীজগন্নাথ বন্দিগৃহে কৃষ্ণদাসের নিকটে আগমন করেন, ঠিক সেই সময় শ্রীবলরামও হল-মুষল-হস্তে দিব্যসিংহ নৃপতির শয়নগৃহে যাইয়া উপস্থিত হন। তিনি মহা তর্জ্জনগর্জ্জন-সহকারে হল মুষল দেখাইয়া নৃপতিকে ভীতি প্রদর্শন করেন। আসিবার সময় বলিয়া আসেন,—দেখ মহারাজ, কৃষ্ণদাস আমাদের একান্ত দাস, তুমি অকারণ তাহাকে দণ্ড দিয়া আমাদিগকে বড়ই ব্যথিত করিয়াছ। যদি তোমার বাঁচিবার বাসনা থাকে, তবে সত্বর তাহাকে কারামুক্ত করিয়া দিতে চাও। শুনিয়া নরনাথ অতিমাত্র ভীত হইলেন। প্রাতঃকাল হইতে না-হইতে বন্দিভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বন্দিগৃহের দ্বার মোচন এবং প্রস্তর-কাষ্ঠগুলির অপসারণ করাইতেকরাইতে প্রাতঃকাল-হইয়া গেল। প্রভাতের আলোকে নরপতি যাহা দেখিলেন, তাহাতে আর তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি কাষ্ঠ-প্রস্তরগুলি সরাইবার পূর্ব্বেই তো কৃষ্ণদাসের মুখোচ্চারিত উচ্চ কৃষ্ণনাম শুনিতে পাইতে-ছিলেন, তাহাতে তাঁহার তত বিস্ময় হয় নাই। কাষ্ঠ-প্রস্তরগুলি সরাই-বার পর যখন তিনি দেখিলেন,—কৃষ্ণদাসের হস্তপদে বন্ধনশৃঙ্খল নাই,

তখন তাঁহাকে অতিমাত্র বিস্মিত হইতেই হইল। ঠিক এই সময় আর এক বিস্ময়কর সংবাদ লইয়া কয়েকজন পণ্ডা আসিয়া মহারাজকে জানাই-লেন,—মহারাজ, অদ্য আমরা শ্রীজগন্নাথের শয্যোত্থান করাইবার সময় দ্বার উন্মোচন করিয়া দেখি,—শ্রীপ্রভুর একটী শ্রীহস্তের 'করপল্লব' নাই! এই কথা শ্রবণের সঙ্গেসঙ্গে মহারাজ যখন কৃষ্ণদাসের মস্তকের উপর সেই করপল্লবটী দেখিতে পাইলেন, তখন তাঁহার বিস্ময়ের উপর বিস্ময় বাড়িয়া গেল। স্বপ্নকথায় তাঁহারও আর অবিশ্বাস করিবার কিছুই রহিল না। অমনি তিনি কৃষ্ণদাসকে কোলে করিয়া মহা আদর-আপ্যায়ন আরম্ভ করিয়া দিলেন। তিনি অনেক কাকুতিমিনতি করিয়া কৃষ্ণদাসের নিকট নিজকৃত অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন;—তাহার ভাগ্যের শতমুখে প্রশংসা করিয়া আপনাকে অনেক ধিক্কার প্রদান করিলেন।

বিনয়ীর আদর্শ কৃষ্ণদাস আত্ম-প্রশংসায় অতিশয় লজ্জিত হইল এবং নৃপতির নিকট বিদায় লইয়া শ্রীজগবন্ধুর শ্রীমন্দিরে যাইবার নিমিত্ত অনুমতি ভিক্ষা করিল। মহারাজ মহামূল্য রত্নাদি দিয়া তাহার সৎকার করিলেন এবং কৃপা ভিক্ষা করিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। কৃষ্ণদাসও আনন্দমনে কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতেকরিতে দেউলের অভিমুখে যাইতে লাগিল। দেখিয়া পুরীবাসী সকলেরই আনন্দ। স্বভাবের নিয়মে আবার পট-পরিবর্ত্তন হইল। নিরানন্দের পর আবার আনন্দ দেখা দিল। এবার কেবল রাজসভা নয়, সমগ্র পুরী সহর সে আনন্দে টলমল করিয়া উঠিল। ভক্ত কৃষ্ণদাসের জয়নাদে বিশ্বব্যোম ভরিয়া গেল।

বালকরাম দাস

———:*:———

ভক্ত ও ভগবান্ অভিন্ন-আত্মা। কবি বলেন,—"ভকত ভগবন্ত দুই। একই আত্মা, ভিন্ন নোহি॥" তবু যেন কেমন ভক্তের প্রভাব কিছু বেশী বলিয়াই বোধ হয়। সে কেমন, তাহাও বলি। এই যেমন সূর্য্য আর সূর্য্যতপ্ত বালুকা। উত্তাপ-অংশে উভয়ে অভিন্ন। তবু যেন কেমন বালুকার উত্তাপ কিছু অধিক বলিয়াই অনুভূত হয়। অথচ সূর্য্যের উত্তাপ লইয়াই বালুকার উত্তাপ, ভগবানের প্রভাব লইয়াও ভক্তের প্রভাব।

ভক্ত এই অপ্রমিত প্রভাবের অধিকারী হইয়াও দীনতার আবরণে তাহাকে ঢাকিয়া রাখিতে চাহে, তথাপি কিন্তু ঘটনাচক্রে একটু আধটু প্রকাশ না হইয়াও থাকে না। এই আবরণসামর্থ্য সকল ভক্তের সমান নয়,—কাহারও কিছু কম, কাহারও কিছু বেশী। ভক্ত বালকরামদাসের প্রভাব কিছু বেশীবেশীই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। হয়তো বহির্ম্মুখকে ভগবদুন্মুখ করিবার নিমিত্তই এইরূপ প্রকাশের প্রাচুর্য্য। অভিন্নভগবান্ ভক্তের প্রকৃত অন্তরের কথা কি করিয়া বুঝা যাইবে বল?

লবপুর বা লাহোর প্রদেশ বালকরামদাসের জন্মভূমি। সদ্‌ব্রাহ্মণকুলে জন্ম। পিতা মাতা ও চারিটি অগ্রজ ভ্রাতা বর্ত্তমান। বিষয়-বৈভব মন্দ নয়। সে কিন্তু কিছুরই খবর রাখে না, খবর রাখে কেবল খাবারের। খাবার সময় খাইয়া যায় আর ভাল মিহি কাপড় পরিয়া,—ফুলের মালা গলায় দুলাইয়া,—আতর-চন্দন গায়ে মাখিয়া বাবুয়ানা করিয়া বেড়াইয়া বেড়ায়।

নামে বালক হইলেও বয়সে তো আর বালক নয়, তবু কিন্তু তাহার সংসারের আসক্তি কিছুই নাই। খাও-দাও আর স্ফূর্ত্তি করিয়া বেড়াও, ইহাই হইল তাহার মূল মন্ত্র। পিতা-মাতা বা ভ্রাতারা ইহাতে সন্তুষ্ট নন, সকলেই তাহাকে তিরস্কার করেন,—কত উপদেশ দেন, কিন্তু সে সকল কথা শুনে কে? সে সেই সকল কথা শুনিয়াও না শুনিয়া—খাইয়া-দাইয়া সরিয়া পড়ে।

এইরূপে কিছুদিন যায়। ক্রমে তাহার বয়স বাড়িতে লাগিল, কিন্তু স্বভাব বদলাইল না। পিতা মাতা প্রভৃতি ভাবিয়াছিলেন যে, বড় হইলেই সে সংসারের সেবায় নিযুক্ত হইবে,—অর্থ-উপার্জ্জনে মনোযোগী হইবে। কিন্তু তাহা হইল না দেখিয়া তাঁহারা সকলেই তাহার উপর বিরূপ হইয়া উঠিলেন,—বকা ঝকায় কিছু হইল না দেখিয়া শেষ তাঁহারা তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

বালকরামদাসের ইহাতে মর্ম্মান্তিক দুঃখ হইল,—অভিমানে অন্তর ভরিয়া গেল। মনেমনে সুদৃঢ় সঙ্কল্প করিল,—ছার আহারের জন্য এত অপমান, যাহাতে আর বাহিরের আহারের কোন প্রয়োজন না হয় তাহারই উপায় করিতে হইবে। এই ভাবিয়া সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া এক বিজন বনে যাইয়া প্রবেশ করিল এবং এক পবিত্র স্থানে বসিয়া নির্ব্বিঘ্ন-হৃদয়ে হৃদয়েশ্বরকে ডাকিতে আরম্ভ করিল।

বালকরামদাসের দোষের মধ্যে—বিষয় কর্ম্ম কিছুই দেখিত না—সংসারের ধরাছোঁয়ায় যাইত না, তাহা ছাড়া সদ্‌ব্রাহ্মণের যাহা যাহা থাকিতে হয়, ভিতরেভিতরে তা তাহার সমস্তই ছিল। সে সেই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ করিত,—যথাশাস্ত্র শৌচ-আচমন সন্ধ্যাবন্দন সকলই সম্পাদন করিত,—অল্পবিস্তর শাস্ত্রচর্চ্চাও করিত। অদ্যাবধি বিবাহ হয় নাই,—সংসারে আসক্ত হইবার ভয়ে করে নাই বলিয়াই হয়

নাই, তথাপি সে গুরুর নিকটে দীক্ষিত হইয়াছিল এবং যথাবিধি সাধন-ভজনেও নিযুক্ত ছিল। কিন্তু এ সকল ব্যাপার করিত অতি গোপনে—নিভৃত স্থানে। বেশে বাবু হইলেও সে একটী দিনও অসৎসঙ্গে মিশিত না, বা কোন প্রকার মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিত না। পিতা-মাতা বা অগ্রজ ভ্রাতারা যে তাহাকে অত অপমান অত তিরস্কার করিতেন, সে এতদিন নীরবে তাহা সহ্য করিয়া আসিয়াছে। আজিও তাহা নীরবেই সহ্য করিয়া আসিয়াছে। মুখ না ফুটিলেও আজ কিন্তু তাহার নয়ন দুইটি দিয়া অবিরল দুঃখের জল ছুটিয়াছিল! ছুটিবে না,—আজ যে জননী পর্য্যন্ত তাহাকে দূর দূর করিয়া কুক্কুরশৃগালের মত বাটী হইতে বিতাড়িত করিয়াছেন।

এ সংসারে কিসের ভিতর কিসের বাসা কে জানে? কাঠের ভিতর কাঠপোড়ানো আগুনের বাসা, বিশ্বাস হয় কি? দুঃখের ভিতর সুখের বাসা তবে বিশ্বাস হইবে কেন? বিশ্বাস কাহারও হউক, কাহারও না-ই হউক, বালকরামদাস কিন্তু প্রবল আন্তর-দুঃখের মধ্যেই প্রবল আন্তর-সুখের সাক্ষাৎকার লাভ করিল। নির্ব্বিঘ্ন-হৃদয়ে ডাকিতে ডাকিতেই সন্তাপনাশন শ্রীনারায়ণ যেন প্রশান্ত মূর্ত্তিতে তাহার অন্তরে আবির্ভূত হইলেন। অন্তরের আহার পাইয়া তাহার বাহিরের ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হইয়া গেল।

এইরূপে সাত দিন কাটিয়া গেল। সে সেই নিশ্চল-আসনে বসিয়াই আছে, আর প্রাণ ভরিয়া শ্রীহরির নাম গান করিতেছে! এমন সময় একদিন এক পাল ব্যাঘ্র তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত! তাহাদের তর্জ্জন-গর্জ্জন উল্লম্ফন-বিলম্ফন দেখে কে? বালকরাম কিন্তু অচল অটল।—

"দেখি মনরে নাহি ভীতি। বোলে—যা করিবে শ্রীপতি॥
সে কথা হেব ত অবশ্য। মোহর বলে হেব কিস॥
রখিলে রখু—নেলে নেউ। এথকু ভয় নাহিঁ আউ॥

অন্তরে অণুমাত্র ভীতির সঞ্চার নাই। মনেমনে বলে,—শ্রীপতি যাহা করিবেন, তাহাই অবশ্য হইবে! আমার বলে আর কি হইবে বল? তিনি রাখিবার হয় রাখুন, লইবার হয় লউন, আমার আর ইহার জন্য ভয়-ভাবনা কিছুই নাই।

বালকরামদাস মনেমনে এই কথা বলিয়া—নয়ন মুদিয়া শ্রীহরির ধ্যানে নিমগ্ন হইল। শ্রীহরি তাহা জানিলেন। তখনি তিনি শবরের রূপ ধারণ করিয়া ধনুর্ব্বাণ-হস্তে সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহার হুঙ্কার ও ধনুকের টঙ্কার শুনিয়াই ব্যাঘ্র সকল সভয়ে পলায়ন করিল। বালকরাম চাহিয়া দেখে,—সম্মুখে এক অপূর্ব্ব শবরমূর্ত্তি! তাহার প্রস্তরকঠোর মূর্ত্তি ভেদ করিয়া যেন স্নেহের কোমলতা ফুটিয়া বাহির হইতেছে!

বালকরাম কিছু বলিবার পূর্ব্বেই মায়াশবর তাহাকে বলিয়া উঠিলেন,—ওহে ও ঠাকুর, তুমি এই গহন বনে বসিয়া আছ কেন? জান না, এখানে ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু ছাড়া আর কিছুই নাই? তাহারা এখনই যে তোমার প্রাণনাশ করিবে, তোমার কি প্রাণে একটুও ভয় নাই? পলাও ঠাকুর! পলাও—শীঘ্র পলাও, আর একমুহূর্ত্তও এস্থানে থাকিও না।

সরল প্রাণের সরল কথায় বালকরাম বলিয়া উঠিল,—পলাইব আর কোথায়, পলাইবার কি আর আমার স্থান আছে? আমার মা-বাপ ভাই-বন্ধু সকলেই যে আমায় বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। আমার আর সংসারের বাসনা নাই, বাসনা কেবল ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া মানব-জনম সফল করি। সেই আশাতেই এখানে আসা। তা তিনি দেখা দেন ভালই, না দেন—ব্যাঘ্র-ভল্লুকে মারিয়া ফেলুক, তাহাতেও দুঃখ নাই।

শুনিয়া শবর সহাস্য-বদনে বলিলেন,—এঃ, তুমি তো ঠাকুর! ভারি ছেলে মানুষ দেখিতেছি। ব্রহ্মাদি দেবগণ সহজে যাঁহার দর্শন পান না,—যোগি-ঋষিগণ ধ্যানযোগে যাঁহার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন না তাঁহার দেখা তুমি কিরূপে পাইবে? আর তিনিই বা তোমায় সুড়সুড় দেখা দিতে যাইবেন কেন বল? তার চেয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও, অত সাহসে দরকার নাই।

উত্তরে বালকরাম বলিল,—তবে কি শাস্ত্রবাক্য সকলই মিথ্যা? শাস্ত্রে তো দেখিয়াছি,—

"সবুরি জীবর জীবন। অটন্তি প্রভু ভগবান॥
সবুরি তাত মাত সেহি। তা বিনা অন্য নাহিঁ কেহি॥
জগত যাক খেলঘর। সবু এ আয়ত্ত তাহার॥
যাহাকু হেউ মার্গে পেশি। তাহাকু সেহি পথ দিশি॥
তেনু ভরসা মোর মন। অবশ্য পাইব দর্শন॥"

সেই প্রভু ভগবান্ সকল জীবেরই জীবনস্বরূপ। তিনিই সকল জীবের প্রকৃত পিতা মাতা। তিনি ভিন্ন আপনার বলিবার অপর কেহই নাই। এ সংসার তাঁহারই খেলার ঘর, সুতরাং সংসারের সকলই তাঁহার আয়ত্ত। তিনি যাহাকে যে পথে প্রেরণ করেন, সে সেই পথই দেখিতে পায়। তাই আমার মনে ভরসা হয়,—আমি নিশ্চয়ই তাঁহার দর্শন পাইব। শবর হে, তাঁহারই প্রেরণায় আমি এখানে আসিয়াছি, তাঁহারই প্রেরণায় তুমিও এখানে আসিয়াছ। তাঁহার নাম সম্বল করিয়া—তাঁহারই সাহসে বুক বাঁধিয়া আমি বসিয়া আছি, সামান্য ব্যাঘ্র-ভল্লুকে আমার আর কি করিবে বল? তোমার কার্য্যে তুমি যাইতে পারো, আমাকে আর উপদেশ দিবার আবশ্যক নাই, দয়া-দৃষ্টি থাকিলেই যথেষ্ট হইবে।—আশীর্ব্বাদ কর যেন ভগবদ্দর্শন লাভ করি।

এই বলিয়া বালকরাম নেত্রদ্বার রুদ্ধ করিয়া উচ্চৈস্বরে প্রাণারাম হরে-কৃষ্ণ-রাম-নাম গান করিতে লাগিল। এইবার মায়াশবরের মায়া বজায় রাখা কঠিন হইয়া পড়িল। তিনি দেখিলেন,—হাঁ, ঠিকই হইয়াছে, ইহার অন্তরে যথার্থ ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে। অমনি তিনি বীণাবেণু-বিনিন্দিত স্নেহ-সুধাসিক্ত স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—বৎস রে—বালক-রাম রে, একবার চাহিয়া দেখ বৎস, কে আমি আসিয়াছি! যাহারা সংসারের সকল আসক্তি উপেক্ষা করিয়া আমারই উদ্দেশে আত্মসমর্পণ করে, আমিই তাহাদের নানা মূর্ত্তিতে নানা বিঘ্ন বিদূরিত করিয়া থাকি। আজ তাই শবরমূর্ত্তিতে তোর ব্যাঘ্রবিঘ্ন দূর করিতে আসিয়াছি। এইবার একবার চাহিয়া দ্যাখ বাছা! চাহিয়া দ্যাখ, যাহাকে দেখিবার জন্য প্রাণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা, তাহাকেই দেখিতে পাইবি।

বালকরাম চক্ষু বুজিয়াই বলিল,—আমি সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, শ্রীভগবান্‌কে হৃদয়ে সাক্ষাৎ দর্শন না করিয়া আমি আর নয়নের দ্বার খুলিব না। তা তুমি যদি সেই ভগবান্‌ই হও, তবে একবার আমার গুরুদত্ত মূর্ত্তিতে অন্তরে দেখা দাও, নচেৎ আমার এই চক্ষু-বুজাই শেষ চক্ষুবুজা।

করুণাময় ভক্তের প্রার্থনায় তাহাই করিলেন,—শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্ত্তিতে তাহার হৃদয়ে সাক্ষাৎ প্রাদুর্ভূত হইলেন। অভীষ্টদেবের শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে বালকরামের আর আনন্দের সীমা নাই। প্রেমাশ্রুর পূত প্রবাহে তাহার বদন-বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। শ্রীভগবান্ তাহার হৃদয় হইতে শ্রীমূর্ত্তি অন্তর্হিত করিয়া করুণস্বরে তাহাকে আহ্বান করিলেন,—বৎস বালকরাম, নয়ন উন্মীলন কর,—অভিমত বর প্রার্থনা কর, আমি তোমার দৃঢ়তায় যৎপরোনাস্তি প্রীতিলাভ করিয়াছি। বালকরাম এইবার তৃষিত-নয়নে চাহিয়া দেখিল,—অন্তরে

সাক্ষাৎকৃত শ্রীমুর্ত্তিই বাহিরে বিদ্যমান! সে চর্ম্ম-নয়নে সেই কন্দর্প-কোটিলাবণ্য দিব্য রূপ দর্শন করিয়া আনন্দের আতিশয্যে উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিল। সে একবার তাঁহার চরণতলে দণ্ডবৎ পতিত হয়, আবার উঠিয়া করযোড়ে স্তব করে, আবার পতিত হয়, আবার উঠে। ক্ষণে নাচে, ক্ষণে গায়, ক্ষণে কাষ্ঠপুত্তলীর মত স্থির হইয়া রহে, ক্ষণে উচ্চস্বরে চীৎকার করে। কি যে করে কিছুরই ঠিক নাই। করুণাময় তাঁহার করুণার করস্পর্শে তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন এবং বরগ্রহণের নিমিত্ত ব্যতি-ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। একটা কিছু না দিয়া তো আর ছাড়ান পান না, কাজেই এত পীড়াপীড়ি। ইচ্ছাময় তিনি, তাঁহার ইচ্ছার জয়ই চিরকাল। তাঁহার ইচ্ছা—বালকরামকে কিছুদিন বিষয়ভোগ করাইয়া পরে আপন নিকটে আনয়ন করা, তাই বালকরামকে সেইরূপ বরই প্রার্থনা করিতে হইল। সে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিল,—ঠাকুর, যদি আমাকে বরই দিতে হয় তবে এই বর দাও—আমার যেন আর জন্ম না হয়, জন্ম-মরণ যেন ইচ্ছাধীন হয়, জীবন যেন সুখেই কাটিয়া যায়। জীবনান্তে যেন বৈকুণ্ঠধামলাভ করি এবং স্পর্শমাত্র প্রস্তরকে যেন সুবর্ণ করিতে পারি।

শ্রীনারায়ণ 'তথাস্তু, বলিয়া বর দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহাকে তো একটি ভক্ত লইয়া থাকিলে চলে না, কাজেই বর দিয়াই পাশ কাটাইলেন। তিনিও অন্তর্হিত হইলেন, বালকরামও খানিক হাহুতাশ করিয়া বরের পরীক্ষা-কার্য্য আরম্ভ করিলেন। শেষ বরটি ঐ পরীক্ষারই জন্য কি না? কি জানি, যদি কোন মায়া-টায়াই হয়, তবে ঐ বরের পরীক্ষাতেই ধরা পড়িয়া যাইবে, বোধ হয় ইহাই তাহার মনের ভাব। বালকরাম এক খণ্ড কৃষ্ণপ্রস্তর লইয়া হস্তদ্বারা স্পর্শ করিল। করিবামাত্রই দেখিল, তাহা আর কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর নাই, তাহা পীতবর্ণ সুবর্ণ হইয়া গিয়াছে। এইবার তাহার প্রাণে যথার্থ আনন্দের সঞ্চার হইল,—সকল বরেই সুদৃঢ়

বিশ্বাস জন্মিল। সে এইবার করিল কি? এক নিভৃত স্থানে যাইয়া কতকগুলি প্রস্তর লইয়া হস্তস্পর্শে সেগুলিকে সুবর্ণে পরিণত করিল। ক্রমে বিক্রয় দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া এক প্রকাণ্ড মঠমাড়ী প্রস্তুত করাইল। নিজে নাকি আহারেরই জন্য বাড়ী হইতে বিতারিত হইয়াছিল, তাই সর্ব্বাগ্রে উত্তমরূপ আহারের বন্দোবস্ত করাইয়া তারপর অপর কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিল। খালি খাও আর খাওয়াও;—অতিথি অভ্যাগত যে আসে অবারিত-দ্বার। অর্থের তো আর ভাবনা নাই; ক্রমে হাতী-ঘোড়া লোক-লস্করে মঠভবন পরিপূর্ণ হইয়া গেল। কেবল তাহাই নহে; মঠে প্রহরেপ্রহরে নহবৎ বাজে! অসংখ্য বিদ্যার্থী ব্রহ্মচর্য্য করিয়া বিদ্যা লাভ করে। তজ্জন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার, সাধক সুপণ্ডিত সকলেও নিযুক্ত। শ্রীসঙ্কীর্ত্তনস্থলীতে তো শ্রীভগবানের নামগানের বিরামই নাই। ইহা ছাড়া নানাবিধ দায়গ্রস্ত দরিদ্রগণের সাহায্যের জন্য মঠের ভাণ্ডার নিত্য উন্মুক্ত। বাগান-ভরা ফুল-ফল; দেবসেবারই বা পারিপাট্য কত। উৎসবযাত্রা তো একটিও বাদ যায় না। ফলে অল্প দিনের মধ্যেই বালকরামদাসের মঠ দেশপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল।

কিছুদিন এইরূপেই কাটিয়া যায়। ভগবানের সম্বন্ধ ধরিয়াও বালক-রামের বিষয়ভোগ যেমন হইতে হয় হইতে লাগিল! পবিত্র ভগবৎ সম্পর্কিত বিষয়ভোগ বলিয়াই হউক আর যে কারণেই হউক, বালকরাম-দাসের ইহাতে বৈরাগ্য জন্মিল। বিশেষত যে বিষয়কর্ম্ম করে নাই বলিয়া তাহাকে বাড়ীছাড়া হইতে হইয়াছে, ইচ্ছা না থাকিলেও সেই বিষয়কর্ম্মের কিছু-না-কিছু এখানে করিতেই হয়! কেননা, মঠের এখন প্রচুর সম্পত্তি, নির্ব্বিবাদে বিষয়সম্পত্তি কখনও রক্ষা পায় নাই—পাইবারও নয়। তাই বিষয়সম্পত্তি রক্ষার জন্য বিষয়ব্যাপারের হাত এড়াইবার যো নাই। ইহাতে যথেষ্ট উদ্বেগ পাইতেও হয়। এই সকল কারণে বালকরামদাস

মাঠের পরিচালনভার যোগ্যহস্তে অর্পন করিয়া শ্রীক্ষেত্রবাস অভিলাষে পদব্রজে শ্রীক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা করিল। নিজের সম্বল কৌপীন কম্বল; কিন্তু বিষয়ের হস্ত তো আর সহজে এড়াইবার যো নাই; তাই তাহার সঙ্গেসঙ্গে অসংখ্য বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী যাইতে লাগিল। এত বড় মঠের অত বড় একটা মহান্ত বাবাজী, তাঁহাকে সকলে একাএকাই বা ছাড়িয়া দেয় কি প্রকারে? ফলে বালকরামের শ্রীক্ষেত্রযাত্রা এক সমারোহের শোভাযাত্রায় পরিণত হইয়া পড়িল। সঙ্গে আশা-সোঁটা ধ্বজা-পতাকা হাতী-ঘোঁড়া উট-পাল্কী তুরী-ভেরী দামামা-মৃদঙ্গ প্রভৃতি আসবাব এবং বাদ্যভাণ্ডের অন্ত নাই।

এইরূপে যাইতেযাইতে কিছুদিন পরে তাহারা দিল্লীসহরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। বাদ্য ভাণ্ডের প্রচণ্ড শব্দে দিল্লীবাসীর হৃদয় দুরুদুরু কাঁপিয়া উঠিল। স্বয়ং দিল্লীশ্বর দূতগণকে শব্দের বৃত্তান্ত জানিবার জন্য সত্বর প্রেরণ করিলেন তাহারা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বলিল,—জাঁহাপনা! একমহাপ্রভাবশালী ফকির অসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গিগণের বাজনার রোলই দিল্লীকে কাঁপাইয়া তুলিয়াছে। শুনিয়া বাদশাহ বাদ্য বন্ধ করিবার আদেশ প্রচার করিলেন। দূতগণ দ্রুতপদে গমন করিয়া বালকরাম-দাসকে বাদশাহের আদেশ জানাইল! বালকরামদাস শুনিয়া হাসিয়াই অস্থির। হাসিতেহাসিতেই বলিয়া উঠিল,—আচ্ছা দূতগণ! তোমাদের দিল্লীশ্বরের আজ্ঞায় আমাদের বাদ্য বন্ধ হউক, আমাদেরও আজ্ঞায় দিল্লীর নহবৎ-বাজনা থামিয়া যাউক।

আশ্চর্য্যের বিষয়,—বালকরামদাসের আদেশে দিল্লীর নহবৎ আর বাজে না। সানাইদার সানাইএ ফুঁ দেয়, সানাইএর স্বর আর ছুটে না; নাগরাওয়ালা নাগরায় কাটি দেয়, আওয়াজ আর উঠে না। সকলেই অবাক্! দূতেরা কি করে? ভয়ে ভয়ে বাদশাহকে এই বিস্ময়কর ব্যাপার

বিজ্ঞাপিত করিল। বাদশাহের তো শুনিয়া বিশ্বাসই হয় না। তিনি বিশ্বস্ত লোক দ্বারা সন্ধান লইয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন। ব্যাপারখানা কি, জানিবার জন্য দূতগণকে আবার ডাকাইলেন। তাহাদের মধ্যে যাহারা বালকরামদাসের নহবৎ-বন্ধের আদেশ শুনিয়াছিল, তাহারাও ছিল। তাহারা বলিল,—জাঁহাপনা, ফকীরের বাজনা মানা করিয়া দেওয়ায় ফকীর কোপভরে দিল্লীর নহবৎ- বাজনা বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

দূতগণের কথা শুনিয়া দিল্লীশ্বর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহাদিগকে আদেশ দিলেন,—যাও, তোমরা এখনি সসৈন্যে যাইয়া ফকীরকে বন্দী কর; দেখি তার কেরামৎ কত? দিল্লীপতির মুখের আজ্ঞা শেষ হইতে না হইতে দূতবৃন্দ বালকরামদাসকে বন্দী করিবার নিমিত্ত সসৈন্যে ধাবমান হইল।

ঐশ্বর্য্যমদের অদ্ভুত মহিমা,—নয়ন থাকিতেও অন্ধ করিয়া দেয়! ঐশ্বর্য্যমদে অন্ধ বাদশাহ সাধু বালকরামদাসের প্রভাব দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না। দিল্লীতে বসিয়া দিল্লীর নহবৎ যিনি বন্ধ করিয়া দিতে পারেন, তিনি যে একজন সামান্য মানব নন, বাদশাহের মনে একথা একবারও উদিত হইল না। তাই তিনি বালকরামদাসকে বন্দী করিবার নিমিত্ত সৈন্যপ্রেরণের ব্যবস্থা করিতে একটুও ইতস্তত করিলেন না।

বাদশাহের আদেশে দূতগণ সৈন্যসমভিব্যাহারে যাইয়া বালকরামকে বন্দী করিয়া ফেলিল। বালকরাম তাহাদের কার্য্যে নিজেও বাধা দিল না,—সঙ্গিগণ বাধা দিতে উদ্যত হইলে তাহাদিগকেও নিষেধ করিয়া দিল। সুতরাং তাহাকে বন্দী করা আর একটা কঠিন কার্য্য কি? দূতবৃন্দ তাহাকে বন্দিমন্দিরে লইয়া গিয়া হস্ত পদ শৃঙ্খলরুদ্ধ করিল এবং প্রহরার বিশেষরূপ বন্দোবস্ত করিয়া বাদশাহকে আসিয়া সেই সংবাদ জানাইল। বাদশাহও মহা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিলেন।

বালকরামদাসের সঙ্গিসকলের আর দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। তাহার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেও বোধ হয় তাহাদের কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখ হইত না, কিন্তু বাঁচিয়া থাকিয়া মহান্তের এই নির্য্যাতন দর্শন তাঃাদের মর্ম্মান্তিক হইয়া পড়িল। বালকরামদাসের কিন্তু অন্তরে-বাহিরে উল্লাসের অণুমাত্র ব্যতিক্রম নাই;—সেই হাসিমাখা মুখ, সেই সুমিষ্ট সম্ভাষণ, সেই মনোমদ নামসংকীর্ত্তন, সকলই পূর্ব্ববৎ। তাহার হৃদয়ের ভাব,—শ্রীপ্রভুরও খেলাটা একবার দেখি,—বাদশাহেরও দৌড়টা কতদূর একবার দেখি।

দূতগণ প্রতিদিন তাহাকে দেখিতে আসে, প্রতিদিনই তাহার সংবাদ বাদশাহকে জানায়। দেখিতে দেখিতে তিন দিন অতীত হইয়া গেল, বালকরামদাস আহারও করে না, নিদ্রাও যায় না। অথচ তাহার স্ফূর্ত্তির কিছুই কমী নাই। দেখিয়া দূত বা প্রহরিগণ বিস্মিত হইল, তাহারা এই বিস্ময়জনক ব্যাপার বাদশাহকেও জানাইল, কিন্তু বিষয়ান্ধ বাদশাহের তাহাতেও চক্ষু ফুটিল না। বরং তিনি উত্তরোত্তর কঠোরতর নির্য্যাতনের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

বালকরামদাস চতুর্থ দিবসে দূতবৃন্দকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—বাপু হে, তোমরা তোমাদের বাদশাহকে যাইয়া জিজ্ঞাসা কর,—কোন্ অপরাধে তিনি আমাকে বন্দী করিয়াছেন? নিরপরাধ বৈদেশিককে দণ্ডদান করা কি দিল্লীর বাদশাহের উপযুক্ত কার্য্য? এরূপ কার্য্যে যে ভগবান্ বিরূপ হইয়া থাকেন, তাহা কি তিনি জানেন না? তোমরা তাঁহাকে যাইয়া বুঝাইয়া-সুঝাইয়া বল,—ভগবান্ তাঁহার মঙ্গল করুন, তিনি আমাকে কারামুক্ত করিয়া দিউন, আমি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া যাই। আর যদি তিনি তাহা না করেন, তবে আমার প্রভুর প্রভাব জানাইয়াই আমি এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব,—তাঁহার সমগ্র সাম্রাজ্যই সাগরমধ্যে লইয়া নিক্ষেপ করিব।

দূতগণ এই কথা বাদশাহকে জানাইল। শুনিয়া তিনি একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন,—কর্কশ শ্লেষের ভাষায় বলিলেন,—আচ্ছা আচ্ছা, তাহাই হউক, আমার সমস্ত রাজ্যই সমুদ্রে লইয়া ফেলিয়া দিউক। তাহার পর যাহা হয় করা যাইবে।

দূতেরা আর কি করে, বাদশাহের নিকটে বিদায় লইয়া বালকরামকে সেই সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিল। তাহাদের আর দুঃখের সীমা-পরিসীমা নাই। বালকরাম বলিল,—বটে, এত বড় স্পর্দ্ধা, তবে একবার আমার প্রভুর প্রভাবটা ভাল করিয়াই দেখাইয়া দিই, নচেৎ বাদশাহের বিষয়মদের নেশাটা ছুটিবে না,—জ্ঞানের নয়নও খুলিবে না।

বলিতেবলিতে বালকরামের অঙ্গ হইতে ঝরণার মত জল ঝরিতে আরম্ভ করিল। দেখিতেদেখিতে সেই জল প্রবল প্রবাহের আকার ধারণ করিল। দুই প্রহর না যাইতে যাইতে সমগ্র দিল্লীসহরে একহাঁটু জল দাঁড়াইয়া গেল। আর প্রহরখানেকের মধ্যে দিল্লী বুঝি ভাসিয়া যায়। সহরবাসী সকলেই প্রমাদ গণিলেন। চারিদিকেই ক্রন্দনের উচ্চ রোল,—মহা হাহাকারধ্বনি। ফকীরের প্রভাবের কথাও তখন জল-প্রবাহের সহিতই প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। সহরবাসী সকলেই যাইয়া বাদশাহকে ফকীরের এই অদ্ভুত কেরামতের কথা জানাইলেন এবং ফকীরকে শান্ত করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। বাদশাহ স্বচক্ষে সহরের অবস্থা দেখিলেন। দেখিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এইবার উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগে তাঁহার নয়নের রোগ সারিয়া গেল। এতক্ষণ যাহা তিনি দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছিলেন না, এইবার তাহা দেখিতে পাইলেন।

শাস্ত্র বলেন,—নিদান-বিপর্য্যয়-ন্যায়ে চিকিৎসা। অর্থাৎ যে কারণে রোগের উৎপত্তি, ঠিক তাহার বিপরীত কারণেই রোগ নিবৃত্ত হইয়া

থাকে। ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগ হইলে, ঠাণ্ডার উল্টা গরমই হইল তাহার উপযুক্ত চিকিৎসা। বাদশাহের রোগটা হইয়াছিল—চক্ষুরোগ। রোগের নিদানটা হইতেছে—ঐশ্বর্য্যমদ। এরোগের চিকিৎসা কি?—না, ঐশ্বর্য্যের ঠিক উল্‌টা—ঐশ্বর্য্যহীনতা। বালকরামদাস এইবার নবাবের নয়নে সেই ঔষধই প্রয়োগ করিয়াছে—যে ঐশ্বর্য্যমদের মত্ততায় বাদশাহ মহত্তের প্রভাব দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছিলেন না, আজ তিনি দেখিতেছেন—তাঁহার সেই ঐশ্বর্য্য—সাধের সেই দিল্লীসহর জলে ভাসিয়া যাইতেছে,—সেই ঐশ্বর্য্য হইতে তাঁহাকে একেবারে বঞ্চিত হইয়া পড়িতে হইতেছে। এই মহৌষধ প্রয়োগে আর তাঁহার নয়নের রোগ না সারিয়া থাকিতে পারে কি?

বাদশাহ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, সেই একহাঁটু জল ভাঙ্গিয়া উঠিপড়ি করিয়া পাত্র-মিত্র ও প্রজাবর্গ সমভিব্যাহারে বালকরামের সমীপে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এইবার নাকি নয়নের রোগ সারিয়া গিয়াছে, তাই বাদশাহ বালকরামের প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তাহার কাছে গিয়া ক্ষমাভিক্ষা করিতেও যেন কেমন তাঁহার লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। তিনি মহা অপরাধীর মত বালকরামদাসের চরণতলে পতিত হইয়া কাঁদিতেকাঁদিতে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। বালকরামদাসের হস্তপদের শৃঙ্খলবন্ধন তখনও রহিয়াছে; নড়িবার-চড়িবার যো নাই। তাই ইচ্ছা হইলেও সে বাদশাহকে হাতে ধরিয়া তুলিতে পারিল না, কেবল বড় গলায় বলিয়া উঠিল,—ছি ছি, কি করেন, কি করেন, আমি অতি সামান্য ব্যক্তি, আমার অপরাধ হইবে—অপরাধ হইবে, ক্ষমা করুন—ক্ষমা করুন।

বাদশাহ আস্তে আস্তে তাহার বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। অনুনয়-বিনয়পূর্ব্বক স্নানাহারের জন্য অনুরোধ করিলেন। বালকরামদাস

হাস্যবদনে বলিলেন,—তার আর কি, হইবে এখন; আমার সঙ্গিগণ আমার জন্য আমারই মত উপবাসে রহিয়াছে, তাহাদের সহিত মিলিত হইয়াই একত্র স্নানাহার সম্পন্ন করিব। এখন আপনারা যাইতে পারেন, ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন।

এই বলিয়া বালকরাম তথা হইতে গমনোদ্যত। বাদশাহ কি করেন, তাহার সহিত অধিক হঠ করা ভাল নয় ভাবিয়া বিদায় দিতে বাধ্য হইলেন। অনুগমন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—আজি হইতে এ দিল্লীসহর আপনারই রহিল। আমি আপনার অনুগত ভৃত্যরূপে ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিব মাত্র।

বন্দিমন্দিরের বাহিরে আসিয়া সকলেই দেখেন,—অবাক্ কাণ্ড,—দিল্লীর পথে একবিন্দুও জল নাই! দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন। বিষাদের আর্ত্তনাদের পরিবর্ত্তে আনন্দের হলাহলায় দিল্লীসহর ভরিয়া গেল। বাদশাহকে বিদায় দিয়া বালকরামদাস আপন সঙ্গিগণের সহিত সম্মিলিত হইল। দিল্লীর সকল জল বুঝি আজ তাহাদের নয়নের কোণে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে! বালকরামেরও নয়নপ্রান্তে প্রেমের জল দেখা দিল; শ্রীপ্রভুর প্রভূত প্রভাবের কথা স্মরণ করিয়া সে-ও আর না কাঁদিয়া থাকিতে পারিল না।

বালকরামদাস সঙ্গিগণের সহিত স্নানাদি সমাপন করিল। দেবনিবেদিত পবিত্র অন্নে উদর ভরণ করিয়া হরিধ্বনি দিয়া দিল্লীসহর পরিত্যাগ করিল। তাহার প্রভাবই আর তাহাকে তথায় অধিকক্ষণ থাকিতে দিল না। সকলের মুখে অত প্রশংসা,—সকলের অত আদর অভ্যর্থনা,—অনেকের আবার অনেক প্রকার পীড়ানাশের প্রার্থনা প্রভৃতি তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। বিষয়-বিরাগী সন্ন্যাসীর এ সকল ভাল লাগে কি?

মথুরা বৃন্দাবন প্রয়াগ-বারাণসী প্রভৃতি পুণ্যতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া বালকরাম নীলাচলের পথ ধরিল। তাহারা যে পথে যে তীর্থে যায়, সেই পথে সেই তীর্থেই হরিধ্বনির ধুম পড়িয়া যায়। তাহারা যেন একটা চলন্ত আনন্দ উৎসের মত সকলকে আনন্দে চুবাইতে চুবাইতে চলিয়াছে। যাইতে-যাইতে তাহারা এক রাজার দেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই দেশে মদন ভারতী নামক একজন বামাচারী সন্ন্যাসী থাকিতেন। সঙ্গে অনেক সাজা-সন্ন্যাসী শিষ্য। তাঁহার বামাচার নামে 'বামাচার' হইলেও বাস্তবপক্ষে কামাচারই ছিল। কেননা, বলিদানের দোহাই দিয়া প্রতিদিন অবৈধ পশুহিংসা, সুরাপান, এবং পশুরক্তে সর্ব্বশরীর রঞ্জিত করিয়া ঢক্কাবাদ্যের তালেতালে সশিষ্যে উন্মত্ত-নর্ত্তন, ইহাই হইল তাঁহার প্রধান অনুষ্ঠান। মারণ-বশীকরণাদি আভিচারিক ক্রিয়ায় দক্ষতা থাকায় এবং অনেক উৎকট রোগের ঔষধ অবগত থাকায়, অনেক লোক তাঁহার বশীভূত হইয়াছিল,—শিষ্যত্বও স্বীকার করিয়াছিল। ফলে সে দেশটাই একরূপ বিকৃত বামাচারের বন্যায় ভাসিয়া যাইতেছিল। সাধনভজন যে যত করুক আর না-ই করুক, মদ্যপান এবং মাংস-ভোজনে সকলেই বেশ অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। চারি দিকেই কেবল অবৈধ পশুহিংসা এবং মদের নেশা।

সেই দেশের এই দুঃখদ দৃশ্য দেখিয়া বালকরামদাসের দয়ার হৃদয় গলিয়া গেল। সে যাহাকে দেখে তাহাকেই বিনীতভাবে বলে,—

"শ্রীহরিভক্তিপথ চ্ছাড়ি। কিপাঁ অমার্গে অচ্ছ বুড়ি॥
জীব সাক্ষাতে নারায়ণ। এহা ন জানি মূঢ়জন॥
করএ জীবহত্যামান। এ পাপ চ্ছাড়িব কেসন॥
জীবন্তে নাহিঁ সুখলেশ। মলে নরকে পরবেশ॥
পারিলে এবে বুদ্ধি কর। যেবে হোইব ভবুঁ পার॥
শ্রীহরিভক্তিভাবে রহ। সকল জীবে দয়া বহ॥

সেব সে সাধুঙ্ক চরণ। দরিদ্রজনে দিঅ দান॥
ললাটে উর্দ্ধপুণ্ডর। কণ্ঠে তুলসীমাল্য ভর॥
নিত্যে নির্ম্মাল্য সেবা কর। মুখে শ্রীরামনাম ধর॥
তেবে তরিব ভবুঁ জান। নোহিলে হেব অকারণ॥”

ভাই সব! শ্রীহরিভক্তির বিমল পথ ছাড়িয়া কি নিমিত্ত তোমরা পঙ্কিল ভ্রষ্ট মার্গে বুড়িয়া রহিয়াছ? জীব সেই সাক্ষাৎ নারায়ণ, মূঢ় নর ইহা না জানিয়া সেই জীবকে হত্যা করিয়া থাকে। এ পাপের কি আর অব্যাহতি আছে? এ কার্য্যে জীবদ্দশাতেও সুখ নাই, মরিলেও নরক হইতে নিস্তার নাই। ভাইরে, তোমরা পার তো আমার কথা ধর—ভবপারে যাইবার উপায় অবিলম্বে অবলম্বন কর। শ্রীহরিতে ভক্তিমান্ হও। সকল জীবে দয়া কর। সজ্জনের চরণ সেবন করিতে থাক। দরিদ্রজনে দান কর। ললাটে উর্দ্ধপুণ্ড্র এবং কণ্ঠে তুলসীমাল্য ধারণ কর। শ্রীহরির শ্রীচরণার্পিত নির্ম্মাল্য-তুলসী নিত্য সেবন কর। আর মুখে শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন কর। তবেই ভাই! তোমরা ভবসাগর পার হইতে পারিবে, নচেৎ এই সুদুর্ল্লভ মানবজনম সকলই অকারণ হইয়া যাইবে।

বালকরামের এই ভক্তিপূর্ণ উপদেশ শুনিতেশুনিতে অনেকের মন ফিরিয়া গেল,—অনেকেই হরিভজনে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে এ কথা মদন-ভারতীর কর্ণগোচর হইল। শুনিয়াই তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠি-লেন এবং সশিষ্যে মারমার রবে বালকরামের বধোদ্দেশে ধাবিত হইলেন।

ভারতীর পরিধানে রক্তবসন। ললাটে রক্তচন্দনের ত্রিপুণ্ড্র, তদুপরি সিন্দুরের স্থূলবিন্দু। আরক্ত নয়ন। আরক্ত গণ্ডস্থল। মস্তকে তাম্রবর্ণ-জটা। গলে রক্ত জবা এবং রক্তচন্দনচর্চ্চিত রুদ্রাক্ষের মালা। হস্তে রক্ত-রঞ্জিত খড়্গ। ওঃ, সে কি ভীষণ মুর্ত্তি,—স্বয়ং প্রমথপতিই যেন প্রলয়-লীলায় প্রমত্ত হইয়াছেন!

বালকরামদাসের দলও বড় যেমন তেমন নয়,—লোকবাহুল্যেই বল, আর অস্ত্রশস্ত্রেই বল, তাহারা বিশেষ প্রবল। ভারতী দূর হইতে তাহাদের দেখিয়া নিজের দুর্ব্বলতা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন। ভাবিলেন,—ইহাদের সহিত বিবাদ বাধাইতে গেলে নিজেরই জীবন হারাইতে হইবে। তার চেয়ে একটা কোন উপায় উদ্ভাবন করা যাউক, যাহাতে আমাদেরও মর্য্যাদা বজায় থাকে, আর উহারাও পলাইয়া যায়। উপায় উদ্ভাবন করিতে তাঁহার বড় বিলম্ব হইল না। কারণ তাঁহার মাথা এ সকল বিষয়ে খেলে বেশ। তিনি শিষ্যগণকে বলিলেন,—ছ্যাখ, তোমরা এক কার্য্য কর, ঐ বৈষ্ণবটার কাছে গিয়া বল যে,—বাপু হে, তুমি কোথা হইতে এখানে আসিয়া অকারণ লোকের বুদ্ধিভ্রম জন্মাইতেছ কেন? আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট করায় তোমার কি ধর্ম্ম হইতেছে বল। তুমি হয় এখান হইতে চলিয়া যাও, নচেৎ তোমার কিছু ক্ষমতা থাকে,—দেখাও,। হাঁ, মরা-মানুষকে যদি বাঁচাইতে পার, তবেই তোমার মহিমা বুঝা যাইবে, আমরাও তোমার পদানত হইয়া থাকিব।

ভারতীর শিষ্যবর্গ তৎক্ষণাৎ বালকরামদাসের সকাশে আসিয়া গুরু-মন্ত্রের আবৃত্তি করিলেন। বালকরাম শুনিয়া বালকের মত হাসিয়া উঠিল। হাসিতেহাসিতেই বলিল,—মড়াকে বাঁচাইলেই যদি যথেষ্ট ক্ষমতা দেখানো হয়, তবে ভাই, তোমরা কুমীরেপোকারই পদানত হওগে? সে তো প্রতিনিয়তই কত কীটের প্রাণনাশ করিয়া আপন বাসায় আনিতেছে, আবার তাহাকে আপন স্বরূপে পরিণত করিয়া জীবন দিয়া দিতেছে! ছিছি, সন্ন্যাসী তোমরা—তোমাদের এমন দুর্ব্বুদ্ধি কেন হইল? সহজেই জ্ঞানহীন লোক সকলকে কপট বিদ্যায় প্রতারিত করিয়া জ্ঞাননাশক উপদেশ দেওয়া কি তোমাদের কর্ত্তব্য? জান না, ইহাতে পরিণামে নরক-পাত কিছুতেই নিবারিত হইবে না? তদপেক্ষা তোমরা এক কার্য্য কর,—

এইরূপ লোক প্রতারণা ছাড়িয়া হরিভজনে প্রবৃত্ত হও, মঙ্গলময় সকলের মঙ্গল করিবেন। আর যদি তোমরা আমার কেরামতই দেখিতে চাও, তবে যাও,—একটা মড়া খুঁজিয়া-পাতিয়া লইয়া আইস, আমার নিজের কেরামত তো কিছুই নাই, যাঁহার কেরামতে সকলেরই কেরামত—তাঁহারই কেরামত দেখাইয়া দিব।

বালকরামের কথা শুনিয়া কয়েকজন বামাচারী তাড়াতাড়ি মড়া আনিতে চলিয়া গেলেন এবং অনেক কষ্টে একটা পচা পোকাপড়া মড়া যোগাড় করিয়া লইয়া আসিলেন। দুর্গন্ধে তাহার কাছে যায় কাহার সাধ্য? আনিয়া বালকরামকে বলিলেন,—বাবাজি, এই তো মড়া আনা হইয়াছে, এইবার একবার কেরামতটা দেখাও—ইহাকে বাঁচাইয়া দাও? দিতে পার তো তোমারই পক্ষে মঙ্গল, নতুবা তোমাকে হয় এদেশ ছাড়িতে হইবে, না হয় এই মড়ার সামিল হইতে হইবে, বুঝেছো?

বালকরামদাস হাসিতে-হাসিতেই বলিল,—হাঁ ভাই বুঝিয়াছি—বুঝিয়াছি। কেবল আমি বুঝিলে কি হইবে ভাই, আমার প্রভু যদি বুঝেন, তবেই না হয়? আমরা তো তাঁহার খেলার পুতুল,—তিনি আমাদের যে ভাবে খেলাইবেন, আমরা তো তেমনই খেলিব? আমাকে দিয়া এই মড়াকে বাঁচাইয়া দেওয়া যদি তাঁহার অভিপ্রেত হয়, এখনই বাঁচাইয়া দিবেন।

এই বলিয়া বালকরাম বালকের ন্যায় সরল প্রাণে দু'বাহু তুলিয়া দীন-বন্ধুকে ডাকিতে আরম্ভ করিল। অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর সে সেই মড়ার কর্ণে তারকব্রহ্ম রামনাম শুনাইয়া দিয়। উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল,—যে নামের গুণে গহন বনে মৃততরু মুঞ্জরিত হয়,—যে নামের গুণে সাগর-জলে পর্ব্বত-পাষাণ ভাসমান হয়, সেই নামের গুণে মৃতক! তুমি জীবিত হও—জীবিত হও।

ভক্তমুখোচ্চারিত শ্রীরামনামের কি অপূর্ব্ব প্রভাব, দেখিতেদেখিতে সর্ব্বজনসমক্ষে সেই গলিত শব হাঁকডাক ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল! দেখিয়া সকলের আর বিস্ময়ের সীমা নাই। বালকরামের প্রভাব আর কাহারও নিকট অপ্রকাশিত রহিল না। বামাচারি-সন্ন্যাসিগণ তাহার শরণাগত হইয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। সে দেশের রাজা-প্রজা প্রায় সকলেই তাহার নিকট বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। দেখিয়া-শুনিয়া মদনভারতী সে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। বালকরামদাসও তথায় এক মঠ এবং ধর্ম্মশালা স্থাপনপূর্ব্বক—কতিপয় প্রবীণ বৈষ্ণবের উপর পরিচালনের ভার অর্পণ করিয়া ৺পুরী অভিমুখে যাত্রা করিল। অসিবার সময় নৃপতিকে আদেশ করিয়া আসিল,—

"বেইলে—এহি ধর্ম্মে থিবু। সাধুঙ্ক চরণে সেবিবু॥
দুঃখি-দরিদ্রে দেবু দান। রাম-ভজনে নেবু দিন॥"

রাজন্ এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠানেই তুমি নিত্য নিরত রহিবে। সাধুর চরণ সেবা করিবে,—দুঃখি-দরিদ্রকে দান করিবে এবং ভগবদ্ভজনে দিন যাপন করিবে।

মহা আনন্দ উল্লাস করিতেকরিতে বালকরামদাস অল্পদিবস মধ্যেই শ্রীক্ষেত্রধামে আসিয়া উপস্থিত হইল। সিংহদ্বারে আসিয়া শ্রীপতিতপাবন দেবকে দর্শন করিয়া তাহার আনন্দ-আবেশ দ্যাখে কে? তাহার ভাব দেখিয়া সকলেই তাহাকে ধন্যধন্য করিতে লাগিল। তারপর সে যখন তিনবার শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া, বেঢ়ার চারিধারের শ্রীবিগ্রহ সকল দর্শন করিয়া, তাঁহাদের কৃপাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া, মণিকোঠায় যাইয়া নীলাচলের নীলকান্তমণিকে দর্শন করিল, তখন তাহার ভাবসাগর একেবারে উদ্বেল হইয়া পড়িল। প্রহরমধ্যেও সে আবেশ আর ভাঙ্গে না। দেখিয়া সকলেই অবাক্।

বালকরাম তথাকার সেবক-পূজক ব্রাহ্মণ-সজ্জন আতুর-ফতুর সকলকেই অকাতরে কাঞ্চন-বসন বিতরণ করিল। সকলের মুখেই তাঁহার দাতৃত্বের প্রশংসা। শ্রীনীলাচলনাথ তাহার মন এমন ভুলাইয়া ফেলিলেন যে, তাহার প্রাণ সেখান হইতে আর কোথাও যাইতে চাহিল না। ইন্দ্র-দ্যুম্ন-সরোবরের সন্নিকটে এক সুরম্য মঠ প্রস্তুত করাইয়া সেইখানেই সে ক্ষেত্রবাস করিতে লাগিল। মঠের বন্দোবস্ত সমস্তই লাহোরের মত ব্যবস্থাপিত হইল। বালকরাম নিজ মঠের কোন কার্য্যই দেখে না; উপযুক্ত শিষ্যগণই পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকে। তাহার নিজের কার্য্য—একমাত্র শ্রীজগন্নাথের দর্শন, আর তাঁহারই সেবায় সর্ব্বতোভাবে আত্ম-নিয়োজন। আহার,—তাহাও সেই শ্রীজগবন্ধুর মহাপ্রসাদ,—তা-ও দিনান্তে একবার মাত্র। কোন কোন দিন তাহারও আবশ্যক হয় না—প্রেমেই ভিতর ভরিয়া থাকে।

স্বভাবের নিয়মে বালকরামের দেহে বার্দ্ধক্য দেখা দিল, শ্রীভগবানের সেবা-সুখেও ব্যাঘাত জন্মিল। তাই তাহার সমাধি লইবার বাসনা জন্মিল। ভগবৎকৃপায় জীবন মরণ ভক্তের ইচ্ছাধীন, সাধারণ লোকের মত কর্ম্মের প্রেরণায় নয়। সুতরাং বালকরামের বাসনা সঙ্কল্পমাত্রেই পূর্ণ হইল। শিষ্যগণকে বলিয়া কহিয়া অবলীলাক্রমে বালকরাম ইহলোকের সম্বন্ধ অতিক্রম করিল। অবিরাম হরেকৃষ্ণ হরেরাম বলিতেবলিতে তাহার জিহ্বার স্পন্দন থামিয়া গেল। হৃদয়ের স্পন্দনও আর অনুভূত হয় না। শিষ্যগণ উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। পুরীবাসী নরনারী সকলেই সেই ক্রন্দনে যোগদান করিল। সমগ্র পুরীনগর হাহাকার-রবে ভরিয়া গেল। যেন সকলেরই পরম আত্মীয়ের বিয়োগ ঘটিয়াছে।

অনেক কাঁদাকাঁদির পর শিষ্যবৃন্দ বালকরামের দেহ সুগন্ধিসলিলে স্নান করাইয়া পুষ্প চন্দন-চর্চ্চিত করিল এবং বিমানে বসাইয়া মহাসমারোহে

সমাধিস্থলে লইয়া গেল। এই সমাধিস্থল বালকরামের আদেশে পূর্ব্বেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। শিষ্যগণ সমাধিস্থলে কর্পূরের শয্যা বিছাইল এবং বহুবিধ সুগন্ধদ্রব্যে তাহার ভিতর পরিপূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে গুরুদেবকে স্থাপন করিল। অমনি কোটিকণ্ঠ ভেদ করিয়া হরিহরি জয়জয় ধ্বনি যুগপৎ উত্থিত হইয়া ভক্তের মহামহিমায় গগন-পবন ছাইয়া ফেলিল।

সমাধিকার্য্য শেষ করিয়া সকলে বিষণ্ণমনে আপনআপন স্থানে প্রস্থান করিল; শিষ্য সকলও মঠে ফিরিয়া আসিল। কেবল কয়েকজন খল করিল কি,—এই সংবাদ লইয়া তাড়াতাড়ি খোরধা অভিমুখে ধাবিত হইল। তথায় যাইয়া পুররাজকে জানাইল,—মহারাজ, পুরীধামের একজন বাবাজী কল্য মারা গিয়াছে, তাহার কুবেরের মত সম্পত্তি; হুজুর যদি সত্বর বন্দোবস্ত না করেন, এখনই পাঁচ জনে লুটপাট করিয়া লইবে। পুরীরাজ তৎক্ষণাৎ তাহাদের সঙ্গে অনেক সৈন্যসামন্ত লোকজন প্রেরণ করিলেন। বলিয়া দিলেন,—বাবাজীর ফৌতি সম্পত্তি সমস্তই যেন রাজসরকারভুক্ত করিয়া লওয়া হয়। তাহারাও কালবিলম্ব না করিয়া পুরীর দিকে ছুটিয়া চলিল এবং তথায় আসিয়া সর্ব্বাগ্রে বালকরামের শিষ্যগণকে মঠ হইতে তাড়াইয়া দিল। তারপর স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তির তালিকা করিয়া লইয়া প্রহরার বন্দোবস্ত করিল। তালিকা দ্রুতগামী দূতের হস্তে নৃপতির নিকটে প্রেরিত হইল।

মঠের সেবা-পূজা অধ্যাপনা সদাব্রত-দানাদি সমস্তই বন্ধ হইয়া গেল। শিষ্যগণ বালকরামদাসের সমাধিমন্দিরে গিয়া বালকের মত মহা ক্রন্দন জুড়িয়া দিল। কিছুক্ষণ ক্রন্দন করিতে করিতে গুরুদেবের অভয়-বাণী তাহাদের কর্ণগোচর হইল। তাহারা শুনিল,—গুরুদেব যেন বলিতেছেন,—ভয় নাই তোমাদের ভয় নাই, সত্বর তোমরা সমাধির আবরণ উন্মোচন কর, আমি স্বয়ং যাইয়া তোমাদের দুঃখ দূর করিতেছি।

শিষ্যগণের অনেকেই সাধক ও সুপণ্ডিত। তাহারা গুরুদেবের মহিমা জানিত। বিশেষত, সিদ্ধ-বৈষ্ণবের শরীর প্রাকৃতের মত দেখিতে হইলেও যে তাহা প্রকৃতির অতীত,—সেই কারণেই যে, সেই দেহের দাহের পরিবর্ত্তে সমাধির ব্যবস্থা, তাহা তাহারা জানিত। তাই তাহারা সেই কথায় অবিশ্বাস করিল না ;—তখনই সমাধির আবরণ উন্মোচন করিল। অমনি বালকরাম হাস্যমুখে সমাধি হইতে উত্থিত হইয়া শিষ্যগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে করিতে মঠে আসিয়া প্রবেশ করিল। নৃপতির লোক-সমূহকে হাসিতেহাসিতেই বলিল,—বলি বাপসকল, তোমরা তোমাদের নৃপতিকে যাইয়া বল, তাঁহার দুর্ব্বুদ্ধি হইল কেন? তাঁহার কি এত রাজ্য-ঐশ্বর্য্যেও আঁটিল না, শেষ বৈষ্ণবের বিষয় ধরিয়া টানাটানি? তা তিনি আমার সম্পত্তি লইবেনই বা কি প্রকারে? আমি মরিলেই না লইবেন? আমি এখন কিছুদিন রহিলাম, দেখি তিনি কি করিয়া আমার দেবসেবার বিষয় লইতে পারেন? যদি তিনি বিষয়ের লালসা ছাড়িয়া দেন ভালই, নচেৎ তিনি না মরিলে আমি আর মরিতেছি না। যাও,—তোমরা তোমাদের রাজাকে সত্বর যাইয়া এই সংবাদ জানাওগে।

ভগবানেরই এ খেলা। তাঁহার ভক্ত যে লোকদৃষ্টিতে মরিয়াও মরে না, প্রত্যুত তাঁহার শরীরের মত নিত্য সত্য, কেবল অপ্রকটভাবে অবস্থান করে মাত্র, এই তত্ত্ব অজ্ঞজনকে জানাইবার জন্যই তাঁহার এই নৃপতিসমীপে খলপ্রেরণাদি ব্যাপার। সে যাহা হউক, নৃপতির কর্ম্মচারি-গণ তো তিন-দিনের বাসি মড়াকে সমাধি ছাড়িয়া হাজির হইতে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছে,—ভয়ে বিস্ময়ে জড়সড় হইয়া গিয়াছে। তাহারা তাঁহার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। নৃপতির অগ্রে যাইয়া যথা কথা জানাইল। ধনমদান্ধের দৃষ্টি তো সহজে খুলে না,

তাই দুষ্টবুদ্ধি রাজা আবার তাহাদিগকে আদেশ করিলেন,—যাও, তোমরা সত্বর গিয়া বৈরাগীটাকে ধরিয়া লইয়া আইস, আমি স্বহস্তে তাহার শিরশ্ছেদন করিব, তারপর অগ্নিসংযোগে তাহার দেহ দগ্ধ করিয়া ফেলিব,—সকল আপদ চুকিয়া যাইবে।

রাজ-আজ্ঞা শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত। মন্ত্রিপ্রভৃতি সকলেই নৃপতিকে বলিলেন,—মহারাজ! এরূপ আদেশ করিবেন না করিবেন না। যিনি মৃত্যুর তিনদিন পরে আবার ফিরিয়া আসিতে পারেন, তিনি কি একজন সামান্য ব্যক্তি। জন্মমৃত্যু যাঁহার ইচ্ছাধীন, তাঁহার দ্রোহ আচরণ করিলে এ রাজবংশ সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইবে মহারাজ! সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

নৃপতি এ কথার আর কোন প্রত্যুত্তর দিলেন না। সেই দিন হইতে দশমদিনে তাঁহাকে শৌর্য্য-বীর্য্য দম্ভ-অহঙ্কার সমস্তই মৃত্যুর হস্তে ডালি দিতে হইল। বালকরামও শিষ্যগণকে ভীতিহীন দেখিয়া আবার সমাধিমন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক চিরসমাহিত হইল। ভক্তের এই মহা প্রভাবের কথা নিমেষে সকল দেশে প্রচারিত হইয়া পড়িল। সেই দিন হইতে বৈষ্ণবের দ্রোহ আচরণে সে দেশের সকলেই বিরত হইল। জয় ভক্তের জয়। জয় ভক্তাধীন ভগবানের জয়।

— —

নন্দ মহান্তী।

ভাব লইয়া ভাষা। ভিতরে ভাবের ভাষা আগে নীরবে ফুটিয়া উঠে, তার পর মুখ দিয়া সেই ভাষা বাহিরে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সকলের ভাব সমান নয়। তাই একের ভাষা অপরের ভাষার সহিত সমান হয় না। তবে এখানকার ঘট-পট ধন দৌলত বিষয়-বৈভব লইয়া যাহারা ব্যাপৃত, তাহাদের ভিতরের ভাব প্রায় এক প্রকার, সুতরং মুখের কথাও প্রায় সমশ্রেণীর। আর যাঁহারা এ সংসার-ছাড়া সামগ্রী লইয়া কালযাপন করেন, তাঁহাদের ভাবও একধরণের,—ভাষাও তা-ই। এরূপ লোক কিন্তু বড় বিরল, তাই এই কতিপয় লোকের কথা এই কতিপয় লোক ভিন্ন অপর কেহ বড় বুঝিতে পারে না। সুতরাং অপর সাধারণের কাছে ইঁহাদের কথা পাগলের প্রলাপ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এই কারণেই সংসারী আমাদের কাছে জ্ঞানিগুরু মহাদেব, পরমহংস শিরোমণি শুকদেব, আর প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রভৃতি এবং প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞানি-ভক্ত সকলেই পাগলের শ্রেণীভুক্ত। আমাদের অন্তরের ভাব যতদিন না সংসারের সামগ্রী ছাড়িয়া তাঁহাদের আদর্শে সংসারের অতীত সামগ্রীকে বরণ করিতে পারিবে, ততদিন তাঁহাদের কথা আমাদের কাছে প্রলাপ আখ্যায় প্রখ্যাত হইবেই। হইতেছেও তা-ই। নচেৎ নন্দ মহান্তীর মত একজন ভজননিষ্ঠ বিজ্ঞ ব্যক্তিকে কখন 'পাগল' বলিয়া নানা নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইত না।

চারিশত বৎসরের অতীত ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, পুরীরাজ প্রতাপরুদ্র প্রথম জীবনে একজন রুদ্র-রসের অবতার বজ্রাদপি কঠোর শাসক ছিলেন। প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গের অমিয়ময় সঙ্গপ্রভাবে শেষ জীবনে তিনি একজন বিনয়বিনম্র কুসুমকোমল ভক্ত হইয়া উঠেন। তাঁহার পূর্ব্ব জীবনের ইতিকথার এক পৃষ্ঠায় দেখা যায়, নন্দ মহান্তী নামে তাঁহার একজন প্রীতিপাত্র 'পাত্র' ছিলেন। ইনি মহারাজের ষোলজন 'পাঞ্জিয়' বা 'রেকর্ড কীপারের' মধ্যে প্রধান। মহারাজ প্রীতিবশে ইঁহাকে "পট্টনায়ক" উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছিলেন। তাই সাধারণ লোকে ইঁহাকে "নন্দ পট্টনায়ক" বলিয়া ডাকিত। রাজার প্রিয়পাত্র বলিয়া সর্ব্বত্রই যথেষ্ট খ্যাতিপ্রতিপত্তি। তাহার উপর অসামান্য দয়া-গুণে ইনি কেবল নৃপতির নয়, প্রকৃতিপুঞ্জেরও প্রীতির পাত্র ছিলেন।

নন্দ মহান্তীর দয়ার প্রবাহ কেবল মানব জাতির সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না,—সকল জীবেই সমভাবে প্রবাহিত হইত। কারণ তিনি বিচার পূর্ব্বক জানিয়াছিলেন যে'—

"জানই জীব নারায়ণ! সংসার যাহার ভিআণ।
কীটরু ব্রহ্মবাএ যেতে হরি সবুরি হৃদগতে॥
পিণ্ড মাত্রক ভিন্ন ভিন্ন। সর্ব্বত্র একই সমান॥
যে প্রাণী জীবদ্রোহ করি। সে নিশ্চে শ্রীহরি-বইরী

এই বিশ্ব-সংসার যাঁহার রচনা, জীবমাত্রেই সেই নারায়ণ। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রকীট হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহতের বৃহৎ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সকলের অন্তরেই সেই শ্রীহরি বিরাজমান। দেহ কেবল সকলের ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু অন্তর-বিহারী হরি সর্ব্বত্র সমান—সেই একই। যে কোন ব্যক্তি যে কোন

জীবের দ্রোহ আচরণ করে, সে নিশ্চয় সেই শ্রীহরিরই দ্রোহ আচরণ করিয়া থাকে। জীবদ্রোহী আর হরিদ্রোহী একই কথা।

এই সার কথা সততই তাঁহার অন্তরে গাঁথা ছিল। তাই তাঁহার সংসার কেবল পত্নী পুত্র লইয়া ছিল না। অনেক বিপন্ন-রুগ্ন অসহায় এবং নিরাশ্রয় জীবজন্তু তাঁহার পরিবারভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; মানবের ত কথাই নাই। এই বিপুল পরিবারের ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্তই তাঁহার রাজার চাকুরি করা—বিষয়ীর অন্ন অঙ্গীকার করা।

যেমন নন্দমহান্তী, পত্নী তেমনই গুণবতী। পতির অত পয়সা উপার্জ্জন, দু'খানা ভাল গহনা পরি—কাপড় পরি, কি, মনের মত কিছু আহার করি, এ সকল দিকে তাঁহার আদৌ দৃষ্টি ছিল না। তাঁহার দৃষ্টি ছিল একমাত্র পতির মতির দিকে,—পতির আচরিত পথের দিকে,—সেই বিপন্ন অনাথদিগের সেবার দিকে। তিনি অশ্রান্ত পরিশ্রমে তাহাদের সেবায় আপনাকে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। মনেমনেও গোবিন্দচরণে তাহাদের কল্যাণ কামনা করিতেন। ইহাই তাঁহার স্বার্থ, ইহাই তাঁহার পরম পুরুষার্থ।

জীবের যন্ত্রণা-দুর্গতি দেখিয়া সময়সময় তাঁহার দয়ার হৃদয় অতিমাত্র গলিয়া যাইত, নয়নের জলে বদন-বক্ষ ভাসিয়া যাইত, আর তিনি কাতর-কণ্ঠে বৈকুণ্ঠবিহারীর শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইতেন,—আর না, আর না প্রভু! জীবের যন্ত্রণা-দুঃখ আর দেখিতে পারিনা নাথ! হায়! জীবের কর্ম্মের বাঁধন কি এতই কঠিন, সর্ব্বশক্তিমান্ তুমি তাহা মুক্ত করিয়া দিতে পার না? দাও—দাও প্রভু! তোমার কৃপা-কৃপাণে ইহাদের কর্ম্মপাশ ছেদন করিয়া দাও।

ভক্ত ও অভক্তের দুঃখের অনেক পার্থক্য। ভক্তের তুলনায় স্বার্থপর অভক্তের দুঃখ আর কতটুকু? কেন না, সে কেবল আপনার সুখদুঃখ

লইয়াই ব্যস্ত। তবু সে সেটুকুও সহিতে পারে না ; কারণ সে তাহার দুঃখের পশ্চাতে দুঃখছাড়া আর কিছুই দেখিতে পায় না। তাহার দুঃখ তাহার কর্ম্মফলের বিকাশ মাত্র। কিন্তু ভক্তের দুঃখ অভক্তের তুলনায় বিশাল ও বিরাট। কেন না, সে দুঃখ যে তাঁহার সমগ্র জগৎ লইয়া। কিন্তু তবু ভক্ত তাহা সহিতে সক্ষম। কেন না, তিনি যে তাঁহার দুঃখের পিছনেপিছনে সেই আনন্দঘন ভগবান্‌কেই দেখিতে পান। আর তাঁহার দুঃখ যে তাঁহার কৃপাশক্তিরই বৃত্তিবিশেষ। এ দুঃখ যে তাঁহার সাধের দুঃখ। তাই পতি-পত্নী এই দয়া জনিত দুঃখ লইয়া একরূপ সুখেই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। এমন সময় হইল কি, একদিন প্রতাপরুদ্র নরপতি কতকগুলি প্রজার প্রতি অকারণ দণ্ড বিধান করেন। তাহাদের করুণ ক্রন্দনে নন্দমহান্তীর সদয় হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, প্রাণের আবেগে মহারাজের মুখের উপরেই বলিয়া ফেলিলেন,—

“বোইলে—শুন নৃপরাণ। জীব অটই নারায়ণ॥
তাহাঙ্কু দণ্ডমান দেলে। লাগই নিজ অঙ্গে ভলে॥
তুম্ভে সুবুদ্ধি নরবর। এ কথা কিপাঁ ন বিচার॥
এঠারে সিনা বড় সান। সেঠারে সমস্ত সমান॥
এঠারে সাআন্ত সেবক। সেঠারে জান সর্ব্ব এক॥
এঠারে নীচ উচ্চ অচ্ছি। সেঠারে এহা নাহিঁ কিচ্ছি॥
প্রবেশ হেলে সেহি স্থান। এ কথা সত্য করি ঘেন॥
সমস্ত সমান অটই। এঠারে ভিন্ন ভিন্ন হোই॥
জীব-আত্মা এ আদিকর্ত্তা। হে রাজা! ন করুচ্ছ আস্থা॥
যে প্রাণী জীবদ্রোহ করি। সে নিশ্চে বিষ্ণুঙ্ক বইরী॥”

মহারাজাধিরাজ! আমার কথা শ্রবণ করুন।—জীবমাত্রই নারায়ণ। তাহাকে দণ্ডদান করিলে, সে দণ্ড না আপন অঙ্গেই সংক্রামিত হইয়া

থাকে? দণ্ডিতের দুঃখ যে দণ্ডদাতাকেই ভোগ করিতে হয়। পুরুষ-শ্রেষ্ঠ! আপনি তো সুবুদ্ধিমান, এ কথা কি নিমিত্ত বিচার করিয়া দেখেন না? দেখুন,—বিচার করিয়া দেখুন, এখানেই তো আমাদের কাছে ছোট-বড় যাহা কিছু, সেখানে তো তাঁহার কাছে আর ছোট-বড় কিছু নাই.—তাঁহার কাছে তো ছোট বড় সমস্তই সমান? এখানেই এ প্রভু এ ভৃত্য ব্যবহার, সেখানে কিন্তু সকলেই এক বলিয়া জানিবেন। এখানেই এ নীচ এ উচ্চ বলিয়া বিচার, সেখানে কিন্তু এসকলের কিছুই নাই। আপনি সত্যসত্য জানিবেন যে, একবার সেই সর্ব্বেশ্বরের সমীপস্থ হইতে পারিলে, সমস্তই সমান হইয়া যায়,—ভিন্ন ব্যবহার ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়। এ ভিন্ন সে ভিন্ন, একথা যতদিন এখানে,—ততদিনই; সেখানে গেলে কিছুই থাকে না। মহারাজ! জীবাত্মা যে সেই আদি-কর্ত্তা নারায়ণ, একথায় আস্থা করিতেছেন না;—ইহা কি বিবেচকের কার্য্য? আপনি জানিয়া রাখুন মহারাজ! যে প্রাণী জীবের দ্রোহ করে, সে নিশ্চয় বিষ্ণুরই বৈরতা করিয়া থাকে। জীবদ্রোহে বা বিষ্ণুদ্রোহে কল্যাণ হয় না মহারাজ! কথনই কল্যাণ হয় না।

প্রজাবৃন্দের উপর দণ্ড-বিধানকালেই দণ্ডধারী প্রতাপরুদ্রের মূর্ত্তি প্রচণ্ডভাব ধারণ করিয়াছিল, নন্দমহান্তীর উক্তি শুনিয়া সেই মূর্ত্তি আরও অধিক প্রচণ্ড-ভাব ধারণ করিল। কর্ণের প্রান্তভাগ, চক্ষু, কপাল, সকলই আরক্ত হইয়া উঠিল। কুঞ্চিত ভ্রূযুগল এবং ললাট-রেখায় কোপের লক্ষণ সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইল। তিনি ফণাহত ফণীর মত ভীষণ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। তাঁহার ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠের সকল কথা কেহই বুঝিতে পারিল না। না পারিলেও, যে টুকু বুঝা গেল, তাহা হইতেই স্থির হইল যে, নন্দমহান্তীর আর অব্যাহতি নাই; এখনই যাহা হউক তাঁহার একটা প্রাণদণ্ড বা অন্য কোনরূপ দণ্ডের আজ্ঞা হইবেই।

হইলও তা-ই। কিছুক্ষণ তর্জ্জনগর্জ্জনের পর নরপতি বিদ্রূপভঙ্গীতে প্রহরিবৃন্দের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন,—যা, বেটাকে বন্দিমন্দিরে নিয়ে যা। ভারি জ্ঞানী রে! আমি রাজা, আমার চেয়ে আবার জ্ঞান বেশী! ভারি যে জ্ঞান, কই তোমার আত্মারামকে দেহ থেকে একবার বা'র ক'রে দেখাও? নয় জেলে প'চে মরগে। যা, শীগ্‌গির বেটাকে নিয়ে যা।

প্রহরিগণ অবিলম্বে মহারাজের আদেশ প্রতিপালন করিল। তথাপি নৃপতির ক্রোধের শান্তি নাই। তিনি বিশ্বস্ত দূতগণকে ডাকাইয়া বলিয়া দিলেন,—"তোমরা সত্বর বন্দিশালায় যাও, সাবধানে সজাগ থাক, যেন ওকে কেহ কিছু খাইতে না দেয়, আর ওর হাত-পা উত্তমরূপে বাঁধিয়া রাখা হয়। হয় ও ওর আত্মারামকে আমাকে দেখাইয়া দি'ক, নয় না-খেয়ে-খেয়ে শুকিয়ে মরুক।" দূতগণ অবনত-মস্তকে রাজ-আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক চলিয়া গেল। নরনাথও সভা ভঙ্গ করিয়া অভ্যন্তরে গমন করিলেন।

ভগবদ্ভক্তের বন্দিমন্দিরই বা কি, আর ভগবন্মন্দিরই বা কি; তাহার পক্ষে উভয়ই সমান। নন্দমহান্তীর বন্দিমন্দিরেও আনন্দের অভাব নাই। আনন্দময় ভগবান্ যে সেখানেও তাঁহার সঙ্গেসঙ্গে।

নন্দমহান্তী যোগাভ্যাসে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি প্রতিস্মৃতি শ্রীপতিময় করিয়া নিশ্চল আসনে বসিলেন। দেখিতেদেখিতে তাঁহার ইন্দ্রিয়দ্বারে কবাট পড়িয়া গেল। ক্রমে দেহে আত্মবুদ্ধিও বিলোপ প্রাপ্ত হইল। একে একে সকল চক্র ভেদ করিয়া সহস্রারে তিনি পরম-পুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। এ আনন্দ আর রাখিবার তাঁহার স্থান নাই। তিনি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন,—প্রাণিমাত্রেই শ্রীহরির শ্রীমন্দির, সকল মন্দিরেই শ্রীহরি বিরাজমান। তবে আর এ সংসারে ভয় করিবার—ঘৃণা করিবার কে আছে;—ভাবিয়া নন্দমহান্তী বন্দিশালা

হইতে বাহিরে আসিলেন। হস্তপদের শৃঙ্খল-বন্ধন কখন যে কে মোচন করিয়া দিয়াছে, তাহা তিনি জানিতেও পারেন নাই। প্রহরীরাও তাঁহার বহির্গমনে বাধা জন্মাইল না। তিনি বরাবর রাজপথে আসিলেন। আসিয়া দেখেন, একজন রমণী গমন করিতেছে, তাহার হস্তে অন্নপাত্র। সে কে, কি বৃত্তান্ত, মহান্তী কিছুই জানেন না। জানেন কেবল,—ইহারও হৃদয়ে হরি বিরাজিত। এইটুকু জানিয়াই তিনি তাহার হস্ত হইতে অন্ন গ্রহণ করিতে গেলেন। রমণী—চণ্ডালিনী ; তাহার অন্তরে তো আর মহান্তীর মত ব্রহ্মভাব প্রকাশিত হয় নাই ; সে তাই ভয়েভয়ে পলাইতে লাগিল। নন্দমহান্তীর তখন ক্ষুধা-বোধ হইয়াছে, ব্রহ্মবোধ ত আছেই ; তিনি বলপূর্ব্বক চণ্ডালিনীর হস্ত হইতে অন্ন লইয়া ভোজন করিলেন।

নন্দমহান্তীকে কে না চিনে ? সকলে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল,—হায় হায় করিতে লাগিল। মন্দলোকে বলিল,—মহান্তীর পোলা ভারি বড়পণা দেখাইতেছিল, এইবার ঠিক হইয়াছে,—রাজদণ্ডের ভয়ে খেপিয়া গিয়াছে। বাবা, অদৃষ্টের ফল কি কখনও খণ্ডানো যায় ? জাত গেলো মাগ-ছেলে গেলো, ধর্ম্ম গেলো কর্ম্ম গেলো ; এখন খাও চণ্ডালের ভাত, শেষ নরকে নিপাত !

চণ্ডালিনী যেমন নন্দমহান্তীর ভাব বুঝে নাই, ইহারাও তেম্‌নি তাঁহার ভাব বুঝে নাই। নীচুতে থাকিলেই এ ছোট এ বড়—এ ব্রাহ্মণ এ চণ্ডাল। উচ্চে উঠিলে এ ভেদ আর থাকে না,—সবই সমান হইয়া যায়। ব্যোমযানে চাপিয়া উচ্চে উঠিলে প্রথম প্রথম বাড়ী-ঘর গাছ-পাহাড় প্রভৃতির ছোট বড় বিচার করিতে পারা যায়, বেশী উচ্চে উঠিলে নীচের সবই একসা হইয়া যায় ; ছোট-বড় বিচার করিবার কিছুই থাকে না। নন্দমহান্তী সকলের উচ্চস্থানে উপনীত হইয়াছেন, তাই তাঁহার ব্রাহ্মণ চণ্ডাল

সকলই এক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু উচ্চ ভাব লাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না,—সকলেও বুঝে না। বরং না বুঝায় পাপ নাই, কিন্তু এই ভাব লাভ না করিয়া—ভাব-পাওয়ার মত ভাণ করায় মহা পাপ।

এদিকে হইল কি, রাজদূতগণ রাজার অগ্রে যাইয়া এই অদ্ভুত ঘটনা বিজ্ঞাপিত করিল। রাজা শ্রবণ করিয়া প্রথম ত অবাক্ হইয়া গেলেন, তারপর তাঁহার নাম লইয়া অনেক দুঃখ প্রকাশ করিলেন। সভাসদ্‌গণও হাহাকার করিয়া উঠিলেন। সমগ্র রাজসভাই যেন দুঃখের সুরে ছাইয়া গেল।

নন্দমহান্তীও নগর-গ্রাম ছাড়িয়া দুর্গম অরণ্যে যাইয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অন্তরে বাহিরে নিরন্তর ভগবন্মূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি,—বদনেও সেই ভগবন্নামের উচ্চ আবৃত্তি; এই আনন্দেই তাঁহার আহার-আদির অনুসন্ধান নাই। দেহ-মন-বাক্য তো আর হিংসার সম্পর্ক নাই, তাই তাঁহার উপর হিংস্র জন্তুগণেরও বৈরভাব নাই। হিংস্রজন্তুগণও মিত্রের মত তাঁহার সহিত ব্যবহার করে, তিনিও তাহাদের হৃদয়েহৃদয়ে হরিকে দেখিয়া আদর করেন। এইরূপে কিছুদিন বনেবনে ভ্রমণ করিয়া তিনি রথিপুর-নামক এক স্থানে আগমন করিলেন।

রথিপুর-গ্রামের বাহিরে এক বিপুল-কলেবর অশ্বত্থবৃক্ষ বহুকালের অতীত কথা বক্ষে লইয়া দণ্ডায়মান। সেই বৃক্ষের নাম—'সংহারি-স্তম্ভ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইরূপ নাম হইবার কারণ,—

"সে রাজ্যে যেতে দণ্ডমান। যাহাকু দিয়ন্তি রাজন॥
কেবল সেহি বৃক্ষমূলে। রথন্তি নেই রথু আলে॥
চেঙ্গি চাবুক ছাট পিটি। বাঙ্কিন নাক কাণ কাটি॥
রথন্তি সেহি বৃক্ষঠারে। প্রমাণ অচ্ছই তহিঁরে॥

সে রাজ্যে রাজা কাহাকেও দণ্ডবিধান করিলে রক্ষকগণ সেই বৃক্ষ-

তলায় লইয়া গিয়া তাহাকে রক্ষা করে। তাহার পর হুকুমমত দণ্ড দিয়া,—হয় চেঙ্গি (উচ্চমঞ্চের উপর হইতে শাণিত খড়্গের উপর ফেলিয়া দেওয়া) না হয় চাবুক বা ছড়ি পেটা, না হয় বাঁধিয়া নাক কাণ কাটিয়া দেওয়া, প্রভৃতি দণ্ড দিয়া তাহাকে সেই বৃক্ষের নিম্নভাগে রাখিয়া দেয়। এইরূপ দণ্ডে অনেকের প্রাণ সংহার হইয়া থাকে। এই সংহার-কার্য্যে সাক্ষী বলিয়াই বৃক্ষের নাম—'সংহারি-ওস্ত' বা 'সংহারি-অশ্বথ'।

নন্দমহান্তী এই বৃক্ষের মূলে গোময়-ভস্ম ছড়াইয়া অপূর্ব্ব শয্যা রচনা করিলেন এবং পরম সুখে শয়ন করিয়া হরিনাম গান করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন যায়। একদিন হইল কি, একটা প্রজার উপর রাজার দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে—পঁচিশ-ঘা 'কোবড়া' পিটিবার। রাজভৃত্যগণ তাহাকে সেই বৃক্ষমূলে লইয়া আসিয়া কোবড়াপেটা * করিয়া ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল। নন্দমহান্তী শুইয়াশুইয়া তাহা দেখিলেন। এ দেখা যেমন-তেমন দেখা নয়—আন্তরিক সহানুভূতির সম্মিলনমন্ত্রে সেই দণ্ডিত প্রজার সহিত অপনাকে এক করিয়াই দেখা। এ দেখা স্বার্থপর স্ব-সুখ-সর্ব্বস্ব তোমার আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব, কেবল স্বার্থগন্ধহীন পরার্থসর্ব্বস্ব সাধুমহাত্মারই সম্ভব। সেই দেখার ফলে এক অঘটন ঘটনা ঘটিয়া গেল—পর-পর পঁচিশটি কোবরার আঘাতে তাঁহার অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত এবং রুধির-ধারায় অনুরঞ্জিত হইয়া গেল। হইবে না-ই বা কেন? যদি কাহারও কাতরতা দেখিয়া, সেই কাতর ব্যক্তির মুখ নেত্র প্রভৃতির বিকৃতির অনুকৃতি তোমার আমার মত লোকেরও মুখনেত্রাদিতে আপনাআপনি অল্পবিস্তর ফুটিয়া উঠিতে পারে,—তাহার অন্তরের দুঃখও অল্পবিস্তর অনুভবের বিষয় হইয়া উঠিতে পারে, তবে সর্ব্বভূতে সমদর্শী সহৃদয় সাধুমহাত্মার এরূপ অবস্থা হইবে না-ই বা কেন?

* কোবড়া-পেটা—কাপড় বা দড়ি মোটা করিয়া পাকাইয়া, তাহার আগায় গেঁট বাঁধিয়া তদ্দারা প্রহার।

রথিপুর-গ্রামের সকল লোকই নন্দমহান্তীকে ভালবাসে। সকলেই তাঁহার জন্য দুঃখিত। অনেকেই হয় তো তাঁহার কাছে পূর্ব্বে অনেক উপকার পাইয়াছে, তজ্জন্য দুঃখিত; আবার অমন একজন সজ্জনের উন্মত্তের অবস্থা দেখিয়াও অনেকে দুঃখিত। তজ্জন্য তাহারা সর্ব্বদাই তাঁহার খোঁজখবর রাখিত। কেহকেহ আবার তাঁহাকে একজন সাধু মহাপুরুষ জ্ঞানে ভক্তিশ্রদ্ধা করিত। তাই তাহারা সময়-সময় তাঁহাকে দেখিতে আসিত। এরূপ নানা শ্রেণীর কতক লোক আসিয়া দেখিল,—নন্দমহান্তীব সকল শরীর ক্ষতবিক্ষত এবং রক্তেরক্ত। দেখিয়া তাহাদের আর দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। পরস্পর জিজ্ঞাসা করিয়াও প্রকৃত ব্যাপার জানা গেল না। নন্দমহান্তীকে জিজ্ঞাসা করিলেই বা কি হইবে, তিনি তো আর ভগবানের নাম ভিন্ন অপর কিছুই বলেন না? তাই তাহারা কতক লোক দ্রুতগতি যাইয়া নৃপতিকে জানাইলেন,—আহা মহারাজ! নন্দ-খেপাকে কে প্রহার করিয়াছে। তাহার সর্ব্বঅঙ্গ ফাটিয়া রক্তের বন্যা বহিতেছে মহারাজ! বন্যা বহিতেছে!

নন্দমহান্তীকে তখন সকলেই নন্দ-বাই বা নন্দখেপা বলিয়া ডাকিত, মহারাজও ডাকিতেন। তিনি নন্দখেপার এই দুরবস্থার কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ পাইকগণকে আদেশ করিলেন,—যাও, তোমরা সত্বর যাইয়া একখানি পাল্‌কি করিয়া নন্দকে এখানে লইয়া আইস। ব্যাপারখানা তো আগে বুঝা যাউক, তারপর তাহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া প্রহারকারীকে যেমন দণ্ড দিতে হয়, দেওয়া যাইবে। যাও তোমরা আর বিলম্ব করিওনা, ত্বরিতপদে চলিয়া যাও।

নৃপতির অনুমতি অনুসারে দূতগণ তৎক্ষণাৎ পাল্‌কী লইয়া নন্দমহান্তীর নিকটে গমন করিল এবং রাজার আজ্ঞা বিজ্ঞাপিত করিল। শুনিয়া নন্দ-মহান্তী তাহাদের সহিত পদব্রজেই মহারাজের সমীপে যাইয়া উপস্থিত হই-

লেন। পাল্কীতে কি তিনি চাপিতে পারেন? যাহারা পাল্কী বহিবে,তাহারাও যে তাঁহার শ্রীহরির শ্রীমন্দির। মহান্তীর অবস্থা দেখিয়া মহারাজের বড়ই দুঃখ হইল। তিনি ব্যাকুলভাবে স্নেহসিক্ত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন,—আরে আরে নন্দ! কোন্ মন্দ লোক তোকে এমন করিয়া প্রহার করিল রে? আহা আহা, দেখিয়া যে আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না?

যেন একটু অভিমানের সহিত একটু উপহাস মিশাইয়া—বড়-বড় চক্ষু দুইটা বাহির করিয়া নন্দমহান্তী নরনাথকে বলিয়া উঠিলেন,—ওগো,তুমিই তো আমাকে মারিলে' আবার তুমিই আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, কে মারিল? বাঃ—বেশ কথা ত!

শুনিয়া তো মহারাজের মুখে হাসি আর ধরে না হাসিতেহাসিতেই বলিলেন,—এঃ তোমার 'বাই' যে এখনও ছাড়ে নাই দেখিতেছি? উত্তরে নন্দমহান্তী কহিলেন, —হাঁ মহারাজ!—

"মোতে লগিচ্ছি যেউঁ বাই। তহিঁ কি মউষধ নাহিঁ॥"

যে 'বাই'এ আমাকে ধরিয়াছে, তাহার আর মহৌষধ নাই। কিন্তু নরনাথ!—

"কেমন্ত হেব সেহু ভল। এহা ত বিচার ন কল"

সেই 'বাই' সারে কিসে, তাহা ত একবার বিচার করিয়া দেখিলে না?

মহাজ্ঞানী মহান্তীর কথার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া মহারাজ তাঁহার উপর চটিয়া উঠিলেন। কিন্তু তাহা স্পষ্ট প্রকাশ না করিয়া—একটু রাখিয়াঢাকিয়া অবজ্ঞার ভাবে বলিলেন,—কিরে নন্দ! কি,—কি বল্ছিস্ কি? দৈব কি তোকে একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে;—আবার তুই আমার সঙ্গে লাগিয়াছিস্? ভাল, জ্ঞানী জ্ঞানী জ্ঞানী—ভারি জ্ঞানী তুই,তোর জ্ঞানের পরিচয়টা একবার আমার কাছে দিয়ে দে দেখি? নচেৎ কেবল কথায় কিছু হবার নয়।

. নৃপতি চটিলেও নন্দমহান্তী চটিবার পাত্র নহেন। তিনি হাসিমুখে নৃপতিকে নিবেদন করিলেন,—আচ্ছা মহারাজ! আচ্ছা,আপনার আদেশ অমান্য করিধ না। জ্ঞান তো সেই জ্ঞানঘন শ্রীভগবানের। তাঁহার কৃপায় তাঁহার জ্ঞানের বল কিঞ্চিৎ দেখাইয়া দিই। তা মহারাজ, এক কার্য্য করুন —আপনার কোন ভৃত্যকে কিছু পাকা কলা পাকা কাঁঠাল, ছানা ও নারিকেল আনিতে আদেশ করুন, তারপর আমি যাহা করিতে হয় করিতেছি।

নৃপতির ইঙ্গিতে তখনি কলা-কাঁঠাল ছানা নারিকেল আনা হইল। মহান্তীও সেইগুলি লইয়া এক-একজনকে একএক সামগ্রী খাইতে দিলেন। কাহাকেও কলা খাওয়াইলেন, কাহাকেও কাঁঠাল খাওয়াইলেন, কাহাকেও ছানা খাওয়াইলেন, আর কাহাকেও নারিকেল খাওয়াইলেন। তারপর মহারাজকে বলিলেন,—দেখুন মহারাজ! এই তোআপনাদের সম্মুখেই একএকজন একএক সামগ্রী আহার করিল—দেখিলেন, এইবার একবার আমার দিকে চাহিয়া দেখুন, দেখিলেই আমার জ্ঞান বিগ্রহ প্রভুর জ্ঞানের পরিচয় পাইতে পারিবেন।

এই বলিয়া নন্দমহান্তী হুড়্‌হুড় করিয়া বমন করিয়া ফেলিলেন। আশ্চর্য্য, সকলে যাহা খাইয়াছে,—সেই কলা-কাঁঠাল ছানা নারিকেল সমস্তই নন্দমহান্তীর উদর হইতে নিঃসৃত হইল! দেখিয়া কাহারও মুখে আর কথা বাহির হয় না। নন্দমহান্তী নরপতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—মহারাজ, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। অনুভব লইয়া কথা। অনুভব করিতে পারিলে সকল দেহের সুখ-দুঃখ আপন দেহে অনুভূত হইয়া থাকে। আত্মা এক বই দুই নয়। সকল শরীরেই তিনি অন্তর্য্যামিরূপে বর্ত্তমান। সেই আত্মাকে অনুভবের বিষয় করিতে পারিলে, —অপরের সঙ্গে আপনাকে এক করিতে—অপরের সুখ-দুঃখে আপনাকে

মাথাচোথা করিতে বড় বিলম্ব হয় না। আপন-আপনিই তাহা হইয়া উঠে। সংসারে-ভোলা সাধারণ লোক আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত—আপনার সুখ-দুঃখই তাহার অনুভবের বিষয়। আর ভগবানে-ভোলা অসাধারণ লোক আপনার অস্তিত্বটাকে সকলের মধ্যে লোপ করিয়া দেয়, তাই সকলের সুখ-দুঃখই তাহার নিজস্ব হইয়া দাঁড়ায়। মহারাজ, আপনার অনুচরগণ সংহারি অশ্বত্থমূলে যাইয়া একজন অপরাধি-প্রজাকে যে পঁচিশ-ঘা কোবড়া, প্রহার করিয়াছে, সেই প্রহারের সকল চিহ্নই এই আমার অঙ্গে লক্ষ্য করিতে আজ্ঞা হউক। এই কথা কাহাকে বলিবার নয়,—বলিয়া বুঝাইবারও নয়; কেবল আপনি আমার অন্নদাতা পিতা, তাই কিছু খুলিয়া বলিতে হইল। এখন অনুমতি হয় তো আমি আসিতে পারি।

নন্দমহান্তীর কথায় ও আচরণে মহারাজের নয়নের আঁধার অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু মনের আঁধার একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। প্রত্যক্ষে এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিলেও মহারাজের মন তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিল,—বুজ্‌রুকিতে ভুলিবেনা মহারাজ, মহান্তীর পোলা অসাক্ষাতে কলা-কাঁঠাল ছানা-নারিকেল খাইয়াছিল, তাই অন্য সামগ্রী আনিতে না বলিয়া ঐ সকল সামগ্রীই আনাইল এবং অপরকে খাওয়াইয়া—বমি করিয়া বাহাদুরি দেখাইল। ও বুজ্‌রুকিতে ভুলিবেন না মহারাজ! ভুলিবেন না। সংহারি-অশ্বত্থ-মূলে কে কোথায় কাহাকে পিটিল. আর তাহার চিহ্ন আসিল কিনা মহান্তীর পোলার পৃষ্ঠে? হাসির কথা মহারাজ! হাসির কথা। ভাল, আপনি একজনকে দু'চার ঘা সপাসপ্‌ বেত বসাইয়া দিন্‌ দেখি,—মহান্তীর পোলার গায়ে কেমন কোরে দাগ ফুটে উঠে?

মনের এই পরামর্শে মহারাজ করিলেন কি? কাহাকেও কিছু না বলিয়াকহিয়া প্রহরীর হস্ত হইতে বেত্র লইয়া হঠাৎ একজনকে

ঘা-কতক বসাইয়া দিলেন। এই দেওয়াও যা,—দেখিতেদেখিতে নন্দ-মহান্তীর অঙ্গ ফুটিয়া রুধিরের ধারা ছুটিতে লাগিল—ছালও কতকটা উঠিয়া গেল ; প্রহৃত ব্যক্তির কিন্তু কিছুই হইল না। নরনাথ তাহা দেখিলেন। এবার এ ব্যাপার স্বধু তাঁহার নয়ন নিরীক্ষণ করিলনা,—মনও দেখিল। দেখার সঙ্গেসঙ্গে তাঁহার সন্দেহ-রোগও সারিয়া গেল। তাহার যখন রোগ সারিয়া গেল—অম্নি রাজা নন্দমহান্তীর প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পাইলেন। এইবার তাঁহার পূর্ব্বের আচরণের কথা ভাবিয়া ভয় হইতে লাগিল। মহান্তীকে প্রসন্ন করিবার উদ্দেশে তাঁহার চরণতলে নানা উপঢৌকন রাখিয়া তিনি প্রণত হইলেন—ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। নন্দমহান্তী মহা সংকুচিতভাবে তাঁহাকে বলিলেন,—মহারাজ, এসকল সামগ্রীতে আমার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? আমি আপনার দাস, আমার প্রতি আপনার কৃপা থাকিলেই যথেষ্ট হইল। তাহার অধিক আর কিছুই চাই না। তবে একটা প্রার্থনার জিনিষ আছে। সেটা হইতেছে,—

"তুম্ভে এণিকি চেতা হুঅ। চির নুহেটি নরদেহ॥
চালুনি-মধ্যে যেহ্নে পানী। রখিলে ন রহে তা জানী॥
সেহি প্রকারে এহি জীব। কেবল চাহুঁ চাহুঁ যিব॥
এথকু জীবে দয়া করি। জাগ্রত হুঅ দণ্ডধারি॥"

মহারাজ! আপনি এ বিষয়ে একটু সচেতন হউন,—এই মানব-শরীর চিরস্থায়ী নয়। চালুনীর মধ্যে যেমন জল রাখিলে থাকেনা, নবচ্ছিদ্রযুক্ত এ দেহও জীবনের অবস্থা সেইরূপ,—দেখিতেদেখিতেই তাহা চলিয়া যায়। তাই বলি মহারাজ, সকল জীবে দয়া বিস্তার করিয়া একটু সজাগ হইয়া থাকিবেন।

নন্দমহান্তী নৃপতিকে এইরূপ উপদেশ দিয়া—বিদায় লইয়া চলিয়া

গেলেন। নৃপতির বহু উপরোধেও তিনি উপঢৌকন সামগ্রীর কণিকাও স্পর্শ করিলেন না। করিবেনই বা কেন? তিনিতো আর সাজা-জ্ঞানী নন যে, অভাবের দায়ে ছট্‌ফট্‌ করিয়া বেড়াইবেন। তিনি যে একজন যথার্থ জ্ঞানী। জ্ঞানের পূর্ণতায় যে তাঁহার অভাবের অবকাশই নাই।

নন্দমহান্তী তথা হইতে বরাবর খণ্ডগিরিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং এক গুপ্ত-গুহায় গুহা-বিহারী শ্রীহরির ভাবনায় ভবের লীলা সাঙ্গ করিলেন। আর তাঁহার মাংসের মূর্ত্তি কেহই দেখিতে পায় নাই, কিন্তু যশের মূর্ত্তি আজিও জগতে জীবিত রহিয়াছে।

নীলাম্বর দাস

——:০:——

বিষয় এবং ভগবান্—এই দুই এর মধ্যে কাহার আকর্ষণ অধিক? এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকেই হয় তো বলিবেন,—বিষয়ের আকর্ষণই অধিক। সংসারের আসক্ত অল্পজ্ঞ আমাদের এইরূপ উত্তরই স্বাভাবিক। কিন্তু বিশেষজ্ঞ মহানুভব ব্যক্তিগণ এ কথায় কিছুতেই সায় দিতে পারেন না। কেননা, তাঁহারা জানেন,—কোন্ এক অলক্ষ্য কারণে—কি জানি কাহার ইঙ্গিতে মানুষ যখন দিগ্বিদিগ্ জ্ঞান হারাইয়া 'ভগবান্ ভগবান্' বলিয়া উধাও হইয়া ছুটিতে থাকে, তখন ত্রিভুবনের কোন প্রলোভনের সামগ্রীই তাহাকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে না। এই ভুবন-ভোলানো শক্তি আছে বলিয়াই না ভগবান্ ভুবনমোহন? ভাগ্যবশে তাঁহার এই আকর্ষণে যিনি কখন পড়িয়াছেন, তিনিই ইহার বিক্রম বুঝিয়াছেন। তুমি আমি কখনও পড়িও নাই, বুঝিও নাই। তবে এ কথা সত্য যে, যাঁহারা এই আকর্ষণে পড়িয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য ঘটিলে, কিংবা তাঁহাদের লোকাতীত চরিত্রে বিশ্বাস জন্মিলে, হৃদয়ই এ আকর্ষণের বিক্রম বুঝাইয়া দেয়।

ভক্ত নীলাম্বরদাসের ভাগ্যের সীমা নাই, তাই তিনি শ্রীভগবানের আকর্ষণে পড়িয়াছিলেন, বিক্রমও বুঝিয়াছিলেন। বিক্রম বলিয়া বিক্রম? নীলাম্বরদাসের কি-ইবা না ছিল,—স্ত্রী বল পুত্র বল, ধন বল জন বল, এ সংসারের প্রলোভনের সামগ্রী কি-ইবা না-ছিল? কিন্তু যেদিন কি এক মোহন মন্ত্রে আকৃষ্ট হইয়া তিনি ভগবানের আকর্ষণে পড়িয়া গেলেন,

সেদিন আর তাঁহাকে এ সংসারের কোন সামগ্রীই আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারিলনা। বরং তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—

"যেতে এ পুত্র দারা ধন। এ সবু মায়ার বন্ধন।
এহাঙ্ক সঙ্গে সঙ্গে হোই। বি অর্থে গলা মোর দেহি ॥"

স্ত্রী পুত্র ধন-রত্ন সকলই মায়ায় ভুলাইয়া বাঁধিয়া থাকে। হায় হায়, ইহাদের সঙ্গে সঙ্গ ঘটিয়া আমার মানব জীবনই ব্যর্থ হইয়া গেল।

দরিদ্রের মনোরথের মত এই ভাব কেবল তাঁহার মনেই উঠিয়া মনেই লয় পাইল না, এই ভাবই তাঁহাকে বিষয়-বিরাগী গৃহত্যাগী করিল। তা না হইলে আর এ আকর্ষণের বিক্রমই বা বেশী কিসের?

নীলাম্বরদাস গৃহত্যাগ করিয়া ব্যাকুল-প্রাণে নীলাচল অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। সে ব্যাকুলতাই বা কত?—

"মাতা অন্তর পুত্র যেহ্নে। মাতা লোড়ই তার মনে ॥
সেই প্রকারে তার মন। চিন্তই সদা ভগবান ॥"

ঠিক যেন মাতৃহারা শিশু। সে যেমন মনেমনে মায়েরই জন্য লালাইত। নীলাম্বরদাসও তেমনই মনে মনে ভগবানের জন্য চিন্তাকুল। এইরূপে ভগবানের কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি চলিয়াছেন। দিগ্বিদিগের জ্ঞান নাই। আহারাদি দৈহিকসুখেরও অনুসন্ধান নাই। কেবল চলিয়াইছেন। তাঁহার দেশ হইতে নীলাচল অল্প পথ নয়। কোথায় উত্তর খণ্ডে তাঁহার বাড়ী আর কোথায় দক্ষিণখণ্ডে নীলাচল। এ কথাও তাঁহার মনের আলোচ্য নয়। তিনি কেবল চলিয়াইছেন। কত দুর্গম অরণ্য-পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া—বিঘ্নবাধার আক্রমণ হইতে নিস্তার পাইয়া, তিনি ভাগীরথীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বর্ষা কাল নদীর কূলে কূলে জল। বিস্তৃতিই বা কত? এ-পার ওপার নজর চলেনা। সুরতরঙ্গিনীর সে তরঙ্গ-রঙ্গই বা দেখে কে? দেখিলে নির্ভীক প্রাণেও

ভীতির উদ্রেক করে। অথচ নদী পার হওয়া প্রয়োজন। সন্তরণ-সাহায্যে পার হওয়া সহজ কথা নয়। নীলাম্বরদাস মহা সমস্যায় পড়িয়া গেলেন। বিশেষতঃ এই মাত্র তিনি এক পঞ্চক্রোশব্যাপী ভীষণ বন অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, বেলাও অধিক নাই, সূর্য্যদেব থাকিতে-থাকিতে নদী পারে নিরাপদ স্থানে না পৌঁছাইলেই নয়। সেখানে জন-মানবেরও নামগন্ধ নাই যে, কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবেন,—পারঘাটা কত দূরে? এ অবস্থায় তিনি কি করেন? করিবেন আর কি, ভগবানকেই ভাল করিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলেন।

এই ভাবেই কিছুক্ষণ যায়। এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে তিনি দেখিতে পাইলেন,—এক ধীবর নৌকায় চাপিয়া মাছ ধরিতে ধরিতে সেই দিকেই আসিতেছে। দেখিয়া তাঁহার বড় আনন্দ হইল। ভাবিলেন ভগবান কৃপা করিয়া আমার পারে যাইবার জন্য ইহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তিনি অমনি উচ্চকণ্ঠে তাহাকে ডাকিতে লাগিলেন,—কৈবর্ত্ত ভাই! কৈবর্ত্ত ভাই! নৌকাখানি একবার এইদিকে লইয়া আইস, এই বিপন্ন ব্রাহ্মণকে পার করিয়া দিয়া প্রচুর পুণ্যের অধিকারী হও। পারের পয়সা তুমি যাহা চাহিবে, তাহাই দিব; তজ্জন্য কোন চিন্তা নাই।

নীলাম্বরদাসের ডাক শুনিয়া ধীবর তীরে নৌকা ভিড়াইল এবং মিষ্ট কথায় আপ্যায়িত করিয়া তাঁহাকে নৌকায় চাপাইল। নৌকায় চাপিয়া ব্রাহ্মণের আর আনন্দ ধরে না; তিনি মনে মনে ভগবান্‌কে অগণিত ধন্যবাদ দেন। ব্রাহ্মণকে নৌকায় চাপাইয়া ধীবরেরও আর আনন্দ ধরে না; সে-ও মনেমনে ভগবান্‌কে অগণিত ধন্যবাদ দেয়। ব্রাহ্মণের ধন্যবাদ দিবার কারণ একরূপ, ধীবরের ধন্যবাদ দিবার কারণ আর একরূপ। ব্রাহ্মণ ধন্যবাদ দেন—পারে যাইবার তরী পাইয়া, আর ধীবর ধন্যবাদ দেয়—এমন একজন অসহায়

হীনবল আরোহী পাইয়া। দুষ্টের হৃদ্‌গত ভাব,—নদীমধ্যে লইয়া গিয়া ব্রাহ্মণের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লই, তারপর তাঁহাকে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করি, অনেক অর্থ পাইব,—আর আমার খাটিয়া খাইতে হইবে না।

ধীবর তো জানেনা যে, ব্রাহ্মণের যথাসর্ব্বস্ব তাঁহার স্কন্ধের কাপড়ের ঝুলির মধ্যে আবদ্ধ নয়, তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব তাঁহার হৃদয়ের ঝুলির ভিতর? ধীবর তো জানেনা যে ব্রাহ্মণের সঙ্গি-সহায় দেহের বাহির না থাকিলেও হৃদয়ের ভিতরে লুকানো আছে? তাই তাহার এই দুর্ব্বুদ্ধি! সে দুষ্টবুদ্ধির প্রেরণায় ব্রাহ্মণকে বধ করিবার উদ্দেশে বিরুদ্ধ-পথে নৌকা চালিত করিল। তীরের দিকে না চালাইয়া অগাধ জলের দিকে নৌকা চালাইতে দেখিয়া ব্রাহ্মণের মনে কেমন একটু সন্দেহ হইল। কিন্তু সে সন্দেহ প্রকাশ হইতে না দিয়া তিনি হাস্য-মুখেই ধীবরকে বলিলেন,—তোমার ভাই! খুব সাহস দেখিতেছি, তুমি মাঝগাঙ্‌ দিয়া পাড়ি জমাইতেছ! তা, যে তুফানের তোড়, অত সাহস না করিলেই ভাল। বেলাও বেশী নাই, সত্বর তীরে তরী লাগাইয়া দাও ভাই!—বাঁচিয়া যাই।

সে কথা তখন শুনে কে? ধীবর সেই সমভাবেই নৌকাখানি বিপথে লইয়া যাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণের কথার উত্তরে সে কেবল উপহাসের ভাবে মস্তকটা দুলাইয়া দিল মাত্র। এইবার ব্রাহ্মণের প্রাণটা যেন কেমন কেমন করিয়া উঠিল। তিনি সাহসে ভর করিয়া ধীবরকে একটু রূক্ষ ভাষায় বলিয়া উঠিলেন,—কি রে কি,—তোর মৎলবখানা কি? তুই কি আমায় মারিয়া ফেলিতে চা'স? আচ্ছা দেখি তুই কেমন করিয়া আমাকে মারিস।

ধীবর বিকট হাস্যের চোটে দিগন্ত ফাটাইয়া বিদ্রূপের স্বরেই বলিয়া উঠিল,—ওঃ ঠাকুরের যে ভারি ঝাঁজ দেখ্‌ছি, ঝাঁজ আর বেশীক্ষণ থাক্‌বে

না, এখনই সব থেমে যাবে। নাও—এইবার একবার যাকে ডাক্‌বার ডেকে নাও, আর ক্ষমতা থাকে তো আপনাকে সাম্‌লাও। বুঝ্‌লে ঠাকুর!..বুঝলে। আজ ভগবান্ তোমাকে নিরাশায় জুটাইয়া দিয়াছেন। এমন খোরাক ছাড়ি কি?

ব্রাহ্মণ ধীবরের সকল কথাই শুনিলেন। চারিদিক্ যেন তাঁহার ধোঁয়া-ধোঁয়া বোধ হইতে লাগিল। মাথা ঘুরিতে লাগিল। কাণের ভিতর ভোঁভোঁ করিতে লাগিল। তারপর যে ধীবর কি করিল, কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি একান্তমনে ভগবান্‌কে ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। মনেমনে কেবলই বলেন,—

"রথ হে কমলাবল্লভ। রথ হে নীলাদ্রি-সুলভ॥
বারণ-দুঃখ নিবারণ। বারেথ রখিবা শরণ॥
দেই করুণা-নাব তোর। বিপত্তি সমদ্রু উদ্ধর॥
তুম্ভর শ্রীমুখ-দর্শন। উত্তারু যাউ মো জীবন॥"

ওহে কমলা-নায়ক নীলাচলনাথ। আমায় রক্ষা কর হে রক্ষা কর। তুমি শরণাগত গজেন্দ্রের দুঃখও দূর করিয়াছ, আর আজ শরণাগত ব্রাহ্মণের দুঃখ দূর করিয়া দাও,—তোমার করুণার তরণী সাহায্যে বিপদসমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়া দাও। তোমার শ্রীমুখ দর্শন করিবার পর আমার জীবন যাউক, তজ্জন্য দুঃখ কিছুই নাই।

ব্রাহ্মণের অন্তরের আর্ত্তি অন্তর্য্যামী জনার্দ্দন জানিলেন। অমনি তিনি এক যুবক ক্ষত্রিয়ের বেশ ধারণ করিয়া গঙ্গাতীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ধাইতে ধাইতে তিনি ধীবরকে উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগি-লেন,—আরে, ও কে নৌকা নিয়া যায় রে? আয়,—শীঘ্র এ'দিকে আয়, প্রাণের আশা থাকে তো সত্বর নৌকা এই তীরে লইয়া আয়।

শ্রীহরির কণ্ঠধ্বনি তো সহজ নয়, সে যেন সিংহ গর্জ্জন। শুনিয়া

ধীবরের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। ভয়ে তাহার সকল শরীর কাঁপিয়া উঠিল,--নৌকা-বহা কঠিন হইয়া পড়িল। তীরের দিকে না চাহিয়াই সে যথাপূর্ব্ব ধীরেধীরে নৌকা চালাইয়া চলিল। যেন সে কিছুই শুনিতে পায় নাই। মায়া-ক্ষত্রিয়ের বারংবার রে-রেকার রবেও সে নৌকা ফিরাইল না। এইবার ভগবান্ হাঁকডাক ছাড়িয়া মনভেদী-শরে তাহার নৌকা বিদ্ধ করিলেন। ধনুকের টঙ্কার ও শরের হুঙ্কারে ধীবর অতিমাত্র ভীত হইয়া পড়িল। শরের দিব্য জ্যোতিতেও তাহার নয়ন যেন ঝলসিয়া গেল। এবার আর কিছু শুনি নাই বা দেখি নাই বলিবার যো নাই; কেন না, বাণ যাইয়া তাহার সম্মুখভাগেই নৌকাকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। সে ভয়েভয়ে ভাবে,—হায় হায়, কি সর্ব্বনাশ, ব্রাহ্মণ যদি বলিয়া দেয়, তবেই তো গিয়াছি। নৌকা ফিরাইয়া না লইয়া গেলেও তো নিস্তার নাই, শরাঘাতেই প্রাণ ছাড়িতে হইবে। ব্রাহ্মণের কিন্তু খুব কপালজোর যা'হক।

এইরূপ ভাবিতেভাবিতে সে তীরের দিকে জোরেজোরে নৌকা চালাইল এবং তীরে নৌকা লাগাইয়া মায়া-ক্ষত্রিয়ের চরণতলে লুটাইয়া পড়িল। নীলাম্বরদাস দেখিয়া-শুনিয়াই অবাক! তিনি যেন স্বপ্ন দেখিতেছেন! মায়াক্ষত্রিয় কোপের কর্কশ ভাষায় ধীবরকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে লাগিলেন। বলেন,—ব্যাটা ক্যাওট! তোর বুকের পাটাও তো কম নয়, তুই রাজার গণ্ডা না দিয়া বড় যে নৌকায় পারাপার করিতেছিস্? জানিস্ না, রাজা আমাকে এই গঙ্গাতীরের ইজারা দিয়াছেন? আমি সর্ব্বদা এখানে জাগিয়া বসিয়া আছি, বেটা আমায় ফাঁকি? এখন আমি যদি তোর মুণ্ডটা উপড়াইয়া ফেলি, তবে তোর কোন্ বাবা তোকে রক্ষা করে বল্ দেখি?

মায়াক্ষত্রিয়ের কথা শুনিয়া ধীবরের তো ধড়ে আর প্রাণ নাই। সে

তাঁহার চরণতলে মড়ার মত পড়িয়া রহিল। এইবার ভগবান্ কোপের মুখ কোপের স্বর বদ্‌লাইয়া ফেলিয়া নীলাম্বরদাসের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—ঝলি ও ঠাকুর, এস—নৌকা হইতে নামিয়া এস। আমি কে জান কি? বোধ হয় জাননা। আচ্ছা, আমিই তোমাকে আমার পরিচয়টা দিয়া দিই।—

"এ বন জগিবা নিমন্তে। শাড়ী দেইচ্ছি রাজা মোতে॥
যেঅবা খণ্টপণ করে। পথুকীজন ধন হরে॥
কিঅবা ধনবস্ত্র মান। ছড়াই করই নিধন॥
তাহাকু দেখিবা নিমন্তে। ঠণা মুঁ জগিথাই এথেঁ॥
এ কাণ্ডে তাঙ্ক প্রাণ হরি। পেশইঁ যমরাজা-পুরী॥"

সর্ব্বদা সজাগ থাকিয়া এই বন রক্ষা করিবার নিমিত্ত রাজা আমাকে পাট্টা দিয়াছেন,—আমার মাথায় সেই কাজের 'শিরোপা' বাঁধিয়া দিয়াছেন। যে কেহ এই বনে দুরন্তপনা করে,—পথিকজনের ধন অপহরণ করে, কিংবা বসন-ভূষণ কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে বধ করে, তাহাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই আমি এখানে থানা করিয়া জাগিয়া বসিয়া থাকি। এই যে আমার হস্তে ধনুর্ব্বাণ দেখিতেছ, ইহারই সাহায্যে আমি সেই দুষ্টদের যমালয়ে প্রেরণ করিয়া থাকি। ঠাকুর, বুঝলে আমি কে? তা ঠাকুর তুমি আমার থানার পাস দিয়াই আসিলে, একবার আমাকে সাড়াটাও দিয়া আসিতে হয়।

ব্রাহ্মণ যেন কেমন ঘুমভাঙার মত জড়ানো গলায় বলিয়া উঠিলেন,—যা বাপু, তোমার থানা যে বনের কোন্‌খানে ছিল, তা তো জানা ছিল না, তাই দেখা করিয়া আসিতে পারি নাই, তজ্জন্য কিছু মনে করিও না। দেখ বাপু, বড় ভাগ্যে তোমার দেখা পাইয়াছি। তোমাকে আমার একটি উপকার করিতেই হইবে। আমার প্রাণ প্রাণনাথ নীলাচলনাথকে দেখি-

বার জন্ত বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে, তাই আমি গৃহ-বিত্ত সকল ছাড়িয়া পথের বাহির হইয়াছি। তুমি যদি দয়া করিয়া আমায় গঙ্গাপারের উপায় বলিয়া দাও, তবেই আমি প্রাণকান্তকে যাইয়া দর্শন করিতে পারি।

হায় ব্রাহ্মণ, তোমার প্রাণনায়ক যে তোমার সম্মুখেই, চিনিতে পারিলে না? চিনিবেই বা কোথা হইতে? তিনি নিজে না চিনাইলে তো আর তাঁহাকে চিনা যায় না; জপে-তপে যোগে-যোগে কিছুতেই চিনা যায় না?

নীলাম্বরদাসের কথা শুনিয়া মায়াক্ষত্রিয় বলিলেন,—তার আর কি ঠাকুর, তুমি জগন্নাথকে দর্শন করিবে বলিয়া বাড়ীঘর ছাড়িয়াছ, তোমার কি বাঞ্ছা অপূর্ণ থাকিতে পারে? জগন্নাথই যে তোমার সকল পথে সহায় হইবেন। এই ক্ষুদ্র নদী পার তোমার পক্ষে আর কি একটা ব্যাপার, তুমি অপার ভবসাগরের পারে যাইবার অধিকার পাইয়াছ।

ব্রাহ্মণকে আশ্বস্ত করিয়া ভগবান্ ধীবরকে বলিলেন,—আর মড়ার মত পড়িয়া থাকিতে হবে না, ওঠ্,—যা শীগ্‌গির এই ঠাকুরকে গঙ্গা পার কোরে দে,—এই আমার সাম্‌নে দিয়ে দেখ্‌তেদেখ্‌তে এখনই পার কোরে দিতে হবে, নচেৎ এই তীর-ধনুক দেখিতেছিস্ ত? শীগ্‌গির ওঠ্।

ধীবরের পোলার এইবার ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া মায়াক্ষত্রিয়ের চরণতলে বারংবার প্রণাম করিতে লাগিল এবং অপরাধের ক্ষমা মাগিয়া লইয়া নীলাম্বরদাসকে নৌকায় বসাইয়া পারের পথ ধরিল। এবার আর ধীবরের মনেও কুভাব নাই, মুখেও কটু কথা নাই। ভগবানের দর্শন-সৌভাগ্যে তাহার সকল মন্দই ভাল হইয়া গিয়াছে। সে হরিনামের সারি গাহিতেগাহিতে গঙ্গায় গাড়ি দিতে লাগিল।

হায় হায়, ভক্তের মহা মহিমা আমরা বুঝিলাম না গো বুঝিলাম না! ভক্তকে বধ করিতে যাইয়াও ধীবর ভগবানের দেখা পাইল গো,

না জানি ভক্তের সেবায়-কি অমিয়ময় ফলই ফলে গো, কি অমিয়ময় ফলই ফলে!

গঙ্গার পরপারে যাইয়া নৌকা পঁহুছিল, নীলাম্বরদাস নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন; ভগবান্‌ও অন্তর্হিত হইলেন। ধীবর ব্রাহ্মণের চরণ ধরিয়া অনেক কাকুতিমিনতি করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিল। ব্রাহ্মণও প্রসন্ন-মনে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া নীলাচলের পথে প্রস্থান করিলেন। কত গ্রাম-দেশ নদ-নদী অতিক্রম করিয়া কিছুদিন পরে তিনি নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দৈবযোগে সেই দিন শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা। আনন্দ-উৎসবে নীলাচল যেন টলমল করিতেছে। হরিহরি জয়জয়-রবে গগন-পবন ভরিয়া গিয়াছে। বাদ্যকোলাহল এবং রমণীগণের হুলাহুলি সেই শব্দকে তুমুল-তর করিয়া তুলিয়াছে। নর্ত্তন-কীর্ত্তনের তো বিরামই নাই যেদিকে কাণ পাতিবে, সেইদিকেই আনন্দ-কোলাহল, যেদিকে নয়ন ফেলিবে, সেই দিকেই উল্লাসের দৃশ্য। শ্রীবলরাম, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথ সারিসারি তিনখানি সজ্জিত রথে শুভ বিজয় করিয়াছেন। গৌড়গণ মহানন্দে রথ-রজ্জু আকর্ষণ করিতেছে। আর গভীর গর্জ্জন করিতেকরিতে তিনখানি রথ পরপর গমন করিতেছেন। সেবকবৃন্দ দুবাহু তুলিয়া—"মণিমা! মণিমা!" (প্রভু! প্রভু!) ধ্বনি করিতেছেন। আনন্দের আতিশয্যে কেহ বা করতালি দিয়া নাচিতেছেন, কেহ বা অশ্রু বর্ষণ করিতেছেন, আর কেহ বা জড়বৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া গিয়াছেন। এমন সময় নীলাম্বরদাস শ্রীপ্রভুদের শ্রীরথাগ্রে যাইয়া উপস্থিত। তাঁহার আনন্দ রাখিবার আর স্থান নাই, ক্রন্দনেরও আর বিরাম নাই। এত দীর্ঘকালের পথপর্য্যটন, এত বিঘ্ন-বিপদের বিতাড়ন; এত অনিদ্রা এবং অনশন প্রভৃতির ক্লেশ তাঁহার একেবারে দূর হইয়া গেল। প্রেমাশ্রুর পবিত্র অভিষেকের এমনই মহিমা বটে!

নীলাম্বরদাস নীলাচলনাথে তন্ময় হইয়া প্রাণের প্রার্থনা জানাইলেন।

নয়নে-নয়নে না জানি তাঁহাদের কি কথাবার্ত্তা হইল। দেখিতেদেখিতে ভক্ত নীলালম্বরদাস শ্রীরথাগ্রে ঢলিয়া পড়িলেন। সেবকবৃন্দ সকলে গিয়া দেখেন,—শূন্য পিঞ্জর পড়িয়া আছে, প্রাণপাখী উড়িয়া গিয়াছে! হায় হায়, এই যে পাখী হরে কৃষ্ণ রাম নাম বলিতেছিল, বলিতেবলিতে কোন বনে উড়িয়া গেল গা? বুঝি বা বৃন্দাবনেই চলিয়া গেল!

মরণ বলিয়া মরণ, এ মরণ সাধ করিয়া বরণ করিতে হয়। দেখিয়া সকলেই বিস্মিত, সকলেই পুলকিত, সকলেই এ মরণের জন্য লালায়িত! দেখিতেদেখিতে এই আশ্চর্য্য মরণবার্ত্তা কোটীকণ্ঠে উদগীত হইতে লাগিল। অহো ভক্তের অপার মহিমা, তাঁহার মরণও মরধামে অমর হইয়া রহিল! আজিও যে এ মরণের জয়-ঘোষণার বিরাম নাই!

তুলসী দাস।

দক্ষিণদেশ—সমুদ্রতীরে বিজয়া-পাটনা নামক স্থানে তুলসীদাস বাস করিত। জাতিতে রজপুত। দেখিতে যেমন সুন্দর, হৃদয়ও তেমনই সুন্দর। শরীর ও মনের বল অসাধারণ। দাতা যেমন হইতে হয়,—প্রাণ প্রার্থনা করিলেও প্রদানে সমর্থ। অশ্বারোহণনৈপুণ্যের নিমিত্তও তাহার নাম দেশ-বিখ্যাত। বয়স বেশী নয়, কিন্তু পূর্ব্বজন্মের কি পুণ্য-প্রভাব বলা যায় না, এই অল্প বয়সেই তাহার বিষয়ের বদলে ভগবানে ভালবাসা জন্মিয়াছিল। ঘরে রূপগুণবতী যুবতী স্ত্রী, ননীর পুতলীর মত দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা, অবস্থাও মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে নিতান্ত মন্দ নয়, তথাপি তাহার মতিগতি সে-সকল দিকে ভুলিয়াও যাইত না কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে সংসারের সহিত যেটুকু সংবন্ধ রাখা আবশ্যক, সেই-টুকু সংবন্ধই সে রাখিত। তার পর, কোথায় ভগবৎকথা হইতেছে,—কোথায় ভগবন্নামকীর্ত্তন হইতেছে,—কোথায় ভগবন্মন্দিরে যাত্রা-মহোৎসব হইতেছে, এই সকলই সে দেখিয়া শুনিয়া বেড়াইত। তাহার শরীরের অপ্রমিত বল প্রধানত এই সকল সৎকর্ম্মের সহায়তায় কিংবা কোন বিপন্নের উদ্ধারকার্য্যেই নিয়োজিত হইত। মনের বলে সে যে কি না করিতে পারিত, বলা যায় না। তাহার এই মনের বলই তাহার শারীর-বলকে তুলনাহীন করিয়া তুলিয়াছিল। এই মনের বলের অনুগত শারীর-বলের সহায়তায় সে একবার লঙ্কাপতি রাবণকেই বধ করিতে ধাবিত হইয়াছিল।

তুলসীদাসের মত সরল শাস্ত্রবিশ্বাসী বড় একটা দেখা যায় না। সে শ্রীরামমন্ত্রের উপাসক। শ্রীরামচন্দ্রই তাহার ধন-প্রাণ ধ্যান-জ্ঞান—সক-

লই। শ্রীরামচন্দ্রের কথা পাইলে সে বিশ্বসংসার বিস্মৃত হইত। শ্রীরাম-চন্দ্রের পবিত্র চরিত্র আদ্যোপান্ত তাহার প্রতিদিন পড়া, বা শুনা চাই-ই চাই। তাহার রামচরিত্র পঠনও বিচিত্র—শ্রবণও বিচিত্র। পঠন বা শ্রবণের সময় তাহার সকল শরীরে সকল ভাব মুর্ত্তি ধরিয়া খেলিয়া বেড়া-ইত। যখন যেমন ভাবের কথা সে পড়িত বা শু'নত, সে অমনি সঙ্গে-সঙ্গে হর্ষ বিষাদ প্রভৃতি সেই সেই ভাবে অভিভূত হইয়া পড়িত। বাহ্য-জ্ঞান কিছুমাত্র থাকিত না। শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম-বিবাহাদি কথা শুনিয়া তাহার আর আনন্দ ধরে না, আবার বনবাসাদি কথা শুনিয়া তাহার আর দুঃখ ধরে না। কখনও আনন্দ-জলে কখনও বিষাদ-সলিলে তাহার নয়ন পরিপূর্ণ হইয়া পড়ে। ফলে শ্রীরামচরিত্র-শ্রবণ বা কীর্ত্তনকালে তাহার নয়নজলের আর বিরামই হয় না।

এইরূপেই তাহার রামকথানন্দে দিন যায়। একদিন হইয়াছে কি? সে এক যায়গায় শ্রীরামলীলা শুনিতে গিয়াছে। আর পাঁচজনে শুনিতেছে, সে-ও বসিয়া বসিয়া শুনিতেছে। শুনিতে শুনিতে রামের প্রেমে তাহার মন-প্রাণ কেমন গরগর করিয়া উঠিতেছে। এদিন ভাবের জমাটী বড় বেশী। সে কখনও হাঁসিতেছে, কখনও কাঁদি-তেছে, কখনও আনন্দভরে লাফাইয়া উঠিতেছে, কখনও বা বাহু এবং উরুদেশে চপেটাঘাত করিয়া মালসাট মারিতেছে। কি যে করে কিছুরই ঠিক নাই। এদিকে শ্রীরামায়ণপাঠক সীতাহরণকথা বর্ণন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আর রক্ষা নাই,—সর্ব্বনাশ! একেই শ্রীরামচন্দ্রের বন-গমন কথা শুনিয়া অবধি সে দুঃখভরে ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতেছিল, তারপর সে যখন শুনিল—শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীর প্রার্থনায় মায়ামৃগকে ধরিতে গেলেন,—মৃগের কপট চীৎকারে প্রতারিত হইয়া লক্ষ্মণও সেই দিকে গমন করিলেন,—পঞ্চবটীর পর্ণকুটীরে সীতা তখন একা পড়ি-

লেন,—আর সেই সময় সন্ন্যাসীর বেশে রাবণ আসিয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লঙ্কাপুরে গমন করিল, আর যায় কোথায়, সে অমনি লম্ফ দিয়া উঠিয়া পড়িল। ক্রোধে তাহার শরীর থর থর কাঁপিতেছে। আরক্ত চক্ষু অলাতচক্রের মত ঘুরিতেছে। স্বেদে সকল শরীর ভরিয়া গিয়াছে। দুই যুগ পূর্ব্বের কথা আজ যেন তাহার প্রত্যক্ষ! সে বিকট চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—কী-ই, এত বড় স্পর্দ্ধা, আমি থাকিতে আমার জননীকে অপহরণ? এখনই তোর উপযুক্ত দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেছি,— এখনই আমার মাকে আনিয়া রামের সহিত মিলিত করিয়া দিতেছি। আরে রাব্ণা! তুই যাবি কোথা,—রোস্-রোস্!

এইরূপ বলিতে বলিতে তুলসীদাস গৃহ অভিমুখে ছুটিল। তাহার কণ্ঠস্বর ক্রোধের আতিশয্যে গদগদ হইয়া গিয়াছে, সকল কথা কেহ শুনিতে বা বুঝিতে পারিল না। তাহার ঘন ঘন দন্তকড়মড়ি শুনিয়া ও ভীষণ ভ্রূভঙ্গী দেখিয়া কেহই তাহার কাছে যাইতে সাহসী হইল না। তাহার ভাবও কেহ বুঝিল না। তুলসীদাস বরাবর বাড়ীতে আসিয়া অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইল এবং বেগবান্ অশ্বে আরোহণ করিয়া—রাবণকে মারিয়া সীতা দেবীকে উদ্ধার করিতে চলিল। তীরের বেগও বুঝি তাহার অশ্ববেগের কাছে পরাভব স্বীকার করে! দূর হইতে লোকে কেবল দেখিল,—একটা ঘূর্ণায়মান ধূলিসমষ্টি দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া গেল!

তুলসীদাস তো ছুটিল,—সে কি একাএকাই ছুটিল? না না, তাহা হইবে কেন,—তার সঙ্গে আর একজনও ছুটিল। তিনি কে?—তিনি অপর কেহ নন, এই যিনি—যতক্ষণ আমরা অভিমানমাখা নিজের চোখে দেখি, ততক্ষণ আমাদের কিছু দেখেন না, আর তাঁর উপর সকল ভার দিয়া অভিমানশূন্য তাঁর চোখে দেখিলে, আমাদের হইয়া আমাদের সকলই দেখিয়া থাকেন,—সেই তিনি।

তুলসীদাস তো দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া সমুদ্রতীরে ছুটিয়াছে, সে তো আর নিজের বলিবার কিছুই রাখে নাই, সুতরাং নিজের চোখে কিছুই দেখিতে পাইতেছে না, তাই বলিয়া তিনি' তো আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না? তুলসীদাসের অশ্ব আর কত দ্রুত যাইবে বল, তার অগ্রেই 'তিনি' তথায় গিয়া উপস্থিত। তুলসীদাস অশ্ব হইতে অবতরণ না করিয়াই সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চায়, 'তিনি' অমনি সমুদ্রকে চুপি চুপি বলিলেন,—"ও সাগর সাগর সর-সর—থানিক দূর সরিয়া যাও।" তাঁহার কথায় সাগর সরিলে কি হইবে; তুলসীদাস তো সরিবার পাত্র ন'ন? সাগরের সেই গভীর গর্জ্জনমাখা উত্তাল তরঙ্গ কিংবা শুভ্রফেণের বিকট হাস্যও সে দেখে নাই, আর এখন সাগরের সরিয়া যাওয়াও তাহার লক্ষ্যের বিষয় হয় নাই। তাহার লক্ষ্য যে একমাত্র—লঙ্কায় গমন, তথায় যাইয়া রাবণকে নিধন, আর যেনতেন· প্রকারেণ শ্রীশ্রীসীতাদেবীকে আনিয়া শ্রীরামের সহিত মিলন-সংঘটন।

সেই 'তিনি' দেখিলেন—মহা মুস্কিল! আড়ালে-আব্‌ডালে থাকিয়া আকার-ইঙ্গিতে আর কাজ চলে না। কাজেই তাঁহাকে একটু আবরণের মাঝে আপনাকে লুকাইয়া মানুষের সাজেই দেখা দিতে হইল। 'তিনি' করিলেন কি? এক বিজ্ঞ-ব্রাহ্মণের বেশে তুলসীদাসের পশ্চাৎ হইতে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিলেন—ওহে, থামো থামো,—সাগরজলে পোড়ো না—পোড়ো না।

সে কথা তুলসীদাসের কাণেও পশিল না। সে কোন দিকে না চাহিয়া সমুদ্রের দিকেই ছুটিতে লাগিল। 'তিনি'ও দেখিলেন,—বিষম গোল—পিছন হইতেও আর চলিল না;—কি করি সম্মুখেই যাওয়া যা'ক্। 'তিনি' তুলসীদাসের সম্মুখে আসিয়া বাধা দিয়া বলিলেন,—আরে, কি কর—কি কর, বৃথা সমুদ্রজলে জীবন বিসর্জ্জন দাও কেন?

তুলসীদাস তাঁহার দিকে না চাহিয়াই ক্রোধভরে বলিয়া উঠিল, "কি বলেন মহাশয়! জগজ্জননী সীতাদেবীকে রাবণ হরণ করিয়া লইয়া গেল, আর আমি নিশ্চিন্তে থাকিতে পারি কি? আমি এখনই লঙ্কায় গিয়া সবংশে রাবণকে ধ্বংশ করিব, আর মা-জননীকে আনিয়া জগৎপিতা রামের বামে বসাইয়া দিব। যদি না পারি, আপন হস্তেই আপন প্রাণ বিনষ্ট করিব।" এই বলিয়া আবার ছুট্!

'তিনি' দেখিলেন,—এ সহজে ভুলিবার ছেলে নয়, দেখি আরও দু'একটা চাল চালিয়া দেখি, তারপর যাহা হয় করা যাইবে,—ধরা দিতে হয় দেওয়া যাইবে। 'তিনি' আবার বলিলেন,—আরে, তুমি তো দেখিতেছি মহা পাগোল,—বুদ্ধিশুদ্ধি তোমার কিছুই নাই? বলি,—লঙ্কায় গিয়া রাবণ তো মারিবে, তা এ সাগর পার হইবে কি প্রকারে? এ পাগ্লামি ছাড়িয়া বাপু! ফিরে এসো,—ঘরের ছেলে ঘরে চ'লে যাও,—কেন বেথোরে প্রাণটা খোয়াবে বল?

তুলসীদাসের সেই সমান অবস্থা,—সে সেই চলিতেছে আর বলিতেছে,—তাঁহার দিকে না চাহিয়াই বলিতেছে,—মহাশয়, আমায় আর আপনি বেশী কিছু বলিবেন না, আপনি আপনার কার্য্যে যাইতে পারেন, আমার প্রভুর নামের গুণে আমি গোষ্পদের মত সাগর লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় চলিয়া যাইব এবং রাবণকেও সবংশে বিনষ্ট করিব, দয়া করিয়া আপনি আমার কার্য্যে বাধা দিবেন না। এই বলিয়া দৌড় দৌড় ভোঁ দৌড়!

'তিনি' দেখিলেন,—এ ছেলে কাঁচা ছেলে নয়, ইহার মন যেমন পাকিবার পাকিয়াছে। ভাল, দেখি—আর একটা শেষ চাল চালিয়া দেখি, যদি ফিরাইতে পারি, নচেৎ সাক্ষাতে দেখা তো দিতেই হইবে। এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন, ধন্য বীর! ধন্য তোমার বীরপণার বলিহারি

যাই! কিন্তু বাপু! তুমি আর লঙ্কায় যাইয়া করিবে কি,—বধিবেই বা কাহাকে? তোমার রামই রাবণকে বধ করিয়া জানকীকে আনিয়াছেন।

তুলসীদাস এখনও ফিরে না,—ফিরে চায়ও না। সেই সমভাবে চলিতেচলিতেই বলিল,—ক্ষমা করিবেন মহাশয়, আমি আপনার কথায় বিশ্বাস করিত পারিতেছি না। আমাকে ফিরাইবার জন্য আপনি ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছেন।

"অচল যেবে হেব চল। শীতল হোইব অনল॥
নিশারে রবি উদে হেব। স্থাবর বচন কহিব॥
কর্পূর-চন্দন-বোলসি। অনল বরষিব শশী॥
এমন্ত হেলে অবা হেব। তুলসী অশ্ব ন ফেরিব॥"

অচল পর্ব্বত যদি সচল হয়, অনল যদি শীতল হয়, রাত্রিতে যদি রবি উদিত হয়, স্থাবর যদি বচন কয়, কর্পূর-চন্দনের প্রলেপ কিংবা আকাশের শশী যদি অনলবর্ষী হয়;—হয় তো এমন কখনও হইলে হইতে পারে, কিন্তু আপনি জানিবেন,—তুলসীদাস কখনও অশ্ব ফিরাইবে না। তবে, একটা কথা আছে; তাহা হইলেই বিশ্বাস করিতে পারি—অশ্বও ফিরাইতে পারি। যদি এই স্থানেই সাক্ষাতে দেখিতে পাই যে,—শ্রীরামচন্দ্রের বাম-ভাগে মা জানকী আমার বিরাজ করিতেছেন, শ্রীলক্ষ্মণও ধনুর্ব্বাণহস্তে তাঁহাদের সঙ্গে শোভা বিস্তার করিতেছেন, তবেই।

'তিনি' দেখিলেন,—মনের যতটা দৃঢ়তা হইলে তিনি আত্ম-সাক্ষাৎকার দিয়া থাকেন, তুলসীদাসের মনের দৃঢ়তা ততটাই হইয়াছে। এ মন কিছুতেই টলিবার নয়। কাজেই তিনি আর তখন করেন কি, ফাঁকি দিয়া টুস্কি মারিয়া আর পলায়ন করা চলিল না,—ভক্তের মনোমত মূর্ত্তিতে তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শনই দিতে হইল।

ও তুলসি! ও তুলসি! এই দ্যাখ্,—যা দেখিতে চা'স্ এই দ্যাখ্

বলিয়া 'তিনি' হস্তসঙ্কেতে ডাকিলেন। সে আহ্বানের স্বরে কেমন এক আকর্ষণ মাখানো ছিল, এবার আর তুলসীদাস না চাহিয়া থাকিতে পারিল না। সেই 'তিনি' এতক্ষণে 'ইনি' হইয়া গেলেন! দেখিয়া তুলসীদাসের উল্লাস দ্যাখে কে? সে বারবার তাঁহার চরণে প্রণাম করে, আবার উঠিয়া আনন্দভরে নৃত্য করে। মুখে কেবল বলে,—

"আজি কি ভাগ্যবল মোর। দেখিলি ব্রহ্মাণ্ড-ঠাকুর॥
কি কৃপা কলা প্রভু মোতে। পূর্ব্বে মো তপ থিলা কেতে॥
কি পুণ্যতীর্থে করি স্নান। দেই মু থিলি কেতে দান॥
দ্বিজবরে কি দান দেলি। কি গঙ্গাসাগরে ঝাসিলি॥
কি পুণ্যক্ষেত্রে বাস করি। হোই কি থিলি ব্রতাচারী॥
করি মু থিলি যজ্ঞ কেতে। কি শিব পূজি বিধিমতে॥"

হায় হায়, আজ আমার কি ভাগ্য—কি ভাগ্য!—আজ আমি ব্রহ্মাণ্ডের-নাথের দর্শন পাইলাম! প্রভু হে! আমার প্রতি তোমার কি করুণা কি করুণা! না জানি পূর্ব্বজন্মে আমি কত তপই করিয়াছি, কত পুণ্যতীর্থেই বা স্নানের পর দান করিয়াছি? না জানি কত দ্বিজবরের হস্তে কত দান অনুষ্ঠান করিয়াছি? অথবা হয় তো গঙ্গাসাগরসঙ্গমেই অবগাহন করিয়াছি? কিংবা কোন পুণ্যক্ষেত্রে বাস পূর্ব্বক ব্রতাচরণই করিয়াছি? আর নয় তো যথাবিধি শিবপূজাকরিয়া কত যজ্ঞই করিয়াছি? বলিহারি যাই প্রভু! বলিহারি যাই,—তোমার চরণতলে মস্তক রাখিয়া লুটাপুটী খাই প্রভু! লুটাপুটী খাই!

এই বলিয়া তুলসীদাস তাঁহার চরণতলে অবলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। শ্রীভগবান্ তখন হাস্যপ্রফুল্লমুখে তাহাকে ব'লিতে লাগিলেন,—তুলসি-দাসরে, তুই এতক্ষণ যে সকল কর্ম্মের কথা বলিলি, ওই সকল সকাম

কর্ম্মে আমায় চর্ম্ম-নয়নে দর্শন করা যায় না। কামনা মানবের মনের ভ্রম মাত্র। ভ্রমের কর্ম্মে কি কখনও যথার্থ বস্তু পাওয়া যায়? যে নিষ্কাম-ভাবে আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাকেই এইরূপে দর্শন দিয়া থাকি,—তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেও ভালবাসি। বৎস রে! তুই দেহ দৈহিক সকল ভুলিয়া অপার মহাসাগরে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলি,—তাই তো আমার সাক্ষাৎকার পাইলি? আমার ভক্তশ্রেষ্ঠ হনূমানের মন আর তোর মন—সমান। তাই আমি তোর উপর প্রসন্ন হইয়াছি। এখন তুই যে বর ইচ্ছা চাহিতে পারিস্,—তোকে আমি সকল বরই দিবার জন্য প্রস্তুত।

শ্রীপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া, তার উপর শ্রীমুখের সুধামাখা কথা শুনিয়া তুলসীদাসের সকল সাধই মিটিয়া গিয়াছে, ইহার উপর চাহিবার কি আছে যে, সে তাহা চাহিবে? অথচ প্রভুর বরগ্রহণের জন্য বারবার অনুরোধ। সে করে কি? কাজেই কাঁদিতেকাঁদিতে শ্রীপ্রভুর শ্রীপাদ-পদ্মে প্রার্থনা জানাইল,—বরের প্রলোভনে আর আমায় প্রলোভিত করিও না ঠাকুর! যদি বর দিতেই হয়, তবে এই বর দাও,—যেন শয়নে-জাগরণে তোমার এই শ্রীমূর্ত্তিই দর্শন করিতে পারি। আর যদি কখনও তোমার অদর্শনে মনপ্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে, তবে স্মরণমাত্র যেন তোমার আবির্ভাব দেখিয়া জীবন জুড়াইতে পারি। তা কালাকাল কিংবা স্থানাস্থান নাই ঠাকুর! যখন যেখানে ডাকিব, তখনই সেইখানে দেখা দিতে হইবে।

তাই হবে তুলসীদাস! তাই হবে—বলিয়া শ্রীপ্রভু অন্তর্হিত হই-লেন। তুলসীদাসও হিয়ার মাঝারে হরিকে জাগাইয়া—জগৎ জুড়িয়া হরির বিভূতি দেখিবার জন্য তীর্থযাত্রা করিল। এ তীর্থ সে তীর্থ দর্শন করিতেকরিতে তুলসীদাস প্রেমের ধাম শ্রীবৃন্দাবনধামে আসিয়া উপ-

স্থিত। সেখানে আসিয়া সে বনেবনে ভ্রমিয়া বেড়ায়, হরিণ-ময়ূর প্রভৃতি তাহার নিকটে আসে—ভালবাসা জানায়, দেখিয়া তাহার আর আনন্দ ধরে না। শরীর সর্ব্বদাই পুলকিত,—নয়ন সর্ব্বদাই প্রেমাশ্রু-পরিপ্লুত। ব্রজবাসী বালকবৃন্দ যখন তাহার কাছে আসিয়া হাত্‌তালি দিতেদিতে বলে,—

"শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরি-গোবর্দ্ধন।
মধুরমধুর বংশী বাজে এই বৃন্দাবন॥"

তখন সে যেন কেমনকেমন হইয়া যায়,—শ্যামবঁধুর মধুরমধুর মুরলী-ধ্বনিই যেন তাহার কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া যায়।

এইরূপ ভ্রমণ করিতেকরিতে সে একদিন এক মহান্তের মঠে আসিয়া প্রবেশ করিল। মহান্তের নাম—গোপালদাস। মহান্ত লোক মন্দ নন, —দেব-সেবায় বা অতিথি-সেবায় তাঁহার নিষ্ঠা ছিল, সাধন-ভজনও কিছু-কিছু করা ছিল। কিন্তু তাঁহার এক বিষম দোষ ছিল,—সকল সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবকে তিনি সমান-চক্ষে দেখিতেন না,—সমানভাবে আদর-অভ্যর্থনা বা সেবা-সৎকারও করিতেন না। যদি কেহ 'রাধা কৃষ্ণ' বলিয়া মঠে প্রবেশ করেন, তাঁহার পক্ষে উত্তম ভোজনের আয়োজন, আর যদি ,সীতা রাম' বা আর কিছু বলিয়া প্রবেশকরিলেই রূথাভাতের বন্দোবস্ত। তুলসী-দাসও বৈষ্ণব, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক, সুতরাং সে মঠে প্রবেশ করি-বার সময় "জয় রাম, জয়জয় সীতারাম" বলিয়াই প্রবেশ করে। ফলে প্রসাদ পাইবার সময় সে দেখে—রূথাভাত অসিয়া হাজির!

বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধারাণীর কি মর্জ্জি বলা যায় না। গোপালদাস তাঁহার রাজ্যে থাকেন, অথচ বৈষ্ণবে তাঁর এত ভেদবুদ্ধি, ভাল কথা তো নয়। তাই বুঝি তাঁহার বুদ্ধির বিশুদ্ধির নিমিত্ত তিনি মহাপ্রভাবশালী তুলসীদাসকে তাঁহার মঠে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

তুলসীদাস অনেক সময় উপবাস করিয়া কাটায়, নচেৎ যথালব্ধ আহার্য্যে উদর ভরণ করিয়া থাকে। হইলই বা 'রুখাভাত,' তাহাতে তাহার বড় কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু অন্তরে অন্তরে শ্রীরাধারাণীর কি প্রেরণা বলা যায় না. আজ তুলসীদাস খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে দুই এক কথা না বলিয়া থাকিতে পারিল না। তুলসীদাস হাস্য করিতে করিতে মহান্ত গোপালদাসকে বলিল,—বলি, মহান্ত মহারাজ! আমাকে কি এই 'রুখা-ভাতই খাইতে হইবে? ঐ যে অত ঘৃত অন্ন—অত উপকরণ, ও সকল তবে কাহাদের জন্য?

উত্তরে গোপালদাস বলিলেন—যে রাধাকৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন করে, সে মঠে দিব্য স্থান লাভ করে এবং উত্তম শালিধান্যের অন্ন ভোজন করিতে পায়, আর যে সীতারাম নাম কীর্ত্তন করে, এ মঠে তাহার ভাগ্যে মোটা-চাউলের মোটা অন্নই জুটে।

শুনিয়া তুলসীদাসের হাস্যের মাত্রা বাড়িয়া গেল। সে হোহো হাস্য করিতে করিতে বলিল,—আচ্ছা মহান্ত মহারাজ! আমি আপনার মঠে 'সীতারাম' বলিয়াই উত্তম উপকরণ-সমেত উত্তম অন্নই আহার করিব।

তুলসীদাসের কথাটা গোপাপালদাসের কাণে ভাল ঠেকিল না। তিনি চটিয়া উঠিয়া বলিলেন,—আরে যা যা—ও সকল গর্ব্ব অযোধ্যায় গিয়া দেখাগে যা। ভাল, তুমি যে এখানে ভাল ভাত খাবার ক্ষমতা ধর,—কই, তোমার সীতারামকে আমাদের দেখাতে পার কি? যদি পার, তবে তোমার গর্ব্ব করা সাজে। নচেৎ, কিসের গর্ব্ব—কিসের কি? মুখের ফাঁকা আওয়াজে কিছু হবার নয় বাবাজি।

মহান্তের কথা শুনিয়া তুলসীদাসের হাস্যের মাত্রা আরও অধিক বাড়িয়া গেল। হাসিতেহাসিতেই বলিল,—আচ্ছা আচ্ছা; বলি মহান্ত মহারাজ! আমি একবার শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে যাইবার আদেশ পাইতে পারি কি?

মহান্ত বলিলেন,—তা কেন পারিবে না,—একবার ছাড়া একশতবার যাইতে পারো,—কিন্তু তোমার সীতারামকে আমাদের দেখানো চাই বাবা! তার জন্য তুমি আমাদের যাহা করিতে বলিবে, সকলই করিতে প্রস্তুত।

তুলসীদাস আর কিছু না বলিয়া,—হাস্যভঙ্গীতে সম্মতি জানাইয়া শ্রীমন্দিরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। তার পর শ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তির নিকটে তাহার আর্ত্তি দেখে কে? সে কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল,—

"তূ নাথ দশরথসুত। কৌশল্যাগর্ভরু সম্ভূত॥
তূ সে দেবকীদেবীসুত। নন্দরাজন তোর তাত॥
তূ ধনুর্দ্ধর বলবন্ত। তূ বংশীধর জগজ্জিত॥
তূ সে জানকীদেবী-কান্ত। তোহর নাহিঁ আদি অন্ত॥
তূহি শ্রীরাধা-প্রাণধন। ভকতবন্ধু ভগবান॥
তূহি জগতজন হিতে। অনেক রূপ এ জগতে॥
ধরি জগৎ প্রতিপালু। এণু তূ পরম দয়ালু॥
এ কথা যেবে সত্য তোর। দেখাঅ রাম-অবতার॥

নাথ! তুমি সেই কৌশল্যাদেবীর গর্ভসম্ভূত দশরথের পুত্র। তুমিই সেই দেবকী তনয়, আবার নন্দনন্দনও তুমিই। তুমিই মহাবলবান্ ধনুর্দ্ধারী রাম, আবার তুমিই সেই জগদ্বশীকারি মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণ। তুমিই সেই অনাদি অনন্ত জানকীবল্লভ, আবার তুমিই সেই ভক্তের জীবন শ্রীরাধার প্রাণধন শ্রীভগবান্। তুমি জগজ্জনের হিতের জন্য অনেক রূপ ধারণ করিয়া থাক এবং সেই সেই রূপে জগৎ প্রতিপালন করিয়া থাক। অতএব তোমার মত দয়াল আর কেহই নাই। নাথ! একথা কি মিথ্যা কথা? কখনই নয়—কখনই নয়। যদি তাহাই হইল, তবে দয়া করিয়া একবার তোমার শ্রীরাম-অবতার মূর্ত্তি দেখাইয়া দাও।

ভক্তের প্রার্থনা—বিশেষত তুলসীদাসের মত ভক্তের প্রার্থনা ভগবান

কথনও অপূর্ণ রাখেন না। দেখিতেদেখিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীপ্রতিমা শ্রীসীতারাম প্রতিমায় পরিণত হইয়া গেলেন! সর্ব্ব-অবতারের অবতারী স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গে কোন্ অবতারই বা নাই, ইচ্ছা অনুসারে তিনি সকল অবতারমূর্ত্তিই আপন অঙ্গে প্রকাশ করিতে পারেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে এ ব্যাপার কিছুই অসম্ভব নয়।

দেখিয়া তুলসীদাস আনন্দের আতিশয্যে 'জয় সীতারাম' বলিয়া মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিল। দেখিয়া সকলে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া গেলেন। মহান্তের তো মুখ দিয়া কথাই বাহির হয় না। আনন্দ-ভরে সকলেই শ্রীমূর্ত্তিকে প্রণাম করিলেন। এইবার তুলসীদাসের আদর বাড়িয়া গেল, সে যাহা বলিয়াছিল তাহাই,—উত্তম অন্ন উত্তম উপ করণ তাহার ভাগ্যে জুটিল। মহান্তের প্রার্থনায় তুলসীদাস আবার শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল এবং শ্রীপ্রভুকে পূর্ব্বের মূর্ত্তিতে প্রকট করিবার নিমিত্ত স্তবস্তুতি আরম্ভ করিয়া দিল। অনর্গল নয়নের জলে তাহার বদন-বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। অশ্রুসিক্ত নয়নে শ্রীপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি ভাল দেখা যায় না। তুলসীদাস চক্ষু বুজিয়াই শ্রীপ্রভুর শ্রীপাদ পদ্মে প্রাণের প্রার্থনা জানাইতে লাগিল। অশ্রুবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে সে চাহিয়া দেখে,—অহো, সে সীতারামরূপ আর নাই, যে রাধাকৃষ্ণ সেই রাধাকৃষ্ণই সিংহাসনোপরি বিরাজ করিতেছেন! তাঁহাদের সেই স্মিত-সুভগ মুখ দেখিয়া তুলসীদাসের আনন্দসাগর উথলিয়া উঠিল। সে উর্দ্ধবাহু হইয়া তাঁহাদের করুণার জয়জয়কার দিয়া মন্দিরের কপাট খুলিয়া দিল। দেখিয়া সকলেই এ ওর মুখপানে চাহিয়া দেখেন,—বিস্ময়ের অতিশয্যে মুখ দিয়া আর কাহারও কথা বাহির হয় না। এই ভাবেই কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। তারপর শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করিতে করিতে সকলেই উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—

"বোইলা—নমো ভগবান। তো—তহুঁ ভক্ত নুহে আন ॥
যে হরি ভক্ত ভিন্ন করে। সে মহাপাপী এ সংসারে ॥
আম্ভে যা দেখিলুঁ সমস্ত। তূ ভক্তচ্ছলে দেহবন্ত ॥"

হে ভগবান্! তোমার চরণে প্রণাম। তুমি এবং তোমার ভক্ত—পৃথক্ পদার্থ নও। হরিহে, এ সংসারে যে তোমায় এবং তোমার ভক্তে ভেদজ্ঞান করে, তাহার মত মহাপাপী আর নাই। আমরা আজ যাহা দেখিলাম,—দেখিলাম—ভক্তের ছলে তুমিই হরি! দেহধারী হইয়া বিরাজ করিতেছ। জয় হরি! তোমার জয়,—তোমার ভক্তের ও জয়-জয়!

এই বলিয়া সকলে তুলসীদাসের চরণতলে প্রণত হইয়া পড়িলেন। বিনয়ের খনি তুলসীদাস দৈন্যসম্ভাষণে সকলের সমীপে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। ভক্তের প্রতিষ্ঠার ভয়—ভারি ভয়। আর তাঁহার সেখানে থাকা হইলনা,—তদবধি তাঁহার সমাচারও এরাজ্যের আর কেহই পাইলনা।

THE ASIATIC SOCIETY
CALCUTTA-16